উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে

পিএইচ.ডি. উপাধির জন্য প্রদত্ত

গবেষণা অভিসন্দর্ভ

উৎপল দত্তের নাটক : নাট্যচিন্তা ও রাজনৈতিক বাস্তবতা

গবেষক

কমলেশ মণ্ডল

তত্ত্বাবধায়ক

আশিস রায়

বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

সেপ্টেম্বর ২০২২

Ouriginal
by Turnitin

Document Information

Analyzed document	Kamalesh Mandal_Bengali.pdf (D143643586)
Submitted	2022-09-06 08:00:00
Submitted by	University of North Bengal
Submitter email	nbuplg@nbu.ac.in
Similarity	1%
Analysis address	nbuplg.nbu@analysis.urkund.com

Sources included in the report

W	URL: https://www.math.ucdavis.edu/~linear/linear-guest.pdf Fetched: 2020-03-21 17:02:05	7
W	URL: https://www.nrc.gov/docs/ML2007/ML20070C850.pdf Fetched: 2022-03-05 19:22:22	2

Entire Document

. . ! " # $% : $ ' ( ) *% + * % %, - ,. */ % 0 - 1 23 4544 . . ! " # $% : $ ' ( ) *% + * % %, - ,. */ % 0 - 1 23 4544 16 16 16 16 0 , ' # $% : $ ' ( ) *% + * ' - , % $! " % 9: ! " $ 0 - ,; - */ * ; 9: > 1% - 1% = % ; : ! " $ 0, < * 1,? % : * : (%, - ,.) % 16 16 16 16 0 , ' # $% : $ ' ( ) *% + * ' - , % $! " % 9: ! " $ 0 - ,; - */ * ; 9: > 1% - 1% = % ; : ! " $ 0, < * 1,? % : * : (%, - ,.) % . 0 - , , ; B ;% % " CDE5FD. H, , * """"समानो म : : : : सिमितः समानी"""" ashisroy@nbu.ac.in Accredited by NAAC With grade B++ [\5E[4DF\4] % = : * = : CERTIFICATE This is to certify that, Kamalesh Mandal has prepared his Ph.D. thesis entitled ' # $% : $ ' ( ) *% + * ' Under my supervision for the award of Ph.D. Degree of the University of North Bengal. He has fulfilled the requirements of the University rules and regulations in preparing the Said thesis. I further certify that this thesis has not been submitted in this form to any other University or Institution previously for Ph.D. Degree. To the best of my knowledge, it is an original work with sufficient academic merit, fit to be adjudicated for the award of Ph.D. Degree by the University of North Bengal. Date : (Ashis Roy) Supervisor Department of Bengali University of North Bengal i # $% : $ ' ( ) *% B # $% : $ ' ( ) *% B # $% : $ ' ( ) *% B # $% : $ ' ( ) *% B (area of the subject) (area of the subject) (area of the subject) (area of the subject) $; * - -* % 1- % *, * $ % 9 # c : * $ %, " , B '* , * , * d % 9 : * , , %) *% 1 e $, , % f , 1 -% g * %h i 9: 1 , e * * $, 1 - , j' , k % , l- - m * * ' n o" e % 9 : 0, < * p " (*" % B 1 - 1o) *% *" ; 9 , o 0, , % ,p $ 9 * q ' * ; 9 $ % 0 % (% i , *: # r F[4[4[, ": 19 $ 1h % * ' s ' , * 1 n i 9 : , $ " 19 $ 1h % * % $ % ; %$,mt % 9 : F[Eu – E[, % n , *) *% w " f * ,B = ,B = ; 9 : - - x* oB t y 1 * - ; * z - d , 1 - $ 6 *{ * % , | $" t ;(, * } 9 % o > ~ : < * y 0 1h % - (- 6 $ 9 6$ g * : F[E5 , 0 ! o " % - , * 9 % (" - : F[E5 ,B , %+ + €; % : *= 1h % % x= .* % * }, ; 9 : F[E4- * 9 n 0 ! , F[ED- „ $- - pn ' - ; 1 = 1 ,j' , % , ,B z (* ; * m * * * ' B B ... % 9 o *z * ; 9 * $ % ," 0 *) *% $% (% „* €; % 9 * } B, > - , %" *, B† , z , ,"*‡ m * , t % €* % (0ˆ *{ % 9 * : %m* * 9 % '1 ‰|': F[E[B , % , % $ % Š% = ii , '1 $ ' = 1h % } , ; * h : * = o $ }, ; 1 ‹ 1 " % n , : z - 1-% ', , $' $ % , * }, % : z 0 (B $ $ % % 9 : * 1h % * % 0 9 z * % * ; : % 9 % % % $%, * ... % 9 - *, Œ*, * , B - tn , € * Ž : * B† , (* ‡ , t $ % , ; 9 | * * % } B, > $% % $ % , , B (- (, , B % %h * 9 : 0, % e ; # $% 0 : ,% 6$ e * 0, $% ' %" * † ' - ,) *% ,) *% d' * 0 € ; : # * $ %) *% B " - %m *' 1 = 9 : h * $ %) *% B 1*, 1% e % : ,p * 1 % ' # $ % ' $ ' ( ) *% B ' % $ €; % 9: * p " 0 % ," ey q = * p " 0 % ," ey q = * p " 0 % ," ey q = * p " 0 % ," ey q = (A brief ove (A brief ove (A brief ove (A brief overrrr---- view of literary work already done in area of the proposal) view of literary work already done in area of the proposal) view of literary work already done in area of the proposal) view of literary work already done in area of the proposal) 19 $ 1h % # * %$ - r : *" , ™ *% ™ * % o" n , # š $% n 1 ? % , * † $% i% * † * %, ›t , - 0% " B % * h %: * ' %" * - 0€; : i; # ; * % = * , $ % ;(/(* † $ % (- %," 0, : * † $% š > >% %9B %9B 1 = 1 9 $ * * † $% ' %"* p " = (; : h $ % ; * % < (<*‡: $ % (œ > < (<*‡* 9 : $ % 0 % ;) *% * % * 1,? %* 9 : * h, $ %, o ;

Forwarded

Asst. Professor
Dept. of Bengali
University of North Bengal

কমলেশ মণ্ডল
28.09.2022

Scanned by TapScanner

ঘোষণা

আমি 'উৎপল দত্তের নাটক : নাট্যচিন্তা ও রাজনৈতিক বাস্তবতা' শিরোনামে একটি গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা করছি। এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আশিস রায় মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছে। গবেষণা পত্রের কোনো অংশই অন্য কোনো উপাধির জন্য দাখিল করা হয়নি। এই অভিসন্দর্ভটি আমার স্বরচিত এবং মৌলিক রচনা।

কমলেশ মণ্ডল

তাং : ২৫.০৭.2022

(কমলেশ মণ্ডল)
গবেষক
বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

Scanned by TapScanner

ড. আশিস রায়
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

"समानो मन्त्र: समितिः समानी"
Accredited by NAAC With grade B++

রাজা রামমোহনপুর
দার্জিলিং ৭৩৪০১৩, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ashisroy@nbu.ac.in
৯৮০৪৯২৩১৮২

স্মারক সংখ্যা : তারিখ :

CERTIFICATE

This is to certify that, Kamalesh Mandal has prepared his Ph.D. thesis entitled 'উৎপল দত্তের নাটক : নাট্যচিন্তা ও রাজনৈতিক বাস্তবতা' Under my supervision for the award of Ph.D. Degree of the University of North Bengal. He has fulfilled the requirements of the University rules and regulations in preparing the Said thesis.

I further certify that this thesis has not been submitted in this form to any other University or Institution previously for Ph.D. Degree. To the best of my knowledge, it is an original work with sufficient academic merit, fit to be adjudicated for the award of Ph.D. Degree by the University of North Bengal.

Date : 15.09.2022

(Ashis Roy)
Supervisor
Department of Bengali
University of North Bengal

Asst. Professor
Dept. of Bengali
University of North Bengal

উৎপল দত্তের নাটক : নাট্যচিন্তা ও রাজনৈতিক অনুষঙ্গ

বিষয় বিবরণী (area of the subject)

বাংলা নাট্য সাহিত্যে বিশ শতকের শেষের দিকের অন্যতম প্রতিভাবান নাট্যকার ছিলেন উৎপল রঞ্জন দত্ত। তার নাট্যকর্মের মধ্যে সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন। তার রচনার মধ্যে সমাকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, সামাজিক অবস্থা, দেশকালের উত্থান পতনের কথা উঠে এসেছে। সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তার নাট্য রচনার মধ্য দিয়ে দেশ বিভাগ, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, বিট্রিশদের অপশাসন প্রভৃতি অত্যন্ত নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। আমাদের স্বাধীনতা পূর্ব ও পরবর্তীকালে দুই বাংলা দেশে যেভাবে রাজনৈতিক পরিবর্তন হয়েছিল, যা আমাদের সামাজিক মূল্যবোধ পালটে দিয়েছিল তা রূপান্তরিত হয়েছে নাটকের বিষয় আঙ্গিক ও কাঠামোতে।

উৎপল দত্তের জন্ম ১৯২৯ সালের ২৯ মার্চ। ছোটোবেলা থেকেই অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যেই তিনি বেড়ে উঠেছিলেন। পরিবারের মধ্যে নাট্যচর্চা ছোটোবেলা থেকেই তাকে নাট্যকার হিসেবে অনেকটা সমৃদ্ধ করেছিল। ১৯৪৫ – ৪৯ সালের মধ্যে কলেজে পড়ার সময় তিনি নানান রাজনৈতিক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন। পাশাপাশি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উত্তপ্ত রণাঙ্গনে সোভিয়েত রাশিয়ার হাতে ফ্যাসিবাদী শক্তির পরাজয়, দেশে গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠাতা কমিউনিস্ট পার্টির নিষিদ্ধ হওয়ার মধ্যে দিয়ে তিনি শুনেছিলেন কালের যাত্রার পদধ্বনি। স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগে থেকেই এদেশে ও বিদেশে ঘটে চলেছিল নানা ঘটনার উত্থান পতন। ১৯৪০ সালের উত্তাল সময়ের আন্দোলন যা গর্জনকারী চল্লিশার মতো ছিল ভয়ংকর ও সর্বনাশা। ১৯৪০ সালের মুসলিম লিগ পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ করে। তখন থেকেই বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৯৪২-এ ভারত ছাড়ো আন্দোলন, ১৯৪৩-এ ব্রিটিশ উপনিবেশের চূড়ান্ত অভিশাপ হিসেবে দেখা গেল মন্বন্তর, কালোবাজারি, মুনাফাবাজ ও রাজনীতিবিদদের হাত ধরাধরি প্রভৃতি তিনি অত্যন্ত সুনিপুণভাবে উপলব্ধি করেছেন যা প্রতিফলিত হয়েছে তার নাট্যকর্মে। আসলে তিনি রাজনৈতিক নাটক ও অভিনয়কেই জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন এবং তা শুধুমাত্র অবশ্যই মার্কসবাদী রাজনীতি, পুঁজিবাদ, ফ্যাসিবাদ, ধর্মতন্ত্রবাদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে জনগণকে জাগ্রত করা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা করাই ছিল তার সাধনা। প্রকৃতই তিনি ছিলেন একজন ‘প্রোপাগান্ডিস্ট’।

১৯৪৯ সালে জুলাই মাসে কলেজ ম্যাগাজিনে ইংরেজি ভাষায় একটি একাঙ্কিকা লিখলেন

নাম ‘বেটিবেলসাজার’ এখান থেকে শুরু হয় তার পথ চলা। তার উল্লেখযোগ্য নাট্যাভিনয় শুরু হয় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়বার সময়। ফাদার উইভার-এর পরিচালনায় শেকসপিয়রের ‘হ্যামলেট’ নাটকের মধ্য দিয়ে তিনি অভিনয় শুরু করেন। এরপর ফাদার উইভারের পরিচালনায় আরও দুটি নাটকে অভিনয় করেছিলেন। তারপর থেকে তাকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। রচনা করেছিলেন একের পর এক কালজয়ী নাটক, তিনি উপলব্ধি করেছিলেন শাসিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত মানুষের পাশে না দাঁড়ালে সমাজের অগ্রগতি সম্ভব নয়। তিনি পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে নাটকের মধ্যে দিয়ে সরব হয়েছেন। তিনি রাজনীতি করার জন্য শুধুমাত্র নাটক রচনা করেননি নাটকের মধ্যে দিয়ে মানুষের চাওয়া-পাওয়া, মানুষের অধিকারের কথা তিনি বলেছেন।

আমার গবেষণা প্রকল্পের লক্ষ্য হল উৎপল দত্তের নাটক আলোচনা। সমকাল এবং প্রধান ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা নাটক সম্পর্কে তাঁর চিন্তা-ভাবনা, রাজনৈতিক প্রসঙ্গ, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হব। উৎপল দত্ত তার নাটকে বা রাজনৈতিক অনুষঙ্গ নির্বাচনে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। অথচ তার নাটকে রাজনৈতিক অনুষঙ্গ নিয়ে তেমন কোনো গবেষণা লক্ষ করিনি। মূলত সেই কারণেই ‘উৎপল দত্তের নাটকে ‘নাট্যচিন্তা ও রাজনৈতিক অনুষঙ্গ’ এই গবেষণা প্রকল্পটি গ্রহণ করেছি।

ইতিপূর্বে এ বিষয়ে আলোচনা বা গবেষণা কর্মের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা (A brief overview of literary work already done in area of the proposal)

ছোটোবেলা থেকেই উৎপল দত্তের প্রতি একটা বিশেষ ভালোলাগা জন্মায়। পরবর্তী সময় স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়ার সময় উৎপল দত্তের বিভিন্ন নাটক পড়ার সৌভাগ্য লাভ করি, তাঁর নাটক পাঠকালীন তাঁর প্রতি অন্যরকম শ্রদ্ধা, বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করতে থাকি। এরপর তার সম্পর্কে জানতে বিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠি। উৎপল দত্ত বাংলা সাহিত্যের একজন খ্যাতনামা নাট্যকার হওয়া সত্ত্বেও তাঁর নাটকের ওপরে বিশেষ গবেষণা কর্মাদি আমাদের অজানা। তাঁর নাটক নিয়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় কিছু কিছু লেখা বেরিয়েছে বটে তবে তাঁর নাটক সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ গবেষণা এখনও হয়নি। অথচ নাট্যকার হিসেবে তিনি একজন স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। নাটকের বিষয় ও বৈচিত্র্যে স্বাধীন ও স্বতন্ত্রতার পরিচয় দিয়েছেন। নাটকের আঙ্গিক হিসেবে রাজনৈতিক প্রসঙ্গের অবতারণা করে তিনি মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি প্রথম নাট্যকার, যিনি বিষয়বস্তু হিসেবে

নিখাত রাজনীতিকে তার নাট্যরচনায় স্থান দিয়েছেন। মূলত এই কারণেই উৎপল দত্তের নাটক নিয়ে গবেষণা প্রকল্পটি রচনা করেছি।

গবেষণা প্রকল্প (Research Hypothesis)

প্রস্তাবিত বিষয়টিকে আমরা পাঁচটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর কথা ভেবেছি। অধ্যায়গুলি নিম্নে উল্লেখি ত হল।

গবেষণা প্রকল্পটির অধ্যায় বিন্যাস (Chapterisation)

ভূমিকা :

প্রথম অধ্যায় : উৎপল দত্তের সমকালে রাজনৈতিক ভাঙাগড়ার ইতিবৃত্ত

দ্বিতীয় অধ্যায় : উৎপল দত্তের জীবন : রাজনৈতিক দীক্ষা ও নাটক-নাট্যকার সত্তা

তৃতীয় অধ্যায় : উৎপল দত্তের নাটকের রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

চতুর্থ অধ্যায় : উৎপল দত্তের নাটকে বঞ্চিত মানুষ ও রাজনৈতিক দর্শন

পঞ্চম অধ্যায় : উৎপল দত্তের থিয়েটার ভাবনায় রাজনৈতিক চেতনা

উপসংহার :

গ্রন্থপঞ্জি :

ভূমিকা

ভূমিকাংশে বাংলা নাটকের বিবর্তন, উৎপল দত্তের সমকালে রাজনৈতিক উত্থান ও নানান ভাঙাগড়ার ও বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নাট্যকার উৎপল দত্তের আবির্ভাবের ইতিহাস ও তার নাট্যজগতের প্রবেশের ইতিহাস তুলে ধরা হবে।

প্রথম অধ্যায়

উৎপল দত্তের সমকালে রাজনৈতিক ভাঙাগড়ার ইতিবৃত্ত

ভারতীয় রাজনৈতিক চেতনা জনমানসে যথাযথভাবে সঞ্চারিত হয়। ১৮৮৫ সালের 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠার সময় থেকে নানা ভাঙাগড়া-উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্ত এদেশের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য

অধ্যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কালে রাশিয়ায় অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব (১৯১৭) সারা পৃথিবী জুড়ে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সাম্যবাদী দল গঠনে সচেষ্ট ও উৎসাহী হতে দেখা যায়, জন্ম হয় 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'-র। ১৯৩৯ সালে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। সমস্ত পৃথিবীর মতো ভারতবর্ষের সমাজ অর্থনীতি জনজীবন রাজনীতির ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ১৯৪২ সালে আসে ভয়াবহ মন্বন্তর। যা বাংলা ও বাঙালিকে চরম সংকটের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। ১৯৩৮ সালের পর থেকে মহাত্মা গান্ধি স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জাতীয় সংগ্রামের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা তিনি নিন্দা করেছেন। অন্যদিকে ১৯৪৩ – ৪৪ সালের রাষ্ট্রীয় সংকটের মুখোশ খুলে দেওয়ার দায়িত্বভার গ্রহণ করে কিছু কমিউনিস্ট পার্টির উগ্রপন্থীরা। ১৯৪৭ সালে এল কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। স্বাধীন ভারতের স্বাধীন সূর্য নব আনন্দ নব চেতনা সঞ্চার যেমন করেছিল তেমনি প্রভাব পড়েছিল রাজনৈতিক আঙ্গিকের ওপর। ১৯৫২ সালে শুরু হয় ভারতীয় গণতন্ত্রে প্রথম সাধারণ নির্বাচন। প্রথম সাধারণ নির্বাচনে সি. পি. আই-এর অংশগ্রহণ। ১৯৬৪ সালে দ্বিখণ্ডিত হয় 'ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি'। বিপ্লবী সংগ্রামের আশাবাদ নিয়েও চিন্তা জগতের নানান পার্থক্য নিয়ে গঠিত হয় এদেশের দ্বিতীয় সাম্যবাদী দল সি. পি. আই (এম)। আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে ১৯৬৪ সালে। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেখা যায় ১৯৪১-এর জুন মাসে হিটলারের রাশিয়া আক্রমণের পর প্রচণ্ড ধাক্কা খেল ছাত্র ফেডারেশন। জার্মানির বিরুদ্ধে রাশিয়াকে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের সহযোগী হতে হয়, রাজনীতির এ এক নিষ্ঠুর পরিহাস। ফলে কমিউনিস্ট পার্টি যুদ্ধে ব্রিটিশদের সাহায্যের কথা ঘোষণা করে। ১৯৪২-এ ৪ মার্চ ঢাকার প্রকাশ্য দিবালোকে শ্রমিকদের ফ্যাসি বিরোধী একটি মিছিল পরিচালনার সময় তরুণ কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী সোমেন চন্দ্র ফ্যাসিস্ট শক্তির চক্রান্তে নিহত হয়। ১৯৪২-এ ২৪ মার্চ এই হত্যার প্রতিক্রিয়ায় কলকাতায় প্রগতিপন্থী শিল্পী সাহিত্যিকরা প্রতিষ্ঠা করলেন 'ফ্যাসি বিরোধী লেখক সংঘ'। 'প্রগতি লেখক সংঘ'-এর বঙ্গীয় শাখা রূপান্তরিত হল নতুন নামে 'ফ্যাসি বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'। ১৯৭৭ সালে সারা দেশব্যাপী হল সাধারণ নির্বাচন। তারপরে ১৯৮২-র সাধারণ নির্বাচন। দুটি নির্বাচনেই জয়লাভ করে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এল বামফ্রন্ট এবং বহাল রইল। উৎপল দত্ত আজীবন বাম রাজনীতির সঙ্গেই ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিলেন। বামফ্রন্ট তাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিল। আর সেই বাম আদর্শ নীতি নৈতিকতা তার নাটকের মধ্যেও তিনি যেমন তুলে ধরেছিলেন তেমনই আজীবন বহন করেছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উৎপল দত্তের জীবন : রাজনৈতিক দীক্ষা ও নাটক-নাট্যকার সত্তা

উৎপল রঞ্জন দত্তের জন্ম ১৯২৯ সালের ২৯ মার্চ। বর্তমান বাংলাদেশে বরিশাল জেলায়। উচ্চ

সংস্কৃতিবাদী সম্পন্ন উৎপল দত্ত জানিয়েছেন তার জন্ম শিলং-এর মামার বাড়িতে। পিতামহ দ্বিজদাস দত্ত, পিতা গিরিজা রঞ্জন দত্ত, মাতা শৈলবালা দত্ত। প্রথম পাঠ শুরু হয় মামার বাড়ি শিলং-এ। সেখানকার সেন্ট এডমন্ড স্কুলে ভরতি হন ১৯৩৫ সালে। ১৯৩৯ সালে উৎপল দত্ত এক ভাইয়ের সঙ্গে কলকাতায় সেন্ট লরেন্স স্কুলে ভরতি হন পঞ্চম শ্রেণিতে। দশ বছর বয়সে উৎপল প্রথম কলকাতায় এলেন। ইংরেজি স্কুলে পড়াশোনা শুরু করলেন এবং থাকছিলেন বালিগঞ্জের অভিজাত পল্লিতে। ১৯৪৫ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা সেন্ট জেভিয়ার্স থেকে। ওখানেই কলেজে ভরতি হন ১৯৪৭ সালে। আই. এ. পাশ করে বি. এ ক্লাসে ইংরেজি ভাষা সাহিত্যে অনার্স নিয়ে পড়তে থাকেন। বলা বাহুল্য তার প্রিয় বিষয় ছিল ইতিহাস। স্কুলে থাকতেই তাঁর নাটক পড়া ও অভিনয়ে হাতেখড়ি। কলেজ জীবনে নাটক পাঠ ও অভিনয়ের পাশাপাশি নাট্যবিষয়ক গ্রন্থাদি ও বিদেশের নাট্য পরিচালক ও প্রযোজকদের কর্মধারা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে থাকেন। কলেজ জীবনেই তিনি শেকসপিয়রের নাটক অভিনয় ও শেকসপিয়র বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন। পরবর্তীকালে তিনি একজন শেকসপিয়র বিশেষজ্ঞ হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। শেকসপিয়রের পাশাপাশি উৎপল দত্ত এই সময় থেকে মার্কসবাদের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন এবং মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, হেগেল প্রমুখ দার্শনিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের গ্রন্থাদি পড়তে থাকেন। আর এখান থেকেই তার রাজনৈতিক নাটক সম্পর্কে ভাব ও ধারণার গোড়াপত্তন হয়। সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়ার সময় ১৯৪৯ সালে জুলাই মাসে কলেজ ম্যাগাজিনে ইংরেজি ভাষায় একটি একাঙ্কিকা লিখলেন নাম ‘বেটি বেলসাড্যার’। তার উল্লেখযোগ্য নাট্যাভিনয় শুরু হয় সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়ার সময়। ফাদার উইভারের পরিচালনায় শেকসপিয়রের হ্যামলেট নাটকের মধ্য দিয়ে তিনি অভিনয় শুরু করেন। এরপর ফাদার উইভারের পরিচালনায় আরও দুটি নাটকে অভিনয় করেছিলেন। তার নাটকচর্চা ও অভিনয় করার মধ্য দিয়ে শেকসপিয়র নাটক সম্পর্কে অভিজ্ঞ হয়ে উঠতে থাকেন। শুরু হয় উৎপল দত্তের নাট্যকার জীবন। যা বিশ শতকের শেষ পর্যন্ত উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছিল।

তৃতীয় অধ্যায়

উৎপল দত্তের নাটকের রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

‘যে নাটকের রাজনীতি ভুল তার সব ভুল।’

উৎপল দত্ত : সাক্ষাৎকার

ব্রিটিশ পরাধীন বাংলার থিয়েটারে রাজনৈতিক চিন্তা মানেই ছিল জাতীয় মুক্তির কথা। তাতে জাতীয়তার ভাবাবেগ ছিল প্রবল। কিন্তু ততপরিমাণ ব্রিটিশ শাসন উৎখাত করার চিন্তা দেখা

যায়নি। স্বদেশি আন্দোলনের যুগে নাটকগুলি ছিল স্বদেশিক। প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক চিন্তা এইসব নাটকে স্থান পায়নি। তবু ব্রিটিশ যুগে পরাধীন বাংলার জাতীয়তার ভাবনা নিয়ে অনেক নাটক লেখা হয়েছে, তার বেশকিছু অভিনীতও হয়েছে। জাতীয়তাবাদের মধ্যে স্বাভাবিক কারণে ব্রিটিশ বিরোধিতাও কাজ করেছিল। পরাধীন দেশের সাহিত্যে শৃঙ্খল মুক্তির আবেগ আকাঙ্ক্ষা থাকবে না, তা হতেই পারে না। স্বাভাবিক কারণে অন্যান্য সাহিত্যের মতো বাংলা নাটকেও রাজনৈতিক প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। বাংলা নাটকে রাজনৈতিক আন্দোলন প্রতিবাদ এতটাই ব্যাপকভাবে সাড়া জাগিয়েছিল যে ব্রিটিশ সরকার সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এবং নাটকের কণ্ঠরোধ করার জন্য ১৮৭৬ সালে নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন চালু করে। ১৯৫০-এর দশকের টালমাটাল অবস্থায় উৎপল দত্তর নাট্যজগতে প্রবেশ। ১৯৫১-তে 'গণনাট্য সংঘে' যোগ দেন। গণনাট্যের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে নাটক এবং পথনাটক করতে লাগলেন এইভাবে প্রায় একবছর যুক্ত থেকে উৎপল দত্ত নিজের রাজনৈতিক নাট্যভাবনার প্রস্তুতিকে ভালোভাবে গড়ে নিয়েছিলেন। বাংলায় উৎপল দত্ত প্রথম নাট্যকার যিনি বিষয়বস্তু হিসেবে নিখাদ রাজনীতিকে তার নাট্য রচনায় স্থান দিয়েছিলন। দেশ-কাল ভেদে এইসব নাটকের বিষয় বহু বিচিত্র হলেও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি সর্বদাই ছিলেন মার্কসবাদী।

১৯৫৯ সালে কলকাতার পেশাদার সাধারণ রঙ্গালয় 'মিনার্ভা' ভাড়া নিয়ে সেখানে 'লিটিল থিয়েটার গ্রুপের' হয়ে নিয়মিত অভিনয় শুরু করলেন। বাংলা থিয়েটারে আন্দোলন ও সংগ্রামের রাজনীতির প্লাবন নিয়ে এল। উৎপল দত্ত ঘোষণা করলেন, 'অরাজনৈতিক নাটকের চেয়ে রাজনৈতিক নাটকের শক্তি অনেক বেশী।' রাজনৈতিক নাটকে শুধু রাজনৈতিক কথা বললেই চলে না। সমাজজীবনে রাজনীতির বর্ণনা দিলে চলে না। মানুষ যে রাজনৈতিক মানসিকতা নিয়ে চলছে, তার বিবরণ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের মধ্যে সেই মানুষের জীবন্ত ছবি আঁকতে হবে নাটকে, তবেই রাজনৈতিক নাটক হয়ে উঠবে।

'সন্ন্যাসীর তরবারি' নাটকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন, গোড়াপত্তন, তাদের অত্যাচার, শোষণ, তার বিরুদ্ধে বাংলার ফকির সন্ন্যাসীদের দলবদ্ধ লড়াই। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের ইতিহাস তিনি সুকৌশলে তুলে ধরেছেন।

'টিনের তলোয়ার' নাটকে উনিশ শতকের বাঙালি নাট্যকর্মীদের মুক্তির শপথ, তাদের আত্মবলিদানের কথা, তাদের আত্মত্যাগের কথা ফুটিয়ে তুলেছেন। সমাজের মাথা এবং ব্রিটিশ শাসনের নাট্যবিরোধী আইনের বিরুদ্ধে ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের পক্ষে তিনি কলম ধরেছেন। 'দিল্লী চলো' নাটকে আজাদহীন বাহিনীর দুঃসাহস, সংগ্রামের ইতিহাস, তাদের আত্মত্যাগ প্রভৃতি সুকৌশলে তিনি তুলে ধরেছেন।

‘কৃপাণ’ নাটকে স্বাধীনতার পর উত্তরভারতে যে গণঅভ্যুত্থান। পাঞ্জাবের গদরপন্থীদের সহায়তায় বিহারী বসু ও শচীন সান্যাল প্রমুখের নেতৃত্বে যে গণঅভ্যুত্থান ঘটেছিল তারই বিবরণ দেওয়া হয়েছে। শেষ মুহূর্তের বিশ্বাসঘাতকতা এই অভ্যুত্থানের ব্যর্থতা ঘটিয়েছিল।

‘টোটা/মহাবিদ্রোহ’ ব্রিটিশ মদতপুষ্ট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তির জন্য ভারতীয় সৈন্যদের সংগ্রাম ১৮৫৭-এর সিপাহী মহাবিদ্রোহের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা তিনি আলোচ্য নাটকে করেছেন।

‘রাইফেল’ নাটকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী লড়াই। ‘কল্লোল’ নাটকে ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে ভারতীয় নৌসেনাদের বিদ্রোহ ও মুক্তির লড়াই। ‘একলা চলো’ নাটকে গান্ধি বনাম গান্ধিবাদের বিবাদ এবং গান্ধি হত্যা। ‘অঙ্গার’ নাটকে জামাডোবায় চিনাকুড়ি কয়লাখনির দুর্ঘটনায় খনি শ্রমিকদের অসহায় মৃত্যু প্রভৃতি তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। এছাড়া তার রচিত ও পরিচালিত পথ নাটকগুলিতে সমসাময়িক রাজনৈতিক-সামাজিক ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণ পর্যবেক্ষণ জনমানসে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

চতুর্থ অধ্যায়

উৎপল দত্তের নাটকে বঞ্চিত মানুষ ও রাজনৈতিক দর্শন

উৎপল দত্তের নাটক শুধুমাত্র রাজনীতি করার জন্য নয়, রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে মিশে আছে মানুষের সংগ্রাম, মানুষের অধিকার, মানুষের মুক্তির লড়াই তার নাটকের মূল বিষয়। এই পৃথিবীতে বঞ্চিত মানুষ, শোষিত মানুষ, অবহেলিত মানুষ, নিপীড়িত মানুষদের ওপরে যখন শাসক শোষকের অত্যাচারের খাঁড়া নেমে এসেছে, শোষিত মানুষের মুক্তির পথ অবরুদ্ধ হয়েছে তখনই মুক্তিকামী মানুষের হয়ে তার কলম ঝলসে উঠেছে। পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ সাম্প্রদায়িক মৌলবাদ, রাজতন্ত্র, ধনতন্ত্র প্রভৃতির বিরুদ্ধে উৎপল দত্তর সর্বদা সরব থেকেছেন। কলমকেও সচল রেখেছেন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই হোক না কেন, যখনই মানুষকে শোষিত ও বঞ্চিত হতে দেখেছেন তখনই তার প্রতিবাদী সত্তা জাগ্রত হয়েছে। তিনি আদ্যপান্ত বামপন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন। বামপন্থীদের আদর্শ সমবন্টন, শ্রমজীবী ও বঞ্চিত মানুষদের অধিকারের জন্য তিনি লড়াই করেছেন। ভিয়েতনামে মানুষদের মুক্তির যুদ্ধ, চিনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব, দেশে-বিদেশে নানা স্থানে ছাত্র-শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনরত মানুষের পাশে থেকে তিনি নাট্যচর্চা করে গেছেন। ইতিহাসের যেখানেই মানুষ শোষিত, নিপীড়িত ও বঞ্চিত হয়েছেন, নাট্যকার উৎপল দত্ত তাকেই তার নাটকের বিষয় করে নিয়েছেন। তিনি অত্যাচার ও লাঞ্ছনার অশ্রুসজল কাহিনি শুধুমাত্র রচনা করেননি, সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হয়েছেন।

পঞ্চম অধ্যায়

উৎপল দত্তের থিয়েটার ভাবনায় রাজনৈতিক চিন্তা ও চেতনা

'আমি থিয়েটারের লোক'— একথা বলেছিলেন উৎপল দত্ত একটি সাক্ষাৎকারে। তার কর্মজীবন বহুধাবিস্তৃত, সবক্ষেত্রেই তার প্রতিভার স্বাক্ষর উজ্জ্বল। তার মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল হল তার থিয়েটার জীবন— নট, নাট্যকার, নাট্যপরিচালক, নাট্যপ্রযোজক উৎপল দত্তের থিয়েটার জীবন। থিয়েটারই তার জীবন, থিয়েটার ছিল তার সত্তায়, তার প্রাণের গভীরে। বাংলায় উনিশ শতকের ধারা বেয়ে বিশ শতকের শেষ পর্যন্ত সাধারণ রঙ্গালয়গুলি তার ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি নিয়ে থিয়েটার চালিয়ে এসেছে, উৎপল দত্তের থিয়েটার তার থেকে ভিন্ন। বিশ শতকের চল্লিশ দশকে এদেশের গণনাট্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে নতুন থিয়েটার গড়ে উঠেছিল তিনি তারই পথিকৃৎ। ভারতীয় গণনাট্যের সঙ্গে তিনি বছরখানেক যুক্ত থেকেছেন। এরপর পিপলস থিয়েটারের মধ্যে দিয়ে তার নাট্যসত্তাকে জাগ্রত রেখেছিলেন। অর্থাৎ রাজনৈতিক থিয়েটারই ছিল তার জীবন। তাকে 'থিয়েটারওয়ালা' ও বলা যেতে পারে। তিনি কোনো জাতপাতের নয়, কোনো বর্ণ কোনো ধর্মের নয় তার জাত হচ্ছে থিয়েটারওয়ালা।

উৎপল দত্তের থিয়েটার ছিল শ্রমিক শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সৃষ্ট বিপ্লবী থিয়েটার। বিপ্লবী থিয়েটারের মূল কাজ হল অবশ্যই বিপ্লব প্রচার করা, শোষকদের বিরুদ্ধে শ্রেণি ঘৃণা জাগিয়ে তোলা। বিপ্লবী থিয়েটারের অন্যতম কাজ বৈপ্লবিক সত্যে উপনীত হওয়া। আর তার থিয়েটার জীবনের সঙ্গে আপাদমস্তক জড়িয়ে ছিল রাজনৈতিক চেতনা।

উৎপল দত্ত ১৮৫১ সালে তার প্রতিষ্ঠিত লিটিল থিয়েটার গ্রুপ থেকে বেরিয়ে গণনাট্য সংঘে যোগ দিলেন। এতদিন সেখানে ইংরেজি ভাষায় অভিনয় করলেও এখানে বাংলা ভাষায় অভিনয় শুরু করলেন। মানুষের সুখ, দুঃখ, অভাব, অভিযোগ প্রভৃতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে নিজেকে মেলে ধরার চেষ্টা করেন। এই গণনাট্য সংঘই উৎপল দত্তকে সমকালীন যুগভাবনা ও জনতার মানসিকতা সুখ-দুঃখ বুঝে নিতে সাহায্য করেছিল। উৎপল দত্ত নিজেকে থিয়েটার জগতে প্রকাশের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে থাকেন ১৯৪০ দশকের পর থেকে। ১৯৫১ গণনাট্য সংঘে যোগ দেওয়া তার ভাবনার একটি পূর্ণতা পেয়েছিল। ১৯৫৯ সালে মিনার্ভা, লিটল থিয়েটার গ্রুপের মধ্য দিয়ে মানুষের সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগ অত্যন্ত কাছ থেকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে সমসাময়িক সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অনুষঙ্গ তার নাট্যকর্মের মধ্য দিয়ে সুচারুভাবে ফুটে উঠেছে।

উপসংহার

'নাটক আমার জীবন, নাটক না করতে পারলে আমার বেঁচে থেকে লাভ কী?'

—'আজকের সাজাহান'

উৎপল দত্তের শেষ অভিনয় ১৯৯৩ সালের ৩ আগস্ট কলকাতায় রবীন্দ্রসদন মঞ্চে, তার লেখা 'একলা চলোরে' নাটকে। গান্ধিবাদী নেতা অনাথবন্ধু চক্রবর্তীর ভূমিকায়, অভিনয়ের মধ্যে সারা জীবনটা কাটিয়ে দিলেন তিনি। ক্লান্তি এসেছে, অবসাদ এসেছে, শরীর অসুস্থ হয়ে পড়েছে, সব সামলে তিনি থিয়েটার জগৎ অর্থাৎ অভিনয়ের জগতে ফিরে এসেছেন। পুলিশ প্রশাসন, গুণ্ডার অত্যাচার সহ্য করেছেন রাজনৈতিক নানা মতভেদের শিকার হয়েছেন, এক রকম বিনা কারণেই কারাবাস কাটিয়েছেন। তা সত্ত্বেও তিনি নাটক লিখেছেন, নাট্য পরিচালনা করেছেন এবং নাট্যাভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছেন। অভিনয়ের নানা দিকে তিনি নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিলেন। থিয়েটার ছিল তার জীবন নাট্যের প্রথম ও শেষ আস্তানা। যাত্রা-চলচ্চিত্র-বেতার দূরদর্শন সব জায়গাতেই তিনি হয় অভিনয় নয়তো পরিচালনায় নয়তো বা রচনায় কর্তৃত্বের ছাপ রেখে গিয়েছিলেন। ক্লান্ত-অবসন্ন শরীরেও কাজ করতে চেয়েছেন, করেও গেছেন মৃত্যুর দিন পর্যন্ত। বাংলা থিয়েটারের সর্বদিকের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকে এবং থিয়েটার ও সমাজজীবন তথা রাজনৈতিক ভাবনা ও জীবনকে সাধারণ মানুষের সামনে নিয়ে এসে তিনি বাংলা থিয়েটার তথা দেশবাসীর প্রতি এক মহান কর্তব্য পালন করেছেন।

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ :

১. উৎপল দত্ত। *নাটক সমগ্র* (প্রথম খণ্ড)। মিত্র ও ঘোষ। কলকাতা, ১৯৯৪।

২. উৎপল দত্ত। *নাটক সমগ্র* (দ্বিতীয় খণ্ড)। মিত্র ও ঘোষ। কলকাতা, ১৯৯৪।

৩. উৎপল দত্ত। *নাটক সমগ্র* (তৃতীয় খণ্ড)। মিত্র ও ঘোষ। কলকাতা, ১৯৯৫।

৪. উৎপল দত্ত। *নাটক সমগ্র* (চতুর্থ খণ্ড)। মিত্র ও ঘোষ। কলকাতা, ১৯৯৬।

৫. উৎপল দত্ত। *নাটক সমগ্র* (পঞ্চম খণ্ড)। মিত্র ও ঘোষ। কলকাতা, ১৯৯৭।

৬. উৎপল দত্ত। *নাটক সমগ্র* (ষষ্ঠ খণ্ড)। মিত্র ও ঘোষ। কলকাতা, ১৯৯৮।

৭. উৎপল দত্ত। *নাটক সমগ্র* (সপ্তম খণ্ড)। মিত্র ও ঘোষ। কলকাতা, ১৯৯৯।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. অজিতকুমার ঘোষ, *বাংলা নাটকের ইতিহাস*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১০

২. অরূপ মুখোপাধ্যায়, *উৎপল দত্ত জীবন ও সৃষ্টি*, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া, 'নেহেরু ভবন'।

৩. দীপক চন্দ, *বাংলা নাটকে আধুনিকতা ও গণচেতনা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

৪. দর্শন চৌধুরী, *থিয়েটারওয়ালা উৎপল দত্ত*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

৫. দর্শন চৌধুরী, *উনিশ শতকের নাট্যবিষয়*, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, ২০০৭

পত্রপত্রিকা :

১. এপিক থিয়েটার : মার্চ ১৯৯৪। উৎপল দত্ত স্মারক সংখ্যা। ***উৎপল দত্ত লিটল থিয়েটার ও আমি।***

২. গ্রুপ থিয়েটার [উৎপল দত্ত সংখ্যা] ১৬ বর্ষ, সংখ্যা-২। ১৯৯৩-৯৪। ***দর্শন চৌধুরী : থিয়েটারওয়ালা উৎপল দত্ত।***

৩. এপিক থিয়েটার : মার্চ ১৯৯৪, উৎপল দত্ত স্মারক সংখ্যা। ***শক্তি বিশ্বাস : উৎপল দত্ত – শ্রেণি সংগ্রামের শিল্পী যোদ্ধা।***

৪. সাপ্তাহিক বসুমতী : ২২ আগস্ট ১৯৬৮, সমালোচনা : ***মানুষের অধিকারে।***

৫. বহুরূপী : সংখ্যা-৮০, ১৯৯৩। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় – ***অভিনেতা উৎপল দত্ত।***

৬. নন্দন : ৩০ বর্ষ, ৪ সংখ্যা। এপ্রিল ১৯৯৪। ***শোভা সেন : প্রস্তুতিপর্বের উৎপল দত্ত ও অগ্রজের অনুপস্থিতি।***

নিবেদন

ছোটবেলায় দূরদর্শনের মাধ্যমে উৎপল দত্তকে প্রথম দেখা ও চেনার সুযোগ ঘটে, ক্রমে ক্রমে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা ও পড়াশুনার সূত্রে জানতে পারি এক অসামান্য বহুমুখী প্রতিভা ও দিকপাল পান্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন তিনি। নাটক, প্রবন্ধ, গদ্য, কবিতা রচনায় তাঁর পান্ডিত্য, সুচিন্তিত মতামত ও অগাধ জ্ঞানে যুগপৎ মুগ্ধ ও বিস্মৃত হয়েছি। উৎপল দত্তের সাথে বাস্তব সাক্ষাৎ অথবা তাঁর মঞ্চাভিনয় স্বচক্ষে দেখার সুযোগ না হলেও তাঁর নাটকের সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা আমাকে প্রভাবিত করে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে গবেষণার সুযোগ পেয়ে মহান, বিচিত্র, বিরল প্রতিভাধর নাট্যকার উৎপল দত্তকে নিয়ে অভিসন্দর্ভ রচনা করতে মনস্থির করি। আমার গবেষণার বিষয়—"উৎপল দত্তের নাটক: নাট্যচিন্তা ও রাজনৈতিক বাস্তবতা।"

আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম জানাই আমার পিতামাতাকে, যারা সদাসর্বদা উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন গবেষণা কর্মটি এগিয়ে নিয়ে যেতে। তাদের স্নেহ ভালোবাসা ও আশিস আমার পাথেয়। পিতৃমাতৃস্থানীয় গুরুজন, যারা গবেষণা কর্মটি এগিয়ে নিয়ে যেতে নিরন্তর উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন, তাদের প্রতিও আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

গবেষণা হল নিরলস, আপসহীন ও নিরন্তর অনুসন্ধান। এই গবেষণা কর্মের বিভিন্ন বাঁক ও মোড়ে যাঁর কাছ থেকে অকৃপণ সহযোগিতা ও নির্দেশনা পেয়েছি, তিনি হলেন আমার গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. আশিস রায় মহাশয়। তিনি সদা সর্বদা কার্য ও চিন্তার স্বাধীনতা প্রদানে কুণ্ঠাহীন আনুকূল্য করেছেন। তাঁর সস্নেহ ও যত্নশীল তত্ত্বাবধানে গবেষণা কর্মটি গন্তব্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে।

গবেষণা অন্তহীন অন্বেষণের পথে হেঁটে চলা জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় এক অধ্যায়। গবেষণা দীর্ঘপথে নানা প্রতিকূলতা ও নানা চমকপ্রদ অভিজ্ঞতার সমাহার। পথ যত দীর্ঘ হয়েছে, অভিজ্ঞতায় তত সমৃদ্ধ হয়েছি। দীর্ঘপথের প্রত্যেক বাধা বিপদে উপস্থিত থেকেছেন সুজনেরা, বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের ঐশ্বরিক সাহায্যের হাত। যাদের সাহায্য ছাড়া গবেষণা কর্মটি পরিণতির পথে কখনই সম্ভব হয়ে উঠত না। সেই সমস্ত স্বজন, সুজনকে জানাই আমার অন্তরের শ্রদ্ধা ও প্রণাম, যাদের সহযোগিতায় গবেষণা হয়েছে ঋজু ও সহজসাধ্য, যাদের সহচর্যে মুহূর্তগুলি হয়েছে শিক্ষণীয়। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগীয় প্রধান ড. উৎপল মণ্ডল, ড. নিখিল চন্দ্র রায়, ড. মঞ্জুলা বেরা, ড. উর্বি মুখার্জী, ড. সূর্য লামা, ড. প্লাবন সিংহ, ড. হাসনারা খাতুন এবং শর্মিষ্ঠা পাল প্রমুখ অধ্যাপক-অধ্যাপিকা প্রত্যেকেই নানাভাবে আমার গবেষণা কর্মে সহযোগিতা করেছেন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও তথ্য দিয়ে গবেষণা কর্মটি পরিণতি দানের পথে

নানাভাবে আমার গবেষণা কর্মে সহযোগিতা করেছেন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও তথ্য দিয়ে গবেষণা কর্মটি পরিণতি দানের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন। প্রত্যেকের প্রতি রইল আমার একান্ত কৃতজ্ঞতা ও সশ্রদ্ধ প্রণাম।

গবেষণা সন্দর্ভটি সম্পূর্ণ করতে বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য পত্র-পত্রিকা, বইপত্র এবং প্রাসঙ্গিক দৈনিক পত্রের সাহায্য পেয়েছি নাট্য শোধ সংস্থান, ন্যাশনাল লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে। তাঁদের কাছে আমি ঋণী ও কৃতজ্ঞ।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই বন্ধুবর শিক্ষক, গবেষক, প্রাবন্ধিক তাপসকুমার সরদারকে। তিনি অভিসন্দর্ভ রচনার প্রাথমিক লগ্ন থেকে অন্তিম পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, বই, প্রবন্ধ ও বিভিন্ন প্রকার তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করে গবেষণা কর্মে সহযোগিতা ও সমৃদ্ধ করেছেন। তার আন্তরিক প্রচেষ্টায় দীর্ঘ গবেষণা কর্মটি মসৃণ ও সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। কৃতজ্ঞতা জানাই আমার সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা সুরূপা বিশ্বাসকে। নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য ও পত্র পত্রিকা, বিভিন্ন বই ও প্রবন্ধ সংগ্রহ করে ও প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করে তিনি গবেষণা কর্মের অংশীদার হয়ে উঠেছেন।

আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই সেই বিশেষ বন্ধুদের যারা গবেষণায় নিরন্তর উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছে। সকলের অকৃপণ সহায়তা সত্ত্বেও গবেষণা-সন্দর্ভে কিছু ব্যক্তিগত মুদ্রণ ত্রুটি ও অনিচ্ছাকৃত ভ্রান্তি থেকে গেলে তার সব দায়িত্ব আমার ব্যক্তিগত। অনেকের নাম হয়তো উল্লেখিত হল না, যারা এই গবেষণা সন্দর্ভে আন্তরিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, সেজন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

সকলের আশীর্বাদ ও শুভকামনা প্রার্থনীয়।।

তারিখ : ২৫·০৭·2022

ধন্যবাদান্তে—

কমলেশ মণ্ডল

(কমলেশ মণ্ডল)

গবেষক, বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

Scanned by TapScanner

সূচিপত্র

ভূমিকা :	১
প্রথম অধ্যায় :	৬
উৎপল দত্তের সমকালে রাজনৈতিক ভাঙাগড়ার ইতিবৃত্ত	
দ্বিতীয় অধ্যায় :	৪৯
উৎপল দত্তের জীবন : রাজনৈতিক দীক্ষা ও নাট্যকার সত্তা	
তৃতীয় অধ্যায় :	৯৩
উৎপল দত্তের নাটকের রাজনৈতিক প্রসঙ্গ	
চতুর্থ অধ্যায় :	২১৩
উৎপল দত্তের নাটক : বঞ্চিত মানুষ ও রাজনৈতিক দর্শন	
পঞ্চম অধ্যায় :	২৫৮
উৎপল দত্তের থিয়েটার ভাবনায় রাজনৈতিক চেতনা	
উপসংহার :	২৯৬
গ্রন্থপঞ্জি :	৩১০

ভূমিকা

বাংলা নাট্যচর্চায় মনীষাদৃপ্ত সৃজনশীল নাট্য-ব্যক্তিদের মধ্যে অগ্রগণ্য পথিকৃৎ হলেন উৎপল দত্ত (১৯২৯-১৯৯৩)। আধুনিক বাংলা নাট্যধারায় তিনি একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রমী ও বিশিষ্ট নাম। চলচ্চিত্র অভিনেতা হিসেবে তিনি সমধিক পরিচিত হলেও, তাঁর সৃষ্টিকর্মের উর্বরতমভূমি মঞ্চনাটক। রাজনীতি ও নন্দনতত্ত্বের সঠিক সংমিশ্রণে তিনি তৈরি করেছিলেন এক অনন্য নাট্যশিল্প। বাংলা এবং ভারতীয় নাট্য প্রাঙ্গণে তিনি এক দুঃসাহসী ও ব্যতিক্রমী চরিত্র। রাজনীতি ও শিল্পের অভিন্ন সম্পর্কের ভাবনায় নাটকের যে কাঠামো তিনি নির্মাণ করেছেন, তা ইতিহাস ও রাজনৈতিক চেতনার দলিল। আধুনিক বাংলা নাটকের বিষয় ও রূপরীতিতে উৎপল দত্তের রয়েছে অটুট স্বতন্ত্রতা। বিষয় ভাবনায় তিনি বরাবরই ছিলেন আধুনিক চিন্তার শরিক ও আঙ্গিকগত প্রয়োগে তিনি সঠিক পরম্পরা ও আধুনিক রীতির সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। নাটক নিয়ে রাজনীতির কথা বলার ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে উৎপল দত্তের গুরুত্ব অপরিসীম। স্কুলে পড়াকালীন নাট্যাভিনয়ে যুক্ত হয়ে ও নাটকের প্রতি বিশেষ আকর্ষিত হয়ে বাকি জীবন নাট্যাভিনয়, নাট্যরচনা ও নাট্যপরিচালনার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেছেন। মঞ্চ নাটকের উন্নতি সাধনের ব্রত নিয়ে সমস্ত জীবনটা অতিবাহিত করেছেন তপস্বীর মগ্নতা নিয়ে। লিখেছেন শতাধিক নাটক, এর মধ্যে পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক যেমন আছে, তেমনি আছে পথনাটক, একাঙ্ক নাটক, যাত্রাপালা তার সঙ্গে বিভিন্ন বিদেশি ভাষার নাটকের বাংলায় অনুবাদ ও রূপান্তর। যে ধরনের নাটকই হোক না কেন তাঁর নাটকের মূল সুর একটি তারেই বাঁধা ছিল, সেই সুর ছিল সামাজিক, রাজনৈতিকভাবে শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত ও নির্যাতিত মানুষের অধিকার আদায়ের জন্য লড়াই ও সংগ্রাম। তিনি শ্রমিক আন্দোলনকে সরাসরি পেশাদার নাট্যশালায় আনয়নের প্রচেষ্টা করলেন। শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলন ও তাদের সংগ্রাম যা এতদিন পেশাদার নাট্যশালায় অচ্ছুত ছিল, সেই পেশাদার নাট্যশালায় তিনি শ্রমিক শ্রেণিকে ও তাদের সংগ্রাম ও আন্দোলনকে প্রতিষ্ঠা করলেন। নাটকে সংগ্রামের কথা তুলে ধরার সাধানায় সমস্ত জীবন মগ্ন ছিলেন নিবিষ্ট তপস্বীর ন্যায়। সমকালীন প্রগতির ফিসফিস ধরনের নাটক তাঁকে তৃপ্ত করতে পারেনি, তাই তিনি চাইলেন নাটকে সমাজ বিপ্লবের রণহুংকার।

উৎপল দত্ত মনে করতেন বাংলায় রাজনৈতিক নাটকের ঐতিহ্য সুদীর্ঘকালের, কিন্তু এই রাজনৈতিক নাটক বিপ্লবী থিয়েটারের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেনি। তাই অর্ধশতাব্দীব্যাপী সুনিবিড়

নাট্যচর্চার মাধ্যমে উৎপল দত্ত বাংলা নাটককে বিপ্লবী থিয়েটারের অভিযাত্রায় বেগবান রাখার অঙ্গীকারে আবদ্ধ ছিলেন। সেই সঙ্গে বিশ্ব নাট্যতথ্য বিশেষ করে শেকসপিয়র নির্ধারিত ইউরোপীয় নাট্যভাবনা ও তার প্রয়োগ কলাকে তিনি সাধ্যাতীত পরিশ্রমে আয়ত্ত করে প্রয়োগ করেছিলেন। মানুষে মানুষে যে বৈষম্য যুগযুগান্ত ধরে চলে আসছে, তিনি তার কার্যকারণ অনুসন্ধান ও রাজনৈতিক জ্ঞানকে সুগভীর ও তীক্ষ্ণভাবে অনুভব করেছেন। উৎপল দত্তের থিয়েটারি কর্মকাণ্ডের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হল অকপট সারল্য ও সহজবোধ্য ভঙ্গি। এই অকপট সারল্য ও সহজবোধ্য ভঙ্গি তিনি আয়ত্ত করেছিলেন বাংলার থিয়েটারের প্রচলিত ঐতিহ্য অবগাহন করে এবং সেই প্রতিটি ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করে তাকে সমকালের দর্শকের চাহিদা অনুযায়ী আধুনিকীকরণের মাধ্যমে। সমাজকে উৎপল দত্ত যুদ্ধক্ষেত্র বিবেচনা করেছেন। সেই যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াইয়ে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ হাতিয়ার 'নাটক'। তিনি সদাসর্বদা বিশ্বাস করতেন গণমানুষের উপর ও গণমানুষের জন্য সৃষ্ট নাটকের উপর। তিনি এটাও মনে করতেন, এই গণমানুষের দ্বারা এবং গণমানুষের জন্য সৃষ্ট নাটকের দ্বারা এই সমাজ পরিবর্তন সম্ভব।

স্কুল জীবনে নাটকে অভিনয় দক্ষতার জন্য বিখ্যাত নাট্যাভিনেতা ও নাট্যপরিচালক জেফ্রি কেন্ডালের সান্নিধ্যে আসেন ও তাঁর কাছ থেকে নাট্যাভিনয় সংক্রান্ত সমস্ত কলাকৌশল, নাট্যপরিচালনা ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভ করেন। পরবর্তীকালে নাটকের প্রতি অদম্য আগ্রহ ও ভালোবাসার জন্য পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের বিভিন্ন রচনাগুলোর সঙ্গে তাঁর সম্যক পরিচয় ঘটেছিল। শেকসপিয়র, ব্রেখট্, ওডেটস্, গোর্কি, বার্নাড শ প্রমুখ কিংবদন্তি নাট্যকারগণের রচনায় তিনি তাঁর প্রয়োজনীয় রসদ ও শিল্প চেতনা খুঁজে পান এবং তাঁদের রচনাগুলি দেশ ও কালের চেতনায় সমন্বিত করে সামঞ্জস্য রেখে রূপান্তরিত করেন। তাঁর নাটকগুলি সমকালীন রাজনৈতিক চেতনাপ্রসূত। তিনি অতীত ও সমকালীন সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতির গতিপ্রকৃতিকে অতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন ও অনুধাবন করেছেন। দেশ-কাল-সমাজে নিরন্তর ঘটে যাওয়া শাসক শ্রেণির দ্বারা অন্যায়-অত্যাচার-অবিচার-শোষণ-নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। বাংলার থিয়েটারে উৎপল দত্তের মতো আর কোনও নাটককার-পরিচালক পৃথিবীর ইতিহাস নিয়ে এত মাথা ঘামাননি। সেই সঙ্গে একজন নাটককার-পরিচালককে নিয়ে বাংলার থিয়েটারে এত তর্কবির্তকের ঝড় কোনোদিনও ওঠেনি। উৎপল দত্ত সেই ব্যতিক্রমী নাটককার যিনি সরাসরি শুধুমাত্র রাজনীতিকে বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছেন। নাটকের আঙ্গিক হিসেবে রাজনৈতিক প্রসঙ্গের অবতারণা করে তিনি মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। উৎপল দত্ত সেই ব্যতিক্রমী

নাটককার যিনি বাংলা নাটকে মার্কসীয় চেতনার নাট্যরূপায়ণে বিশেষ সাফল্য ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। পাশাপাশি পরিচালক ও অভিনেতা হিসেবে তাঁর দক্ষতা ও সাফল্য অনস্বীকার্য। উৎপল দত্ত সমস্ত জীবনব্যাপী মার্কসবাদী আদর্শ ও ভাবধারায় বিশ্বাসী ছিলেন। সেই মার্কসবাদী ভাবধারা বিশ্বাস ও আদর্শকে সঙ্গী করে সমস্ত জীবনব্যাপী নাট্যসাধনায় ব্রতী ছিলেন। এই মার্কসবাদী ভাবধারা ও আদর্শকে সঙ্গী করেই সমাজের শোষিত-নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন সদাসর্বদা ও প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক বাংলা নাটকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার উৎপল দত্ত যিনি মার্কসবাদী ভাবধারা ও আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন ও মার্কসবাদকে তাঁর নাট্য পরিচালনা ও নাট্যকর্মের মধ্যে সযত্নে লালিত পালিত ও বহন করে গেছেন, তাঁর নাট্যকর্ম স্বতন্ত্র গবেষণার দাবি রাখে। তাই 'উৎপল দত্তের নাটক; নাট্যচিন্তা ও রাজনৈতিক বাস্তবতা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনায় আমাদের আগ্রহী করেছে। বর্তমান গবেষণাকর্মটি সে বিশেষ ও সচেতন আগ্রহের পরিণত ফল। উৎপল দত্তের নাটকে রাজনৈতিক বাস্তবতা, রাজনৈতিক সচেতনতা ও রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার রূপ পরিচিতি পেতে ও আলোচনার সুবিধার্থে আমরা বর্তমান অভিসন্দর্ভটিকে ছয়টি অধ্যায়ে বিভাজন করেছি।

প্রথম অধ্যায় : উৎপল দত্তের সমসাময়িক অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে ভারত তথা বিশ্বের রাজনৈতিক ঘটনাবলি, যা ভারত তথা বিশ্বের ইতিহাসকে নাড়িয়ে দিয়েছিল, যা সমাজ তথা রাষ্ট্র পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, সেইসব রাজনৈতিক বিশেষ ঘটনাবলি আলোচিত হয়েছে। সেই সঙ্গে যেহেতু উৎপল দত্ত একজন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট, তাই ভারতবর্ষে তথা বিশ্বের মার্কসবাদী আন্দোলনের রূপরেখা অঙ্কিত হয়েছে। ভারতবর্ষে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা বিভিন্ন আন্দোলন ও রূপরেখা, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বিভিন্ন নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা প্রভৃতি আলোচিত হয়েছে। মার্কসবাদীর সান্নিধ্যে থেকে উৎপল দত্ত বিংশ শতাব্দীতে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাবলিকে কেন্দ্র করে উৎপল দত্তের রচিত নাটকগুলির উল্লেখ ও চিহ্নায়নের প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : উৎপল দত্তের জীবন, রাজনৈতিক দীক্ষা ও নাট্যকার সত্তা। এই অধ্যায়ে উৎপল দত্তের জন্ম বৃত্তান্ত, শৈশব, কৈশোর, বিদ্যায়তনিক জীবন, কলেজ জীবন, পাঠভ্যাস, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন আলোচিত হয়েছে। সংযুক্ত হয়েছে উৎপল দত্তের নাটকের প্রতি আগ্রহ থেকে অভিনয় শিক্ষা, গুরুলাভ থেকে একজন দক্ষ নাট্যকার ও পরিচালক হয়ে ওঠার কাহিনি। নিজস্ব

নাট্যদল সৃষ্টি থেকে শুরু করে লিট্ল থিয়েটার গ্রুপ, নণনাট্য সংঘ ও পিপল্স্ লিট্ল থিয়েটার গ্রুপ পর্বও আলোচিত হয়েছে। গণনাট্য সংঘে থাকাকালীন স্বল্পকালীন অভিজ্ঞতা, লিট্ল থিয়েটার গ্রুপ ও পিপল্স্ লিটল থিয়েটারের প্রযোজনা ও তার গুরুত্ব আলোচিত হয়েছে। সবমিলিয়ে উৎপল দত্তের একজন গুরুত্বপূর্ণ নাট্য ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠা, যা বিশ শতকের শেষপর্যন্ত উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত ছিল, তার গুরুত্বপূর্ণ পরিপ্রেক্ষিত এ অধ্যায়ে উন্মোচন করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় : উৎপল দত্তের নাটকের রাজনৈতিক প্রসঙ্গ। আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা উৎপল দত্তের রচিত শতাধিক নাটকের মধ্যদিয়ে নির্বাচিত নাটকের বিস্তৃত বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে নাটকগুলিতে নিহিত ও আলোচিত উৎপল দত্তের সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনা, রাজনৈতিক ভাবাবেগ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগ্রাম, রাজনৈতিক অনুষঙ্গ প্রভৃতি উদ্‌ঘাটিত করার প্রয়াস করেছি। এই অধ্যায়ে উৎপল দত্তের মোট দশটি পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে রাজনৈতিক ঘটনা, রাজনৈতিক বিদ্রোহ ও রাজনৈতিক অনুষঙ্গের বিচার বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। সেই নাটকগুলিই নির্বাচন করা হয়েছে যেগুলিতে উৎপল দত্তের সময়কার অর্থাৎ **১৯২৯** খ্রিস্টাব্দ থেকে **১৯৯৩** খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রাজনৈতিক উত্থান-পতন ও রাজনৈতিক বিভিন্ন অনুষঙ্গের সার্বিক প্রতিফলন হয়েছে। উৎপল দত্তের সমসময়ে (**১৯২৯-১৯৯৩** খ্রি.) যেসব গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিদ্রোহ, আন্দোলন, বাংলা তথা ভারতবর্ষ অথবা পৃথিবীর ইতিহাসে ঘটেছিল, যা নিয়ে সারা ভারতবর্ষসহ সারা পৃথিবী উত্তাল হয়ে উঠেছিল, সেইসব গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা নিয়ে উৎপল দত্ত যে পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটক রচনা করেছেন, সেই পূর্ণাঙ্গ মৌলিক নাটকগুলি নিয়ে আলোচ্য অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে নাটকে নিহিত রাজনৈতিক ঘটনাবলিগুলো চিহ্নায়নের প্রচেষ্টাও হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় : উৎপল দত্তের নাটক বঞ্চিত মানুষ ও রাজনৈতিক দর্শন। উৎপল দত্ত মার্কসবাদী আদর্শ ও ভাবধারায় বিশ্বাসী একজন নাট্যকার। তাঁর থিয়েটার ছিল শ্রমিক শ্রেণি তথা নিপীড়িত, শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সৃষ্ট বিপ্লবী থিয়েটার। আলোচ্য অধ্যায়ে উৎপল দত্তের নাটকে নিহিত মার্কসবাদী ভাবধারা, আদর্শ উন্মোচনের প্রয়াস করা হয়েছে। সেই সঙ্গে 'মার্কসবাদ যেহেতু শ্রমিক শ্রেণির মতবাদ', তাই যখনই যেখানে শ্রমিক-কৃষক স্বার্থ বিঘ্নিত হয়েছে, বুর্জোয়া শ্রেণি দ্বারা শ্রমিক-কৃষক শ্রেণি অত্যাচারিত হয়েছে তখন তিনি শ্রমিক-কৃষক শ্রেণির পাশে সদাসর্বদা দাঁড়িয়েছেন ও তাঁর লেখনী গর্জে উঠেছে কৃষক-শ্রমিকের সপক্ষে বুর্জোয়া শ্রেণির অত্যাচারের বিরুদ্ধে। মেহনতি মানুষের শ্রেণিসংগ্রামকে তুলে ধরা হয়েছে আলোচ্য অধ্যায়ে।

শোষিত, অত্যাচারিত, নিপীড়িত শ্রমিক শ্রেণিকে ও শোষিত, নিপীড়িত শ্রমিক আন্দোলনের বিভিন্ন ধারাকে মার্কসবাদী আলোকে নাট্যাঙ্গনে নিয়ে আসার কৌশল উন্মোচিত হয়েছে আলোচ্য অধ্যায়ে।

পঞ্চম অধ্যায় : উৎপল দত্তের থিয়েটার ভাবনায় রাজনৈতিক চেতনা। একটি সাক্ষাৎকারে উৎপল দত্ত সদর্পে ঘোষণা করেছিলেন 'আমি থিয়েটারের লোক'। তাঁর কর্মজীবনের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, উজ্জ্বল হল তাঁর থিয়েটার জীবন— নাট্যকার, নাট্যপরিচালক, নাট্যপ্রযোজক উৎপল দত্তের থিয়েটার জীবন। অর্ধ-শতাব্দীব্যাপী নাট্য ও থিয়েটার চর্চায় তাঁর অভিনিবেশ ছিল রিভেলিউশানারী (বৈপ্লবিক থিয়েটারের অভিযাত্রায়)। মার্কসবাদী চিন্তাচেতনা, মার্কসবাদী আদর্শ ও মার্কসবাদী আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা মূলত তাঁর থিয়েটারের বিশেষ নিয়ন্ত্রক। নাটকের বিষয় অনুযায়ী আঙ্গিক নির্মাণ প্রচেষ্টা উৎপল দত্তের নাট্যদর্শনের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। তিনি নিজেই নাটক লিখেছেন, পরিচালনা করেছেন, অভিনয় করেছেন এবং মঞ্চ, সংগীত, আলোক, পোশাকসহ প্রযোজনসংশ্লিষ্ট অন্যান্য দায়িত্বও পালন করেছেন সমান দক্ষতা ও নিবিষ্টতায়। বিশ শতকের চল্লিশের দশকে এদেশের গণনাট্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে নতুন থিয়েটার গড়ে উঠেছিল তিনি তারই পথিকৃৎ। 'পাশ্চাত্য নাট্যভাবনায় পরিচালকের থিয়েটার' বলে যে বিশিষ্ট ভাবধারা বা প্রত্যক্ষের উদ্ভব হয়েছিল তা কার্যকর অর্থে বাংলা নাটকে উৎপল দত্তই লালন পালন করেছেন। উৎপল দত্তের থিয়েটার ছিল শ্রমিক শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সৃষ্ট বৈপ্লবিক থিয়েটার। তাঁর থিয়েটার জীবনের সঙ্গে আপাদমস্তক জড়িয়ে ছিল রাজনৈতিক চেতনা। এবং সে রাজনীতি ছিল অবশ্যই মার্কসবাদী রাজনৈতিক ভাবনা ও আদর্শ। উৎপল দত্ত সেই ব্যতিক্রমী থিয়েটারওয়ালা যিনি মার্কসীয় চেতনায় নাট্য রূপায়ণে বিশেষ সাফল্য ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বর্তমান অধ্যায়ে উৎপল দত্তের থিয়েটারে মার্কসীয় চিন্তাচেতনা, মার্কসীয় আদর্শ ও মার্কসীয় ভাবধারার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।

অভিসন্দর্ভের ষষ্ঠ ও শেষ অধ্যায় উপসংহার। এই অধ্যায়ে সামগ্রিকভাবে আলোচনাসূত্রে প্রাপ্ত রাজনৈতিক নাট্যকার উৎপল দত্তের নাটকে রাজনৈতিক বিশিষ্টতা ও নাট্যপরিচালক, নাট্য প্রযোজক উৎপল দত্তের থিয়েটারের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচিত। নট, নাটককার, নাট্যপরিচালক, নাট্য প্রযোজক উৎপল দত্তের বিশিষ্টতা ও স্বতন্ত্রসূচকসমূহের সমন্বয়সার তৈরি করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

উৎপল দত্তের সমকালে রাজনৈতিক ভাঙাগড়ার ইতিবৃত্ত

বাংলা নাটকে যারা সাহসিকতার সঙ্গে রাজনীতিকে মঞ্চে নিয়ে এসেছেন এবং জনপ্রিয় করে তুলেছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন উৎপল দত্ত। পুরো নাম উৎপলরঞ্জন দত্ত। নাটকের রাজনীতি নিয়ে কথা বলার ক্ষেত্রে, সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে উৎপল দত্তের অবদান সবচেয়ে বেশি। অনেকেই রাজনৈতিক নাটক এবং উৎপল দত্তকে সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। বাংলা রাজনৈতিক নাটকের ঐতিহ্য ও ধারাবাহিকতা খুবই গৌরবজনক। আদিপর্বের বাংলা নাটকে যথা রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুল সর্বস্ব', দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ', মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', মীর মশারফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ' প্রভৃতি নাটকে সমাজ সংস্কার ও সমাজ চেতনা এবং ইউরোপীয় বিশেষ করে ব্রিটিশ বণিকদের নির্মম শোষণের চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। সমসাময়িক সমাজের অর্থ-রাজনৈতিক কার্যকলাপ এবং তার প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, বিরুদ্ধাচরণ এই নাটকগুলোকে রাজনৈতিক নাটকে পরিণত করেছে। তারপর জাতীয়তাবাদের উন্মেষ পর্বে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র দত্ত, হরলাল রায় প্রমুখ নাট্যকার মূলত ইতিহাসের প্রেক্ষিতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নাটক রচনা করেছিলেন। এর পরবর্তীকালে এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। চল্লিশের দশকে ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলন ও গণনাট্য আন্দোলন, নাট্য রাজনীতির মধ্য দিয়ে উৎপল দত্ত নাটকে রাজনীতির এই ধারাকে ঐতিহ্যের সঙ্গে বহন করে চলেছেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল পর্যন্ত যারা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী নাটক লিখেছেন এবং মঞ্চস্থ করেছেন তাঁদের নাটককে সমগ্রভাবে দেখলে বোঝা যাবে যে, শুধুমাত্র রাজনীতি তাদের সমগ্র নাটকের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক ছিল না, সহজ সরলভাবে বলতে গেলে বলা যায় তারা অন্য অনেক বিষয়ের সঙ্গে রাজনীতিকে বিষয় হিসেবে নাটকে এনেছেন। এই নাট্যকারগণ তাঁদের সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাবলিকে সোজাসুজি নাটকে উপস্থাপিত না করে বিভিন্ন সামাজিক ও ঐতিহাসিক বাতাবরণে তা উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু উৎপল দত্ত সরাসরি আর দশটা নাটকের সঙ্গে সঙ্গে কিছু রাজনৈতিক নাটক লিখেছেন। রাজনৈতিক ঘটনাকে সরাসরি নাটকে এনেছেন। এখানেই পূর্বসূরিদের থেকে উৎপল দত্ত একেবারে স্বতন্ত্র। উৎপল দত্ত একান্তভাবেই সাম্রাজ্যবাদ,

ফ্যাসিবাদ, ঔপনিবেশিকতাবাদ-এর বিরোধী এক বিশিষ্ট রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির নাট্যকার ছিলেন। এই সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ ও শোষণবাদের বিরুদ্ধে তাঁর কলম গর্জে উঠেছে সদাসর্বদা।

উৎপল দত্তের নাটক ফ্যাসিবাদ বিরোধী দর্শন কীভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে তা অনুধাবন করতে গেলে ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে ও ফ্যাসিবাদের চরিত্র সম্পর্কে সম্যক পরিচয় প্রয়োজন। ফ্যাসিবাদের উদ্ভব রোমে। রাষ্ট্রীয় শাসন কর্তৃত্ব ও চরিতার্থ করার মধ্য দিয়েই ফ্যাসিবাদের উৎপত্তি হয়। ফ্যাসিবাদী আদর্শ ও ফ্যাসিবাদী দর্শন মানুষ ও প্রকৃতি সম্পর্কে কতকগুলো চরম নিয়মের কথা বলে, যার বিরুদ্ধে কোনো প্রশ্ন করা যায় না, যার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ করা যায় না, যার বিরুদ্ধে বাক্‌স্বাধীনতাটুকুও হরণ করা হয় সেই হল ফ্যাসিবাদ। মৌলবাদী একটি মতাদর্শ ও বিশ্বাসকে এই দর্শন প্রতিষ্ঠা করতে চায়। সর্বোপরি কিছু মিথ্যা প্রচারের মধ্য দিয়ে এই দর্শন কৌশলের সঙ্গে জনসাধারণের চিন্তাভাবনাকে প্রভাবিত করে এবং আধিপত্য বিস্তার করে। ফ্যাসিবাদ জাতি গঠনের ক্ষেত্রে রক্তের বিশুদ্ধতা এবং জাতিসত্তাগত পবিত্রতাকে অপরিহার্য মনে করে। এই রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য ফ্যাসিবাদ অন্য জাতির প্রতি আক্রমণকেই প্রধান পন্থা বলে মনে করে। ফ্যাসিবাদ নেতিবাচক সমষ্টিবাদের ওপর গুরুত্ব দিয়ে গণতন্ত্রকে বিনষ্ট করতে চায়। তার জন্য ফ্যাসিবাদের প্রয়োজন হয় আধিপত্যকামী কর্তৃত্বকারী একটি রাষ্ট্রের। ফ্যাসিবাদ, উদারনীতিবাদ এবং মুক্ত অর্থনীতি ভাবাদর্শের বিরোধিতা যেমন করে তেমনি সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রবল পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায় এবং শেষ পর্যন্ত সমাজতন্ত্রকে প্রধান শত্রু হিসেবে গণ্য করে। উৎপল দত্ত সারাজীবন ধরে এই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিরোধ করেছেন, এই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তাঁর কলম সচল থেকেছে সদাসর্বদা, জীবনের আদ্যপ্রান্ত ফ্যাসিবাদ বিরোধী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তাঁর লেখায়। সুতরাং খুব স্বাভাবিকভাবে উৎপল দত্তের নাটকে ফ্যাসিবাদ বিরোধী, কর্তৃত্ববাদ বিরোধী এক দর্শন প্রকাশ পেয়েছে। এই ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ প্রতিরোধ তিনি তুলে ধরেছেন নাটকের বিভিন্ন আঙ্গিকের মধ্য দিয়ে। ফ্যাসিবাদী অত্যাচার, শোষণ-নিপীড়ন-এর সাক্ষী হল আমাদের অতীত ইতিহাস। এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে উৎপল দত্ত তাঁর নাটকে চয়ন করে তিনি ফ্যাসিবাদী অত্যাচার শোষণ নিপীড়নকে যেমন তুলে ধরেছেন, তেমনি তার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ প্রতিরোধী কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছে তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে।

উৎপল দত্ত বিশ্বাস করতেন বিশ্বের সব দেশেই শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শাসকশ্রেণি দ্বারা শোষিত মানুষের ওপরে দমন-পীড়ন অত্যাচার ও নিপীড়ন শাশ্বত চিরন্তন। উৎপল দত্ত মনে করেন বিশ্বের সব দেশের মতোই ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস ও শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস, অনবরত রক্তক্ষয়-যুদ্ধের ইতিহাস, যুগে যুগে শাসকের অত্যাচার ও শোষিতের প্রতিরোধে তাদের

আর্তনাদের ইতিহাস। উৎপল দত্ত লক্ষ করেন এই বাস্তব রাজনৈতিক ইতিহাসকে ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে শাসক শ্রেণির কিছু রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রচিত বিকৃত ইতিহাস পাঠের মধ্য দিয়ে। ভারতের স্বাধীনতা এসেছে শান্তিপূর্ণ পথে— এই তত্ত্বের স্পষ্ট বিরোধিতা করেন উৎপল দত্ত এবং তিনি স্পষ্ট ভাষায় তার প্রতিবাদ করেন। ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে দেশের জনগণ বারবার যে সশস্ত্র আন্দোলন করেছেন, স্বাধীনতার জন্য অসংখ্য মানুষ আত্ম বলিদান দিয়েছেন সেসব নজির ইতিহাস থেকে বেমালুম ছাঁটাই হয়ে যাচ্ছে কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তির স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য, উৎপল দত্ত তার প্রতিবাদ করেন। তাই তিনি মনে করেন ভারতবর্ষের মানুষকে জানাতে হবে তাদের প্রকৃত ইতিহাস, তাদের রাজনৈতিক ইতিহাস। শোষিত মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে তাদের সংগ্রামী ঐতিহ্য।

উৎপল দত্ত তার সমসাময়িক ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের ভাঙাগড়া— সেগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তাঁর শিল্প কর্মের মধ্যে তুলে ধরেছেন। শুধুমাত্র ভারতবর্ষ নয় বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক যে উত্থানপতন, যেগুলো তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে এড়িয়ে যায়নি। সেগুলোকেও তার শিল্পকর্মে স্থান দিয়েছেন, বিশেষত প্রতিটি সাম্রাজ্য বিরোধী লড়াইকে তিনি তাঁর নাট্যকর্মে স্থান দিয়েছেন। শুধুমাত্র সমসাময়িক বাংলার রাজনৈতিক ঘটনাবলি নয়, ভারতবর্ষের তথা বিশ্বের ঘটনাবলি, যা ভারত তথা বিশ্বের রাজনীতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল, আন্দোলিত করেছিল সেগুলি নিয়েও তিনি নাটক রচনা করেছেন। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ, ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহ, সিরাজ-উদ্‌দৌলা, মীর কাশিম, তিতুমীর, সিধু কানু, ঝাঁসির রানি, সূর্যসেন, ক্ষুদিরাম, মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা প্রভৃতি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বা এইসব বিপ্লবীদের কথা; আবার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, নৌ বিদ্রোহ, তেলেঙ্গানা বিদ্রোহ, চটকল ও সকল শ্রমিকদের সংগ্রামের কথা প্রভৃতি তিনি গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন এবং তাঁর শিল্পকর্মে স্থান দিয়েছেন। উৎপল দত্তের কথায়—

> *সময় এসেছে এ প্রদেশের প্রতি কোনায় সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধের কাহিনী পৌঁছে দেওয়ার, সেই সিরাজ, মীরকাশেম, মজনু শাহ থেকে ডিরোজিও, তিতুমীর, সিধু কানু, মেঘাই সর্দার, কুঁয়ার সিং, ঝাঁসির রানী, আজিমুল্লাহ, নানা সাহেবের পথ ধরে ক্ষুদিরাম, কানাইলাল, সূর্যসেন, গণেশ ঘোষ হয়ে মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা নতুন ধরনের বিপ্লবীদের কথা পর্যন্ত। সুভাষ, আই এন এ, নৌ বিদ্রোহ, তেলেঙ্গানা, চটকল আর সুতা কলের শ্রমিকদের সংগ্রাম— এসব হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের পূর্বসূরীদের প্রচণ্ড আপোষহীন লড়াইয়ের একটি অধ্যায়।* [১]

বিদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রতি তাঁর দৃষ্টি সমানভাবে নিক্ষেপ ছিল। বিশ্বের ইতিহাস যখন কলঙ্কিত হয়েছে, যখন সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, যখন শ্রমিক কৃষক শ্রেণির স্বার্থ

বিঘ্নিত হয়েছে তখন সেসব ঘটনা অবলম্বন করে উৎপল দত্তের কলম গর্জে উঠেছে। সোভিয়েত রাশিয়ার মুক্তি সংগ্রাম, রুশবিপ্লবের নায়ক লেনিন, তার কর্ম চিন্তা ও তার বিপ্লবের আহ্বান, অক্টোবর বিপ্লবের আদি ও উত্তরকাল অথবা বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত রাশিয়ার গঠন প্রক্রিয়া এবং স্তালিনের কর্মপন্থার বিশ্লেষণ প্রভৃতি ঘটনাবলি তাঁর নাট্য বিষয়বস্তু হিসেবে তিনি চয়ন করেছেন। ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে জনতার বিপ্লব আন্দোলন এবং তাদের ভূমিকা, অন্যদিকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কিউবার জনগণের মুক্তির লড়াই প্রভৃতি ঘটনাবলি তাঁর দৃষ্টির অগোচরে ছিল না। জার্মানিতে ফ্যাসিস্ট অত্যাচার, ইহুদি ও কমিউনিস্ট নিধন ও বিজ্ঞানীদের ওপর নাৎসিদের অত্যাচার, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী আক্রমণের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের সৈন্য ও জনগণের আমৃত্যু মরণপণ প্রতিরোধ ও মুক্তির লড়াইকে তিনি কুর্নিশ জানিয়েছেন এবং শিল্পকর্মে স্থান দিয়েছেন। আবার অন্যদিকে আমাদের পূর্ববঙ্গে মানুষের ওপরে পাকিস্তানি সেনাদের অকথ্য অত্যাচার ও তাদের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের কাহিনি অর্থাৎ ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের লড়াই প্রভৃতি রাজনৈতিক ঘটনাবলি যেসব ভারত তথা বিশ্বের ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছিল, সেই ঘটনাবলি তিনি তার নাট্যকর্মে নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন প্রতিবাদ প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে।

শুধুমাত্র ভারতবর্ষের এবং পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাবলি নয়, তাঁর তীক্ষ্ম দৃষ্টি ভারতবর্ষের সমসাময়িক ঘটনাবলি যা ভারতবর্ষের রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছিল সেসব ঘটনাবলিকে কেন্দ্র করেও তিনি লিখে গেছেন কালজয়ী নাটক। বিহারের জামাডোবায় চিনাকুরি কয়লাখনির যে দুর্ঘটনা এবং শ্রমিকদের অসহায় মৃত্যু, দাড়ি কয়লা খনির শ্রমিকদের ওপরে মালিক পক্ষের যে নির্মম শোষণ অত্যাচারের কাহিনিকেও তিনি তুলে ধরেছেন। ১৯৭৫-এর ভারতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা, তার স্বরূপ ও প্রতিক্রিয়া, সাধারণ মানুষের ওপরে অত্যাচার, প্রতিবাদী কণ্ঠকে দমিয়ে রাখার অপচেষ্টা এবং তার বিরুদ্ধে নতুন জীবনের স্বপ্ন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা; আবার ১৯৭০-এর দশকে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস দমন-পীড়ন, সাধারণ মানুষের কথা বলার অধিকার হরণ, এই অন্ধকার দিনগুলো আবার ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে চিন ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ, কমিউনিস্ট শিবিরে ভাঙন, নকশাল আন্দোলন প্রভৃতি ঘটনাবলিকে কেন্দ্র করে তিনি রচনা করেছেন ও মঞ্চস্থ করে গেছেন কালজয়ী সব নাটক, যা পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের রাজনীতিতে এক বিশেষ ছাপ রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

উৎপল দত্তের সমকালে রাজনৈতিক ভাঙাগড়ার ইতিবৃত্ত

সাহিত্যের জন্ম হয় যুগপৎ সময় ও সমাজের করতলে। সময় ও সমাজের প্রভাব সাহিত্যের

অন্যান্য অঙ্গের উপরে যেমন বিশেষভাবে দৃশ্যমান হয়, নাটকের ক্ষেত্রেও তেমনি। বিষয় নির্বাচন, চরিত্র চিত্রন, বিষয় বিন্যাস, চরিত্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক ও সংযোগে প্রবহমান কালের বিশেষ ছাপ পরিলক্ষিত হয়। সময়ের সুস্পষ্ট প্রভাব সাহিত্যের উপর যেমন আরোপিত পাশাপাশি সাহিত্যিক তথা নাট্যকারদের উপরেও সমানভাবে ছাপ ফেলতে সক্ষম। সময়, সমাজ, রাজনীতির নানামুখী প্রসারের পট পরিবর্তন কীভাবে নাট্যকার ও নাট্যসাহিত্যে তথা নাট্যকার উৎপল দত্তের উপরে কতটা কতভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল তা বিচার বিশ্লেষণ ও বুঝে নেওয়ার অভিপ্রায়ে আমাদের বর্তমান সমীক্ষণ। এই অভিপ্রায়ে আমরা উৎপল দত্তের সমকালে বিভিন্ন রাজনৈতিক ভাঙাগড়ার, রাজনৈতিক আন্দোলন প্রভৃতি আলোচনায় প্রয়াসী হব, যাতে বুঝে নেওয়া সম্ভব হয় উৎপল দত্তের নাটক ও তাঁর জীবনে তৎকালীন রাজনীতি কতখানি ছাপ ফেলেছিল ও প্রভাবিত করেছিল। উৎপল দত্তের জন্ম **১৯২৯** খ্রিস্টাব্দে **২৯**শে মার্চ এবং তিনি পরলোক গমন করেন **১৯৯৩** খ্রিস্টাব্দে **১৯**শে আগষ্ট। আমরা আলোচনার সুবিধার্থে বিশ শতকের রাজনীতির ভাঙাগড়ার ইতিবৃত্ত নিয়েই আলোচনায় অগ্রসর হব।

* **১৯০৫** খ্রিস্টাব্দের **১৬**ই অক্টোবর ভারতের ভাইসরয় লর্ড কার্জনের আদেশে বঙ্গভঙ্গ সম্পন্ন হয়। ইংরেজরা তাদের শাসন কায়েম রাখার উদ্দেশ্যে এক নোংরা হীন চক্রান্ত করে বাংলাকে ভেঙে টুকরো করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বাংলা ছিল সেই সময় সমস্ত স্বাধীনতা আন্দোলন ও বিদ্রোহের উৎসস্থল। তাই ইংরেজরা তাদের নিজেদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হওয়া বিভিন্ন বিদ্রোহ ও আন্দোলনকে অবদমিত করার উদ্দেশ্যে বাংলাকে ভেঙে টুকরো করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর প্রতিবাদে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বশরীরে পথে নামেন ও বাঙালিকে দ্বিখন্ডিত করার ঘৃণ্য চক্রান্তকে রুখে দেওয়ার উদ্দেশ্যে হিন্দু-মুসলিম-খ্রিস্টান সকলের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষার জন্য রাখি বন্ধন উৎসব শুরু করেন।

* **১৯০৬** খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় মুসলিমদের বিভিন্ন দাবি দাওয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হয়।

* **১৯০৮** খ্রিস্টাব্দে বাংলায় ঘটে যায় এক স্মরণীয় ঘটনা। মজফরপুরে কলকাতা প্রেসিডেন্সীর অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করার সংকল্প গ্রহণ করে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী। বোমা নিক্ষেপ করে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তারা মজফরপুরের মতিঝিলে উপস্থিত হয় ও ম্যাজিট্রেট কিংসফোর্ডের গাড়িকে লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করে। যে ঘটনা বাংলা বিপ্লবী আন্দোলনকে আরও উজ্জীবিত ও উদ্বুদ্ধ করে। পুলিশের হাতে ধরা পড়ার আগেই আত্মঘাতী হন প্রফুল্ল চাকী এবং বিচারে ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসী হয়। দেশমাতৃকার জন্য নিবেদিত প্রাণ ক্ষুদিরাম বসুর হাসি

মুখে ফাঁসির দড়িকে গলায় পরার বৃত্তান্ত আজও বাঙালির অন্তরে জাগ্রত।

* ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয় মর্লে-মিন্টো আইন। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বকে খুশি করে ও জাতীয় আন্দোলনকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে ভারতসচীব জন মরলি বড়লাট লর্ড মিন্টো একটি শাসন সংস্কারের পরিকল্পনা করেন ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে। এই শাসন সংস্কার মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইন নামে পরিচিত। একাধিক ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও এই আইনের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম, বিশেষত ভারতের জাতীয় আন্দোলন সংগ্রাম ও বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে। ভারতের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতির উপরে এর গভীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

* ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় সাহিত্য সংস্কৃতির এক উজ্জ্বল নিদর্শন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পুরস্কার জয়। আবার, এই একই বছরে ভারতীয় উদারবাদের নীতি অনুসারে প্রতিষ্ঠিত হয় গদর পার্টি। গদর পার্টি বলতে মূলত বোঝায় ভারতীয় বা ভারতবাসীর দ্বারা গড়ে ওঠা বিপ্লবী সংগঠন। যার উদ্দেশ্য ছিল উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া অর্থাৎ উপনিবেশ বাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম ও অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো।

* ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে সংগঠিত হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এই বিশ্বযুদ্ধের সর্বাত্মক প্রভাব সমস্ত বিশ্বব্যাপী যেমন পড়েছিল, সেই সাথে সাথে পরীধীন ভারতবর্ষের রাজনীতি, সমাজ ও অর্থনীতির উপরে ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

* ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে সংগঠিত হয় চম্পারণ বিদ্রোহ। ভারতের শ্রমজীবি, ভূমিদাস, খেটে খাওয়া মানুষদের আমরণ সংগ্রামের কাহিনি। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তথা সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার দশ হাজারের বেশি চম্পারণের চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক ভূমিদাসদের নীল চাষ করতে বাধ্য করে। এবং সেই নীল খুব কম দামে চাষীদের কাছ থেকে কিনে চাষীদের সাথে প্রতারণা করে তা রপ্তানী করত। তার প্রতিবাদে মূলত এই চম্পারন বিদ্রোহ সংগঠিত হয়। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে এই সময় রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল লেনিনের নেতৃত্বে, যা সারা বিশ্ব ব্যাপী মার্কসবাদী সংগঠন ও আন্দোলনকে এক বিশেষ মাত্রা প্রদানে সক্ষম হয়।

* ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে রাউলাট অ্যাক্ট আইন প্রণয়ন হয়, যাকে বলা হয় 'কালা কানুন'। এই আইনের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তার শাসন শোষণের দূড়ান্ত নগ্ন রূপ উদ্‌ঘাটিত করেছিল। অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রকোপে যেমন নাট্যশালায় ব্রিটিশ বিরোধী কোনোরকম কথাবার্তা বা ব্রিটিশ বিরোধী কোনোরকম ঘটনা দেখানো যেত না, তেমনি এই 'কালা কানুন' এর প্রবর্তনে শুরু

হল অকথ্য নির্যাতন, সভা সমাবেশ বন্ধ, বিনা বিচারে আটক ও জেলের মধ্যে গুলি করে হত্যা। ব্রিটিশ শাসনের এই পৈশাচিক রূপ ও কালো অধ্যায় ভারতবাসীকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল। **১৯১৯** খ্রিস্টাব্দেই পাঞ্জাবের অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগে ঘটে নৃশংস হত্যাকান্ড। যাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অত্যন্ত ব্যাথিত হয়ে তাঁর নাইট উপাধি ত্যাগ করেন।

* **১৯২০** খ্রিস্টাব্দে গান্ধিজীর নেতৃত্বে শুরু হয় 'আইন অমান্য আন্দোলন'। ব্রিটিশ শাসন ও শোষনের বিরুদ্ধে জনগণের এক স্বত:স্ফুর্ত বিদ্রোহী আন্দোলন।

* **১৯২২** খ্রিস্টাব্দে ঘটে চৌরিচৌরা ঘটনা। যেখানে ব্রিটিশ শাসন শোষণের বিরুদ্ধে জনতা কৃষক মজুরের স্বতঃস্ফূর্ত সশস্ত্র প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে শামিল হয়েছিল।

* **১৯২৮** খ্রিস্টাব্দে সাইমন কমিশনের ভারতে আগমন ঘটে, পাশাপাশি দেশজুড়ে বয়কট আন্দোলন প্রকট হয়ে দেখা দেয়।

* **১৯৩০** খ্রিস্টাব্দে বাংলা তথা ভারতবর্ষের রাজনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আইন অমান্য আন্দোলন শুরু, মহাত্মা গান্ধীর ডান্ডি অভিযান। আবার প্রথম গোল টেবিল কনফারেন্স হয় এই খ্রিস্টাব্দেই। এই সময় পূর্ব বঙ্গের বিপ্লবী আন্দোলন অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে সূর্য সেনের নেতৃত্বে। পঁয়ষট্টিজন বিপ্লবী চট্টোগ্রামের অস্ত্রাগার লুন্ঠন ও বন্দুকের লড়াইয়ে আশি জন রক্ষী ও বারো জন বিপ্লবীর মৃত্যু, সূর্য সেন সহ বহু বিপ্লবী পলাতক যদিও পরে অনেকেই ধরা পড়েন। অন্যদিকে বিনয়-বাদল-দিনেশের রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণ, আইজি সিমসন-কে হত্যা করার মত ঘটনা ঘটাতে সক্ষম হয়। ধরা পড়ে বাদল বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হন। বিনয় ও দিনেশ নিজেদের গুলি করে, পাঁচদিন পরে বিনয়ের মৃত্যু হয় ও দিনেশ সুস্থ হয়ে ওঠে, যদিও পরবর্তীকালে বিচারে তাঁর ফাঁসী হয়।

* **১৯৩১** খ্রিস্টাব্দে গান্ধী আরউইন চুক্তি সম্পন্ন হয়। অন্যদিকে লাহোড় ষড়যন্ত্র মামলায় ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুর ফাঁসি কার্যকর হয়। সাথে সাথে পূর্ববঙ্গের বিপ্লবী আন্দোলন ক্রমাগত মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠতে থাকে।

* **১৯৩২** গান্ধীজির হাজতবাস হয় ও কংগ্রেসকে নিষিদ্ধ করা হয়। চট্টোগ্রাম মামলার রায়ে বারো জনের যাবজ্জীবন সাজা প্রাপ্ত হয়।

* **১৯৩৪** খ্রিস্টাব্দে চট্টোগ্রামের বিপ্লবী নেতা মাস্টারদা সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তীদারের ফাঁসীর নির্দেশ কার্যকর করা হয়, যা বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনকে আরও উত্তেজিত ও উদ্দীপিত করে তুলেছিল।

* ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ব্রিটিশ রাজশক্তি এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল সরাসরি। তিরিশের দশক থেকেই জার্মানি, ইটালি, স্পেন, জাপানে ফ্যাসিস্ট শক্তি মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছিল। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এক নির্লজ্জ প্রচেষ্টা চলছিল যার ফলে সমস্ত গণতান্ত্রিক মানুষের স্বাধীনতা ও সত্তা বিনষ্ট করে দিচ্ছিল। হিটলার ও মুসোলিনির দ্বৈত আস্ফালনে সমগ্র ইউরোপ জুড়ে গণতন্ত্র ভুলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে। এই পরিবেশ পরিস্থিতিতে গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষদের স্বাধীনতা যেমন নষ্ট হচ্ছিল তেমনি শিল্পসাহিত্যের স্বাধীন সত্তা ও স্ফুর্তি লাভ করতে পারছিল না। তাই গণতন্ত্রকে বাঁচাবার জন্য ও শিল্পসাহিত্যকে রক্ষা করার তাগিদে গণিতান্ত্রিক মানুষেরা একত্রিত হতে থাকলেন।

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু নানারকম মতপার্থক্যের কারনে কংগ্রেসের সঙ্গে পুরোপুরি সম্পর্ক ত্যাগ করেন ও নিজস্ব মতাদর্শ ও ভাবনা চিন্তায় গঠন করেন ফরওয়ার্ড ব্লক।

* ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লীগ লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তান প্রস্তাব পেশ করে।

* ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে বহু প্রস্তাব নিয়ে ক্রিপস মিশনের ভারতে আগমন ঘটে। এই সময় ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু হয়ও তার সর্বাত্মক ব্যাপকতা লাভ করে। সুভাষ চন্দ্র বোসের নেতৃত্বে গঠিত হয় আজাদ হিন্দ বাহিনী, যা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশেষ কার্যকরী ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। ভারত ছাড়ো আন্দোলন এতটাই ব্যাপক ও তীব্র হয়ে উঠেছিল যে ব্রিটিশ সরকার তা দমন করতে চরম পন্থা অবলম্বন করে এবং তা দমন-পীড়ন-অত্যাচার-নৃশংসতার মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। সরকারি হিসাব অনুসারে ১৯শে আগষ্ট থেকে ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যেই ৬২২২৯ জনকে গ্রেফতার করা হয় ভারত রক্ষা আইনে। ১৮০০০ জনকে নজর বন্দি করে রাখা হয়। পুলিশ মিলিটারির আক্রমণ, অত্যাচার, নিপীড়ন ও নির্যাতনে নিহত হন ৯৪০ জন এবং আহত হন ১৬৩০ জন।

* ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে, বাংলা ১৩৫০ সাল অবিভক্ত বাংলায় দেখা যায় মহামন্বন্তর। যা বাংলার ইতিহাসে পঞ্চাশের মন্বন্তর নামে পরিচিত। সেই সাথে ভয়াবহ মহামারি-মড়ক এবং ঝড়, বৃষ্টি সহ নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়, লক্ষ লক্ষ মানুষের ক্ষুধা-যাতনা ও ক্ষুধা-পীড়িত মানুষের আর্তনাদ, লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু। রেশনের দোকানে লম্বা লাইন, লঙ্গর খানার ভিড়, সুযোগ বুঝে মহাজন-মজুতদার, কালোবাজারিদের নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রবণতা। বিশ্বযুদ্ধের সাইরেন, সৈন্য মিছিল, ব্লাক আউটের মহড়া সেই সাথে ব্রিটিশ প্রশাসন ও পুলিশের অত্যাচার বাংলা তথা ভারতবর্ষের মানুষকে এক দু:স্বপ্নের অতলে প্রবেশ করতে বাধ্য করেছিল। এই কালা কালে কবি সুকান্ত

ভট্টাচার্য্যের 'রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতাটির কয়েকটি পঙ্‌ক্তি বিশেষ তাৎপর্য ও অর্থবহ—

"আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।
আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়
আমার বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়।"[২]

১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সিঙ্গাপুরে আর্জি হুকুমৎ-ই আজাদ হিন্দ অর্থাৎ স্বাধীন ভারতে অস্থায়ী সরকার গড়ার কথা ঘোষণা করেন। যা আজাদ হিন্দ সরকার নামে পরিচিত। ব্রিটিশ সরকারকে অস্বীকার ও ভারত সরকারের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর এই মহৎ উদ্যোগ।

*১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা আন্দোলন তথা ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে সংগঠিত হয় নৌবিদ্রোহ যার তীব্রতা ও ব্যাপকতা সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। কেন্দ্রে গঠিত হয় অন্তবর্তীকালীন সরকার। পাশাপাশি কলকাতায় শুরু হয় হিন্দু মুসলিমের এক রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা। সেই দাঙ্গা ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়ে ঢাকা, নোয়াখালি এবং বিহারেও।

*১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ভাইসরয় হলেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট এল কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। ভারত ও পাকিস্তান ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ হয়ে গেল দুটি দেশ। ভারতের প্রধানমন্ত্রী হলেন পন্ডিত জওহরলাল নেহরুে ও পাকিস্তানের মহম্মদ আলি জিন্না। ভারতবর্ষ উপভোগ করল স্বাধীনতার নতুন সূর্যের স্বাদ।

*১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ৩০শে জানুয়ারী মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করা হয় দিল্লীর সুবৃহৎ প্রাসাদ বিড়লা হাউসের প্রাঙ্গনে। তাঁর ঘাতক ছিলেন নাথুরাম গডসে। মহাত্মা গান্ধী হত্যার পিছনে ছিল এক সুবৃহৎ চক্রান্ত, এবং সেই চক্রান্তের পিছনে ছিল কিছু স্বার্থপর ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক নেতারা।

*১৯৫২-৫৩-র মধ্যে ভারতবর্ষের প্রথম সাধারণ নির্বাচন সংগঠিত হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নির্বাচনে ৪৮৯ টি আসনের মধ্যে ৩৬৪ টি আসন লাভ করে সরকার গঠন করেছিল।

*১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে ভারত-চীন যুদ্ধ, ভারতের পরাজয়, যা ভারতের রাজনীতির উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে ও রাজনৈতিক নানান পট পরিবর্তন করে। পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে ১৯৬২ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রাককালে দেখা যায় বিভিন্ন কলকারখানায় শ্রমিক আন্দোলন ও তাদের

দাবি দাওয়া নিয়ে ধর্মঘট যা তীব্র ও ব্যাপকতা লাভ করে। হুগলি জেলার হিন্দুমোটর কারখানায় ৬০০০ শ্রমিক বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে তাদের ধর্মঘট ও ধর্মঘটিদের উপরে মালিক পক্ষের নির্মম অত্যাচার ও দমন পীড়ন করে সে ধর্মঘট ও আন্দোলন অবদমিত করা হয়।

*১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ড. বিধানচন্দ্র রায়-এর মৃত্যু, তাঁর জায়গায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হন খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন। এইসময় পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যসংকট ভয়াবহ রূপ ধারন করতে থাকে।

*১৯৬৫-৬৬ খ্রিস্টাব্দে খাদ্য সংকট এক চরম পরিণতি লাভ করে। ভয়ংকরতম খাদ্য সংকটের দিনে সারা দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু হয়, পুলিশের গুলি চলে, আন্দোলনকারীর মৃত্যু হয় ও সারা দেশব্যাপী হৈ চৈ পড়ে যায়।

*১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে আবার সাধারণ নির্বাচন সংগঠিত হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসি অপশাসনের বিরুদ্ধে মুক্ত হওয়ার আশায় মেহনতি জনতা-মজদুর, শ্রমিক ও মধ্যবিত্তের লড়াই তীব্র হয়ে ওঠে। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস পরাজিত হয় ও পশ্চিমবঙ্গের শাসনক্ষমতায় আসীন হয় কংগ্রেস বিরোধী দল ও বামপন্থী রাজনৈতিক দলের জোট ‘যুক্তফ্রন্ট’। এই একই সময়ে মে মাসে উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ি অঞ্চলে শুরু হয় কৃষক শ্রেণির সশস্ত্র আন্দোলন। আদিবাসী, ক্ষেতমজুর, কৃষকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ বাধে নিহত হয় দুই শিশুসহ সাত কৃষক রমণী।

*১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে সন্ত্রাস ও অত্যাচারের মধ্যে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে আবার ক্ষমতা দখল করে কংগ্রেস দল। এ সময় পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে হানাহানি, মারামারি ও গুপ্তহত্যা ব্যাপক আকার ধারণ করে।

*১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে সারা দেশব্যাপী ঘোষিত হয় ইমারজেন্সী বা জরুরী অবস্থা। জরুরী অবস্থার পটভূমিকায় বিরোধীদের নির্বিচারে হত্যা, নির্যাতন, ঘরছাড়া, জেল বন্দি ও বিনা বিচারে আটক চলতে থাকত।

*১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হল। কংগ্রেসকে পরাজিত করে জ্যোতিবসুর নেতৃত্বে শাসন ক্ষমতায় এল বামফ্রন্ট সরকার, শুরু হল নতুনতর অধ্যায়।

উৎপল দত্ত ভারতবর্ষ তথা বিশ্বে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাবলি অতীব সুন্দর শিল্পসুষমায় তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ, চিন্তা ও চেতনা নাটকের মধ্যে তুলে ধরেছেন। মানুষের পাশে মানুষের কাছে থেকে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে রাজনীতি করে গিয়েছেন আজীবন। তাঁর স্পষ্ট

মত—‘‘রাজনীতিভীতি- ও হল গণতন্ত্র নিধনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা।...... তার পাশে প্রত্যক্ষ রাজনীতির কথাগুলি কি প্রত্যক্ষভাবে বলার প্রয়োজন নেই? রাজনীতির আসরটাকে গুণ্ডাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমরা সরে পড়ব নাকি?’’[৩]

রাজনৈতিক ভাঙাগড়ার ইতিবৃত্তে উৎপল দত্তের মৌলিক নাটক

এবারে আমরা দেখার চেষ্টা করব উৎপল দত্ত তাঁর সমসাময়িক তথা বাংলা ও ভারতবর্ষের রাজনৈতিক বিভিন্ন ঘটনাবলি নাট্যকর্মের বিষয় করে তুলেছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের প্রতিটি অধ্যায়কেই তাঁর শিল্পকর্মে অত্যন্ত সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছিলেন। উৎপল দত্তের মনোজগতে এ চিন্তাধারা দানা বাঁধছিল ষাটের দশকের প্রথম থেকেই। সেই সময় থেকেই তিনি ভারতের ইতিহাসের পুনর্মূল্যায়ন ও ইতিহাসের মধ্যে অন্তর গহনে ব্রতী হন।

হাতের কাছে তখন বড়ো ঘটনা বিহারের ধানবাদ অঞ্চলে সদ্য ঘটে যাওয়া জামা ডোবায় চিনাকুরি ও বড়াধেমো কয়লাখনি দুর্ঘটনা। সেখানে আগুন লাগা ও জল ঢুকে যাওয়ায় শ্রমিকদের মর্মান্তিক অবস্থার খবর তখন কলকাতার সংবাদপত্রের শিরোনামে। শ্রমিকদের প্রতি মালিকদের উদাসীনতা ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে বাংলা তথা ভারতবর্ষের রাজনীতিতে তোলপাড় করে দিয়েছিল। উৎপল দত্ত নিজে এবং তাঁর নাটক প্রযোজনায় সাহায্যকারী অন্য কয়েকজনকে নিয়ে সেখানে গেলেন, তিনি নিজে সদলবলে সেখানকার পরিস্থিতি ঘুরে দেখলেন, দেখলেন শ্রমিকদের কষ্টকর জীবন, তাদের বস্তিতে গিয়ে তাদের সঙ্গে মিশলেন, কথা বললেন। দুর্ঘটনার পর যেসব শ্রমিক খাদান থেকে বেঁচে ফিরেছিলেন তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন। সবকিছু জেনে বুঝে নিয়ে তারা ফিরে এলেন কলকাতায়। এবারে উৎপল দত্ত লিখলেন ‘অঙ্গার’ নাটক এই ঘটনা অবলম্বন করে। ‘‘প্রথমে নাম রাখা হয় ‘কালো হিরে’। পরে লিটল থিয়েটার গ্রুপের তদানীন্তন সভাপতি চিত্ত চৌধুরির মতে নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় ‘অঙ্গার’।’’[৪]

১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে তিনি লিখলেন ‘ফেরারী ফৌজ’। ‘ফেরারী ফৌজ’ নাটক রচনায় উৎপল দত্ত নতুন বিষয় চয়ন করলেন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের পটভূমিতে এই নাটকটি লেখা। এই সময় পূর্ব বাংলার জেগে ওঠা যুবকদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ নিয়ে নাটকটি গড়ে উঠেছে। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলন তখন তুঙ্গে। পূর্ব বাংলার যে বিপ্লবীরা সশস্ত্র আন্দোলনের পথ ধরে ছিল তাদের নিয়েই নাটক। ব্রিটিশ শাসনাধীন অবিভক্ত বাংলার এইসব বিপ্লবীদের কার্যকলাপ ব্রিটিশদের সাম্রাজ্যবাদী যে শাসনব্যবস্থা তাকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। এই ঘটনা শুধু বাংলার রাজনীতিতে নয় সারা ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে বিশেষ ছাপ রাখতে সক্ষম হয়েছিল। উৎপল দত্ত সেই বিপ্লবী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বিপ্লবের ছবি ফুটিয়ে তুললেন আলোচ্য নাটকে।

'ফেরারী ফৌজ' নাটকের পরে উৎপল দত্তের আরেকটি ঐতিহাসিক প্রযোজনা 'কল্লোল' নাটক। মিনার্ভায় প্রথম অভিনীত হল ২৮ মার্চ, ১৯৬৫। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র বিদ্রোহকে বিষয়বস্তু করে এই নাটকটি লেখা হয়। এই নাটক বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা, কী বিষয় বস্তুর ক্ষেত্রে, কী আঙ্গিকের ক্ষেত্রে, কী সামাজিক আলোড়ন সৃষ্টির ক্ষেত্রে।

১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের ব্যর্থ ও অসম্পূর্ণ নৌ-বিদ্রোহের পর আবার পুনরায় নৌ-বিদ্রোহ সংঘটিত হলে ১৯৪৬ সালে সেনাবাহিনীর মধ্যে ব্রিটিশ শাসকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে-এতদিনের পুঞ্জিভূত ক্ষোভ ১৯৪৬ সালের নৌ-বিদ্রোহের মধ্যে গর্জে উঠেছিল। শুধু 'খাইবার' ও 'তলোয়ার' নামক জাহাজে এইসব ঘটনা ঘটেছিল তাই নয়, 'খাইবার' ও 'তলোয়ার' জাহাজের মতো আরও অনেক জাহাজেই এইরকম সেনাবাহিনীর মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ ও সংগ্রাম লক্ষ করা গিয়েছিল। এই নাটক পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের প্রাক্ মুহূর্তের। দেশের নানা প্রান্তে তখন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন স্বাধীনতা লাভের উত্তেজনায় ফেটে পড়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে। ভারত ছাড়ো আন্দোলন, শ্রমিক ধর্মঘট সারাদেশে এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি করেছিল। ঠিক তার পরেই সংঘটিত হয় নৌ-বিদ্রোহ। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ইন্ডিয়ান আর্মির ভারতীয় নৌবাহিনীতে বিদ্রোহ, এই বিদ্রোহ ভারতের ইতিহাসে নৌ-বিদ্রোহ বলা হয়। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় নৌবাহিনীর বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে 'কল্লোল' নাটকটি উৎপল দত্ত রচনা করেন। এই ঘটনা ভারতের রাজনীতিতে এক বিশেষ পরিবর্তনের ছাপ রাখতে সক্ষম হয়েছিল। এই নাটকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে উৎপল দত্ত অকপটে বলেন :

> *'কল্লোল' নাটক স্বাধীনতা সংগ্রামে নাবিক ও মজদুরদের বীরত্ব গাথাই শুধু বলেনি, বলেছিল কংগ্রেসি বেইমানদের দেশদ্রোহীতার কথা। অহিংস সত্যাগ্রহ যে আসলে সাম্রাজ্যবাদের দালালি, অস্ত্র ছাড়া যে জয় নেই এ কথা বলার প্রয়াস হয়েছিল।* [৫]

উৎপল দত্তের লেখা 'তীর' নাটকটি মিনার্ভা থিয়েটারে মঞ্চস্থ হল ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর। ১৯৬৭-এর নির্বাচনে কংগ্রেসকে পরাজিত করে কংগ্রেস বিরোধী দল ও বামপন্থী রাজনৈতিক দলের জোট যুক্তফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গের শাসনক্ষমতায় আসীন হয়। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জেলার নকশালবাড়ি অঞ্চলে কৃষকদের সশস্ত্র আন্দোলন শুরু হয়। বেনামি জমি উদ্ধার, খাস জমি বন্টন নীতি প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে ৩০ লক্ষ খেতমজুরদের সঙ্গে প্রশাসনের পুলিশের সংঘর্ষ বাঁধে। আদিবাসী কৃষক পুরুষ, রমণী বেশিরভাগ এতে যোগ দেয়। উত্তরবঙ্গের আদিবাসী সমাজের এই সংগ্রামকে দমিত করতে স্বাধীন দেশের যুক্তফ্রন্ট

সরকার নির্বিচারে গুলি চালায়। উত্তরবঙ্গের এই মর্মান্তিক গুলি চালানোর ঘটনায় সাত কৃষকরমণী ও দুইজন শিশু নিহত হয়েছিল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উৎপল দত্ত লিখলেন তাঁর 'তীর' নাটকটি। তীর, ধনুক, টাঙ্গি, বল্লম নিয়ে কৃষকরা সেদিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়েছিল এবং আমৃত্যু বীরের মতো লড়াই করেছিল। উৎপল দত্ত 'তীর' নাটক লেখার সময় নকশালবাড়ি অঞ্চলে ১৫ দিন ছিলেন, উত্তরবঙ্গের কৃষকদের মধ্যে ঘুরেছেন। জেনেছেন কৃষকদের জীবন সংগ্রামের কথা— তাদের দুঃখ কষ্ট ও শোষণের কাহিনি। নাটকে রয়েছে ঐক্যবদ্ধ কৃষক সমাজ যেখানে হিন্দু, মুসলিম, ওরাওঁ, রাজবংশী, নেপালি ঐক্যবদ্ধ; অন্যদিকে রয়েছে জোটবদ্ধ পুলিশ জোরদার— সেনাবাহিনী প্রশাসন। উৎপল দত্ত স্থির করলেন এ ঘটনার উপরে নাটক লিখবেন। উৎপল দত্তের কথায়—

> *মনে করেছিলাম প্রসাদুজোতে পুলিশের নৃশংস গুলি চালানোর বিরুদ্ধে আমাদের মুখ খুলতেই হবে, যেই সরকার থাকুক না কেন। আরো ভেবেছিলাম কৃষক যোদ্ধার বীরত্ব অমর গাঁথা হয়ে থাকবে।* [৬]

এ ঘটনা বাংলার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিশেষ একটা পটপরিবর্তন করেছিল। বলাবাহুল্য উৎপল দত্তের অতি বাম রাজনৈতিক চিন্তাধারা এখান থেকেই সূত্রপাত হয়েছিল।

'তীর'-এর পরবর্তী নাটক ছিল 'মানুষের অধিকারে'। এটি উৎপল দত্ত লিখেছিলেন ১৯৬২ সালে, মঞ্চস্থ করেন ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে। মানুষের অধিকারে নাটকটি প্রযোজনা করে উৎপল দত্ত প্রমাণ করেছিলেন আন্তর্জাতিক ভাবনার শরিক তিনি। বিশ্বের রাজনৈতিক ঘটনাবলি তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি, তার দৃষ্টান্ত হল এই 'মানুষের অধিকারে' নাটকটি। দেশে দেশে, কালে কালে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের প্রতি শ্বেতাঙ্গ মানুষদের যে বর্ণবিদ্বেষী ঘৃণা ও অত্যাচার চলে এসেছে, উৎপল দত্ত ইতিহাসের পাতা থেকে সেই ঘটনাটিকে তুলে এনেছেন আলোচ্য নাটকে। এই বর্ণবিদ্বেষী নির্মমতার বিরুদ্ধে মানুষের জেহাদ প্রতিবাদ প্রতিরোধকে সোচ্চার করে তুলেছেন।

১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের সেই কুখ্যাত স্কর্টসবরো মামলা অবলম্বনে মার্কিন মুলুকে কৃষ্ণাঙ্গ পীড়নকে কেন্দ্র করেই এই নাটকটা। কৃষ্ণাঙ্গরা আজ জেগে উঠেছে, আর শুধু পড়ে পড়ে মার খাওয়া নয়। 'মারের বদলা মার'-এর নীতিকে বিশ্বাস করে কৃষ্ণাঙ্গরা হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে, শ্বেতাঙ্গ অত্যাচারের মোকাবিলা করেছে রাইফেল নিয়ে। শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের এই সাম্প্রদায়িক বিরোধ আমেরিকান ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা, যা আমেরিকা তথা সারা বিশ্বের রাজ্য রাজনীতিকে তোলপাড় করে তুলেছিল। উৎপল দত্ত সুকৌশলে সেই ঘটনাটিকে এখানে তুলে এনেছেন। উৎপল দত্ত এই 'মানুষের অধিকারে' নাটক সম্পর্কে বলেন—

১৯৩১-এর কুখ্যাত স্কটসবরো মামলা অবলম্বনে মার্কিন মুলুকে কৃষ্ণাঙ্গ পীড়নের এই নাটকটি...আফ্রো-মার্কিন সংগীতে এলাবামার তুলার ক্ষেতের পারে পেন্টরক রেল স্টেশনে ও ডেকটুর শহরের আদালতের দৃশ্যসজ্জায়, পোষাকে, হাবভাবে, মেকাপে, সমবেত অভিনয়ে...যথাযথ ও শক্তিমান হয়ে উঠেছিল। [৭]

মিনার্ভা থিয়েটারে 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ'-এর নাট্যাভিনয়ের একেবারে শেষ পর্যায়ে 'যুদ্ধংদেহী' নাটকটি অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয় ২৪ নভেম্বর ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে 'মিনার্ভা থিয়েটারে'। মতান্তরে ১১ ডিসেম্বর ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে। নাটকটিতে দেখানো হয়েছে যুদ্ধের হাঁকডাক রাষ্ট্রনেতাদের নিজস্ব প্রয়োজনে সৃষ্টি করা হয় এবং দেশের অভ্যন্তরে জনসাধারণের মধ্যে যখন বিক্ষোভ জানাতে থাকে, তখন তাকে প্রশমিত করে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার একটা রাজনৈতিক কৌশল হল যুদ্ধ। দেশপ্রেমের জিগির তুলে বহু মানুষকে খাদ্য ও অর্থের লোভ দেখিয়ে যুদ্ধে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, আর বাকি দেশকে বোঝানো হয়— এখন যুদ্ধ চলছে, দেশকে রক্ষা করাই মহান ব্রত, সবকিছু ত্যাগ স্বীকার করা অবশ্য কর্তব্য। 'যুদ্ধংদেহী' নাটকের উৎপল দত্ত ভারত ইতিহাসের কল্পিত রূপকের আড়ালে বর্তমান ভারতের রাষ্ট্রশক্তি পাকিস্তানের সঙ্গে সীমান্ত সংঘাতকে তীব্র কশাঘাত হেনেছেন। যুদ্ধ যে একটি কৌশল এবং প্রকারান্তরে একটি ব্যবসা তা তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেছেন আলোচ্য নাটকে। রাষ্ট্রনেতাদের পেট বাজানো এবং মুনাফা বৃত্তি সাধিত করা, উৎপল দত্ত ব্যঙ্গ বিদ্রুপ ও শান্ত আক্রমণ করে দর্শকের সামনে তুলে ধরেছেন।

'লিটল থিয়েটার গ্রুপ'-এর গর্ভে জন্ম নিয়েছিল 'পিপলস্ লিটল থিয়েটার'। আন্তর্জাতিক থিয়েটার আন্দোলনের অভিজ্ঞতা নিয়ে তাতে জুড়ে দিলেন 'পিপলস্' শব্দটি। এই নতুন নামকরণের ফলে নতুন ভাবনার হাতিয়ার হয়ে উঠল 'পিপলস্ লিটল থিয়েটার'। এই নতুন নামকরণের এর ব্যাখ্যা উৎপল দত্ত পরবর্তী একটা সাক্ষাৎকারে বলেছেন; তাঁর কথায়—

কেননা ততদিনে মনে হচ্ছে 'পিপলস' কথাটা সর্বত্র জুড়ে দেওয়া উচিত, কেননা, 'লিটল থিয়েটার' যে আন্দোলন ইংল্যান্ডে শুরু হয়েছিল ১৯০৫ সালে সেটা ছিল শুধুই এক্সপেরিমেন্ট ফর এক্সপেরিমেন্ট সেক; পরীক্ষামূলক নাটক এর জায়গা। কিন্তু আমাদের যেটা মতবাদ, মতাদর্শ এখন অনেক পাল্টে গেছে। আগে পিপলস কথাটা না নিয়ে এলে আমাদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার হচ্ছে না দর্শকের কাছে। [৮]

'পিপলস্ লিটল থিয়েটার'-এর প্রথম এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা হল 'টিনের তলোয়ার'। প্রথম অভিনয় হয় ১২ আগস্ট ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রসদনে। বাংলা নাটকের ইতিহাসে

যে গুটিকয়েক নাটকের নাট্যসাহিত্য হিসেবে আলাদা করে বিচার করা যায়, 'টিনের তলোয়ার' তার মধ্যে অন্যতম প্রধান। এই নাটকটি থিয়েটার প্রযোজনা ও নাটক অভিনয়ের ইতিহাসে এক মাইল স্টোন হিসেবে পরিচিত। বাংলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চ ও প্রতিষ্ঠার ১০০ বছর স্মরণে নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল। এটি বোধহয় উৎপল দত্তের সবচেয়ে উপভোগ্য একটি নাটক।

বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্ব থেকেই নাটক ও নাটক অভিনয়ে ব্রিটিশ বিরোধিতা প্রকাশ পাচ্ছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের গণ্ডীতে এদেশ তখন আবদ্ধ। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ব্রিটিশরা এদেশের থিয়েটারের কণ্ঠরোধ করার জন্য এক কুখ্যাত আইন চালু করেন, তার নাম অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন (১৮৭৬)। এই কুখ্যাত আইন বাংলা থিয়েটারকে কীভাবে কণ্ঠরোধ করেছিল, এসবের মধ্য থেকেই কীভাবে বাংলা নাটক নানা রকম প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছিল তার আলেখ্য রচিত এই 'টিনের তলোয়ার' নাটক। শিল্পীরা সব সংশয় অতিক্রম করে কীভাবে থিয়েটারের শোষক ও দেশের শাসক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সদর্পে রুখে দাঁড়ালেন তার এক অবিস্মরণীয় রূপ হল 'টিনের তলোয়ার'। উৎপল দত্ত একবার একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন—

> *বাংলা নাট্যজগতে কিছু খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবী প্রচার করে চলেছেন বাংলায় নাকি রাজনৈতিক থিয়েটারের জন্মই হয়নি এখনো, বাংলা রাজনৈতিক নাটকের কোন অস্তিত্বই নেই; এই প্রচার এর বিপরীতে আমরা মনে করি, বাংলা রাজনৈতিক নাটক ও রাজনৈতিক নাট্যশালার অস্তিত্ব অবশ্যই আছে এবং এই রাজনৈতিক থিয়েটার ও রাজনৈতিক নাট্য আন্দোলন গড়ে উঠেছে গত ১০০ বছর ধরে।* [৯]

উৎপল দত্ত 'ব্যারিকেড' নাটকটির প্রযোজনা করেন ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে। প্রথম অভিনয় হয় ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে, কলামন্দিরে। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে নির্বাচনে সিপিআইএম পশ্চিমবঙ্গে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল, এবং এরপর ক্ষমতা দখলের জন্য অত্যাচার, ব্যাপক র‍্যাগিং করা ছাড়া কংগ্রেসের সামনে আর কোনো রাস্তা ছিল না। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে তারা গুলি চালিয়ে, বোমা মেরে, ভোটারদের ভয় দেখিয়ে, সন্ত্রস্ত করে বুথ থেকে তাড়িয়ে, তারা বুথ দখল করল বন্দুক উঁচিয়ে নিজেদের ইচ্ছামতো ভোটদান করল। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনের ঠিক আগে বামপন্থী নেতা হেমন্ত বসুকে হত্যা করেন কিছু অজ্ঞাতপরিচয় লোক। কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা এই হত্যার দায় সিপিআইএমের উপর চাপিয়ে দেয়, চলতে থাকে বামপন্থী কর্মীদের উপরে পুলিশি নির্যাতন, অত্যাচার ও নিপীড়ন। এ সবকিছুই ঘটেছিল প্রকাশ্য দিবালোকে গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এবং চরম লজ্জার কথা এই যে বুদ্ধিজীবীদের তরফ থেকে কোনো রকম প্রতিবাদ করা

হয়নি। বুদ্ধিজীবীদের এই নীরবতা উৎপল দত্তকে ক্রুদ্ধ করে তুলেছিল; একই সঙ্গে তাকে ক্রুদ্ধ করেছিল শাসক শ্রেণির এই বেপরোয়া সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। উৎপল দত্ত প্রত্যাঘাতের পথে এগোলেন তাঁর নাটক নিয়ে। এ সময় বামপন্থী কর্মীরা তাদের বাড়ি থাকতে পারছে না, তারা কর্মক্ষেত্রে যেতে পারছে না। এসব ঘটনা নিয়ে তিনি লিখে ফেললেন 'ব্যারিকেড' নাটকটি। উৎপল দত্তের কথায়—

> *তখন চতুর্দিকে ফ্যাসিস্ট শক্তির উত্থান ঘটেছে, সিপিআইএম এর একজন সদস্য ও তখন নিজের বাড়িতে থাকতে পারছেন না, তারা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে যেতে পারছেন না, এহেন অবস্থায় প্রচণ্ড ক্রোধে আমি নাটক লিখলাম— 'ব্যারিকেড'।* [১০]

নাটকটি জার্মানির হিটলারের উত্থানের পটভূমিকায় রচিত হলেও নাট্যগঠন, সংলাপ ঘটনাবলি এমন এক আশ্চর্য দক্ষতায় তুলে ধরা হয়েছিল যে দর্শকদের এটা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয়নি যে জার্মানির ঘটনার মধ্য দিয়ে আসলে বাংলার কথাই বলা হচ্ছে।

উৎপল দত্ত তার সমসাময়িক রাজনৈতিক বিভিন্ন ঘটনাবলি যা ভারত তথা বিশ্বের ইতিহাসকে নাড়া দিয়েছিল, সেইসব ঘটনাবলি অবলম্বন করে যেমন নাটক রচনা করেছেন, তেমনি ভারতের অতীত কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস যা বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে ও বাংলা তথা ভারতের রাজনীতিকে নাড়িয়ে দিয়েছিল, এমন কিছু ঘটনাকে কেন্দ্র করে ও নাটক রচনা করেছেন। তার মধ্য অন্যতম হল 'টোটা' নাটকটি। 'ব্যারিকেড'-এর পরের নাটকটি ছিল 'টোটা'। প্রথম অভিনয় হয় ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির 'আইফাক্স' হলে। পরে কলকাতায় অভিনীত হয় 'রবীন্দ্রসদনে', ১লা জুলাই। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের সিপাহীদের যে আন্দোলন, ইতিহাসে 'সিপাহী বিদ্রোহ' নামে পরিচিত, সেই বিদ্রোহ ব্রিটিশ রাজশক্তির ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল, তারই পটভূমিকায় 'টোটা' নাটকটি লেখা হয়। পরবর্তী সময়ে 'টোটা' নাটকের কিছু অংশ বাদ দিয়ে এবং কিছু অংশ সংযোজন করে নতুন নামকরণ হয় 'মহাবিদ্রোহ'।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতের সিপাহীরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ শাসনের কবল থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিল। বিগত ১০০ বছর ধরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এদেশের নির্মম শাসন শোষণ চালিয়ে এদেশের অর্থনীতি, শিক্ষা ও জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। সিপাহীদের সংগ্রাম ছিল এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, যা ভারতের মহাবিদ্রোহ বলে পরিচিত। এই মহাবিদ্রোহকে পটভূমিকা করে উৎপল দত্ত এই নাটকটি রচনা করেছিলেন।

উৎপল দত্তের আরেকটি স্মরণীয় রাজনৈতিক নাট্য প্রযোজনা 'দুঃস্বপ্নের নগরী'। ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে ১৬ মে প্রথম অভিনয় হয়। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে সাধারণ নির্বাচন জিতে কংগ্রেস সিদ্ধার্থ শংকর রায়-এর মুখ্যমন্ত্রীত্বে পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠন করল। ক্ষমতা কায়েম করতে সব রকমের অত্যাচার দমন-পীড়ন সন্ত্রাস চালিয়ে যেতে থাকল এই কংগ্রেসি সরকার ও তার মদতপুষ্ট গুণ্ডার দল। রাজনৈতিক নেতা, প্রশাসনিক কর্তা, গুণ্ডা মাস্তান ও কিছু তাঁবেদার সংবাদমাধ্যমের নির্লজ্জ আঁতাত— সবমিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গে একরকম হেস্তনেস্ত অবস্থা। শাসক শ্রেণির দ্বারা জনতার উপরে যে দুর্বিষহ অত্যাচার চলছিল, বামপন্থী নেতাকর্মীরাও সমানভাবে অত্যাচারিত, নিপীড়িত হচ্ছিলেন। তারা না পাচ্ছিলেন স্বাধীনভাবে চলতে, না পাচ্ছিলেন কর্মক্ষেত্রে যেতে। তখন কলকাতা সত্যি দুঃস্বপ্নের নগরী হয়ে উঠেছিল সাধারণ মানুষের কাছে। রাষ্ট্রীয় শক্তির সহায়তায় গুণ্ডা মাস্তান ও পুলিশ— উৎপল দত্ত সমসাময়িক রাজনীতির বিষয়কে নাটকে নিয়ে এলেন— একেবারে সোজাসুজি প্রত্যক্ষভাবে— নাট্য প্রযোজনায় নিজের দেশের সমকালের জ্বলন্ত চিত্র আঁকলেন।

উৎপল দত্তের 'দুঃস্বপ্নের নগরী'ও তৎকালীন সরকারের ভাড়াটিয়া গুণ্ডাদের হাতে বারে বারে আক্রান্ত হয়েছে, পুলিশের দ্বারা নিগৃহীত হয়েছে। এমনকি নাটকটি বন্ধ করার উদ্দেশ্যে এ নাটকের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা করা হয়েছে। উৎপল দত্তের ভাষায়—

> *আমাদের 'দুঃস্বপ্নের নগরী'— তখন বেআইনি হলো; শুধু বেআইনি হলো না, প্রহৃতও হলো; যেখানেই অভিনয় করতে যাচ্ছি সেখানেই প্রহার।* [১১]

১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে সারা ভারতে জরুরি অবস্থা জারি হয়। এই জরুরি অবস্থার পটভূমিকে কেন্দ্র করে উৎপল দত্ত আরেকটি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নাটক প্রযোজনা করেন, যার নাম 'এবার রাজার পালা' নামে নাটক, প্রথম অভিনয় হয় ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে। ভারতবর্ষ জুড়ে তখন ইমারজেন্সি বা জরুরি অবস্থা চলছে। কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন-শোষণ, তর্জন-গর্জনে দেশময় সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক জীবন জরুরি অবস্থার সন্ত্রাসে একেবারে থমকে গিয়েছিল। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধি তখন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী, তারই শাসনকালে তার স্নেহধন্য পুত্র সঞ্জয় গান্ধির রাজনীতিতে আবির্ভাব। ইমারজেন্সির সুযোগ নিয়ে সঞ্জয় গান্ধি তখন সর্বময় কর্তা হয়েছেন, দেশের রাজনীতিতে। সে এক অরাজক ভয়ানক অবস্থা। ইন্দিরা গান্ধি ও তার চক্র ভারতের সংবিধানকে নিলর্জ্জভাবে পদদলিত করলেন, ভারতবাসীর সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিলেন। এই জরুরি অবস্থার পটভূমিতে উৎপল দত্ত লেখেন, 'এবার রাজার পালা' যেটি ছিল তার অন্যতম প্রিয় নাটক। এই নাটকে উৎপল দত্ত স্বৈরাচারী শাসকদের এক ধরনের পাগল হিসেবে চিত্রায়িত করলেন। এই পাগলরা যখন দেশের দায়িত্বভার নেয় তখন অনিবার্যভাবে তারা দেশের

সংবিধানকে তছনছ করে দেশের আইনকে পদপিষ্ট করে, মানুষের অধিকার হরণ করে। উৎপল দত্ত এই জটিল বিষয়কে হাস্যরসের মধ্য দিয়ে, অতুলনীয় কমেডির মধ্য দিয়ে বুদ্ধিদীপ্তভাবে 'এবার রাজার পালা' নাটকটিকে চিত্রিত করেন। স্বৈরাচারী শাসকদের হাস্যকর করে তোলেন জনতার কাছে।

১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে যারা ভারতব্যাপী জরুরি অবস্থার পটভূমিতে উৎপল দত্ত আর একটি নাটক প্রযোজনা করেন। নাটকটি হল 'লেনিন কোথায়'। এই নাটকে দেখানো হল দুর্বিষহ রাজনৈতিক পোষণ ও শাসন। এই দুর্বিষহ অবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টি ও কর্মীদের দুরবস্থা এবং এই দুরবস্থার মধ্য দিয়ে তাদের কি কর্তব্য তা বলা হয়েছে। রাশিয়ার প্রেক্ষাপটে লেনিন-এর নেতৃত্ব এবং প্রাক্‌বিপ্লবকালে পার্টিকর্মীদের ও সাধারণ মানুষের অবস্থা খুব সুন্দরভাবে এই নাটকে বলা হয়েছে। জনগণ তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবে নানা আন্দোলনে যোগ দিচ্ছে। কংগ্রেস বিরোধী নানা রাজনৈতিক দলের বহুমুখী আন্দোলন নানা আকারে সারা ভারতে সংঘটিত হয়ে চলেছে। জোটবদ্ধ অবস্থায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কংগ্রেস ও তার নেত্রী ইন্দিরা গান্ধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। গুপ্তহত্যা, জেলে বন্দি করে রাখা, নানা উৎপীড়ন চালিয়ে বিরোধীদের এই প্রতিবাদ, এ আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা, সরকার পক্ষ থেকে নিরন্তর করা হয়েছিল। এরকম একটা পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে উৎপল দত্ত রচনা করলেন 'লেনিন কোথায়'।

১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে থেকে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত মোটামুটি এই সময়ে কেন্দ্রে অংগ্রেসি সরকার ছিল। এই সময় ক্ষমতায় আসে জনতা পার্টির নেতৃত্বে কিছুটা হিন্দুত্ববাদ ঝোঁকের সরকার। এইসময় উৎপল দত্ত যেসব নাটক প্রযোজনা করেছিলেন সেগুলোর মধ্য স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায় স্বৈরতন্ত্র বিরোধী সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী নাটক সৃষ্টির প্রচেষ্টা। উৎপল দত্তের কথায়—

> *দিল্লির ঘুষ আর লম্পটের রাজ্যে অধিষ্ঠিত বোধকরি আজ বিশ্বের সবচেয়ে পশ্চাত্‌পদ সবচেয়ে বিজ্ঞানবিরোধী একদল উচ্চবর্ণ হিন্দু।* [১২]

১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে উৎপল দত্ত মঞ্চস্থ করেন 'তিতুমির', যার বিষয়বস্তু ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের আপসহীন সংগ্রাম। ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক ভাষার বিরুদ্ধে একটা জোরালো প্রতিবাদ। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে তিতুমিরের নেতৃত্বে যে কৃষক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল তারই পটভূমিকায় এই নাটকটি লেখা হয়। ভারতের পরাধীন ইতিহাসে এক বিতর্কিত চরিত্র এই তিতুমীর। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে দেশবাসীর বিদ্রোহের এক পুরুষ চরিত্র হিসেবে তিতুমীরকে উৎপল দত্ত গ্রহণ করেছেন। হিন্দু জমিদারদের, অন্যায় অত্যাচর ইসলাম ধর্মবিরোধী বিভিন্ন আইন— এগুলোর বিরুদ্ধে তিতুমীরের আন্দোলন। প্রথমদিকে এই আন্দোলন মুসলমান

মৌলবাদকে সামনে রেখে এগোলেও পরবর্তী সময়ে এই আন্দোলন হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত লড়াইয়ে পরিণত হয়। ইংরেজ শাসনের ভিত নাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল এই আন্দোলন, যা ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

উৎপল দত্ত 'শৃংখল ছাড়া' নাটকটি প্রথম অভিনয় হয় ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে। কাল মার্কস এর মৃত্যু শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এই নাটকটি উৎপল দত্ত রচনা ও মঞ্চস্থ করেন। ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে জার্মানির বার্ডেন অঞ্চলে বিপ্লব এর কাহিনি থেকে এই নাটকটি লেখা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে পুনরায় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসে। কিন্তু কেন্দ্রে কংগ্রেসি সরকার। এই কংগ্রেস সরকার নানা চক্রান্ত করে চলেছে পশ্চিমবঙ্গের উপর যাতে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারকে অপদস্ত ও বরখাস্ত করা যায়। তার জন্য নানা চক্রান্ত ও সৃষ্টি-অনাসৃষ্টি নিরন্তর প্রচেষ্টা করে চলেছে। দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকারের এই রাজনৈতিক সংকটের মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ ও জনতার মানসিক বিকাশের। রাজনৈতিক সংকটের এই মুহূর্তে উৎপল দত্ত বিপ্লবীদের মহান নেতা কার্ল মার্কসকে স্মরণ করে এবং জার্মানির বার্ডেন অঞ্চলের লড়াকু মেহনতী জনতার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের পটভূমিকায় আলোচ্য নাটকটি রচনা করেন।

> *পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরেও প্রয়োজন ছিল শ্রমিক শ্রেণীর আরো রাজনৈতিক পরিপক্কতা, স্বৈরতন্ত্রকে পরাজিত করার জন্য প্রয়োজন ছিল বুর্জোয়াদের মধ্যকার দ্বন্দ্বকে নিজেদের কাজে লাগাবার, ব্যাখ্যা করার দরকার ছিল কেন শৃংখল ছাড়া মেহনতিদের হারাবার কিছু নেই।... কালমার্কসের মৃত্যু শতবর্ষে উৎপল দত্তের নাটক সেই কাজটাই করার চেষ্টা করেছিল।* [১৩]

মহাত্মা গান্ধির জীবনের শেষ আট মাস অবলম্বন করে লিখলেন 'একলা চলো রে' নাটকটি। প্রথম অভিনয় ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে। গান্ধি ও গান্ধিবাদের দ্বন্দ্ব, দেশভাগ ও স্বাধীনতা প্রাপ্তির, গান্ধি হত্যা ইত্যাদি বিষয় উৎপল দত্ত নাটকটিকে তুলে ধরলেন। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়। ভারতের স্বাধীনতার আগে ও পরে কয়েকমাসের ঘটনা নিয়ে এই নাটক। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে গান্ধিজি হত্যার কিছু পূর্বের ও পরের কয়েক মাস এই নাটকের ঘটনাকাল। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের চক্রান্তের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এদেশের কিছু লোভী, স্বার্থপর মানুষ ক্ষমতা লাভের জন্য দেশবিভাগ মেনে নিয়েছিল। সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ রেখে ইংরেজ ভারতবর্ষকে দু'টুকরো করে ক্ষমতা ভাগ করে দিয়েছিল কিছু লোভী মানুষের হাতে। গান্ধিজি দেশভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না, বরং তিনি দেশভাগ মেনে নিতে পারেননি। তিনি চেয়েছিলেন দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং ভারতের

স্বাধীনতা। তার ফলশ্রুতি হিসেবে শাসকবর্গের চক্রান্তে গান্ধিজিকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। দেশের এই উত্তাল পরিস্থিতিতে উৎপল দত্ত 'একলা চলো রে' নাটকটিতে সুন্দরভাবে নিপুণতার সঙ্গে তুলে ধরেন।

মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙাগড়ার ইতিবৃত্তে উৎপল দত্তের নাটক ও তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শ

উৎপল দত্ত সমস্ত জীবন মার্কসবাদী আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। মার্কসীয় দর্শন সমস্ত জীবন ধরে তিনি লালন পালন ও ধারণ করে গেছেন। তাঁর নাটকের প্রায় প্রতিটি আঙ্গিকে মার্কসীয় ধ্যান-ধারণা চিন্তাভাবনা ও তার আদর্শের কথা পরিলক্ষিত। উৎপল দত্ত একান্তভাবেই সাম্রাজ্যবাদ-ঔপনিবেশিকতাবাদ এবং ফ্যাসিবাদ বিরোধী একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির নাট্যকার ছিলেন। ত্রিশের দশকে অর্থনৈতিক সংকট তীব্রতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাসিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী লোভ ও বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে, পুঁজিবাদী শক্তি বৃদ্ধি পায়। তার ফলে শ্রমিক আন্দোলনের তীব্রতা যেমন বৃদ্ধি পেল, তেমনি কমিউনিস্ট মতবাদের ব্যাপক প্রসার ঘটে। এই ফ্যাসিবাদ এইসময় কমিউনিজমের ভীষণতম শত্রু হিসেবে আবির্ভূত হল। যেসকল সংগ্রাম বিদ্রোহ ও প্রতিরোধের কাহিনি উৎপল দত্তকে মোহিত করে। বিষয় বৈচিত্র্যে ভরপুর উৎপল দত্তের প্রতিটি নাটকই দ্বন্দ্বমূলক, বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা রচিত। ছোটো থেকেই উৎপল দত্ত মার্কসীয় আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি এক বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করতেন। একজন মার্কসবাদী ঠিক কী করে কীভাবে মার্কসবাদী আর্দশে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন, সঠিকভাবে তার নিজের পক্ষে বলা মুশকিল। উৎপল দত্ত যখন স্কুলে পড়তেন তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লাল ফৌজের প্রতিরোধ ও পরাক্রমের কাহিনি পড়ে বিস্মিত ও অবাক হয়েছেন। স্কুল ছেড়ে যখন তিনি কলেজে প্রবেশ করলেন, কলেজে পা দিয়েই মার্কস, এঙ্গেলস্ লেনিন, স্তালিন এমনকি হেগেল বা ফয়েরবাখ প্রভৃতি গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন। উৎপল দত্তের রাজনৈতিক চেতনা অঙ্কুরিত হচ্ছিল স্কুলে পড়ার সময় থেকেই। তাঁর ভাষায়—

> *স্কুলে থাকতেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লাল ফৌজের প্রতিরোধ ও পরাক্রমের কাহিনি পড়ে চমকৃত হতাম। স্তালিনের সহজ ভাষায় লেখা প্যামফ্লেট ও বই তখন থেকে পড়েছি। স্কুল শেষ হতে না হতে লেনিন, মার্কস, এঙ্গেলস্— এমনকি হেগেল, ফায়ের বাখ, কান্ট প্রমোশন নিয়েছি।* [১৪]

মার্কসবাদী চিরায়ত সাহিত্যের এই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে তিনি কলেজে প্রতিনিয়ত ছাত্র ইউনিয়নের সভা সমিতিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের মুণ্ডুপাত লক্ষ করেন, লক্ষ করেন পথে-ঘাটে কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের আক্রান্ত হতে। এরপর 'গণনাট্য সংঘ'-এ যোগদান করে তিনি সরাসরি যুক্ত হয়ে পড়েন সেই সময়কার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পরিস্থিতি নিয়ে বাক্‌বিতণ্ডা মতপার্থক্য ও বিভিন্ন বিষয়ের বিচার-বিশ্লেষণে। সে সময় তাঁর চোখের সামনে ঘটতে থাকে কমিউনিস্ট পার্টির উপরে নানান রকম অত্যাচার ও বেআইনিকরণ। বন্দিদের উপরে গুলি চালানো, কাকদ্বীপে নারী হত্যা, ডিব্রুগড়ে গণনাট্য সংঘের অনুষ্ঠানে গুলি বর্ষণ, হাজরা পার্কের সমাবেশে ও বউবাজারে নারী মিছিলের উপরে বেপরোয়া গুলি বর্ষণ— এইসব ঘটনা বৃত্তান্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলেছিল তাঁর ব্যক্তি জীবনে ও তার নাটকে। এসব ঘটনাক্রম উৎপল দত্তকে মার্কসবাদের প্রতি আরও আকৃষ্ট করে তোলে—

> *তখন একেবারে উত্তাল কলকাতার রাস্তা এবং আক্রান্ত হচ্ছে কমিউনিস্টরা। বিয়াল্লিশ সালে কি করেছিল? নেতাজীকে কি বলেছিল? এইসব তুলে কংগ্রেসীরা আক্রমণ করছে কমিউনিস্টদের। এই প্রথম আমার চোখের সামনে কালীঘাটের পার্টি অফিস আক্রান্ত হয় এবং সেখান থেকে কমরেডদের টেনে বার করে করে রাস্তায় ফেলে মারছে, এইসব আমি দেখি। কলেজ যাতায়াতের পথে।* [১৫]

এইসব দেখে শুনে তার মনে অত্যাচারিতদের প্রতি সমবেদনা বা সহমর্মিতা জাগ্রত হয়। উৎপল দত্তকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, তিনি মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন কোন সময় থেকে? উৎপল দত্ত জবাবে বলেছিলেন—

> *হওয়া উচিত ছিল ছাত্রাবস্থা থেকে। কিন্তু সেন্ট জেভিয়ার্সে কোন ইউনিয়ন পর্যন্ত ছিল না। এমন একটা কলেজ। ছাত্র ফেডারেশন তো দূরের কথা।* [১৬]

উৎপল দত্ত স্কুলে ও কলেজে যে সমস্ত বইপত্র পড়েছিলেন তা বামপন্থী রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট করেছিল এবং বামপন্থীদের উপরে কংগ্রেসিদের যে অকথ্য অত্যাচার তা তাঁকে মার্কসবাদের প্রতি সমব্যথী করে তুলেছিল। কিন্তু মার্কসবাদীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া আর নিজে মার্কসবাদী হওয়া দুটো এক জিনিস নয়। উৎপল দত্ত নিজেকে মার্কসবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন কলেজ ছাড়ার পর থেকে। এরপর থেকে সারাজীবন উৎপল দত্তের রাজনীতি ছিল মার্কসবাদের রাজনীতি। সমাজ-শোষণ ও রাজনৈতিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে জাগ্রত জনতার সমবেত প্রতিরোধ ও সংগ্রামের রাজনীতি। সমকালীন সময়ে তিনি মার্কসবাদের প্রতিটি ভাঙাগড়ার

বৃত্তান্ত ও তাদের রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগ্রামের বৃত্তান্ত গভীরভাবে তিনি অনুধাবন করেছেন এবং রাজনৈতিক ঘটনা বৃত্তান্তকে তার নাট্য সৃষ্টির মধ্যে অতি নিপুণ দক্ষতার সঙ্গে তিনি তুলে ধরেছেন। উৎপল দত্তের মার্কসীয় ভাবাদর্শ, চিন্তাভাবনা ও মতাদর্শ গভীরভাবে অনুধাবন করতে গেলে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা, গঠন ও আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা প্রাসঙ্গিক।

দেশে দেশে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার প্রেরণা জোগাতে লেনিনের উদ্যোগে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক (কমিন্টার্ন) স্থাপিত হয় ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে । এই পটভূমিকায় ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ অক্টোবর মাসে মানবেন্দ্র রায়ের সক্রিয়তায় সোভিয়েত ইউনিয়নের তাসখন্দ শহরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়। প্রতিষ্ঠার সময় পার্টির সদস্য হন সাতজন। পার্টির সম্পাদক হন মহম্মদ শাফিক সিদ্দিকী। (কমিন্টার্ন) ১৯১৯-৪৩ নির্ধারিত নীতি অনুসারে এবং ভারতের পরিস্থিতির উপযোগী একটি কর্মসূচি গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয় পার্টি তার প্রতিষ্ঠিত সভায়। কমিন্টার্ন ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে সিপিআই-কে গোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ১৯২১-২২ খ্রিস্টাব্দ থেকে দেশের কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, লাহোর, কানপুর শহরকে কেন্দ্র করে পার্টি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেন মোজাফ্‌ফর আহমেদ, এস এ ডাঙ্গে, সিঙ্গারা ভেলু চেট্টিয়ার, গোলাম হোসেন প্রমুখ নেতারা। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমশ একটা মূল ধারা হয়ে ওঠে এই কমিউনিস্ট আন্দোলনের ধারা।

প্রতিষ্ঠা পর থেকেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি করে আসে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৩৬তম অধিবেশন হয় আমেদাবাদে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে ও ৩৭ তম অধিবেশন হয় গোয়ায় ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে। এই অধিবেশনগুলিকে কেন্দ্র করে সিপিআই-এর পক্ষ থেকে প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য ইস্তেহার প্রকাশ করা হয়। তাছাড়া কংগ্রেসের আমেদাবাদ অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাব ও উত্থাপন করা হয়।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রথম থেকেই ব্রিটিশ শাসকের কাছে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। ফলে ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে থেকেই এই পার্টির উপর আক্রমণ নেমে আসতে থাকে। ১৯২১ থেকে ১৯২৭ সালের মধ্যে পাঁচটা পেশোয়ার ষড়যন্ত্র মামলা, ১৯২৩ থেকে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা, ১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে মিরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলা চলে। বলা বাহুল্য সব কটাই সাজানো মামলা। কমিউনিস্ট আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি এতটাই ভয়াবহ ও তীব্র ছিল যে, পরাধীন ভারতে ১৯৩৪ থেকে ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে এবং স্বাধীন ভারতে ১৯৪৮-৫১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই পার্টি নিষিদ্ধ থাকে।

সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির, বিভিন্ন পেশার, বিভিন্ন অংশের মানুষকে তাদের নিজ নিজ দাবি সেইসঙ্গে দেশের স্বাধীনতার দাবিতে শামিল করার জন্য সিপিআই নানা শ্রেণি ও সংগঠন গড়ে তুলতে থাকে। অবশ্য কোনো কোনো সংগঠন স্থাপনে প্রাথমিকভাবে সিপিআই-এর অবদান ছিল না। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে সারা ভারত কৃষক সভা, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশন গঠিত হয়, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয় 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ', ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' গঠিত হয়।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের পর পণ্ডিচেরী, গোয়া ও দেশের কিছু অংশ ঔপনিবেশিক শাসনে ছিল। ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে ফরাসিদের কবল থেকে পণ্ডিতচেরী ও অন্যান্য অংশ মুক্ত করা এবং ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজদের কবল থেকে গোয়া ও অন্যান্য অংশ মুক্ত করার ক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। গোয়া মুক্তির জন্য ৩৫ জন দেশপ্রেমিক শহিদ হন, যাদের মধ্যে ২৭ জন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

দেশের স্বাধীনতা এবং সেইসঙ্গে দেশের মানুষের মুক্তির জন্য ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে পার্টি 'ড্রাফ্ট প্ল্যাটফর্ম অফ অ্যাকশন' নামে একটি দলিল হাজির করে। ভারতীয় জনসাধারণের সমস্ত অংশের সমস্যাবলি উপলব্ধি করে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ ঘটাতে একটা সর্বাঙ্গীণ কর্মপন্থা স্থির করে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। বিশ শতকের দুই ও তিনের দশকের ফ্যাসিবাদ ক্রমশ সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে সবচেয়ে বড়ো বিপদ হিসেবে হাজির হয়। এই ফ্যাসিবাদ বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে যুক্ত করা জরুরি হয়ে পড়ে। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে কমিন্টার্ন-এর সপ্তম কংগ্রেস নির্দেশ দেয় যে— ভারতবর্ষে কমিউনিস্টদের সবরকম সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণআন্দোলনকে সমর্থন করতে হবে এবং তাতে অংশগ্রহণ করতে হবে, তাকে ব্যাপকতর করতে হবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতের জনসাধারণের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে আরও বাড়িয়ে তোলার জন্য সবরকম সাহায্য করতে হবে।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকা বৃদ্ধি পেয়েছে বলেই ভিন্ন ধারার স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ক্রমশ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছেন। জাতীয় বিপ্লববাদী আন্দোলনে যারা ছিলেন, গদর পার্টির নেতা যারা ছিলেন, ভগৎ সিং-এর সহকর্মীরা, সূর্যসেনের সহযোদ্ধারা, সুভাষচন্দ্র বসুর সহযোদ্ধারা, ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তারা অনেকেই পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছেন। কমিউনিস্ট পার্টির ভাবধারা, আদর্শ ও কার্যপ্রণালী তাদেরকে প্রভাবিত করে; ফলে তারা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন ও বিভিন্ন আন্দোলনে শামিল হয়।

স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনগুলোতে আন্দামানের সেলুলার জেল, রাজপুতানার দেউলি, বাংলার প্রেসিডেন্সি জেল ইত্যাদি দেশের নানা জেল ও বন্দি শিবিরগুলিতে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা 'কমিউনিস্ট কলসলিডেশ্ন' গড়ে তোলেন। বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে অনেকেই পরবর্তীকালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন এবং নেতৃত্ব প্রদান করেন। এইভাবে কমিউনিস্ট পার্টিতে এসেছেন বাংলার প্রমোদ দাশগুপ্ত, নারায়ণ রায়, হরেকৃষ্ণ কোঙার, বিজয় মোদক, সুকুমার সেনগুপ্ত ও সত্যব্রত সেন প্রভৃতি দিকপাল মানুষেরা যারা মার্কসবাদকে আদর্শ করে জীবন অতিবাহিত করেছিলেন।

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে ও ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে দুটো দলিল গৃহীত হয়। প্রথমটা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর কমিউনিস্ট ও ওয়াকার্স পার্টিগুলোর প্রতিনিধিদের ঘোষণা (বার পার্টির দলিল) এবং দ্বিতীয়টা একাশিটা কমিউনিস্ট ও ওয়াকার্স পার্টিগুলোর বিবৃতি (একাশি পার্টির দলিল) নামে পরিচিত। কিন্তু এইসব দলিলের পরস্পর বিরোধী ব্যাখ্যা হতে থাকে। তার সঙ্গে যুক্ত হয় আরও কিছু কমিউনিস্ট আন্দোলনের মতপার্থক্য। একদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি, অপরদিকে চিনের কমিউনিস্ট পার্টি। ১৯৬৩-৬৪ খ্রিস্টাব্দে এই বিতর্ক হয়ে দাঁড়ায় মতাদর্শগত মহাবিতর্ক। এর প্রতিক্রিয়া ঘটে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে।

১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে ভারত-চিন বিরোধ, ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে সীমান্ত সংঘর্ষের চেহারা নেয়। দেশের মানুষকে উগ্র জাতীয়তাবাদী ভাবনায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে এর প্রভাব পড়ে। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে আবার পার্টির সাধারণ সম্পাদক অজয় ঘোষের জীবনাবসান হয়, সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন নিয়েও বিতর্ক শুরু হয়। কমিউনিস্ট পার্টির একটি অংশ মনে করেছিল ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি কোনো অখণ্ড সত্তা নয়। ভারতীয় বুর্জোয়াদের মধ্যে দুটি বিপরীত গোষ্ঠীর অস্তিত্ব আছে, একটি গোষ্ঠী সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী ও সমাজতন্ত্রের পক্ষপাতী এবং অপর গোষ্ঠী ভারতের শিল্প বিকাশে আগ্রহী ও সাম্রাজ্যবাদ, সামন্ততন্ত্রের বিরোধী, তারা প্রগতিশীল বুর্জোয়া শ্রেণি। এই প্রগতিশীল বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতিনিধিরা মনে করেছিলেন নেহেরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস এবং কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতার মধ্য দিয়েই ভারতের রক্ষণশীল সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করতে হবে, দেশকে আধুনিক শিল্প স্থাপনের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এটি ছিল কমিউনিস্ট পার্টির একটি অংশের মতো এবং এই অংশকে বলা হত পার্টির দক্ষিণপন্থী অংশ। অন্যদিকে পার্টির মধ্য অনেকেই ছিলেন যারা এই মতের বিরোধী— যাদের বলা হত বামপন্থী অংশ। তারা মনে করতেন এদেশের কংগ্রেসরাই জনগণের উপরে অত্যাচার, শোষণ ও নিপীড়ন করছে। কমিউনিস্ট পার্টি হল শোষিত, নিপীড়িত

ও অত্যাচারিত জনগণের পার্টি। সেদিক থেকে বিচার করলে অত্যাচারী শোষক কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতার কোনো প্রশ্নই আসে না। এরপর ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে ভারত-চিন সীমান্তে সংঘর্ষের সময় নেহেরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস যে উদ্দেশ্যে প্রচার শুরু করেছিল তাকে পূর্ণ সমর্থন জানায় কমিউনিস্ট পার্টির দক্ষিণপন্থী অংশ। কংগ্রেস সরকার সরাসরি ঘোষণা করলেন— পবিত্র মাতৃভূমিকে রক্ষা করার জন্য শ্রমিকরা অতিরিক্ত শ্রমদান করবে, কোনো ধর্মঘট করবে না ও তাদের আত্মত্যাগ করতে হবে। শাসক শ্রেণির এই কথাগুলো প্রচার করে শ্রমিক শ্রেণির উপরে নির্দয় শাসন চাপিয়ে দিয়েছিল এবং এই কথাগুলোকে কমিউনিস্ট পার্টির দক্ষিণপন্থী অংশ নিজেদের কথা হিসেবে গ্রহণ করলেন। তারা এ কথাও বললেন যে, প্রয়োজনে কংগ্রেসের সঙ্গে যৌথভাবে সরকার গড়তে হবে দেশের সুরক্ষা ও অগ্রগতির স্বার্থে। স্বভাবতই, পার্টির বামপন্থী অংশ এই মত মেনে নিলেন না ও প্রকাশ্যে বিরোধিতা করলেন, ফলে পার্টির অভ্যন্তরীণ বিরোধ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেতে লাগলো।

ক্রমে পার্টির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এমন জায়গায় পৌঁছায় যে, দক্ষিণপন্থী অংশ বামপন্থী অংশকে 'চীনের দালাল' বলে অভিহিত করলেন। কেননা তাদের মতে চিন-ভারত যুদ্ধের সময় বামপন্থী অংশ কংগ্রেস সরকারকে সমর্থন তো করেইনি বরং বিরোধিতা করেছেন এবং চিনের প্রতি সমর্থন ও সহমর্মিতা জানিয়েছেন। দক্ষিণপন্থী অংশ আরও দাবি করেন যে পার্টির মধ্যে বামপন্থীরা চিনের পার্টির তরফ থেকে প্রচার চালাচ্ছে। এইসব 'চীনের দালালদের' বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আর্জি জানালেন কংগ্রেস সরকারের কাছে। অচিরেই দেখা গেল কংগ্রেস সরকার কমিউনিস্ট পার্টির বামপন্থীর অংশের উপরে ব্যাপক আক্রমণ শুরু করে। 'ভারত-রক্ষা আইন'-এর বলে কমিউনিস্ট পার্টির বামপন্থী অংশের সদস্যরা একে একে গ্রেফতার হতে থাকলেন। বামপন্থী অংশের উপরে নেমে এল অকথ্য অত্যাচার, আক্রমণ ও নিপীড়ন। অথচ দক্ষিণপন্থী অংশ কংগ্রেস সরকারের এই আক্রমণের কোনো প্রতিবাদ, বিরোধিতা তো করলেনই না বরং দেশ রক্ষার নামে এই আক্রমণ ও অত্যাচারকে সমর্থন করলেন। কমিউনিস্ট পার্টির দক্ষিণপন্থী অংশরা যখন বলেছিলেন কংগ্রেসকে সমর্থন করতে বা কংগ্রেসকে সমর্থন করে প্রকৃত দেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যাবে, দেশকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাওয়া যাবে— তখন বামপন্থীরা এই মতের বিরোধিতা করেছিলেন বরং তারা অভিযোগ করেছিলেন দক্ষিণপন্থী অংশরা কংগ্রেসের লেজুড়বৃত্তি করে যাচ্ছেন। দক্ষিণপন্থী অংশ শ্রেণি-সংগ্রামের পথ পরিত্যাগ করে শ্রেণি-সহযোগিতার পথ বেছে নিয়েছেন। তারা কমিউনিস্ট পার্টির মূল নীতিকে পদদলিত করে শ্রমিকশ্রেণি, কৃষক ও মজদুরদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। এই দ্বন্দ্ব ক্রমে ক্রমে তীব্র ও ব্যাপক চেহারা নিতে থাকে।

অবশেষে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দু-ভাগে ভাগ হয়ে যায়। দক্ষিণপন্থী অংশ থেকে যান সিপিআই-তে। অপরদিকে, বামপন্থী অংশ নতুন পার্টি গঠন করেন সিপিআই(এম)।

উৎপলরঞ্জন দত্ত কোনো পার্টির সদস্য ছিলেন না। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন একজন মার্কসবাদী এবং শোষিত, অত্যাচারিত, নিপীড়িত মানুষের গণবিপ্লবে বিশ্বাসী। বাংলা রাজনৈতিক থিয়েটারের প্রবক্তা হিসেবে তিনি গোড়া থেকেই কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে নিবিড়ভাবে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। অবশেষে তিনি ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের পরে সিপিআই(এম)-এর সঙ্গে যুক্ত হন। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি জানান,

> *বারম্বার রাজনৈতিক দলের পাশে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক নাটকই আমরা করে যাবো। এবং ক্রমান্বয়ে রাজনীতি শিখবো দম্ভ ও গরিমা ত্যাগ ক'রে, যাতে শোধনবাদী ভুলও না হয়, আবার ট্রট্স্কিবাদী খোকামি রোগে না ভুগি।* [১৭]

উৎপল দত্ত পার্টিতে যুক্ত হওয়ার পর তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, পার্টির সঙ্গে যুক্ত হলে তার শিল্পী সত্তা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে না। তাকে সর্বদা পার্টির নির্দেশ মেনে কাজ করতে হবে। আর এই পার্টির নির্দেশে চালিত হলে তার শিল্পী সত্তা, শিল্পীর স্বাধীনতা কোথাও না কোথাও লঙ্ঘিত হবে। এসব অভিযোগের জবাব তিনি দিয়েছেন—

> *কোন দলের নেতৃত্ব স্বীকার করলেই যে— শিল্পী স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে তার স্বাধীন থাকার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। নির্দেশ কোন পার্টিই দেয় না। দেয় রাজনৈতিক লাইন। সে-লাইন সাংস্কৃতিক জগতে প্রয়োগ করার ভার নাট্য দলগুলির। সে-লাইন অনুসরণ না করলে শ্রেণী সংগ্রামে নাটককে সামিলই করা যাবে না।* [১৮]

উৎপল দত্ত এইবারে মার্কসবাদী শিল্প সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে শ্রমিক শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন। কমিউনিস্ট পার্টি যেহেতু শ্রমিক শ্রেণির পার্টি, তাই শ্রমিকের ভাবনার জগৎ, চেতনার জগৎ-কে বুঝতে গেলে পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলা অপরিহার্য। উৎপল দত্ত এই কাজটি অত্যন্ত সুনিপুণ ও দক্ষতার সঙ্গে করে গিয়েছিলেন। পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে মার্কসবাদী শিল্পীর চেতনা কোনোভাবেই কলুষিত হয় না বরং শ্রমিকদের অন্তরের বেদনা গভীরভাবে উপলব্ধি করা যায়। পার্টির সংস্পর্শে এসে শিল্পীর মুক্ত চিন্তা, শিল্পীর ধ্যান-ধারণা কলুষিত হয় কিনা, শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গি একপেশে ও পক্ষপাত দুষ্ট হয় কিনা সেসব অভিযোগের উত্তরে উৎপল দত্ত বলেন—

শ্রমিক নিজেই এক বিশাল উৎপাদনী প্রক্রিয়ার অংশ, ... সুতরাং সে বিশ্বকে স্থানু ও অচল হিসাবে দেখতে পাবে না, দেখে প্রক্রিয়া হিশেবে। চলমান জগৎ এইভাবে তার চেতনায় প্রবেশ করে...। শ্রমিকের মতাদর্শই তাই সত্যে পৌঁছয়। দার্শনিকদের তথাকথিত নিরপেক্ষ ও শীতল মস্তিষ্ক বিশ্লেষণে জগতের আসল সত্য ধরা পড়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। শ্রমিকের এক পেশে ও জঙ্গী উপলব্ধিতেই বরং জগতকে বোঝা সম্ভব। এবং বুঝে তাকে পরিবর্তিত করাও সম্ভব। [১৯]

পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়ে শিল্পীর শিল্প স্বাধীনতা খর্বিত হওয়া তো দূরের কথা শিল্পীর ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করতে পার্টি সাহায্য করে। এটা ছিল উৎপল দত্তের অভিমত। শুধু শ্রমিক শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করার প্রশ্নই নয়, নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা একান্তভাবেই প্রয়োজন।

উৎপল দত্তের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকলেও তিনি পার্টির প্রতি অন্ধ ছিলেন না। অন্ধ আনুগত্যের সম্পর্ক ছিল না। তিনি একজন স্বাধীন মার্কসবাদী হিসেবে শিল্প সৃষ্টি করেছেন, নিজস্ব ভাবনাচিন্তা অনুযায়ী নাটক, যাত্রা, চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। কখনো কখনো পার্টির চিন্তার সঙ্গে তার চিন্তা হুবহু মিলে গেছে আবার কখনো পার্টির চিন্তার সঙ্গে তার চিন্তার বিস্তর ফারাক পরিলক্ষিত হয়েছে। তার চিন্তার সঙ্গে পার্টির চিন্তা মিলে গেলে সমস্যা ছিল না, কিন্তু যদি তার চিন্তার সঙ্গে পার্টির চিন্তার অমিল হয় তখন তিনি তার প্রতিবাদ করার কথা বলেছেন। উৎপল দত্ত স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন—

আমি কোন পার্টির সদস্য নই। আমি যেটা ঠিক বলে মনে করব সেটাই করব।... আমার ভাবনার সঙ্গে (পার্টির ভাবনা) না মিললে নিজেকে আবার বিচার করব, পার্টির মধ্যে থেকেই পার্টির সঙ্গে লড়াই করব। [২০]

তিনি আবার ‘স্তানিস্‌লাভ্‌স্কি থেকে ব্রেখ্‌ট’ প্রবন্ধে এসম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করেছেন বা এই অভিযোগ খণ্ডন করেছেন।

পার্টি যদি ভুল পথে যায়। যেতেই পারে। সহস্র ভুল করতে পারে। কিন্তু বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন কখনো সামগ্রিকভাবে ভুল পথে যেতে পারে না। যে মার্কসবাদী সে জানে শ্রমিক শ্রেণী সারা বিশ্বে লড়ছে। কমিউনিস্ট পার্টি কোনো একটি দেশে বা অঞ্চলে বা ভাষায় বা জাতিতে সীমাবদ্ধ নয়...। তাই শেষ বিচারে কমিউনিস্ট আন্দোলন সামগ্রিকভাবে সঠিক পথেই থাকে। [২১]

১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দ্বি-খণ্ডিত হওয়ার পর উৎপল দত্ত কমিউনিস্ট পার্টির দক্ষিণপন্থী অংশের রীতিনীতি, কার্যকলাপ, আদর্শ প্রভৃতিকে নিয়ে প্রবল আপত্তি জানান ও বিরোধিতা করেন। দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টদের নিয়ে প্রবল সমালোচনায় জর্জরিত করে তিনি নাটক লেখেন 'একটি তলোয়ারের কাহিনী'। সেখানে তিনি দেখান যে শোধনবাদী কমিউনিস্টরা কীরকমভাবে চালাকির সঙ্গে শ্রেণি পরিবর্তন করেছিল, কীরকমভাবে নির্লজ্জভাবে তারা শাসকশ্রেণির পদলেহন করেছিল ও শ্রমিক, কৃষক শ্রেণির সঙ্গে প্রতারণা করেছিল। তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে এই দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টরা একটি নতুন সুবিধাভোগী শ্রেণি হিসেবে সমাজে প্রতিপন্ন হয়েছিল।

কমিউনিস্ট পার্টির দক্ষিণ অংশকে আক্রমণ করার পাশাপাশি বামপন্থীদের সমর্থনে এগিয়ে আসেন উৎপল দত্ত। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে ঘোষণা করা হল যে সিপিআই(এম) গোপনে গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি চালাচ্ছে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট প্রমাণ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে আছে। তাদের দাবি সিপিআই(এম)-এর নানা দফতর তল্লাশি করে অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। তার মধ্যে চিন থেকে আনা কিছু নিষিদ্ধ পাণ্ডুলিপি, যেমন মাও সেতুং ও চে গুয়েভারা-এর লেখা গেরিলা যুদ্ধের প্রবন্ধ। সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণপন্থী অংশ সিপিআইও একই অভিযোগ করেছিল বামপন্থী কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে। সিপিআই(এম) গেরিলা যুদ্ধের অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করল। এর প্রতিবাদ স্বরূপ উৎপল দত্ত একখানা পথনাটক লিখলেন 'গেরিলা'। তিনি দেখালেন কীভাবে অন্যায়ভাবে কেন্দ্রীয় সরকার সিপিআই(এম)-এর উপরে মিথ্যে অভিযোগ এনে তাদেরকে গ্রেফতার করছেন ও তাদের উপরে নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করছে। তিনি দেখালেন প্রগতিশীল নাট্য সংস্থাকে দমন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সবরকম প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তিনি 'গেরিলা' পথনাটকে দেখালেন গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতির যে অভিযোগ কেন্দ্রীয় সরকার করলেন তা নিতান্তই হাস্যকর ও অবাস্তব। কেননা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অভিযোগে যে বইগুলো উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো কোনো গোপনীয় বা নিষিদ্ধ পুস্তক নয়। এই পুস্তকগুলি যখন কলেজস্ট্রিট ও পার্কস্ট্রিটের বিভিন্ন দোকানে বিক্রি হচ্ছে তখন নিষিদ্ধ হওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক আরও অভিযোগ করেন ভারতীয় বামপন্থী কমিউনিস্টরা চিনের মদতে ও সাহায্যে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতি চালাচ্ছে, এই অভিযোগের জবাবে উৎপল দত্ত স্পষ্ট ভাষায় তার প্রতিবাদ করলেন ও লিখলেন—

> *স্বদেশী শোষকদের থেকে জনতার দৃষ্টি বিদেশি জুজুর দিকে চালিত করা একটি ঐতিহাসিক প্যাঁচ। তার জন্য প্রচারকার্য সর্বগ্রাসী, বিপুল। ... একটি সীমান্ত প্রশ্ন ফুরোতে না ফুরোতে আরেকটি প্রশ্ন তুলতেই হবে। হিটলার-এর শাসননীতির উত্তরসাধক।* [২২]

উৎপল দত্ত বিশ্বাস করতেন সবদেশের মতো ভারতের ইতিহাসও শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস। যুগে যুগে শাসকের অত্যাচার ও শোষিতের প্রতিরোধের ইতিহাস। অথচ তিনি লক্ষ করেন এই বাস্তব ইতিহাসকে ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে শাসক শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রচিত বিভিন্ন বিকৃত ইতিহাস পাঠের মধ্য দিয়ে। তিনি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের প্রায় প্রতিটি ঘটনাকে তার শিল্পকর্মের মধ্যে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। কেননা তিনি মনে করতেন সশস্ত্র বিদ্রোহের দীর্ঘ ঐতিহ্য ধরে রাখা দরকার, এবং তাঁর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে বিস্তার করা প্রয়োজন।

তিনি ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে লিখলেন কালজয়ী নাটক 'কল্লোল'। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র নৌবিদ্রোহকে বিষয়বস্তু করে তিনি এই নাটকটি লেখেন। এটি বাংলায় থিয়েটার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় রচনা, এক কালজয়ী রচনা। বিষয়বস্তু, আঙ্গিক ও সামাজিক দিক দিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এই নাটকটি। এই নাটক শাসক শ্রেণি ও তার অনুচরদের রীতিমতো ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। তারা 'কল্লোল'-কে বন্ধ করার জন্য সবরকম প্রচেষ্টা করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। তারা দাবি জানায় যে অবিলম্বে এই নাটক অভিনয় বন্ধ করতে হবে ও এই নাটককে নিষিদ্ধ করতে হবে। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে যেভাবে গুণ্ডাদের হামলায় 'অঙ্গার' নাটকটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল সেভাবেই ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে গুণ্ডাদের আক্রমণে 'কল্লোল' নাটককেও স্তব্ধ করার প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৬২ সাল ও ১৯৬৫ সালের মধ্যে রাজনৈতিকভাবে অনেক পার্থক্য ছিল। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে ভারত-চিন সংঘর্ষের বাতাবরণের মধ্যে বামপন্থীদের ওপরে ব্যাপক আক্রমণের ফলে তারা কিছুটা পিছু হটেছিল। স্বাভাবিকভাবে এইসময় তারা মিনার্ভাকে রক্ষা করতে পারেনি কিন্তু 'কল্লোল' অভিনয়ের সময় মিনার্ভাকে রক্ষা করার পুরো দায়িত্ব সিপিআই(এম) নিয়েছিল। সে প্রসঙ্গে উৎপল দত্তের বক্তব্য—

> *১৯৬২ সালে চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের প্রেক্ষাপটে সারা দেশে বামপন্থীদের উপর ব্যাপক আক্রমণের সামনে কমিউনিস্ট পার্টি আত্মরক্ষার্থে পিছু হটেছিল সাময়িকভাবে, তাই মিনার্ভাকে রক্ষা করার দায়িত্ব পার্টি নিতে পারেনি। কিন্তু 'কল্লোল'-এর ক্ষেত্রে মিনার্ভাকে রক্ষা করার পুরো দায়িত্ব নিল সিপিআই(এম)।* [২৩]

শাসক শ্রেণি দ্বারা অনেক অত্যাচার, অনেক নির্যাতন করার পরও 'কল্লোল'-কে থামানো গেল না। মিনার্ভা-তে 'কল্লোল'-এর অভিনয় দেখার জন্য দিনের পর দিন দর্শক বৃদ্ধি পেতে লাগল, পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে দিনের পর দিন অভিনীত হতে থাকল 'কল্লোল'। কলকাতার মানুষ ছাড়াও জেলার নানা প্রান্ত থেকে অসংখ্য মানুষ আসছিলেন 'কল্লোল' দেখতে।

> *এমনকি বাসের কনডাক্টররা মিনার্ভার এই জায়গার নাম দিয়ে দিলেন 'কল্লোল স্টপেজ'।* [২৪]

১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে হয় সাধারণ নির্বাচন। নির্বাচন প্রচারের উদ্দেশ্যে উৎপল দত্ত এসময় লিখলেন এক দীর্ঘতম পথনাটক 'দিন বদলের পালা'। নাটকটি অভিনয় করতে প্রায় তিন ঘন্টা সময় লাগত। কিন্তু এত বড়ো হওয়া সত্ত্বেও অভিনয় চলাকালীন দর্শকরা এতটুকুও অমনোযোগী হতে পারতেন না, এমনই ছিল এই নাটকের আকর্ষণ ও অভিনয়। এই নাটকের মধ্য দিয়ে কংগ্রেস সরকারের অন্যায়-অত্যাচার তুলে ধরেছিলেন উৎপল দত্ত। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে বামপন্থীদের রাজনৈতিক প্রচারে এক অন্যতম হাতিয়ার হয়ে ওঠে এই নাটক। তথ্য ও প্রমাণের ব্যাপক প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন তিনি। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করার ব্যাপারে 'দিন বদলের পালা' নাটকটির ব্যাপক প্রভাব ছিল, সেকথা বামপন্থী রাজনৈতিক মহল থেকে স্বীকার করেছিল ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছিল।

রাজনৈতিকভাবে উৎপল দত্ত আজীবন বামপন্থী কমিউনিস্ট মতাদর্শকে লালন-পালন করে গেছেন। কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শ, শ্রেণি-সংগ্রাম, শ্রমিক কৃষকদের আন্দোলন প্রভৃতি তার নিজের আদর্শের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। কিন্তু 'দিন বদলের পালা' নাটকের পর থেকেই উৎপল দত্তের রাজনৈতিক বিচ্যুতি শুরু হয়। তখন সিপিআই(এম)-এর মধ্যে গড়ে উঠেছিল অতি বামপন্থা চরমপন্থী অংশ। যারা অবিলম্বে সশস্ত্র বিপ্লব ঘটানোর জন্য শপথ গ্রহণ করেছিল। উৎপল দত্ত এই অতি বামপন্থী অংশের সঙ্গে অচিরেই যুক্ত হয়ে পড়লেন।

> *সিপিআই(এম)-এর মধ্যে গজিয়ে উঠেছিল যে অতি— বাম চরমপন্থী চক্র, যারা অবিলম্বে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটানো শপথ গ্রহণ করেছিল, আমি তাদের পক্ষ অবলম্বন করি।* [২৫]

সিপিআই(এম)-এর সাথে উৎপল দত্তের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কিন্তু এই সময়ে দাঁড়িয়ে সেই সম্পর্কে কিছুটা ভাঁটা পড়ে, কিছুটা দূরত্ব তৈরি হয় মতাদর্শগতভাবে। উৎপল দত্তের একটা ধারণা হচ্ছিল যে সিপিআই(এম)-এর বৈপ্লবিক শৌর্য-স্তিমিত হয়ে গেছে। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে সিপিআই(এম)-এর নেতৃত্বে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের সময়ে শরিক হিসেবে সিপিআই ও বাংলা কংগ্রেসকে নেওয়া হল। যারা কিনা কংগ্রেসের তাঁবেদার, যারা কিনা সিপিআই(এম)-এর মতাদর্শের প্রবল শত্রু। অথচ ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনের প্রচারে 'দিন বদলের পালা' নাটকে সিপিআই-কে প্রবলভাবে আক্রমণ করা হয়েছিল ও দেখানো হয়েছিল তারা কংগ্রেসের সহযোগী। নির্বাচনী প্রচারে যারা শত্রু ছিল, নির্বাচনের পরে তারা বন্ধু হয়ে গেল। এ ব্যাপারটা উৎপল দত্তের কাছে অসহ্য লেগেছিল, দ্বিচারিতা মনে হয়েছিল।

উৎপল দত্ত ধীরে ধীরে নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন। নকশালবাড়ি বিদ্রোহ শুরু হয় ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে তখন যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমল। এই সরকারের নির্দেশে

উত্তরবঙ্গের প্রসাদুজোতে নৃশংসগুলি চালানোর ফলে সাত কৃষকরমণী ও দুইজন শিশু নিহত হন। ওই অঞ্চলে ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টি হয়। উৎপল দত্ত মনে করেছিলেন সরকারে যে-ই থাকুক না কেন, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুখ খুলতে হবে। শোষিত মানুষের প্রতিরোধ উৎপল দত্তের নাটকে সবসময় প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। নাটকের মালমশলা সংগ্রহ করার জন্য তিনি, তাঁর সহকর্মীরা শিলিগুড়ি, নকশালবাড়ি, আলিপুরদুয়ার, প্রসাদুজোতে গিয়ে সেখানে পনেরো দিন ধরে নানা গ্রামে গ্রামে ঘুরে রাজবংশী, গোরখা, বাঙালি মানুষজনের সঙ্গে কথা বলে, সংগ্রামী কৃষকদের মুখে তাদের অভিজ্ঞতার কথা শুনে উৎপল দত্ত লিখে ফেললেন এক কালজয়ী নাটক 'তীর'।

নকশাল আন্দোলন ক্রমশ বিস্তার লাভ করেছিল। যুক্তফ্রন্ট সরকার বিষয়টি মোটেও সহজভাবে মেনে নিতে পারেননি। যেহেতু সরকার পক্ষের নির্দেশে প্রসাদুজোতে পুলিশ গুলি চালিয়েছিল যার ফলশ্রুতি 'তীর' নাটকটি। ফলে ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে ১১ নভেম্বর মধ্যরাতে উৎপল দত্তসহ কয়েকজন নেতার নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়। 'তীর' নাটক মঞ্চস্থ করার বিষয়ে 'লিটল থিয়েটার'-এর অনেকেই উৎপল দত্তের সঙ্গে একমত ছিলেন না। অনেকে নকশালবাড়ি আন্দোলন সম্পর্কে উৎপল দত্তের সরাসরি যোগাযোগ ও তার অতি আগ্রহকে সংযত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অনেকে উৎপল দত্তকে আরও গভীরভাবে বিষয়টিকে নিয়ে গভীরভাবে ভেবে দেখার পরামর্শ দিয়েছিলেন। যদিও পরে এই মতপার্থক্য ঘুচে যায়। উৎপল দত্ত এ বিষয়ে বলেছিলেন—

> *কিন্তু 'তীর' নাটক একান্তভাবে জোতদারের অত্যাচার, কৃষকের প্রতিরোধ ও পুলিশের জুলুমে আবদ্ধ থাকায় সেটা মঞ্চস্থ করতে সকলে সহযোগিতা করেছিলেন।* [২৬]

ইতিমধ্যে উৎপল দত্ত জেমস আইভরি-র 'দা গুরু' ছবিতে অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। এই ছবিতে অভিনয় করার বিষয়ে কিছু কিছু নকশাল নেতা আপত্তি তোলেন। তাদের আপত্তি ছিল একজন নকশাল হয়েও আমেরিকান ফিল্ম কোম্পানির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করা যায় না, কারণ আমেরিকা দুনিয়ার পয়লা নম্বর শত্রু। পরে নকশাল নেতারা উৎপল দত্তকে এই ছবিতে অভিনয় করতে সরাসরি নিষেধ করেন। নকশালরা দাবি করেন—

> *Theatre করা মানে সময় নষ্ট। Theatre করা মানে বিপ্লব থেকে পালিয়ে থাকা। Theatre করবে, তাছাড়া এসবও করতে হবে। তা না হলে তো বিপ্লবী পরিচয় থাকছে না।* [২৭]

নকশাল রাজনীতির সঙ্গে উৎপল দত্তের দূরত্ব তৈরি হচ্ছিল এবং তা ক্রমেই বাড়ছিল। রাজনীতিতে নকশালদের অতি বাম বিচ্যুতির সঙ্গে এল সাংস্কৃতিক জগতে স্বৈরাচারী কাণ্ডকারখানা। প্রায় সব

মনীষীদের মুণ্ডুপাত করা হচ্ছিল, অবমূল্যায়ন করা হচ্ছিল, মূর্তি ভাঙা হচ্ছিল। উৎপল দত্ত মন থেকে একেবারে মেনে নিতে পারেননি। এ বিষয়ে উৎপল দত্ত বলেছেন,

> *প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিদের বিশ্লেষণ না ক'রে শুধু খিস্তি করলে বিপ্লবী সংস্কৃতির মূলোচ্ছেদ হয় জনমন থেকে, এসে জুড়ে বসে শাসকশ্রেণীর অপসংস্কৃতি।* [২৮]

নকশালদের বিভিন্ন কার্যকলাপ ও তাদের বিভিন্ন মতাদর্শ উৎপল দত্ত কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিলেন না। ফলে নকশাল রাজনীতির সঙ্গে উৎপল দত্তর দূরত্ব যখন বাড়ছিল তখন সিপিআই(এম)-এর রাজনীতি সম্পর্কে তিনি পুনর্বিবেচনা করতে শুরু করেছিলেন। নানা ঘটনা পরম্পরা ও বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের মধ্যে উৎপল দত্ত নিজেকে আত্মসমালোচনার দিকে ঢেলে দিয়েছিলেন। তিনি ভাবতে শুরু করেছিলেন 'তীর' নাটকটি লিখে তিনি হয়তো ভুল শ্রেণি সংগ্রামের পক্ষে চলেছেন, ঔদ্ধত্যের কারণে নিজের ভুল নিজে স্বীকার করতে চাইছিলেন না। শেষমেষ তার আত্মোপলব্ধি ঘটে যে বাস্তবিকভাবে সিপিআই(এম)-ই শহরের সব ধর্মঘটগুলি ও কৃষক আন্দোলনগুলির নেতৃত্ব দিয়েছিল। তিনি বুঝতে পারেন ইন্দিরা গান্ধির ফ্যাসিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল সিপিআই(এম)। সিপিআই(এম)-ই ছিল দেশের সব প্রতিক্রিয়াশীলদের আক্রমণের লক্ষ্য। এই আত্মোপলব্ধিতে পৌঁছানোর পরে উৎপল দত্ত তার 'তীর' নাটকটি বন্ধ করে দেন এবং সিপিআই(এম)-এর মতাদর্শের সঙ্গে তার নিজের মতাদর্শকে মিলিয়ে চলতে থাকেন।

কংগ্রেসি আমলে যখন সিপিআই(এম)-এর উপরে নানা রকমের অত্যাচর নানা অন্যায় অবিচার নেমে এসেছে উৎপল দত্ত-এর কলম তখনই সচল হয়েছে। সেসব ঘটনার প্রতিবাদে অত্যাচারের প্রতিবাদে তিনি লিখেছেন কালজয়ী সব নাটক। ঠিক বিপরীত দিক থেকে একই রকমভাবে যখনই উৎপল দত্তের নাটকের উপর নানা রকম অত্যাচার নানা রকম হামলা করতে বিরোধীরা কংগ্রেসরা উদ্যত হয়েছে তখনই তা প্রতিহত করতে সিপিআই(এম) সবার আগে এগিয়ে এসেছে, তারা প্রাণপণ দিয়ে রক্ষা করেছে মিনার্ভা থিয়েটারকে তথা উৎপল দত্তের নাটককে।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনের ঠিক আগে বামপন্থী নেতা হেমন্ত বসুকে হত্যা করে কিছু অজ্ঞাতপরিচয় লোক। কংগ্রেসিরা চক্রান্ত করে পুলিশি তদন্তের আগেই চিৎকার শুরু করে দেন এই খুনের জন্য সিপিআই(এম) দায়ী এবং এদের সঙ্গে গলা মেলান স্বার্থপর বুদ্ধিজীবীদের একাংশ। হেমন্ত বসুর হত্যার সমস্ত দায় সিপিআই(এম)-এর উপরে চাপিয়ে দিয়ে তাদের উপর

চলল অকথ্য অত্যাচার, নির্যাতন ও ধড়পাকড়। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে সিপিআই(এম) পশ্চিমবঙ্গে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল। এরপর ক্ষমতা দখলের জন্য ব্যাপক রিগিং ছাড়া কংগ্রেসের সামনে আর কোনো রাস্তা খোলা থাকল না। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে তারা গুলি চালিয়ে, বোমা মেরে, ভোটারদের ভয় দেখিয়ে তারা বুথ থেকে তাড়িয়ে দিল। তারা বুথ দখল করল, বন্দুক উঁচিয়ে ব্যালট বাক্স ভর্তি করল ব্যালট পেপারে এইসব ঘটেছিল একেবারে প্রকাশ্যে দিবালোকে এবং সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে বুদ্ধিজীবীদের তরফ থেকে কোনো রকম প্রতিবাদ দেখা যায়নি। সিপিআই(এম)-এর উপর অকথ্য অত্যাচার, একজন সিপিআই(এম) সদস্যকেও তারা বাড়ি থাকতে দিচ্ছে না। কেউ কর্মক্ষেত্রে যেতে পারছে না, সবাইকে ধরে ধরে জেলে ভরা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র অরাজকতা চলছে। এরকম পরিস্থিতিতে উৎপল দত্ত প্রতিবাদ স্বরূপ প্রচণ্ড ক্রোধে লিখে ফেললেন 'ব্যারিকেড' নাটকটি।

১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে উৎপল দত্ত লিখলেন এক কালজয়ী নাটক 'দুঃস্বপ্নের নগরী'। এই নাটকে ১৯৭১-৭৪ সালের পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সন্ত্রাসের এক দলিল বলা যেতে পারে। এই নাটক প্রথম থেকেই ভাড়াটিয়া গুণ্ডাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে বারে বারে, পুলিশি নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে অসংখ্যবার। এমনকি, এই নাটক বন্ধ করতে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলাও করা হয়।

> *আমাদের 'দুঃস্বপ্নের নগরী' তখন বে-আইনি হল; শুধু বে-আইনি হল না, প্রহার ও হল; যেখানে অভিনয় করতে যাচ্ছি সেখানেই প্রহার।* [২৯]

ভাড়াটে গুণ্ডা ও পুলিশের অত্যাচারে 'দুঃস্বপ্নের নগরী'কে থামানো গেল না। যখন নাটকের উপরে অত্যাচার করার প্রচেষ্টা হয়েছে তখন সিপিআই(এম)-এর সদস্যরা এগিয়ে এসেছে নাটকটিকে রক্ষা করতে। উৎপল দত্তের কথায়—

> *আমাদের পরবর্তী শো ছিল দক্ষিণ কলকাতার একটি থিয়েটারে, এবং যথারীতি দক্ষিণ কলকাতার সিপিআই(এম)-এর সদস্যরা এগিয়ে এলেন নাটকটিকে রক্ষা করতে।... আমার ডায়েরী বলছে নাটকটি অন্তত চৌদ্দবার আক্রান্ত হয়েছিল, যার মধ্যে তেরোটি ক্ষেত্রে গুণ্ডার দলকে প্রতিহত করেছিল কমিউনিস্ট প্রহরীরা।* [৩০]

উৎপল দত্ত তার নাটকে বারে বারে ভারতের অতীত ইতিহাসের নানা পর্বকে তুলে ধরেছিলেন, ভারতবাসীর সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের নানা অধ্যায়কে ভারতবাসীর সামনে নতুন করে উপস্থাপিত করেছেন। সেইসমস্ত সংগ্রামকে মার্কসবাদী আলোকে ও মার্কসবাদী

চিন্তাধারায় বিচার করেছিলেন। তাঁর এই কাজের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতের জনগণের বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের সঙ্গে আজকের কমিউনিস্টদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের অন্তর্নিহিত যোগসূত্রটাকে উন্মোচন করা। তিনি তার নাটকে বারে বারে মার্কসবাদী ভাবধারা, চিন্তা চেতনা ও মতাদর্শকে তুলে ধরেছেন। এক সাক্ষাৎকারে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় উৎপল দত্তকে প্রশ্ন করেছিলেন— "অতীত ইতিহাসের একটা Period নেওয়া এবং সেটাকে closely project করা"— এটা আপনাকে বারে বারে আকর্ষণ করে কেন? উৎপল দত্ত সুন্দরভাবে জবাব দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন :

> *মার্কসবাদী দৃষ্টিতে ইতিহাসকে না দেখলে মার্কসবাদী দৃষ্টিতে বর্তমানকেও দেখা যায় না। এটা আমরা বিশ্বাস করি, এবং নাটকের একটা অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে অতীতকে সঠিকভাবে মার্কসবাদী আলোকে তুলে ধরা। কেননা, আগের সমস্ত বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানেরই ঐতিহ্য বহন করছে আজকের কমিউনিস্টরা। কমিউনিস্টরা কোনও ভুঁইফোড় শক্তি নয়। তারা পৃথিবীতে যত বিপ্লব আগে হয়ে গেছে, অভ্যুত্থান যত ঘটে গেছে— যে সমস্ত ঐতিহ্যের তারা হচ্ছে উত্তরসূরী।* [৩১]

রাজনৈতিক ভাঙাগড়ার ইতিবৃত্তে উৎপল দত্তের পথনাটক

১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় গণনাট্য সংঘে যোগদান করার পর উৎপল দত্ত পথনাটকের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন। তাঁকে বাংলা পথনাটকের অগ্রণী পথিকৃত বলা যেতে পারে। বাংলা রাজনৈতিক থিয়েটারে নাটক রচনা ও অভিনয়ের ক্ষেত্রে উৎপল দত্ত যুগ স্রষ্টা। মার্কসবাদী দর্শনে বিশ্বাসী উৎপল দত্তের কাছে পথনাটক ছিল সরাসরি জনতাকে রাজনৈতিক চেতনায় শিক্ষিত উদ্বুদ্ধ করার হাতিয়ার। তিনি প্রতিটি নির্বাচনেই কমিউনিস্ট পার্টির প্রচারে পথনায়ককে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। নির্বাচন ছাড়াও কারখানার গেটে ধর্মঘটি শ্রমিকদের সমর্থনে পথনাটক অভিনয় করেছেন। রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড নিয়ে নাটক করেছেন, শিক্ষক আন্দোলন নিয়ে নাটক করেছেন, সত্তর দশকের উত্তাল কলকাতাকে নিয়ে পথনাটক করেছেন, নানা রাজনৈতিক বিষয় ও শোষিত বাংলার প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর প্রচারে পথনাটক করেছেন। সমসাময়িক সময়ে প্রতিটি রাজনৈতিক ঘটনাবলি তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুধাবন করেছেন ও সেগুলিকে নাটকের মধ্যে অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। শাসকের অত্যাচার, শ্রমিক মজদুর শ্রেণির প্রতি তাদের অসহযোগিতা, শোষণ, নিপীড়ন প্রভৃতি পথনাটকের মধ্য দিয়ে তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন।

১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে তার প্রথম পথনাটক 'পাসপোর্ট' এবং ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে তার শেষ পথনাটক 'সত্তরের দশক'। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিনি গুরুত্বপূর্ণ পঁচিশটি পথনাটক আমাদের

উপহার দিয়েছেন। যার প্রায় প্রতিটি সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাবলি নিয়ে রচিত। দশটা রাজনৈতিক বক্তৃতায় যে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়, তার থেকে অনেক বেশি আলোড়ন তুলতে পারে একটি পথনাটক— একথা উৎপল দত্ত বারে বারে প্রমাণ করেছেন। পথনাটক সম্পর্কে গণনাট্য সংঘে প্রাথমিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন তা তিনি 'এপিক থিয়েটার' পত্রিকায় সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। উৎপল দত্ত বলেছেন—

> *৫১ সালে শুরু হোলো বন্দীমুক্তি আন্দোলন। চারদিকে সমাবেশ আর মিছিল।... পানুপাল প্রস্তাব তুললেন...। পথনাটিকা চাই। ... পানু পাল উমানাথ ভট্টাচার্যকে বললেন, তক্ষুণি বসে বন্দীমুক্তি সম্পর্কে নাটক লিখতে। উমানাথ লিখলো, 'চার্জশীট'—একরাত্রে।* [৩২]

উৎপল দত্ত ও তার সহকর্মীরা কখনো রাত জেগে কখনো বহু কাজের ফাঁকে পথনাটক রচনা করেছেন। তারা কখনো কখনো সারারাত ধরে মহড়া করেছেন। আবার এমনও হয়েছে নাটক রচনা করার পর সঙ্গে সঙ্গে মহলা করেছেন। আবার এমনও হয়েছে নাটক রচনা করার পর সঙ্গে সঙ্গে মড়ালা করা ও মড়ালা করে সরাসরি মঞ্চে উঠতে হয়েছে অভিনয় করার জন্য। এতবেশি সংখ্যক তারা পথনাটক করতেন যে, তাদের হিসেব ছিল না, কখন, কোথায়, কোন নাটক অভিনয় হয়েছিল, কী পরিস্থিতিতে হয়েছিল।

> *বিকেল পাঁচটায় মহলা থেকে সোজা হাজরা পার্কে এবং বক্তৃতার মঞ্চে উঠলাম ৮-টা নাগাদ অভিনয় করতে। কখনো হিসেব করিনি কোন কোন পথনাটিকার কত অভিনয় হয়েছিল। অসংখ্য। জলপাইগুড়ি থেকে ক্যানিং। হাটে-বাজারে। লরির উপরে। রোয়াকে।* [৩৩]

শ্রমজীবী, মেহনতি সাধারণ মানুষকে তার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে সচেতন করে তোলার জন্য নাট্য শিল্পীদের নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করতে হয়েছে। মেহনতি মানুষের জীবনের বাস্তব তাগিদেই পথনাটকের উদ্ভব হয়েছে। মূলত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নিয়েই পথনাটক পথে-পথে, শহর থেকে গ্রাম-গঞ্জে অভিনয় করে চলে। উৎপল দত্ত ছিলেন মার্কসবাদী আদর্শে বিশ্বাসী ও রাজনীতি ছিল মার্কসবাদের রাজনীতি। সমাজ-শোষণ ও রাজনৈতিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে জাগ্রত জনতার সমবেত ও প্রতিরোধ ও সংগ্রামের রাজনীতি। বলা যায়, পথনাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল রাজনৈতিক বক্তব্য— একথা উৎপল দত্ত মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন।

উৎপল দত্ত রাজনৈতিক বক্তব্যগুলি পথনাটকের মধ্যে যাতে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় এবং মানুষের কাছে সহজে পৌঁছে দেওয়া যায় তার জন্য তিনি তৎকালীন বা তার সমসাময়িক

বাংলা তথা ভারতবর্ষে ঘটে যাওয়া বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক ঘটনাবলি সুকৌশলে নিপুণতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। রাজনৈতিক ঘটনা সম্পর্কে মেহনতি শ্রমজীবী মানুষকে সচেতন করেছেন, তাদের উদ্বুদ্ধ করেছেন, অন্যায় শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদী ও সচেতন করে তুলেছেন।

উৎপল দত্তের প্রথম পথনাটকের নাম 'পাসপোর্ট' (১৯৫১)। একটি বিশেষ বিষয়কে সামনে রেখে লেখা হয়েছিল। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলা ভাগ হয়ে পূর্ব ও পশ্চিমবাংলা দুটো আলাদা দেশের অন্তর্গত হয়েছিল। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের পর এই দুই দেশের মানুষের এক দেশ থেকে অন্য দেশে যেতে গেলে পাসপোর্ট লাগবে বলে আইন ঘোষিত হয়েছিল যা বাংলা ও বাঙালির কাছে অনভিপ্রেত। অনেকেই নিজের দেশ ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে চলে এসেছিল পশ্চিমবঙ্গে। পাসপোর্ট প্রথা তাদের যাতায়াতের পথে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে প্রতিভাত হয়। সেদিন বাঙালি তথা ভারতবর্ষের অনেকেই এই পাসপোর্ট প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র বিরোধিতা করেছিল। 'পাসপোর্ট' নাটকটি এই বিরোধীদের পক্ষে একটি প্রচার মূলক নাটক।

১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি লেখেন 'নয়া তুঘলঘ'। এই পথনাটক এক বিশেষ রাজনৈতিক বিষয়কে ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল। ভারতবর্ষ প্রজাতন্ত্র দেশ হিসেবে ঘোষিত হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ড. বিধানচন্দ্র রায় এবং বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরুর পারস্পরিক বোঝাপড়া বাংলা বিহার প্রদেশের সংযুক্তির প্রস্তাব নিয়ে আসেন। কংগ্রেসের এই রাজনৈতিক প্রস্তাব সে সময় বাঙালির কাছে আত্মহত্যার শামিল বলে মনে হয়েছিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করা শুরু করেন এবং কংগ্রেসের রাজনৈতিক চক্রান্ত মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হন। জনমানসে তৈরি হওয়া এই তীব্র প্রতিক্রিয়া ও বিভিন্ন সংগঠনের মোকাবিলার পটভূমিতেই উৎপল দত্ত 'নয়া তুঘলক' পথনাটিকাটি রচনা করেন।

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে উৎপল দত্ত লিখলেন 'স্পেশাল ট্রেন' ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে। হুগলি জেলার হিন্দ মোটর কারখানায় প্রায় ছয় হাজার শ্রমিক বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে তারা ধর্মঘট করে। মালিকপক্ষ মুনাফা হারানোর ভয়ে এই ধর্মঘটকে বানচাল করার জন্য সমস্ত প্রকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। ভয় দেখিয়ে, লোভ দেখিয়ে, বরখাস্তের হুমকি দিয়েও তাদেরকে দমিয়ে রাখা গেল না। পুলিশ দিয়ে নানা অত্যাচার করে, ধর্মঘটে শ্রমিকদের ক্যাম্প অফিস লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে, তাদের উপর নানা রকম অত্যাচার করেও ধর্মঘট উঠানো গেল না। হাওড়া-ব্যান্ডেল ট্রেন লাইনে হিন্দ মোটর একটি হল্ট স্টেশন ছিল। সেখানে সব গাড়ি দাঁড়ায় না। বিড়লাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কংগ্রেস সরকার বিশেষ অনুমতি দিল যাতে হিন্দ মোটর হল্ট স্টেশনে বাড়তি অনেক

ট্রেন দাঁড়ায়। সেইসব ট্রেনে করে বাইরে থেকে প্রচুর গুণ্ডা নিয়ে এসে ধর্মঘটিদের উপরে অত্যাচার শুরু হল যাতে কারখানাটাকে চালু রাখা যায়। এই পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে উৎপল দত্ত 'স্পেশাল ট্রেন' নাটিকাটি রচনা করেন। উৎপল দত্তের কথায়—

> *৬১-এর ডিসেম্বরে উত্তর পাড়ায় হিন্দমোটরস কারখানায় ধর্মঘটে বিড়লা-র সেবায় স্পেশাল ট্রেন নিয়োজিত হল। ট্রেন বোঝাই বেকার, গুণ্ডা দালাল উত্তর পাড়ায় গিয়ে নেমেছিল ধর্মঘট ভাঙবার জন্য এবং ধর্মঘটি শ্রমিকদের প্রবল মারে দিশেহারা হয়ে তারা প্ল্যাটফর্ম থেকে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। সরেজমিনে গিয়ে আমরা নাটিকা তৈরী করলাম 'স্পেশাল ট্রেন' এবং সেটি অভিনয় করতে লাগলাম বহু জায়গায়।* [৩৪]

১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দ্বি-খণ্ডিত হয়ে সিপিআই(এম) গঠিত হল। এইসময় সিপিআই(এম)-কে দমন করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির দক্ষিণপন্থী অংশ ও কংগ্রেস নেতৃত্ববৃন্দ সদাসর্বদা প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। ভারতের তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুরজালি লাল নন্দ ঘোষণা করেছিলেন যে, সিপিআই(এম) গেরিলা যুদ্ধের প্রস্তুতি চালাচ্ছে, সে বিষয়ে তাদের হাতে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এক বিবৃতি দিয়ে দাবি করেন সিপিআই(এম)-এর নানা দফতর খানা তল্লাশি করার পর তাদের হাতে কিছু গোপন পাণ্ডুলিপি এসেছে যেগুলো চিন থেকে আগত এবং যার লেখক মাও সেতুং ও চে গুয়েভারা। ফলস্বরূপ বামপন্থী কর্মীদের উপরে অত্যাচার ও ধড়পাকড় শুরু হয়।

> *নেতৃত্ববৃন্দ পুনরায় গ্রেপ্তার হন, এবং সদ্যজাত সংসদনবাদী পার্টি ইতরের মতোন প্রগতিশীল নাট্যসংস্থাকে দমন করবার জন্য শাসক শ্রেণীকে উপদেশ দিতে থাকলো।* [৩৫]

কমিউনিস্ট পার্টির দক্ষিণপন্থী অংশের বিশ্বাসঘাতকতা এবং তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিবাদে উৎপল দত্ত 'গেরিলা' (১৯৬৪) পথনাটিকা রচনা করলেন।

১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের পশ্চিমবঙ্গের ভয়াবহ খাদ্যসংকটের পরিস্থিতিতে উৎপল দত্ত 'সমাজতান্ত্রিক চাল' পথনাটিকাটি রচনা করেন। নাটিকাটি প্রথম অভিনীত হয় ১৯৬৫-এর আগস্ট মাসে। বছরের প্রথম থেকেই পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে-গঞ্জে খাদ্যসংকট এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছিল। দিনে দিনে চালের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে, খাদ্যভাবের এই দুর্দিনে মানুষ অনাহারে মরে যেতে লাগলো। খিদের জ্বালায় মা তার সন্তানকে হত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে অথচ মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন রাজ্যে অনাহারের কোনো সংবাদ নেই। এইরকম একটা খাদ্য সংকট, না খেতে পাওয়া মানুষের হাহাকার, আর্তনাদ ও দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে

উৎপল দত্ত রচনা করলেন ‘সমাজতান্ত্রিক চাল’। ১৯৬৫ সালের আগস্ট মাসে প্রথম অভিনয় হয় এবং ওই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে উৎপল দত্ত এবং এই নাটকের প্রকাশক জোছন দস্তিদার গ্রেফতার হন।

অবশেষে ৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে আমি বিনা বিচারে কারারুদ্ধ হই। [৩৬]

উৎপল দত্তের গ্রেফতারের কারণে নাটকটি দশ বারের বেশি অভিনয় করা সম্ভব হয়নি। স্বাধীন ভারতে এই প্রথম কোনো নাট্যকার ও পরিচালককে ‘ভারত রক্ষা আইনে’ কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। দেশে খাদ্যাভাব, কমিউনিস্ট পার্টির উপরে কংগ্রেস সরকারের অত্যাচার, ভারত-চিন সীমান্ত সংঘর্ষ, কমিউনিস্ট পার্টির দ্বি-বিভক্ত হওয়া এবং মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি গঠন— দেশ ও পার্টির এই সময়ে উৎপল দত্ত ‘সমাজতান্ত্রিক চাল’ নাটকটি রচনা করেছিলেন।

১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনের প্রাককালে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থান ও চরিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে লেখেন ‘দিন বদলের পালা’ নাটিকাটি। এই নাটক উক্ত নির্বাচনে বামপন্থীদের রাজনৈতিক প্রচারের এক আশ্চর্য হাতিয়ার। এই নাটকে ব্যাপক প্রামাণ্য তথ্যের প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন উৎপল দত্ত। তাঁর কোনো যুক্তি তথ্য হীন ছিল না। খাদ্য আন্দোলনের সময় এক যুবক পুলিশ অফিসারকে খুন করে বলে অভিযোগ এবং সেই অভিযুক্তকে আদালতে বিচার করা— কাহিনি বলতে এটুকুই। নাটিকাটিতে সেই সময়কার রাজনৈতিক প্রেক্ষিত ও তার বিচার বিশ্লেষণ, কংগ্রেস ও সিপিআই-এর গোপন আঁতাত প্রভৃতি বিষয় তুলে ধরেছেন।

শোধনবাদীদের নির্বাচনী ইস্তাহার উদ্ধৃত করে দেখাতাম তারা আসলে কংগ্রেসের বি-টিম, এবং সাম্প্রতিক খাদ্য আন্দোলনের কারণ, প্রফুল্ল সেন মন্ত্রীসভার জালিয়াতি ও প্রবল অত্যাচারের খতিয়ান হাজির করতাম। [৩৭]

দেশের পথনাটকের ইতিহাসে এই নাট্য প্রযোজনা এক অনন্য দৃষ্টান্ত। প্রথমে এই নাটিকাটি অভিনয় করতে সময় লাগত দেড় ঘণ্টা কিন্তু পরবর্তীকালে এই নাটক শেষ করতে সময় লাগে আড়াই থেকে তিনঘণ্টা। রাজ্যের নির্বাচনী ক্ষেত্রে এক ব্যাপক গণচেতনা ও গণআন্দোলনের জোয়ার নিয়ে এসেছিল। মিনার্ভাতে ‘কল্লোল’ ও ‘অজেয় ভিয়েতনাম’ নাটকের প্রভূত খ্যাতির মধ্যেও এই নাটক দিনে চারবার পর্যন্ত অভিনীত হয়েছে। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে রাজ্যে কংগ্রেস সরকারের পতন হয়ে দিনবদল হল, ক্ষমতা দখল করল প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার।

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে আবার সন্ত্রাস ও নানা অত্যাচার ও নিপীড়নের মধ্য দিয়ে কংগ্রেস দল পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতা লাভ করে। বামপন্থীরা এই নির্বাচনের প্রতিবাদ জানায় এবং বিধানসভার

মধ্যে ও বাইরে অবস্থান বিক্ষোভ করে ও অন্যান্য প্রশাসনিক কাজ বয়কট করে। ক্ষমতা দখল করার পর কংগ্রেস দল এমন একটা রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও বিভীষিকা তৈরি করে যাতে সবরকমের বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে যায়। তারা যেন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। হত্যা, নির্যাতন, ঘরছাড়া, জেলে বন্দি, বিনা বিচারে আটক ও নির্বিচারে গুলি চালনা প্রভৃতি চলতে থাকল। পুলিশ প্রশাসন ও আধাসামরিক বাহিনীর দ্বারা কংগ্রেস সরকার বাংলার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা একেবারে তছনছ করে দিয়েছিল। সত্তর দশকের সন্ত্রাস ও রক্তস্নানের এই অস্থির সময়কে কেন্দ্র করে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে উৎপল দত্ত লেখেন সাড়া জাগানো পথনাটক ‘বর্গী এল দেশে’।

১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে উৎপল দত্ত লিখলেন দিন বদলের ‘দ্বিতীয় পালা’। প্রথম পালার দশ বছর পরে দ্বিতীয় পালা লিখলেন, দুটি পালা-ই অপশাসনের হাত থেকে বাংলাকে মুক্তির পালা। পুলিশ-প্রশাসন এবং কংগ্রেস দলের মিলিত প্রচেষ্টায় সেদিন কী বীভৎস ভয়ংকর সন্ত্রাস পশ্চিমবঙ্গে সৃষ্টি হয়েছিল তার জীবন্ত ও বাস্তব চিত্র এঁকেছেন এই পথনাটকে। শুধু অত্যাচার, শুধু সন্ত্রাস, বা শুধু নিপীড়নের ছবি এই দ্বিতীয় পালা নয়। শত অত্যাচারের শেষে এই অত্যাচারিত, নিপীড়িত ও শোষিত মানুষরাই শেষ কথা বলবে— তারই একটি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে এই পথনাটিকাতে। এই নাটকটি পূর্বে অভিনীত উৎপল দত্তের ‘বর্গী এল দেশে’ পথনাটকের সংক্ষিপ্ত ও ন্যূনতম রূপ। এই নাটক দেখতে দেখতে জনতা যেমন সদ্য ফেলে আসা অতীতকে দেখতে পেত, কংগ্রেস সরকারের অত্যাচারের স্বরূপকে জানতে পারত তেমনি ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে অত্যাচারীর মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হতে পারত। এই নাটকটি অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে পিএলটি নাট্য দল এবং উৎপল দত্ত পশ্চিবঙ্গের নানা প্রান্তে ও নানা দিকে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন। তারা প্রচার করেছিলেন সাধারণ মানুষের নেতৃত্বেই পশ্চিমবঙ্গে পালা বদল ঘটবে। ১৯৭৭-এর নির্বাচনের ফলাফল সেকথা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল। ভারতবর্ষের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো একসঙ্গে মিলে কংগ্রেসকে পরাজিত করে জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে গড়ে উঠল বামফ্রন্ট সরকার।

১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে দাঁড়িয়ে নির্বাচনী পটভূমিকায় উৎপল দত্ত লিখলেন ‘কালো হাত’ নামক একটি পথনাটিকা। সত্তর-এর দশকে প্রবীণ জননেতা হেমন্তকুমার বসুকে হত্যা করেছিল অজ্ঞাত পরিচয় কিছু দুষ্কৃতি। কিন্তু কংগ্রেস সুকৌশলে তার দায়ভার বামপন্থীদের উপরে চাপিয়ে দিয়ে তাদের উপরে পুলিশি নির্যাতন শুরু করল। বামপন্থীদের উপর এই মিথ্যা দোষারোপ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি লিখলেন ‘কালো হাত’

পথনাটিকাটি। এই আলোড়ন সৃষ্টিকারী পথনাটক রাজ্যের সর্বত্র সাড়া জাগিয়েছিল। আদালত দৃশ্যের আঙ্গিকে নির্মিত এই প্রবল রাজনৈতিক বার্তায় বলিষ্ঠ পথনাটক উৎপল দত্তের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা।

সমকালীন কোনো রাজনৈতিক ঘটনাই উৎপল দত্তের নজর এড়ায়নি। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের ৫ জুলাই মালদহ জেলার রতুয়া অঞ্চলে মালো বা জেলে পাড়ার এক পৈশাচিক হত্যা লীলার খবরে সারা দেশে প্রচণ্ড উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। এই পৈশাচিক নারকীয় হত্যাকাণ্ডে তেরো জন সিপিআই(এম) কর্মী নিহত হন। মালো পাড়ায় ঘরবাড়ি পুড়িয়ে, বৃদ্ধ, শিশু ও নারীর উপরে অবাধে সকলের উপর অত্যাচার করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডকে বিষয় করে উৎপল দত্ত লিখলেন 'মালো পাড়ার মা' নাটিকাটি। নাট্যকার নিজে মালদহে গিয়ে সরেজমিনে সবকিছু দেখে, প্রত্যক্ষদর্শীদের ইন্টারভিউ নিয়ে, নিহতদের আত্মীয়দের সঙ্গে কথা বলে, বাস্তব তথ্যের উপরে ভিত্তি করেই এই নাটক লিখেছিলেন। নাটককে কীভাবে শ্রেণি-সংগ্রামে শামিল করতে হয়। তার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ ছিল এই নাটক। এই নাটক সম্পর্কে উৎপল দত্ত তার বিখ্যাত 'জপেন দা জপেন যা' প্রবন্ধে লিখেছেন—

> *বিপ্লবী ভবিষ্যতটা খুব সংযতভাবে চাপাস্বরে উচ্চারণ করে সূত্রধার— অখ্যাত মালো পাড়াকে নিকারোগুয়া, এল সালভাদর-এর সঙ্গে যুক্ত করে দেয়। ব্যাপারটা একি। ওরা এসে মেরে গেল, সেখানেই ঘটনা শেষ নয়, একরকম শুরু বলা যায়। রাজনৈতিক নাটক শেষ যবনিকায় শেষ হয় না, একটা অসমাপ্তির রেশ থেকে যায়। কারণ ইতিহাসের সমাপ্তি নেই।* [৩৮]

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি নিহত হলেন ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে ৩১ অক্টোবর। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁরই পুত্র রাজীব গান্ধি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এইসময় কেন্দ্র সরকারের কার্যকলাপ, অপদার্থতা, ভুল-নীতি নিয়ে তীব্র ব্যঙ্গ ও শ্লেষের মধ্য দিয়ে দুটি নাটক লেখেন— 'মুমূর্ষু বাংলা' (১৯৮৫) এবং 'মুমূর্ষ নগরী' (১৯৮৫)। এই সময় এই দুটি পথ নাটক বাংলা ও বাঙালিকে কিছুকাল যাবৎ মাতিয়ে দিয়েছিল। 'মুমূর্ষু বাংলা' পথনাটিকাটি মূলত তৈরি হয়েছিল বোলপুরের উপনির্বাচন উপলক্ষ্যে। সেখানকার সিপিআই(এম) প্রার্থী সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়-এর সমর্থনে ও প্রচারে এক বিশেষ গুরুতপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এই পথনাটিকাটি। 'মুমূর্ষু বাংলা' ও 'মুমূর্ষ নগরী' দুটি পথ নাটকেই তদানীন্তন কংগ্রেস সরকারের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। তীব্র ব্যঙ্গ, কৌতুক ও শ্লেষের মধ্য দিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধি ও তার কংগ্রেসি সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেছেন।

১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে ‘কাঁচের ঘর’ নামক আর একটি পথনাটিকার প্রযোজনা করেন। এটি মূলত ঐ বছরের সাধারণ নির্বাচন উপলক্ষ্যে রচিত। এ নাটকটিতেও কংগ্রেস সরকারের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রবল সমালোচনা করা হয়েছে এবং তীব্র ভাষায় আক্রমণ করা হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের নির্বাচনী প্রচারে যেমন সহায়তা করেছিল তেমনি এক বিশেষ হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল ‘কাঁচের ঘর’ পথনাটিকাটি।

১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে লেখেন ‘হমে দেখনা হ্যায়’ পথনাটিকাটি। ‘বাঙালির বাচ্চা’ নাম নিয়ে কখনো কখনো অভিনীত হয়েছে কলকাতার বিভিন্ন স্থানে। আলোচ্য নাটকটিতে একই রকমভাবে কংগ্রেস সরকারকে তীব্রভাবে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা হয়েছিল। এইসময় রাজীব গান্ধি ভারতের প্রধানমন্ত্রী। মায়ের মৃত্যুর পর পাইলটের চাকরি ছেড়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। তিনি ভালো বক্তৃতা দিতে পারতেন না বিশেষ করে হিন্দি ভাষায় একেবারে সাবলীল ছিলেন না। তিনি হিন্দি ভাষায় যখন বক্তৃতা করতেন তখন প্রায়ই বলতেন ‘হমে দেখনা হ্যায়’। রাজীব গান্ধির এই কথা বলার ধরনকে ব্যঙ্গ করে উৎপল দত্ত এই পথনাটকটি রচনা করেছিলেন। তিনি কংগ্রেস সরকারের অপদার্থতা, রাজীব গান্ধির অপদার্থতা ও ফাঁকা আওয়াজকে তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন। রাজীব গান্ধির কথা বলার রীতিকে ব্যঙ্গ করতে করতে উৎপল দত্ত প্রকৃতপক্ষে সরকারকেই ব্যঙ্গ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন দেশ শাসনের নামে ভণ্ডামির চূড়ান্ত রূপ। ব্যক্তির অপদার্থতাকে দেশ শাসনের অপদার্থতার বৃহৎ পরিধিতে বিস্তারিত করে দিয়েছেন তিনি।

১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে উৎপল দত্ত রচনা করেন তাঁর শেষ পথনাটক ‘সত্তরের দশক’। এটি ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে রচিত। তিনি কুড়ি বাইশ বছর আগেকার সত্তরের দশকের কংগ্রেস সরকারের অত্যাচার, শোষণ ও ভয়াবহ পরিবেশকে নতুন করে তুলে ধরেছেন এই নাটকে। কংগ্রেসের অত্যাচারের স্মৃতি জাগিয়ে তাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও ঘৃণা উস্কে দিতে চেয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সরকারের সন্ত্রাস তথা সত্তর দশকের রাজনীতির বিভীষিকার ছবি আলোচ্য নাটকে তুলে ধরেছেন। এই ৭০ দশকের কংগ্রেস সরকারের অত্যাচার ও তাদের অপকীর্তিকে নিয়ে এর আগে তিনি ‘ব্যারিকেড’, ‘দুঃস্বপ্নের নগরী’, ‘কালো হাত’ প্রভৃতি নাটক রচনা করেছিলেন। কুড়ি বাইশ বছর পরেও সে বিভীষিকার চিত্র তিনি ভুলতে পারেননি। তিনি প্রয়োজন অনুভব করেছেন কংগ্রেসের অত্যাচার ও অপশাসনকে পুনরায় জনগণের সামনে তুলে ধরার দরকার। এই প্রজন্মের অনেকেই সেই বীভৎস অত্যাচার ও পুলিশি নির্যাতন প্রভৃতির খবর জানেন, তাদের কাছে ফিরিয়ে এনেছেন সেই বীভৎসতার ছবি, সেই সব স্মৃতি।

উৎস নির্দেশ :

১. উৎপল দত্ত, 'শিকড়', 'জপেনদা জপেন যা', উৎপল দত্ত, গদ্য সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ ১৮৫

২. সুকান্ত ভট্টাচার্য-'রবীন্দ্রনাথের প্রতি', 'ছাড়পত্র' কাব্যগ্রন্থ, সারস্বত প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২০৬ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা-০৬, পুনঃমুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২ বঙ্গাব্দ, পৃ.-১৫

৩. দর্শন চৌধুরী, থিয়েটারওয়ালা উৎপল দত্ত, পুস্তক বিপনী, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম সংস্করণ ১০ই অক্টোবর (মহালয়), ২০০৭, প.- ৩০৬

৪. উৎপল দত্ত, 'জবাবদিহি', উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র, প্রথম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৪, পৃ ৬৬

৫. উৎপল দত্ত, 'লিট্‌ল থিয়েটার ও আমি', উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন, নৃপেন্দ্র সাহা (সম্পা), উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব ২০০5 কমিটি, ৭ নভেম্বর ২০০৫, পৃ ৪৫৬

৬. তদেব, পৃ ৪৫৯

৭. তদেব, পৃ ৪৬০

৮. সাক্ষাৎকার : সুরজিৎ ঘোষ, দেশ, ৩০ মার্চ ১৯৯১।

৯. শঙ্কর শীল : পিপল্‌স লিটল থিয়েটার, উৎপল দত্ত : মনন ও সৃজন, প্রতিভাস, সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ ৮৬

১০. তদেব, পৃ ৮৮

১১. তদেব, পৃ ৯৪

১২. সূত্র-১, পৃ ১৮২

১৩. নাটক পরিচিতি, উৎপল দত্ত, নাটক সমগ্র, ষষ্ঠ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ভাদ্র ১৪৫০, পৃ ৬৬০

১৪. সূত্র-৩, পৃ ৪৪৩

১৫. উৎপল দত্ত : শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, 'শূদ্রক', শরৎ, ১৪০০, পৃ ১২৫

১৬. তদেব, পৃ ১২৫

১৭. সূত্র-৩, পৃ ৪৬২

১৮. উৎপল দত্ত : 'রাজনৈতিক নাটক, একটি কলহ', 'জপেনদা জপেন যা', উৎপল দত্ত গদ্য সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), দে'জ পাবলিশিং, পুনর্মুদ্রণ জুলাই ২০১৫, পৃ ২৩১

১৯. উৎপল দত্ত : 'ব্রেখ্‌ট্‌ ও মার্ক্‌স্‌বাদ', 'স্তানিস্‌লাভস্কি থেকে ব্রেখ্‌ট্‌', উৎপল দত্ত গদ্য সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), দে'জ পাবলিশিং, পুনর্মুদ্রণ জুলাই ২০১৫, পৃ ২৮৫

২০. উৎপল দত্ত : 'আনন্দলোক', পত্রিকায় সাক্ষাৎকার, ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৯, পৃ ৯

২১. সূত্র-১৬, পৃ ২৩২

২২. উৎপল দত্ত : 'সংগ্রামের একটি দিক', উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন, সম্পা : নৃপেন্দ্র সাহা, উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব ২০05 কমিটি, ৭ নভেম্বর ২০০৫, পৃ ২১

২৩. উৎপল দত্ত, 'পর্বান্তর' পত্রিকায় সাক্ষাৎকার, 'এপিক থিয়েটার', মার্চ ১৯৯৫, পৃ ৭৬

২৪. শঙ্কর শীল, 'মিনার্ভা থিয়েটারের দিনগুলি', উৎপল দত্ত : মনন ও সৃজন, প্রতিভাস, সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ ৫০

২৫. তদেব, পৃ ৫৫

২৬. সূত্র-৩, পৃ ৪৫৯

২৭. সূত্র-১৩, পৃ ১৩৪

২৮. সূত্র-৩, পৃ ৪৬১

২৯. সূত্র-৭, পৃ ৯২

৩০. উৎপল দত্ত, 'এপিক থিয়েটার', নভেম্বর ও ফেব্রুয়ারি, মার্চ সংখ্যা, ১৯৭৩, পৃ ৯৪

৩১. সূত্র-১৩, পৃ ১৪৫

৩২. সূত্র-৩, পৃ ৪৪৬

৩৩. তদেব, পৃ ৪৪৬

৩৪. তদেব, পৃ ৪৫৩

৩৫. তদেব, পৃ ৪৫৫

৩৬. তদেব, পৃ ৪৫৭

৩৭. তদেব, পৃ ৪৫৮

৩৮. সূত্র-১৬, পৃ ২৩১

দ্বিতীয় অধ্যায়

উৎপল দত্তের জীবন : রাজনৈতিক দীক্ষা ও নাট্যকার সত্তা

ছেলেবেলা ও পারিবারিক জীবন :

উৎপল দত্ত, পুরো নাম উৎপলরঞ্জন দত্ত। জন্ম ১৯২৯ সালের ২৯ মার্চ বর্তমান বাংলাদেশের বরিশাল জেলায়। উৎপল দত্তের জন্মস্থান নিয়ে নানারকম মতভেদ আছে। উৎপল দত্ত নিজে খানিকটা উচ্চ সংস্কৃতি বোধসম্পন্ন রহস্য প্রিয়। তিনি বলতেন তাঁর জন্মস্থান শিলংয়ের মামার বাড়িতে। যাইহোক, উৎপল দত্তের আদি বাসস্থান ছিল অধুনা বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলায়। বিভিন্ন পারিবারিক সূত্র যাচাই করে দেখা গেছে যে তাঁর প্রকৃত জন্মস্থান ছিল কীর্তনখোলা বরিশালে।

উৎপল দত্তের পিতার নাম গিরিজারঞ্জন দত্ত। মাতা শৈলবালা দত্ত। পিতামহ ছিলেন দ্বিজদাস দত্ত। পাঁচ ভাই তিন বোনের মধ্যে উৎপল দত্ত ছিলেন চতুর্থ সন্তান। পিতৃদত্ত নাম ছিল উৎপলরঞ্জন দত্ত। চলতি নাম শংকর যা পারিবারিক ধর্মগুরু ভোলানন্দ গিরি মহাশয় দিয়েছিলেন। পরে তিনি এ নাম পরিহার করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি উৎপল দত্ত নামই ব্যবহার করেন।

উৎপল দত্তের পিতা গিরিজারঞ্জন দত্ত ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত ও রাশভারী মানুষ। পরাধীন ভারতের যে উচ্চবৃত্ত শ্রেণি ব্রিটিশ প্রভাবে অগ্রণী শক্তিরূপে বিকশিত হয়েছিল সেই সম্প্রদায়ভুক্ত। গিরিজারঞ্জন প্রথম জীবনে কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। পরে ইংরেজি অধ্যাপনা ছেড়ে ব্রিটিশ সরকারের জেলার চাকরি গ্রহণ করেন। সরকারি চাকরির কারণে বহু জায়গায় বদলি হওয়ার জন্য ভাইবোনদের সঙ্গে উৎপল দত্তকেও নানা স্থানে ঘুরতে হয়েছে। তাই পড়াশোনা করতে হয়েছে অবিভক্ত বঙ্গদেশের নানা স্থানে।

বাবা ব্রিটিশরাজের একজন বড়কর্তা ছিলেন। উৎপল দত্তের শিক্ষাজীবন শুরু হয়েছিল শৈল শহর শিলং-এ। সেখানকার সেন্ট এডমন্ড স্কুলে ১৯৩৫ সালে ভর্তি হন। এক কুলীন অভিজাত পরিবেশে ইংরেজি পাঠক্রম-এর মাধ্যমে তার ছাত্রজীবন শুরু। বাড়িতে পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিবেশে শেকসপিয়র সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পেত। মেজদা মিহিররঞ্জন দত্ত কিশোর উৎপলকে শেকসপিয়রের নাটকের গল্প পড়ে শোনাতো। তাদের অভিজাত বাড়িতে রেকর্ড চালিয়ে নাটক শোনার চল ছিল। উৎপল দত্ত সেইসব নাটক খুব মন দিয়ে শুনতেন ও সংলাপ মনে রাখার চেষ্টা করতেন। উৎপল দত্রের মননে চিন্তনে পাশ্চাত্য শিক্ষার বীজ এভাবেই রোপিত হয়েছিল। এরপর

উৎপল দত্তের বাবা গিরিজারঞ্জন দত্তকে বদলি করা হয়েছিল বহরমপুর জেলার রূপে। উৎপল দত্ত ও তার অনুজ নীলিন বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। তার পিতা গিরিজা রঞ্জনের উপরে বহরমপুরে সরকারি আবাসনে আক্রমণের ঘটনা ঘটেছিল। আর সেই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন কিশোর উৎপল দত্ত। হয়তো সেই বিপ্লবের দুর্জয় সাহস আর গভীর আত্মবিশ্বাস তার ব্যক্তিত্বে প্রবেশ করেছিল। তাছাড়া সেই সময় বহু রাজনৈতিক বন্দি ও বিপ্লবীদের প্রত্যক্ষ করার সুযোগ ঘটেছিল। তাদের উপরে অত্যাচার নিপীড়ন হত। অতি অল্প বয়স থেকে সেসব দেখার ফলে নিশ্চয়ই গভীরভাবে তার মনে ছাপ পড়েছিল। এই স্মৃতি তার জীবন এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠেছিল। "যা পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী নাটক করতে প্রেরণা যুগিয়েছে।"[১]

বাল্যকাল থেকে উৎপল দত্ত প্রখর মেধাবী ছিলেন। অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও তীক্ষ্ণ স্মৃতিসম্পন্ন বালক উৎপল দত্ত মাত্র ছয় বছর বয়স থেকে শেকসপিয়রের বিখ্যাত নাটকের সংলাপ মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। বহরমপুরে থাকাকালীন তার পিতার কাজের সুবাদে নানারকম গুণী মানুষের আগমন ঘটত তার বাড়িতে। অতিথিদের সামনে উৎপল দত্তের ডাক পড়ত। তখন বালক উৎপল দত্ত অতিথিদের সামনে শেকসপিয়রের নাটক থেকে বিভিন্ন সংলাপ আবৃত্তি করে শোনাতেন। তাঁর মেজদা মিহিররঞ্জন দত্ত জানিয়েছিলেন—

> *উৎপল ছবছর বয়স থেকেই শেক্সপিয়ারের বিখ্যাত নাটকগুলোর বিখ্যাত উক্তিগুলি মুখস্থ করে ফেলেছিল। বাড়িতে কোন অতিথি এলেই দুজনের (উৎপল ও নীলিনের) ডাক পড়ত। উৎপল শোনাত শেক্সপিয়ার থেকে আবৃত্তি।* [২]

বহরমপুরে যখন গিরিজারঞ্জন দত্ত ছিলেন, তখন সেখানে ছিল পাঠান রেজিমেন্ট। শারীরিকভাবে বলিষ্ঠ, কঠোর শৃঙ্খলাপরায়ণ, নিয়মনিষ্ঠ এইসব পাঠানদের মধ্যেই কিশোর উৎপল দত্তের দিন কাটত। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে তিনি পাঠান বাহিনীর সঙ্গে শারীরিক কসরত করতেন। ছেলের উৎসাহ দেখে গিরিজারঞ্জন উৎপল দত্তকে শারীরিক কসরত করার পোশাক ও এয়ারগান কিনে দিয়েছিলেন। জীবনের উষা পর্বেই উৎপল দত্তের সময়ানুবর্তিতা ও কঠোর শৃঙ্খলার পাঠ শুরু হয়ে যায় যা পরবর্তীকালে উৎপল দত্তের জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল।

স্কুল জীবন :

দশ বছর বয়সে পিতার বদলির কারণে কলকাতার বালিগঞ্জ এলাকায় অভিজাত পরিবেশে সপরিবারে স্থানান্তরিত হন। **১৯৩৯** সালে তার এক ভাইয়ের সঙ্গে কলকাতার সেন্ট লরেন্স স্কুলে

ভর্তি হন থার্ড স্টান্ডার অর্থাৎ পঞ্চম শ্রেণিতে। কলকাতায় আসার পর উৎপল দত্ত বাবা-মায়ের সঙ্গে কলকাতার পেশাদার থিয়েটার দেখতে শুরু করেন। স্মৃতিচারণায় তিনি বলেছেন—

> *আমি, আমার বাবা, আমার মা সকলে মিলে নাটক দেখতাম এবং তৎকালীন পেশাদার নাট্যশালায় যত নাটক হত সবই দেখতাম। সেটা ১৯৪৩-'৪৪-'৪৫ সাল।... মহেন্দ্রগুপ্তের পরিচালনায় স্টার থিয়েটারের প্রযোজনার আমি তো রীতিমতো ভক্ত ছিলাম।* [৩]

পড়াশোনার আগ্রহের পাশাপাশি ক্রিকেট খেলার প্রতি তার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে সেন্ট লরেন্স স্কুলটি সেনাবাহিনীর দখলে চলে যায়। ফলে স্কুলটি অস্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হয় দমদমে। বালিগঞ্জের আবাসন থেকে দমদম স্থাপিত স্কুল-এর দূরত্ব অনেকটা বেশি হওয়ায় উৎপল দত্তকে স্কুল ছাড়তে হয়। ১৯৪৩ সালে উৎপল দত্ত বাড়ির কাছে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে নবম শ্রেণিতে ভর্তি হন।

উৎপল দত্তের শিল্পী সত্তার উন্মেষ ঘটতে শুরু করেছিল সেন্ট লরেন্স স্কুল থেকেই। স্কুলে থাকার সময়ই তার নাটকে হাতেখড়ি হয়। তখন তার বয়স মাত্র তেরো। তবে কলেজে এসেই তার যথার্থ নাট্য জীবনের আরম্ভ হয়। সেন্ট লরেন্স স্কুলে থাকাকালীন সহপাঠীদের সঙ্গে বাংলা নাটকে অংশগ্রহণ করতেন। স্মৃতিচারণায় তিনি বলেছেন—

> *সেন্ট লরেন্স স্কুলে আমরা বাংলায় নাটক করতাম।* [৪]

স্কুলে বিদেশি নাটকও অভিনয় হত। স্কুল জীবনের তিনি মাঝে মাঝে ইংরেজি নাটকে অংশগ্রহণ করতেন। ছোটোবেলা থেকেই তাঁর অভিনয় তার সহপাঠী ও স্কুল কর্তৃপক্ষের নজর কাড়ে। অভিনয় করার জন্য মাঝে মাঝে তাকে নামী স্কুল সেন্ট জেভিয়ার্সেও পাঠানো হত। স্মৃতিচারণে সেকথা তিনি উল্লেখ করেছেন—

> *অভিনয় করার জন্য মাঝে মাঝে আমাদের সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে পাঠানো হত।* [৫]

সাহেব পরিচালক ফাদার উইভার-এর অধীনে থেকে তিনি শেকসপিয়রের নাটকে অভিনয় করতে থাকেন। ফাদার উইভারের পরিচালনায় সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে শেকসপিয়রের 'হ্যামলেট' নাটকে তিনি প্রথম অভিনয় করেন ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে। সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের যৌথ উদ্যোগে গড়ে ওঠা 'সাঁসুসি প্লেয়ার্স'-এর প্রযোজনায় নাটকটি মঞ্চস্থ হয়।

স্কুল জীবনের কথা উৎপল দত্ত খুবই কম বলেছেন। যেটুকু বলেছেন তার সবটাই থিয়েটারের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই সময় থেকে থিয়েটার ও মঞ্চ সম্পর্কে তাঁর অধ্যয়ন ও চর্চা শুরু

হয়েছিল। ১৯৪৩ সালে কমিউনিস্ট পার্টির তত্ত্বাবধানে ভারতের 'গণনাট্য সংঘের' জন্ম হয়। স্কুলের শেষ পর্যায়ে এসে স্কুলে থিয়েটারের প্রয়োগ ও এই শিল্পের সাধনায় মনোযোগী হয়ে ওঠেন। তাঁর এই প্রতিভা ও চালচলন ভাবভঙ্গির মধ্যে আভিজাত্যের লক্ষণ দেখে সহপাঠীরা তাঁকে সমীহ করে চলত। ১৯৪৩-৪৪ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এবং ভারতীয় 'গণনাট্য সংঘ' পৃথিবীব্যাপী ফ্যাসিবাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ডাক দিয়েছিল তার প্রভাব স্কুল ছাত্র উৎপলকে আলোড়িত করে তুলেছিল। তখন থেকেই উৎপলের কিশোর মনে বিদ্রোহ প্রতিবাদের রেখার জন্ম নিয়েছিল। ১৯৪২ সালে গান্ধিজির 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের প্রভাব ও অন্যদিকে কমিউনিস্ট পার্টির গণনাট্য সংঘের নেতৃত্বে বিভিন্ন আন্দোলন ও প্রতিরোধ তার কিশোর মনকে আন্দোলিত করে তুলেছিল। যার প্রভাব তার পরবর্তী জীবনে ও নাট্যকার সত্তায় গভীরভাবে পরিলক্ষিত। স্মৃতিচারণায় তিনি বলেছেন—

> *স্কুলে থাকতেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লাল ফৌজের মহান প্রতিরোধ ও প্রত্যাক্রমণের কাহিনী পড়ে চমকিত হতাম। স্তালিনের সহজ ও তীক্ষ্ণ ভাষায় লেখা প্যামফ্লেট ও বই তখন থেকে পড়ছি।* [৬]

<u>কলেজ জীবন</u> :

১৯৪৫ সালে তিনি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন। ১৯৪৩ সাল থেকে ১৯৪৯ সাল, সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ মিলিয়ে মোট ছয়টি বছর উৎপল দত্তের জীবনে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই ছয় বছর তার পরবর্তী চুয়াল্লিশ বছরের শিল্পী জীবনের রেখাচিত্র এঁকে দিয়েছিল। কলেজ জীবনে তার পড়াশোনার ব্যাপ্তি ও গভীরতা ছিল ঈর্ষণীয়। বহুমুখী উৎপল দত্ত ছিলেন বিচিত্র বিদ্যার অধিকারী, তিনি প্রচুর পড়াশোনা করতেন। বিশ্বসাহিত্য তো বটেই বাংলা সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করতেন। স্কুল শেষ হতে না হতেই লেনিন, মার্কস, এঙ্গেলস্ প্রভৃতি তার দখলে ছিল। তাছাড়া নিয়মিত পাঠের মধ্যে ছিল ইতিহাস ইউরোপীয় মধ্যযুগীয় আইন ও দেশি-বিদেশি সংগীত তত্ত্ব। নাটক বা নাটক সম্পর্কিত বইপত্র প্রচুর পড়াশোনা করেছিলেন। পিটার ব্রুক, স্তানিভালোস্কিদের বই ছাড়াও শেকসপিয়র প্রভৃতি সমস্ত বই তিনি পড়াশোনা করতেন ও এইসব জগদ্‌বিখ্যাত নাট্যকারদের সঙ্গে পরিচিত হতে থাকেন। পৃথিবীর যেখানকার যে নাটক সম্পর্কে বই পাওয়া যেত তার সব সংগ্রহ করে তিনি পড়তেন। নাটক অভিনয় সম্পর্কিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকাও তিনি সংগ্রহ করতেন। পড়াশোনা বিষয়ে সেন্ট জেভিয়ার্সের পাঠাগার তাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। কলেজ জীবনে অন্য ছাত্রদের সঙ্গে তিনি অভিনয় চালিয়ে যেতেন। কলেজে পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে নিজের একান্তে শেকসপিয়রের নাটকগুলো ভালো করে পড়েছিলেন।

১৯৪৭ সালে নিকোলাস গোগলের 'ডায়মন্ডস কাটস্ ডায়মন্ড'-এ অভিনয়ের মধ্য দিয়ে উৎপল দত্ত কলেজজীবনে নাট্য অভিনয় শুরু করেন। তার সহপাঠী অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন প্রতাপ রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ তখন ছিল নাট্যচর্চার জন্য বিখ্যাত। নাট্যচর্চা ও অভিনয়ের জন্য আদর্শ জায়গা ছিল এই সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ। তখন যারা শিক্ষক ছিলেন তাদের তত্ত্বাবধানে থাকলে থিয়েটারে না এসে উপায় ছিল না। উৎপল দত্তের ভাষায়—

> *সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্রছাত্রীরা কেউ কেউ যে থিয়েটারে আসেনি, এটাই আমার কাছে আশ্চর্যের। ওই কলেজে পড়লে... থিয়েটারে না এসে উপায় ছিল না... এরকম একটা থিয়েটার সমস্ত যন্ত্রপাতি সমেত— আমি খুব কম দেখেছি।* [৭]

সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে উৎপল দত্ত ও তাঁর সহযোগীরা ইংরেজি নাটক করতেন অধিকাংশরই নাটক, গুগোল ও মলি-এর নাটক ছিল। তবে তিনি শেকসপিয়রের নাটক বেশি উপভোগ করতেন। এইসময় থেকে শেকসপিয়রের নাটকের সঙ্গে তার একটা আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সারা জীবন সেই সম্পর্ক তাহার অন্তর আত্মার ভিতর, তার শিরায় উপশিরায়, তার রক্তের গভীরে কাজ করে গেছে।

উৎপল দত্ত কলা বিভাগের ছাত্র ছিলেন। ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসের প্রথম বর্ষে ১৯৪৫-৪৬ সালে তিনি কলেজে প্রথম পুরস্কার লাভ করেছিলেন। দ্বিতীয় বর্ষেও মোট ৯০০ নাম্বারের মধ্যে ৭১০ নাম্বার পাওয়ায় প্রথম পুরস্কার তার দখলে ছিল। তার প্রিয় বিষয় ছিল ইতিহাস অথচ স্নাতক শ্রেণিতে তিনি সাম্মানিক হিসেবে ইংরেজি বিষয়কে বেছে নিয়েছিলেন। তার কারণ হিসেবে তিনি জানিয়েছিলেন—

> *ও শালার এমন সিলেবাস যার শুরুও নেই, শেষও নেই। অত পড়ার সময় কোথায়? তাহলে থিয়েটারটা শিকেয় উঠবে। সেটা করবে কে?* [৮]

কিন্তু বিদেশি বিষয়ে অপেক্ষাকৃত কঠিন ইংরেজি চয়ন করার কারণ হিসেবে তিনি বলেছিলেন—

> *ফাঁকি দেওয়া যাবে। ইংরেজি নিলাম কারণ বানিয়ে কিছু অন্তত লিখতে পারব।* [৯]

কলেজের তৃতীয় বার্ষিক স্নাতক ফাইনাল পরীক্ষায় তিনি ৯০০ নাম্বারের মধ্যে ৫১১ পাওয়াতে তার নাম সসম্মানের সঙ্গে উচ্চারিত হত। বলা বাহুল্য ইতিহাস তার প্রিয় বিষয় হলেও ছাত্র জীবনে তার প্রবন্ধের বিষয় ছিল মূলত শিল্প ও সাহিত্য।

বহুমুখী উৎপল দত্ত তার নিজের প্রতিভার ছটা বিভিন্ন অঙ্গনে নিজেকে ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন বিভিন্নভাবে। উৎপল দত্তের কলেজ জীবনে অন্যতম প্রিয় বিষয় ছিল আবৃত্তি। ছোটোবেলা থেকেই আমরা দেখেছি আবৃত্তির প্রতি তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। বাড়িতে গুণীজনের আগমন ঘটলে তাঁর ডাক পড়ত আবৃত্তি শোনানোর জন্য। কলেজ জীবনেও সেই আবৃত্তির ধারা সমানভাবে বজায় রেখেছিলেন ও কলেজে আবৃত্তিতে উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। কলেজ ম্যাগাজিনে জানা যায়—

> *আন্তঃকলেজ আবৃত্তি প্রতিযোগীতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের প্রতিনিধি হিসেবে নীলিন যথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন।* [১০]

আবৃত্তির পাশাপাশি বিতর্কেও উৎপলের আগ্রহ ছিল। কলেজে পড়াকালীন বা তার পরবর্তী সময়েও উৎপল দত্ত আর বিতর্ক যেন প্রতিশব্দ ছিল। তিনি বিভিন্ন যে প্রবন্ধ লিখেছেন বা যখনই বক্তৃতা করেছেন তিনি একটি প্রতিপক্ষ তৈরি করতেন। সেই প্রতিপক্ষকে যুক্তি-তর্কে-উপহাসে-কৌতুকে নাস্তানাবুদ করেই তিনি মজা পেতেন। তাঁর বহু নাটকে বিতর্ককে স্থান দিয়েছিলেন বিষয়বস্তু হিসেবে। উৎপল দত্তের বিতর্কের প্রতি এই ভালোবাসা কলেজ জীবন থেকেই শুরু হয়। বহু তার্কিক; নৈয়ায়িককে অনায়াসে যুক্তি তর্কে পরাস্ত করতেন। বিতর্ক বিষয়ে তিনি এতটাই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন যে, শোনা যায়—

> *সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়াকালীনই উৎপল দত্ত অসামান্য খ্যাতি পেয়েছিলেন 'ডিবেটর' হিসেবে, গেছিলেন কেম্ব্রিজ। শোনা যায় এশীয় বিতর্ক প্রতিযোগীতায় তিনি সম্মানীয় স্থান অর্জন করেছিলেন।* [১১]

সংগীত তার জীবনের সবচেয়ে পুরানো সঙ্গী। ভারতীয় পাশ্চাত্য সংগীত উৎপল দত্তের মতো দক্ষতা বাংলা নাট্য ও চলচ্চিত্র জগতে খুবই বিরল। ভারতীয় মার্গ সংগীত ছোটোবেলা থেকেই তার বড়ো দিদির মাধ্যমে শিখতে শুরু করেন বহরমপুর থাকাকালীন। তার উপরে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল এই মার্গ সংগীত। কলেজ জীবনে যখন তিনি নাটকের কাজ নিয়ে পুরোদমে ব্যস্ত, সে সময়েও ভারতীয় মার্গ সংগীতের অনুষ্ঠান সারা রাত্রি ব্যাপী শুনেছেন। কখনও বা ফুটপাথে বসেই। আর পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সংগীতের প্রতি আকর্ষণ তার অন্তরের তীব্র আকাঙ্ক্ষার ফলে সৃষ্ট। কিছুটা বন্ধু-বান্ধবের প্রভাবও আছে। এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন—

> *যখন আমরা ইংরেজি দল করতে শুরু করিনি, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়ছি, তখন থেকেই পাশ্চাত্য সংগীত সম্পর্কে একটা দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলাম।* [১২]

ওয়াটার্লু স্ট্রিটের গ্রামোফোন ক্লাবের সদস্য হয়েছিলেন উৎপল দত্ত, প্রতাপ রায়, সলোমন বেখর।

শুধুমাত্র প্রতি বুধবার পাশ্চাত্য সংগীতের রেকর্ড শুনবেন বলে। সহপাঠী প্রতাপ রায় ও উৎপল দত্ত মনস্থির করলেন পাশ্চাত্য সংগীতের সর্বাধুনিক রেকর্ডগুলি কিনবেন অথচ পকেটে পয়সা কম। শর্ত ছিল এক সপ্তাহ করে এক এক জনের মালিকানায় থাকবে এই রেকর্ডগুলো। পিয়ানো শেখার প্রবল আগ্রহ ছিল উৎপল দত্তের মধ্যে। পিয়ানো শেখার জন্য তিনি ভর্তি হয়েছিলেন 'ক্যালকাটা স্কুল অফ মিউজিক'-এ। 'ক্যালকাটা স্কুল অফ মিউজিক' সেইসময় সংগীতের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। কিন্তু সেখানে ভর্তি হতে না পেরে মিসেস গ্রীন হলের 'ক্যাবিনা দেলা মুজিকায়' ভর্তি হলেন। এ সময় তার মনের প্রবল ইচ্ছা ছিল তিনি একজন কনসার্ট পিয়ানিস্ট হবেন। কিন্তু বাদ সাধল তার হাতের আঙুলের গঠন। মিসেস গ্রীন হল জানালেন—

> *এত ছোট হাতে হবে না। কিছু কর্ড আছে, রিড আছে হাতের স্প্যানেই পাবে না। তাই কনসার্ট পিয়ানিস্ট হয়ে ওঠা আর হল না।* [১৩]

পিয়ানিস্ট হওয়ার স্বপ্ন ব্যর্থ হওয়ায় ইংরেজি থিয়েটার শুরু করলেন পুরোদমে। সংগীতের প্রতি প্রবল ভালোবাসার ফলে তিনি 'সিম্পনি' প্রবন্ধটি রচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে থিয়েটারের সংলাপের পরে সংগীতের প্রয়োগই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল তার কাছে।

সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়ার সময় উৎপল দত্তের নানা গুণের ছটা বিচ্ছুরিত হতে থাকে। সংগীত-আবৃত্তি-বিতর্কের পাশাপাশি অভিনয় কলা সমান্তরালভাবে চালিয়ে গিয়েছিলেন। একটা সময় তার উপলব্ধি হয় থিয়েটার নিয়েই তাকে সমস্ত জীবন অতিবাহিত করতে হবে। সেকথা অকপটে স্বীকারও করেছেন—

> *সেন্ট জেভিয়ার্সে অভিনয়ের সময়েই আমি সিদ্ধান্ত নিই যে আমি থিয়েটারের লোক, থিয়েটারেই থাকব। সারা জীবন থিয়েটার করব।* [১৪]

সহপাঠীদের সঙ্গে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে অভিনয় শুরু করলেন। এই সময় নাটকের প্রতি এতটাই নিবিষ্ট চিত্ত হয়ে পড়লেন যে কলেজে নাটকের সীমিত অভিনয় সংখ্যা তাকে সন্তুষ্ট করতে পারছিল না। তাই উৎপল দত্ত সংগত কারণেই বলেছিলেন—

> *কলেজি অভিনয়ে তৃপ্ত থাকাটা... আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।* [১৫]

১৯৪৭-এর জুন মাসে উৎপল দত্ত তার সহযোগী বন্ধু প্রতাপ রায় ও সেন্ট জেভিয়ার্সের অনেক ছাত্ররা মিলে গড়ে তুললেন 'দ্যা অ্যামেচার শেক্সপিরিয়ানস' নামে নাট্যদল। এটা 'লিট্‌ল্ থিয়েটার' গ্রুপের গোড়া পত্তন বলা যেতে পারে। যা প্রতিষ্ঠিত হয় ইংরেজি দল হিসেবে এবং শেকসপিয়রের নাটক নিয়ে তার যাত্রা শুরু হয়। প্রথম অভিনয় হয় পূর্ণাঙ্গ নাটক 'রিচার্ড দ্যা থার্ড'

নামক নাটকটি। উৎপল দত্ত এই নাট্যদলের মূল ব্যক্তিত্ব, নাট্য নির্বাচনে, পরিচালনায় ও অভিনয়ে। এবারে এর-এর হয়ে নাটক অভিনয় করা নয়, একেবারে নিজের নাট্যদল তৈরি করে ফেললেন। এই নাট্যদলের প্রথম অভিনয় শেকসপিয়রের 'রোমিও এন্ড জুলিয়েট' সঙ্গে 'ম্যাকবেথ'। এই দলের পূর্ণাঙ্গ অভিনীত নাটক 'রিচার্ড দ্যা থার্ড'। 'রোমিও এন্ড জুলিয়েট' এর তিনটি দৃশ্য, 'ম্যাকবেথের' দুটি দৃশ্য অভিনীত হয়েছিল। নাটকগুলির কিছু অংশ অভিনীত হয়েছিল পূর্ণাঙ্গ নাটকের পরিচালনার দায়িত্ব গঠন এবং পরিচালক হিসেবে প্রথম স্বীকৃতি লাভ। অভিনয় করার যেমন নেশা ছিল সেইসঙ্গে নাটক লেখার গভীর তাগিদ অনুভব করতেন। কলেজে পড়ার সময় কলেজ পত্রিকায় সেই তাগিদ থেকে 'বেটি বেল শাজার' নামক প্রথম ইংরেজি নাটক তিনি লিখেছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন বিষয় নিয়েও তিনি লেখা শুরু করেন। যেমন— শেকসপিয়র, রাসেন, রুশ সাহিত্য প্রভৃতি। সেইসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র ও তার লেখা থেকে বঞ্চিত হতেন না। উৎপল মানসকে গভীরভাবে বোঝার জন্য ও পরবর্তীকালে নাটকে তাঁর প্রভাব কতখানি জানার জন্য কলেজ জীবনে তার লিখিত প্রবন্ধের ওপর আলোকপাত করা প্রয়োজন। উৎপল দত্তের মূলত প্রবন্ধ লেখার ঝোঁক ছিল। ছাত্র উৎপল দত্তের খুব কম লেখা আমরা পেয়েছি। স্কুল জীবনেরও তেমন কিছু লেখা পাওয়া যায়নি। তবে কলেজ জীবন থেকে তিনি মোটামুটি লেখা শুরু করেন। তার অনেকটাই পুনরুদ্ধার করা গেছে। কলেজ জীবন থেকে প্রবন্ধের প্রতি একটু বেশি তার ঝোঁক ছিল। নাটক লেখার ব্যাপারটা তার কাছে ছিল শখ মাত্র। কবিতা লেখা দূরের কথা কবিতা তিনি তেমনভাবে পছন্দ করতেন না। উপন্যাস ও ছোটোগল্প ইত্যাদির ছায়াও মাড়াননি। গল্প উপন্যাস কবিতার বদলে তিনি প্রাবন্ধিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। উপন্যাস না লিখলেও উপন্যাসের প্রতি তার একটা আলাদা ভালোবাসা ছিল। তার অধ্যয়ন ও যুক্তি-বুদ্ধি, তত্ত্বে-তথ্যে, বিচার-বিশ্লেষণে, যুক্তিকেই প্রধান করে তুলতে চেয়েছেন।

উৎপল দত্তকে নিয়ে গল্পের শেষ নেই। তিনি অভিনয়ের জন্য রোমান হরফে নিজের ইংরেজি সংলাপ লিখে রাখতেন। তিনি ছোটোবেলা থেকেই বাংলা বলায় ও লেখায় একটু অপরিপক্ক ছিলেন। তবে তিনি কলেজ জীবন থেকেই বাংলা ও ইংরেজিতে একইসঙ্গে প্রবন্ধ লিখে গেছেন। এমনকি তার বাংলা প্রবন্ধের বিষয় পাশ্চাত্য সংগীত পাশ্চাত্য সংস্কৃতি এবং ইংরেজি প্রবন্ধের বিষয় হিসেবে বাংলা সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেছেন। উৎপল দত্তের লিখিত প্রবন্ধে বিষয়বস্তু হিসেবে বাস্তবতা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। বাংলা কিংবা রুশ সাহিত্যের বাস্তবতার সন্ধান করেছেন। তিনি সেই বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তুলতে কখনও রুশ সাহিত্যেরও অতি সাম্প্রতিক বিষয়কে অনুসরণ করেছেন। আবার সামন্ততান্ত্রিক বাস্তবতার সঙ্গে একাত্ম হতে চেয়েছেন। কলেজ জীবন থেকে নাটক সংগীত ও বিতর্কের প্রতি আকর্ষণ প্রবল হলেও উপন্যাসের প্রতি একটু বিশেষ দুর্বল

ছিলেন। তিনি সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়াকালীন কোনো উপন্যাস না লিখলেও এই সময়ে তিনটি প্রবন্ধের বিষয় হিসেবে উপন্যাসকে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি অনেকটা সময় উপন্যাস পড়েই কাটিয়ে দিতেন। সব মিলিয়ে মনে হতে পারে উপন্যাসের প্রতি তার একটা গোপন আত্মিক সম্পর্ক ছিল।

সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে কলা বিভাগের ছাত্র ছিলেন। উৎপল দত্ত প্রথম বর্ষে লিখে ফেললেন একখানি ইংরেজি প্রবন্ধ, যার নাম— 'A Glance At Modern Russian Literature', এটি উৎপল দত্তের প্রথম প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের পত্রিকায় ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে। কলেজের পত্রিকায় ছাত্ররা মূলত ইংরেজি সাহিত্যের চর্চা করতেন। তবে উৎপল দত্তের এই প্রবন্ধটি একেবারেই আলাদা। আধুনিক রুশ সাহিত্যের ওপর আলোচনা করলেন তিনি। এর আগে কেউ বোধহয় এই রাশিয়ান সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করার সাহস দেখাননি।

উৎপল দত্ত রুশ সাহিত্যের উপন্যাসের চরিত্র নিয়ে আলোচনা করলেন। এই প্রবন্ধটিতে সব মিলিয়ে তিনি ছয় জন লেখকের দশটি উপন্যাস-এর উল্লেখ করেছেন। রুশ সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কিত বই প্রায় তখন অমিল বলা যেতে পারে। খুব আগ্রহী ছাড়া ওইসব বইপত্র জোগাড় করা সম্ভব ছিল না। উৎপল দত্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে খুঁজে খুঁজে বইগুলি পড়ে ছিলেন এবং তার ভিত্তিতেই তিনি আলোচনা করেছেন। ম্যাক্সিম গোর্কিকে সামনে রেখে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন উৎপল দত্ত। কারণ গোর্কির প্রতি তার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিল আন্তরিক ও গভীর। এ কারণেই বোধহয় ম্যাক্সিম গোর্কি তার শিল্পী জীবনে প্রতিটা ক্ষেত্রে বারে বারে ঘুরে ফিরে এসেছেন।

রুশ সাহিত্যের প্রতি বিশেষভাবে আকর্ষণবোধ করলেও তিনি বাংলা সাহিত্যকে কোনোভাবেই অবহেলা করেননি। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে প্রথম বর্ষে অর্থাৎ ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে কলেজ পত্রিকায় বাংলা সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্যের বাস্তবতা নিয়ে একখানি প্রবন্ধ লিখে ফেললেন। 'বাস্তবতা ও বাংলা সাহিত্য' এই প্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ খ্যাতনামা ঔপন্যাসিকদের উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কেন্দ্র করে প্রমোদ চৌধুরী, রামকমল মুখোপাধ্যায়, বিপিন পাল-এরা 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় সাহিত্যের বাস্তবতা নিয়ে যে বিতর্ক চালিয়েছিলেন তার সঙ্গে উৎপল দত্ত পরিচিত ছিলেন। বিষয়টি তার বোধহয় ভালো লাগেনি। রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' আর 'গোরা' উপন্যাস তিনি বাস্তবধর্মী উপন্যাস হিসেবেই এদের স্বাদ গ্রহণ করেছেন। 'গোরা'

উপন্যাসে ধর্ম-সমাজ-রাজনীতি-বিতর্কের মধ্যেও বাস্তবতা খোঁজ করলেন। 'চোখের বালি'-তে নায়ক-নায়িকার অসংযম ও উচ্ছৃঙ্খলতার চিত্র না দেখে অথবা 'গোরা' উপন্যাসে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বস্তুহীন কল্পনা না দেখে বাস্তবের রাজ্যে এই দুটি উপন্যাসকে 'অমর উপন্যাস' বলেই স্বীকার করলেন। বাস্তবতার ক্ষেত্রে উৎপল দত্তের সবচেয়ে কাছাকাছি ছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের মধ্যে বাস্তবতার প্রতিমূর্তি ছাড়াও পেলেন বিদ্রোহ, পেলেন নিপীড়িত মানুষের জন্য অন্তহীন সহানুভূতি। তাঁর কাছে বাস্তবতার চরম শিখরে আরোহণ করেছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। 'বাস্তবতা ও বাংলা সাহিত্য' এই প্রবন্ধটিতে বাস্তবতার জমি পরিমাপ করার পর তিনি বাংলা সাহিত্যের তিনজন বিখ্যাত ঔপন্যাসিককে নিয়ে তিনি লিখলেন "Three Bengali Novelist"। এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের পত্রিকায়।

এই প্রবন্ধটি ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের শিল্পী মনের পরিচয় নিতে বাস্তবতার প্রসঙ্গ ফিরে এসেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ও বৈভবের অনুপাতে তার বাস্তবতার স্বরূপ অনুধাবন করতে চেয়েছেন। শরৎচন্দ্র উৎপলের কাছে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। সামাজিক প্রথার অমানবিকতা আর প্রচলিত নীতিবোধের সংকট তাঁর উপন্যাসের মূল উপজীব্য বিষয়। পল্লিসমাজ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শোষণ, নিপীড়ন, সমাজ পতিদের স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা তিনি দেখিয়েছেন, দেখেছেন এবং সমালোচনা করেছেন। নাগরিক আভিজাত্য আর উচ্ছৃঙ্খলতার বদলে সেখানে খুঁজে পেয়েছেন মানবতার মহৎ সৌন্দর্য। শরৎচন্দ্রের নায়িকারা অত সক্রিয় নয়, তত বেশি ছলা-কলা জানে না। তারা সর্বংসহা অভিমানিনী। আঘাত না করে আহত হওয়াতেই তাদের গৌরব।

বঙ্কিমচন্দ্রের কথা আগের প্রবন্ধে তিনি আলোচনা করেননি। কারণ উৎপল দত্ত যে বাস্তবতার খোঁজ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে তার হদিস সম্ভব ছিল না। এই প্রবন্ধে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পী সত্তাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে চেয়েছেন।

এরপর তিনি লিখলেন সংগীতের প্রতি অনুরাগ ও গভীর ভালোবাসা থেকে 'সিম্ফোনি' প্রবন্ধটি। প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের পত্রিকায়। প্রবন্ধটি সম্পর্কে পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

১৯৪৮ সালের ইংরেজি একাডেমীর সম্পাদক ছিলেন উৎপল দত্ত। এই সময় তিনি একটি প্রবন্ধ রচনা করেন যার নাম 'The Sceptcism of Bertand Russell'। প্রবন্ধটি লিখিত হয় ১৯৪৮ সালে। কিন্তু প্রবন্ধটি পাওয়া যায়নি ও কোথাও ছাপা হয়েছিল সেটাও জানা যায়নি। ১৯৪৮

সালের মার্চ মাসের ৬ তারিখে তিনি আর একটি প্রবন্ধ লিখলেন যার নাম 'Production Manifesto'। এখানে তিনি তার আবেগ, কৈশোরিক ভাব বিলাস, চিন্তা ও কিশোরকালীন ভাবাবেগ তাই বেশি প্রকাশ পেয়েছে। ১৯৪৯ সালের জুলাই মাসে উৎপল দত্ত লিখলেন এক্সিটেশন পোয়েট্রি। এটি প্রকাশিত হয়েছিল সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের পত্রিকায়। উৎপল দত্ত যখন কলেজে পড়তেন তখন কলেজ পত্রিকার আকর্ষণ বাড়ানোর জন্য তৎকালীন পত্রিকার সহ-সম্পাদক একটা উপায় বের করলেন। যেমন কোনো খ্যাতনামা কবির অসমাপ্ত কবিতাকে আলাদা করে সমাপ্ত করলেন কলেজের কবিরা। মাঝে মাঝে কবিতার বিভিন্ন দিক নিয়ে ছাত্রদের অনুভূতি অথবা সম্পাদকের মন্তব্য ছাপা হত। এরকম বিভিন্ন বিভিন্ন অনুভবে বহুরূপী সংকলন হল আলোচ্য এই প্রবন্ধটি। কলেজে পড়াকালীন উৎপল দত্তের একমাত্র নাটিকা রচনা করেছিলেন 'বেটি বেলসাজার'। এটি তার মৌলিক রচনা। এই নাটকটি তিনি ইংরেজিতে লিখতে চাননি। কলেজ পত্রিকার সম্পাদক পুরুষোত্তম লাল তাকে অনুরোধ করেছিল ইংরেজিতে লেখার জন্য, তার অনুরোধেই তিনি ইংরেজিতে লিখেছিলেন। কলেজ পত্রিকায় এই প্রথম নাটক ছাপা হয়েছিল এবং সেটি উৎপল দত্তের নাটক। নাটক লিখবার শখ তার বহুদিনের। যখনই সময় পেয়েছেন, নাটক লিখবার প্রচেষ্টা করেছেন। নাটক লিখতে তিনি যে কতখানি উৎসাহী ছিলেন সে বিষয়ে তার সহপাঠী দেবব্রত মুখোপাধ্যায় অসাধারণ সাক্ষ্য দিয়েছেন—

> *কখনো কখনো ক্লাসের মধ্যে বসেই সে লম্বা একখানা খাতায় সদ্যোজাত নাটকের শিরোনামা অঙ্কিত করত, তার পিছনের বেঞ্চিতে বসে নিরাপদ দূরত্ব থেকে উঁকি দিয়ে দেখতাম— কোনোটার নাম 'The League of Bastrds' কোনোটার বা 'Betti Belshazzar'।* [১৬]

'বেটি বেলসাজার' নাটিকাটিতে দুটি দৃশ্য একটি প্রাচীন রাজাদের আমলের ও অন্যটি একেবারেই এখনকার ভোজসভাকে কেন্দ্র করে। দুই কালের ভোজসভাকে কেন্দ্র করে অভিজাত শ্রেণির জীবন দর্শনের ঐক্য ও জীবনচর্চার বিলাসিতা যে অভিন্ন তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো হয়েছে। সম্রাট বেলসাজার সর্ব শক্তিমান তিনি প্রতিবেশী দেশের থেকে বণিকদের মধ্যে প্রকৃত বন্ধু বাছতে জানেন। দেশের নির্মম অত্যাচার আর বাইরের শত্রুর সঙ্গে লড়াই জিইয়ে রাখতে জানেন। তিনি লেনদেনের স্বার্থে বণিক চূড়ামণিদের ভোজসভায় আমন্ত্রণ করেন। ভোজ সভায় চলে ভোগ বিলাসিতা ও লাম্পট্য। 'বেলসাজার' নিজেকে ঈশ্বরের চেয়েও সর্বশক্তিমান মনে করেন। অন্যদিকে 'বেটি'ও তাই ভোগ বিলাসিতার চূড়ান্ত নিদর্শন। তার ভোজসভাতে বিভিন্ন চরিত্ররা ইন্দ্রিয় ভোগ ছাড়া বিশেষ কথাই বলেন না। সবকালের স্বৈরতন্ত্রী ও চাটুকার বণিকদের জমায়েত হয় 'বেটি' ও 'বেলসাজারের' ভোজসভায়।

১৯৪৯ সালের জুলাই মাসের ২৪ তারিখে শেকসপিয়রকে নিয়ে তিনি আর একটি প্রবন্ধ রচনা করলেন। যার নাম "Shakespeare and the Modern Stage"। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়াকালীন উৎপল দত্তের একমাত্র এই প্রবন্ধটি কলেজ পত্রিকার বাইরে ছাপা হয়েছিল। উৎপল দত্তের কলেজে পড়ার পাঠ তখন প্রায় চুকে গেছে। কলেজের ছাত্র গোষ্ঠীর পরিষদ থেকে প্রাবন্ধিক উৎপল দত্ত হাজির হলেন তখনকার সবচেয়ে বিখ্যাত, অভিজ্ঞ সংবাদ পত্রের বিশাল পাঠকের দরবারে। এই প্রবন্ধে শেকসপিয়রকে নিয়ে তিনি সমকালের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে মিলিয়ে ব্যাখ্যা করেছিলেন। এই প্রবন্ধে আধুনিক মঞ্চে শেকসপিয়রের প্রযোজনার বিভিন্ন দিক তুলে ধরলেন।

উৎপল দত্তের প্রতিভা এতটাই ব্যাপক ও বিস্তৃত ছিল যে শিল্প-সাহিত্যের যে অঙ্গনেই তিনি পদার্পণ করেছেন সেখানেই সফলতা অর্জন করেছেন। কলেজ জীবনে তার অধ্যাপক সহপাঠী দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে—

সে একটা আবির্ভাব বললেই চলে...। [১৭]

পড়াশোনার দিক দিয়ে অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছিলেন। কলেজে বিভিন্ন নথিপত্র থেকে জানা যায়—

কলেজে তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষে সাম্মানিক ইংরেজিতে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। [১৮]

কলেজের রেজাল্ট থেকে বোঝা যায় ইংরেজিতে কতটা তিনি দক্ষ ছিলেন ও ছাত্র হিসেবে কতটা মেধাবী ছিলেন। পড়াশোনার এইরকম অসাধারণ সাফল্য পাওয়া সত্ত্বেও পড়াশোনার প্রতি তিনি যে খুব মনোযোগী ছিলেন সেকথা বলা ঠিক হবে না। পাঠ্যপুস্তক, কলেজ বা পরীক্ষা এইসব বিষয় নিয়ে উৎপল দত্ত ভাবতেন 'কলেজ, লেক্‌চার, পরীক্ষা, পাঠ্যপুস্তক'— এসব হচ্ছে কলেজ জীবনের "বিরক্তিকর মায়া"।[১৯] আসলে এইসময় তিনি নাটকের প্রতি অত্যন্ত নিবিষ্ট চিত্ত হয়ে পড়েছিলেন। অন্য কোনোকিছুই তাকে সন্তুষ্ট রাখতে পারছিল না। এইসময় থেকেই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন "সারা জীবন থিয়েটার করব"।[২০] এইসময় কলকাতার পেশাদার নাট্যদলগুলির প্রযোজনা খুঁটিয়ে লক্ষ করতেন। যেখানে যখনই ভালো প্রযোজনা হত সেগুলো লক্ষ করতেন এবং সর্বদা শেখার চেষ্টা করতেন। তিনি বলেছেন—

বিশেষ করে, বড়বাবু, শিশির ভাদুড়ী মহাশয়ের অভিনয় দেখার সুযোগ পেলে ছাড়তাম না। নিবচ্ছিন্ন মনোযোগে তাঁর অভিনয় লক্ষ্য করতাম। সেই সব মহৎ কারবার দেখে মনে হল, আমার পক্ষে অভিনেতা ছাড়া আর কিছু হবার নেই। [২১]

এইরকম যখন তিনি ভাবছেন, তার মন যখন অভিনয় জগতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেছেন তখনই তাকে অভিনয়ের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন জেফ্রি কেন্ডাল সাহেব তার নাট্যদলে।

গুরুলাভ : নিজের নবপ্রতিষ্ঠিত নাট্যদল 'দ্যা অ্যামেচার শেক্সপিয়রিয়াঙ্গের' হয়ে অভিনয় করতে করতে উৎপল দত্তের জীবনে একটা বড়ো সুযোগ এল। তার নিজের দলের তখন অভিনয় চলছে 'রিচার্ড দ্যা থার্ড' নাটকের। সেইসময় ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ পেশাদারি নাট্যদল 'দ্যা শেক্সপিয়রিয়ানা ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার কোম্পানি' কলকাতায় অভিনয় করতে আসে। জগদ্‌বিখ্যাত এই পেশাদারি নাট্যদলের নাট্য প্রযোজক ছিলেন জিওফ্রে কেন্ডাল (Geoffrey Kendal)। তার শেকসপিয়র নাটকের অভিনয় জগৎজোড়া খ্যাতি এনে দিয়েছিল।

সেন্ট জেভিয়ার্সের যে মঞ্চ উৎপল দত্ত ও তার বন্ধুরা অভিনয় করছিলেন, কেন্ডাল ও তার নাট্যদল নিয়ে সেই মঞ্চেই উপস্থিত হন তাঁর দলের নাট্য প্রযোজনা করবেন বলে। কেন্ডাল তার নাটক অভিনয় করার জন্য, যথেষ্ট অভিনেতা না থাকার কারণে তিনি কিছু স্থানীয় অভিনেতা খোঁজ করেন। ঘটনা পরম্পরায় কেন্ডাল সাহেব তরুণ উৎপল দত্ত ও তার দলের অভিনয় দেখলেন এবং মুগ্ধ হলেন। উৎপল দত্তকে প্রস্তাব দিলেন যে তার দলের হয়ে অভিনয় করার জন্য ও তার দলে যোগ দেওয়ার জন্য। প্রস্তাবে উৎপল দত্ত রাজি হলেন এবং কেন্ডাল সাহেবের নাট্যদল 'শেক্সপিয়ারিয়ানা ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার কোম্পানি'-তে যোগদান করলেন। কলকাতায় এই দলের প্রথম নাট্যাভিনয় শুরু হয় ৯ অক্টোবর ১৯৪৭ সালের 'ম্যাকবেথ' নাটক দিয়ে। প্রথম দফায় এখানে তাদের নাটক অভিনয় শেষ হয় ১০ জানুয়ারি ১৯৪৮ সালে। মাঝের এই দীর্ঘ ৯৪ দিন উৎপল দত্ত কেন্ডাল সাহেবের সাহচর্যে থেকেছেন ও নাটক সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা লাভ করেছেন। ৯৪ দিনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে উৎপল দত্ত লিখেছেন—

> *শিখতে লাগলাম বৈজ্ঞানিক মহলা কাকে বলে, অভিনয় বস্তুটা কী, মনোযোগ কতটা একাগ্র হওয়া চাই, একটি বাক্যের কত রকম কথনভঙ্গী হতে পারে। ... ১৯৪৮-এর জানুয়ারীর মাঝামাঝি পর্যন্ত চলল শেক্সপিয়ারিয়ানার কলকাতা সীজন। লোক ভেঙে পড়েছিল দেখেতে। ... প্রতি হপ্তায় নতুন নাটক। সারাদিন পরে নাটকের মহলা, সন্ধ্যেবেলায় অভিনয়। এখানেই শিখলাম মেকআপ, কণ্ঠস্বরের ওঠানামার কৌশল, দেহের ব্যায়াম, তলোয়ার খেলা। তারচেয়েও যা বেশি, এখানে এল মনোভাবের বিরাট পরিবর্তন, থিয়েটার ও নাটক সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিটা বদলে গেল।* [২২]

তারপর তারা ভারত ছেড়ে অন্যত্র অভিনয় করতে চলে যায় কিন্তু উৎপল দত্ত তার নিজের নাট্যদল নিয়ে এখানেই অভিনয় করতে থাকেন। কেন্ডাল সাহেবের পরামর্শ ও শিক্ষা তিনি অক্ষরে অক্ষরে

পালন করতে থাকেন। কেন্ডাল সাহেব তার দল নিয়ে দ্বিতীয় দফায় আর একবার ভারতবর্ষে এসেছিলেন অভিনয় করতে সময়টা ১৯৫৩-৫৪। উৎপল দত্ত আবার এই দলে যোগ দিলেন এবং এই সময়ের মধ্যে আরও কয়েকটি নতুন নাটক উল্লেখযোগ্যভাবে অভিনয় করেন।

জেফ্রি কেন্ডালকে তার গুরু রূপে বরণ করেন উৎপল দত্ত। উৎপল দত্ত ও তার সহযোগীরা প্রথম প্রযোজনা করেন সেন্ট জেভিয়ার্স মঞ্চ ভাড়া নিয়ে শেকসপিয়রের 'রিচার্ড দ্যা থার্ড' নাটকটি। কিন্তু নাটকটির প্রযোজনা ও অভিনয় একেবারেই ভালো হয়নি। সেকথা তিনি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেছেন। "অত্যন্ত জঘন্য হয়েছিল।"[২৩] কিন্তু সেই প্রযোজনার পরে উৎপল দত্তের সঙ্গে এমন এক যোগাযোগ ঘটে যা উৎপল দত্তের শিল্পী জীবনের আমূল পরিবর্তনি ঘটে ও ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে। শিল্পী হিসেবে তার দৃষ্টিভঙ্গিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ "সেদিন চলতি ভাষায় আমার গুরু লাভ হয়।"[২৪] কারণ সপরিবারে জেফ্রি কেন্ডাল সেই নাটক দেখতে এসেছিলেন। তিনি নাটক দেখলেন কিন্তু, প্রযোজনা এত খারাপ হওয়া সত্ত্বেও এতটুকু বিরক্ত বোধ করলেন না অথবা নাট্য প্রযোজক ও নাট্যদলকে কোনোরকম কটুক্তি করলেন না। কেন্ডালদের নিজস্ব নাট্যদল ছিল। তারা ইংল্যান্ড থেকে ভারতসভায় এসেছিলেন। তখন উৎপল দত্ত কলেজি অভিনয়ের গণ্ডী পেরোতে চাইছেন, নিবিড়তম ও একনিষ্ঠভাবে নাট্যচর্চার জন্য নিজেদের নাট্যদল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কলকাতার পেশাদার নাট্যশালার অভিনয় ও প্রযোজনাগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করেছিলেন আরও কিছু জানার, আরও কিছু শেখার জন্য। ঠিক তখনই এসেছিল তার জীবনের শুভক্ষণটি— "তিনি আমাকে বললেন আমি ইচ্ছা করলে তাঁর দলে যোগদান করতে পারি।"[২৫] কেন্ডালের এই আমন্ত্রণ তার জীবনে আশীর্বাদ হয়ে এসেছিল।

কেন্ডালকে গুরু রূপে গ্রহণ করলেন তার থিয়েটার শেক্সপিরিয়ানা-এর সুশৃঙ্খল জীবনযাপান বেছে নিলেন, যেখানে অভিনয় শুরু করলেন, কিন্তু নিজস্ব নাট্যদল 'দ্যা অ্যামেচার শেক্সপিয়রিয়ান্স'কে তুলে দেননি। বরং আরও একনিষ্ঠভাবে প্রবল আগ্রহে শেকসপিয়র, বার্নাড শ, শেরীদান, নোয়েল কাওয়াডের নাটকের অসামান্য উচ্চমানের প্রযোজনা করে গেছেন। এটা জানা গেছে যে ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শেকসপিয়রের 'টুয়েলভ নাইট' প্রযোজনার মধ্য দিয়ে 'দ্যি অ্যামেচার শেক্সপিয়ারিয়ান্সের' অবলুপ্তি ঘটে গিয়েছিল। ওই একই বছরে নভেম্বর মাসের ৬ তারিখে উৎপল দত্ত 'কিউব' নাট্য গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

জেফ্রি কেন্ডালের সঙ্গে এই দুই দফায় উৎপল দত্ত এই নাট্যদলের হয়ে বিভিন্ন নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন। এগুলোর মধ্যে অবশ্যই শেকসপিয়র প্রধানতম, তাছাড়া ছিল বার্নাড শ, গোল্ড স্মিথ প্রমুখ নাট্যকারের নাটক। তার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটক ও চরিত্রাভিনয়

উল্লেখ করা যেতে পারে : ‘ওথেলো’ নাটকে (রোডোরিগো), মার্চেন্ট অফ ভেনিস’ নাটকে (অ্যান্টোনিও), ‘জুলিয়াস সিজার’ নাটকে (ব্রুটাস), ‘ম্যাকবেথ’ নাটকে (রস), ‘গ্যাস লাইট’ নাটকে (কসস্টেবল)।

এরমধ্যে কেন্ডালরা কলকাতা ছাড়ার পর ১৯৪৮ সালের ৪ জুলাই ‘ওথেলো’ নাটকের অভিনয়, কলকাতার পরিশীলিত সম্ভ্রান্ত সমাজে উৎপল দত্ত এক বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করেছিল। ‘ওথেলো’ নাটকের সঙ্গে উৎপল দত্তের নাট্যদল পরপর যে নাটকগুলি অভিনয় করেছিল তার মধ্যে শেকসপিয়রের ‘জুলিয়াস সিজার’ অন্যতম। এই নাটকটি অভিনীত হয়েছিল অত্যাধুনিক পোশাকে। আধুনিক পোশাকে ‘জুলিয়াস সিজার’ নাটকের ব্রুটার্স চরিত্রে অভিনয় করে উৎপল দত্ত কলকাতার মঞ্চে এক নতুন প্লাবন এনেছিলেন। ইংরেজি নাটক কলকাতা শহরে যতটা আলোড়ন তুলতে পারে তা এই নাটক তুলেছিল।

কেন্ডালের নাট্য দলের সঙ্গে অভিনয় ও ভ্রমণতাকে নাটকের অনেককিছু শেখাল। শেকসপিয়রকে আরও বুঝলেন। তার নাটকের বিশ্লেষণ করতে শিখলেন। বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে নাট্য প্রয়োগের গভীরতা কতখানি হতে পারে তাও শিখলেন। নাট্য প্রযোজনায় পেশাদারি দক্ষতার প্রয়োজন কেন তা উপলব্ধি করলেন। ১৯৫৩-৫৪ কেন্ডাল সাহেব এক বছর ধরে ভারত সফর করেন। উৎপল দত্ত দ্বিতীয়বার এই দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন আরও বেশি উদ্যমে, একনিষ্ঠভাবে। কেন্ডাল সাহেবের কাজ একাগ্রচিত্তে অনুধাবন করেছেন। উৎপল দত্ত লিখেছেন—

> *অভিনয় করার জন্য তাদের যেতে হতো শহর থেকে শহরে— ট্রেনে, বাসে, লরিতে। আর গোটা চল্লিশেক বিরাট বিরাট বেতের তৈরি সিন্দুক-ভর্তি দলের পোষাক, পর্দা, সরঞ্জাম, আলো, ডিমার— সব বইতাম আমরা অভিনেতারাই। কুলি নিয়োগে কেন্ডালের ছিল জোর আপত্তি। মঞ্চ ধুয়ে মুছে কীভাবে মোমের পালিস করতে হয় তাও শিখেছিলাম।* [২৬]

এই থিয়েটার দলের সঙ্গে অভিনয় করে তিনি শিক্ষিত ও দীক্ষিত হয়েছিলেন থিয়েটারের শৃংঙ্খলায়, তার নিয়মানুবর্তিতা। এই থিয়েটার দল তাকে অনেক পরিণত অপরিপক্ক করে তুলেছিল। ধীরে ধীরে একজন নাটক অভিনেতা থেকে নাট্য প্রযোজক হিসেবে গড়ে উঠেছেন উৎপল দত্ত। শুধু অভিনয় নয় নাটক পরিচালনা নাট্য প্রযোজনা বিভিন্ন দিক, তার আলো, সংগীত, মঞ্চসজ্জা, সাজসজ্জা, কস্টিউমস, মেকআপ প্রভৃতি যে নাটকের অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ তা তিনি বুঝেছেন ধীরে ধীরে। আর এর সব ক্ষেত্রেই কেন্ডালের প্রভাব ছিল সর্বাগ্রে। উৎপল দত্ত পরবর্তী সময়ে স্বীকার করেছেন কেন্ডালে কণ্ঠ নিয়ন্ত্রণ, বাক্‌ভঙ্গিও বচনের তীব্রতা তাকে প্রভাবিত করেছিল। একেবারে শিক্ষানবিশ-এর মতো হাতে কলমে শিখতে শিখতে উৎপল দত্ত পরিণত হয়েছেন নাট্য প্রযোজক,

পরিচালক ও অভিনেতা হিসেবে। তারপরে নাটক লেখায় হাত দিয়েছেন। নাট্যকার হয়ে উঠেছেন অনেকদিন পর উৎপল দত্ত তাঁর ‘শেক্সপিয়ারের সমাজচেতনা’ (১৯৭৩) গ্রন্থ রচনা করে তার নাট্যগুরু জেফ্রি কেন্ডালকে উৎসর্গ করেছিলেন। উৎসর্গ পত্রে তিনি লিখেছিলেন– ‘You taught me what I know of Shakespeare’

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী উৎপল দত্ত কলেজ জীবন থেকে সংগীত, প্রবন্ধ, নাটক লেখার পাশাপাশি অভিনয় শিখলেন সমান্তরালভাবে। এখন আমরা দেখার চেষ্টা করব উৎপল দত্ত ছোটোবেলা থেকে তার কলেজি অভিনয় থেকে কীভাবে আস্তে আস্তে একজন খ্যাতনামা অভিনেতা হয়েছিলেন পাশাপাশি বিখ্যাত একজন পরিচালক হয়ে উঠেছিলেন তা আমরা দেখার চেষ্টা করেছিলেন। তবে সেখানে উৎপল দত্তের কী ভূমিকা ছিল তা বিশেষ জানা যায় না। তার উল্লেখযোগ্য অভিনয় বলতে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে পড়বার সময়ই। একথা পূর্বেই আলোচিত। ফাদার উইভারের নির্দেশনায় সেখানে মূলত শেকসপিয়রের নাট্যচর্চাই বেশি হত। ফাদার উইভারের পরিচালনায় শেকসপিয়রের ‘হ্যামলেট’ নাটকের তিনি প্রথম অভিনয় করেন ১৯৪৩ সালে। শেকসপিয়রের নাটকের চর্চা, তার নাটক পড়া, তার নাটকের অভিনয় দেখা, তার নাটকে অভিনয় করার মধ্য দিয়ে কিশোর উৎপল ধীরে ধীরে শেকসপিয়রের নাটক সম্পর্কে অভিজ্ঞ হয়ে উঠতে থাকেন। তার আগ্রহ ক্রমশ বাড়তে থাকে। পরে এই ফাদার উইভারের পরিচালনায় উৎপল দত্ত আরও দুটি নাটকে অভিনয় করেছিলেন। একটি হল নিকোলাস গোগলের ‘ডায়মন্ড কাট্‌স ডায়মন্ড’ আরেকটি হল মলিয়রের ‘দ্যা রোজারিজ স্ক্যাপিন’। প্রথমটা অভিনয় হয়েছিল ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ সালে। দ্বিতীয়টি অভিনীত হয় দু’দফায়। ১৩ ও ১৩ ডিসেম্বর ১৯৪৭ সালে কলেজের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এবং ১৩ ও ১৫ ডিসেম্বর ১৯৪৮ সালের কলেজের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে। দুটি নাটকই সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের হলে অভিনীত হয়েছিল। প্রথম নাটকটিতে উৎপল দত্তের অভিনীত চরিত্রের নাম জানা যায় না। তবে দ্বিতীয় নাটকটির তিনি প্রধান চরিত্র স্ক্যাপিনের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। শুরু হল তার অভিনয় জগতে পথ চলা। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে উৎপল দত্ত বলেছেন–

> *গগোল এর নাটকে প্রতাপ রায় এর অভিনয় খুবই উতরেছিল। মলিয়রের নাটকে অনিল চট্টোপাধ্যায় এবং প্রতাপ রায় দুই বৃদ্ধের ভূমিকায় জমিয়ে অভিনয় করেছিলেন।* [২৭]

সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে এভাবেই উৎপল দত্তের নাটকের যথার্থ অভিনয়ের সূত্রপাত হয়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে উৎপল দত্ত ও তার কয়েকজন কলেজের বন্ধুরা মিলে একটি নাট্যদল গড়ে তোলে ১৯৪৭ সালের জুন মাসে। যার নাম “দ্যা অ্যামেচার শেক্সপিয়রিয়ান্স”। যা

থেকেই লিট্‌ল থিয়েটারের জন্ম হয়। এই নাট্যদলের প্রথম পূর্ণাঙ্গ অভিনয় ‘তৃতীয় রিচার্ড’। যার পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন উৎপল দত্ত নিজে। সেই তাঁর প্রথম প্রযোজনা। এরপর এই নাট্যদলের প্রযোজনায় এবং উৎপল দত্তের পরিচালনায় অভিনীত হয় ‘ম্যাকবেথ’ নাটক ৯ অক্টোবর ১৯৪৭ সালে অভিনীত হয় “দ্যা মার্চেন্ট অফ ভেনিস।” এই নাটকটি সেন্ট জেভিয়ার্সের ছাত্রদের দ্বারা অভিনীত হয়েছিল। ‘জুলিয়াস সিজার’ অভিনীত হয়েছিল একই দিনে বা ১০-১০-১৯৪৭ তারিখে। ‘ম্যাকবেথ’ নাটকের দ্বিতীয় পর্বের অভিনয় হয়েছিল ১৩-১০-১৯৪৭ তারিখে। এটি নির্বাচিত হয়েছিল সেন্ট জেভিয়ার্সের ছাত্রদের অভিনয়ের জন্য। ‘ওথেলো’ অভিনীত হয়েছিল ২৭-১০-১৯৪৭ তারিখে। ‘গ্যাসলাইট’ নাটকটি অভিনীত হয়েছিল ৩ নভেম্বর ১৯৪৭। এছাড়া আরও কিছু নাটক অভিনীত হয়েছিল সেন্ট জেভিয়ার্স মঞ্চে এবং উপরে আলোচ্য নাটকের পুনরাভিনয় হয়েছিল।

উৎপল দত্তের ‘দ্যা মার্চেন্ট অফ ভেনিস’ নাটকে অ্যান্টোনিও-এর ভূমিকায় অভিনয়ের দ্বারা তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু হয়। তারপর ‘ম্যাকবেথ’ নাটকের রস, ‘জুলিয়াস সীজার’ নাটকে ডিসিয়াস, ‘গ্যাসলাইট’ নাটকে কনস্টেবল— প্রভৃতি চরিত্রে অভিনয় করতে থাকেন। তিনি বলেছেন—

> *‘দ্যা মার্চেন্ট অফ ভেনিস’ নাটকে অ্যান্টোনিওর ভূমিকা দিয়েই তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। তারপর ‘ম্যাকবেথে’ রস, ‘সীজারে’ ডিসিয়াস, ‘শিস্টুপস টু কংকার’-এ স্যার চার্লস, ‘ওথেলো’য় রডেরিগো, ‘গ্যাসলাইটে’ এক কনস্টেবল, ‘পিগম্যালিয়নে’ এক পথচারী, কখনো বা কোনো নাটকের মৃত সৈনিক।* [২৮]

এভাবে অভিনয় করে তিনি ধীরে ধীরে নিজেকে পরিণত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে নাটক পরিচালনার কাজটাও সমান্তরালভাবে করে গেছেন। একটু একটু করে শিখতে শিখতে একজন দক্ষ, সুযোগ্য, পেশাদার অভিনেতা ও পরিচালক হয়ে উঠেছিলেন।

উৎপল দত্ত সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ পর্যায়ে চার বছর তার প্রতিভাকে বিভিন্ন অঙ্গনে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। বিভিন্ন নথি তথ্য তালাশ করে দেখা যায় এই চার বছরে আবৃত্তি, বিতর্ক, রাজনীতি চর্চার সঙ্গে সঙ্গে প্রবন্ধও লিখে গেছেন। একটি নাটিকা রচনা করেছেন। এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে ছয়টি প্রবন্ধ লিখেছেন, সিনেমা দেখেছেন প্রচুর। অভিনয় করেছেন অন্তত তেরোটি নাটকে। জগৎ জোড়া বিখ্যাত পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করেছেন। তাদের কাছ থেকে সুমূল্য পরামর্শ যেমন পেয়েছেন, তেমনি তাদের নাট্যপরিচালনার কৌশল, নাট্য সম্পর্কিত সমস্ত কাজকে গভীর আগ্রহের সঙ্গে ও নিবিড়ভাবে দেখেছেন। তাঁর অভিনীত ও পরিচালিত নাট্যকারদের মধ্যে প্রধান ছিলেন শেকসপিয়র। এছাড়াও গগোল, বার্নাড শ, মলিয়ের, গোল্ডস্মিথ প্রমুখ বিখ্যাত

নাট্যকারদের নাটকেও কমবেশি অভিনয় করেছেন, পরিচালনাও করেছেন। এসময় তিনি একজন শিল্পী মাত্র মূলত এসময় তিনি জ্ঞান আরোহণ করেছেন। যেখানে যা পেয়েছেন দুই হাত দিয়ে কুড়িয়েছেন। নিজের জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। এসময় তাঁকে 'শেক্সপিয়ার থিয়েটারওয়ালা' বললেও অত্যুক্তি হয় না।

গণনাট্য সংঘ পর্ব :

আগেই আলোচনা হয়েছে উৎপল দত্ত কলেজে পড়ার সময়ে তিনি ও তার বন্ধুরা মিলে একটি নাট্যদল গড়ে তোলেন, সেটাই পরবর্তীকালে 'লিট্ল থিয়েটার গ্রুপ' হয়। উৎপল দত্ত ও তার বন্ধুরা মিলে যে নাট্যদল গড়ে তোলেন তার নাম ছিল 'দি অ্যামেচার শেক্সপিয়ারিয়ানস্।' এই দলের প্রথম অভিনয় হয়েছিল ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে। দু'বছর ইংরাজিতে শেকসপিয়ারের নাটক অভিনীত হত এই গ্রুপের দ্বারা। দু'বছর একটানা শেকসপিয়রের নাটক অভিনয় করার পর ১৯৪৯ সালের শেষের দিকে এই দলের নাম হয় 'কিউব'। এই দ্বিতীয় দলটিও মূলত ইংরেজিতে নাটক অভিনয় করছিল। এই কিউব ১৯৪৯ সালের শেষভাগে রূপান্তরিত হয় 'লিট্ল থিয়েটার গ্রুপে' অর্থাৎ উৎপল দত্তের কলেজ ছাড়ার পরে। এই নাট্যদলের নাম হোক লিটল থিয়েটার গ্রুপ এই প্রস্তাব করেছিলেন দিলীপ রায় যিনি কিউব প্রযোজিত 'ডিস্টিংগুইজড্ গ্যাদারিং' নাট্য প্রযোজনা সংগঠক ছিলেন। 'লিট্ল থিয়েটার গ্রুপের' বাংলা শাখার প্রথম সম্পাদক ছিলেন রবি সেনগুপ্ত।

উৎপল দত্ত কলেজ ছাড়ার পর থেকে লিট্ল থিয়েটার গ্রুপের প্রযোজনা হিসেবে নাটকের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এই পর্বে উৎপল দত্ত একনিষ্ঠভাবে মার্কসবাদ অধ্যায়ন করেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে এই লিট্ল থিয়েটার গ্রুপে ও সেই সময় একাধিক সদস্য ছিলেন যারা রাজনৈতিকভাবে বামপন্থী। সেই সময় স্মৃতিচারণ করেন উৎপল দত্ত বলেছেন—

> *আমাদের গ্রুপের মধ্যেই আসছিল বামপন্থী ধ্যান-ধারণা, ভাবনা।... ভারতেও তখন প্রচণ্ডভাবে বামপন্থী ধ্যান ধারণার প্রবাহ। দেশ সবে মাত্র স্বাধীন হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনা জাগ্রত ছিল মানুষের মধ্যে। সেটা থিয়েটার গ্রুপের মধ্যে সংক্রামিত হতে বাধ্য।* [২৯]

উৎপল দত্ত ও সদ্য প্রতিষ্ঠিত লিট্ল থিয়েটারের অন্যান্য সদস্যদের আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দুটি বিপ্লবী নাটক প্রযোজনা করেন একটি হল 'ক্লিফোর্ড ওডের্টস'-এর বিপ্লবী নাটক 'ওয়েটিং ফর লেফটি'এবং 'ওডেটস'-এর অপর আরেকটি নাটক যেটি কমিউনিস্ট পার্টির আমৃত্যু সংগ্রামের কাহিনি নিয়ে রচিত 'টিল দ্যা ডে আই ডাই।' এই নাটক দুটির প্রযোজনা করার কারণ হিসেবে উৎপল দত্ত বলেন—

১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি হল। গ্রেপ্তার গুণ্ডামি চলল বেপরোয়া। ... শেক্সপিয়ারে বা বার্নাড শ-এ আটকে থাকাটা তখন অসহ্য লাগছিল। কারাগারে গুলি চালানোর সংবাদের ক্রোধ যেন ব্যর্থ নিঃশ্বাস হয়ে ধাক্কা মারছিল বক্ষ পঞ্জরে। [৩০]

এসবের প্রতিবাদে ও কমিউনিস্ট পার্টির সংগ্রামের কাহিনি জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য ও তাদের জানানোর জন্য এই বিপ্লবী নাটক দুটি প্রযোজনা করেন ও তার সহকর্মীরা।

উৎপল দত্ত 'গণনাট্য সংঘ' যোগদান করেন ১৯৫০ সালে। লিট্‌ল থিয়েটারে এইসময় যে নাটকগুলো হত সবই ইংরাজিতে। হলে তাদের ইংরাজি থিয়েটারের দর্শক সংখ্যা দ্রুত কমে আসছিল, কিছু ইংরেজি দর্শক বাদ দিয়ে। উৎপল দত্তের মনে হয়েছিল কিছু ইংরেজি জানা দর্শকদের সামনে নাটক করে যাওয়া নিরর্থক। তাই তিনি চাইছিলেন বাংলায় নাটক করতে, যাতে আরও অনেক বেশি মানুষের কাছে পৌঁছানো যায় কারণ বাংলার বেশিরভাগ দর্শক ছিল বাংলা নাটকের। গণনাট্য সংঘ উৎপল দত্তকে বাংলায় নাটক করার সেই সুযোগ করে দিয়েছিল।

তারপরেই প্রধানত সলিল চৌধুরীর মধ্যস্থতায় এবং গণনাট্য সম্পাদক নিরঞ্জন স্যারের আগ্রহে— আমি 'লিটল থিয়েটার' থেকে ছুটি নিয়ে গণনাট্যে সঙ্গে যোগ দিই। [৩১]

উৎপল দত্ত গণনাট্য সংঘের যোগ দেওয়ার আগে চরম মানসিক অশান্তির মধ্য ছিলেন। কলকাতায় শেকসপিয়র, বার্নাড শ, ওডেটস-এর নাটকগুলো ইংরেজিতে অভিনয় করা তার কাছে অর্থহীন মনে হচ্ছিল। এইসব ইংরেজি নাটক অভিনয় করে তিনি বৃহত্তর জনসাধারণের থেকে ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন হচ্ছিল এবং মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছিলেন। এইরকম মানসিক অস্থিরতা ও বিপর্যস্ততা থেকে কাটিয়ে ওঠার জন্য এবং নিজের আত্মপরিচয়ের অন্বেষণে তিনি গণনাট্য সংঘে যোগ দিয়েছিলেন। শুধুমাত্র নাটকের দর্শক সংখ্যা বাড়ানোর জন্য, নিজের এই অস্থিরতা এবং জনতার থেকে বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনি গণনাট্য সংঘে যোগ দিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য এই সময় তিনি মার্কসবাদ অত্যন্ত গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন।

উৎপল দত্ত নিজের মানসিক অস্থিরতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যেমন গণনাট্য সংঘে যোগ দিয়েছিলেন তেমনি অপরদিকে উৎপল দত্তকেও গণনাট্য সংঘের প্রয়োজন ছিল। গণনাট্য সংঘ ছিল কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক সংগঠন। ১৯৪৮ সালে কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি হয় ও তাদের ফ্রন্টে ভাঙন ধরে। নেতা কর্মী শিল্পীরা পুলিশি অত্যাচার-নির্যাতনে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। আবার ১৯৫০ সালে পার্টির ওপর থেকে যখন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয় তখন গণনাট্য সংঘকে পুনরায় সংগঠিত করার প্রচেষ্টা শুধু হয়। পার্টির বাইরে থেকে যোগ্য শিল্পীদের নিয়ে এসে গণনাট্য

সংঘকে পুনর্গঠনের একটা প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। তারা মনে করেছিল উৎপল দত্তের মতো শিল্পীকে গণনাট্য সংঘে নিয়ে আসা খুবই প্রয়োজন। তাই তারা উৎপল দত্তকে গণনাট্য সংঘে আমন্ত্রণ করেছিল 'গণনাট্য সংঘকে পুনর্গঠনের প্রচেষ্টায়। সাক্ষাৎকারে উৎপল জানিয়েছেন—

> *তখন আই.পি.টি.এ পুনর্গঠন-এর চেষ্টা হচ্ছে ১৯৪৮ পার্টি বেআইনি হওয়ার পরে পার্টির সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল। ... তারপরে এই সময়টা— ৫১/৫২ তে Party reorganize করেছিল তার cultural front। তখন তারা বাইরে থেকেও শিল্পীদের ডাকছিল— আপনারা আসুন। আমাদের সাহায্য করুন reorganize করতে। এই আবেদন নিয়ে সলিল চৌধুরী আমার সঙ্গে দেখা করেন...। তখন আমি যোগদান করি।* [৩২]

গণনাট্য সংঘের তৎকালীন সম্পাদক নিরঞ্জন সেন মহাশয় উৎপল দত্তকে গণনাট্য অভিনয় ও পরিচালনার কাজ করতে অনুরোধ করেন। উৎপল দত্ত সে আবেদন গ্রহণ করেন এবং তিনি ছন্নছাড়া ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া গণনাট্য সংঘের কর্মীদের সংগঠিত করার জন্য উৎপল দত্ত প্রযোজনা করেন কমিউনিস্ট পার্টির আমৃত্যু সংগ্রামের কাহিনি নিয়ে রচিত বিপ্লবী নাটক 'টিল দ্যা ডে আই ডাই'।

> *টিল দ্যা ডে আই ডাই' নাটকের প্রযোজনা কমিউনিস্ট মহলের অনেকেরই ভালো লেগেছিল।* [৩৩]

গণনাট্য সংঘে যোগ দিয়ে তিনি প্রথম অভিনয় করেন পানু পালের 'ভাঙা বন্দর' নাটক। এরপরে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিসর্জন' নাটকটি পরিচালনা করেন। গণনাট্য সংঘ-এর নাটক প্রযোজনা করে উৎপল দত্তের অভিজ্ঞতা খুব একটা সুখকর হয়নি। 'বিসর্জন' নাটকে সব নামিদামি শিল্পীরা অভিনয় করেছিলেন কিন্তু এত শিল্পী সমাবেশ হওয়া সত্ত্বেও নাটকটি প্রযোজক উৎপল দত্তের একেবারে মনঃপুত হয়নি, নামিদামি শিল্পী সমাবেশ সত্ত্বেও না ছিল কারো মধ্যে শৃঙ্খলা না ছিল কারো মধ্যে পেশাদারি দক্ষতা পার্টির প্রচার কার্যে সদস্যদের যতটা নিষ্ঠা ও উৎসাহ ছিল শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে তার ছিটেফোঁটাও ছিল না। উৎপল দত্তের মতে—

> *কদর্য প্রযোজনা। ...কেউ প্রমটার দাবী করছেন, কেউ নির্দেশের বাইরে প্রবল হাত ছুঁড়ছেন। কেউ বা দেরীতে এসে সোজা বলছেন পার্টি মিটিং ছিল, কী করবো?— ইত্যাকার সব বিশৃঙ্খলা।* [৩৪]

অন্যদিকে উৎপল দত্ত গোড়া থেকেই ছিলেন পেশাদারি শৃঙ্খলাবোধে অভ্যস্ত, পেশাদারি দক্ষতায় আস্থাবান। তাই উৎপল দত্তকে নাটক পরিচালনার ক্ষেত্রে 'গণনাট্য সংঘ'-এর শিল্পীদের বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করতে হয়েছিল, শিল্পীদের স্বেচ্ছাচারিতাকে সংযত করতে হয়েছিল। সবার মধ্যে অন্তত

শৃঙ্খলাটুকু প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তিনি এবং করেও ছিলেন। তার কথায়—

> *'অফিসার', গোগলের 'রেভিব্যর', ঋত্বিক-কৃত বাংলা রূপ। এর মহলায় ক্রমশ আমরা একটি সুসংহত টিম হয়ে উঠি, প্রবল শৃঙ্খলায় নিজেদের বাঁধি এবং তারপর অসংখ্য অভিনয় করতে থাকি গ্রামে-গঞ্জে।* [৩৫]

গণনাট্য সংঘ যোগ দেওয়ার আগে উৎপল দত্ত যে মানসিক অস্থিরতা ও টানাপোড়েনের মধ্যে ছিলেন গণনাট্য সংঘে যোগ দিয়ে সেই টানাপোড়েন সব অবসান হল এমন নয়, উৎপল দত্ত একদিকে যেমন জন বিচ্ছিন্ন থেকে মুক্ত হচ্ছেন গণসংযোগ দিয়ে, তেমনি নতুন নতুন সদস্য, নতুন অন্তর্দ্বন্দ্ব ভিন্ন টানাপোড়েনের মুখোমুখি হচ্ছিলেন। সহকর্মীরা তার বিরুদ্ধে নানা রকম অভিযোগ করতে থাকে, তাকে নানা দোষে দোষী বানাতে থাকে। ফলে 'গণনাট্য সংঘে' তার বেশিদিন কাজ করা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। তার কথায়—

> *গণনাট্যতে আমি বেশীদিন থাকিনি বা থাকতে পারিনি— মোটে দশ মাস।* [৩৬]

উৎপল দত্তের আঘাত ও যন্ত্রণার জায়গাটা ছিল যে 'গণনাট্য সংঘে'র যে নেতাকর্মীদের জন্য তিনি প্রাণপণ কাজ করার চেষ্টা করতেন সেই নেতাকর্মীদের মধ্যে কতিপয় নেতা কর্মীরা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করতেন। তাদের অভিযোগগুলো ছিল প্রথমত, উৎপল দত্ত উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করেন। তিনি একজন স্মোকার তিনি 'গননাট্য সংঘের' এ রীতিনীতি সঠিকভাবে মানেন না ও পালন করেন না— সুতরাং তিনি 'গণনাট্য সংঘে' থাকার অনুপযুক্ত। দ্বিতীয় অভিযোগ ছিল উৎপল দত্ত ক্যারিয়ারিস্ট। নিজের ক্যারিয়ার ছাড়া অন্য কিছু বোঝেন না। তিনি গণনাট্য সংঘকে ব্যবহার করেছেন নিজের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্য ও অভিনেতা হিসেবে নিজের ক্যারিয়ারকে আরও উজ্জ্বল ও সুগম করার জন্য। এরকম স্বার্থসর্বস্ব লেখক 'গণনাট্য সংঘে' থাকার অনুপযুক্ত। এসব অভিযোগ শুনে উৎপল দত্ত অবাক ও বিস্মিত হয়েছেন। তিনি তার প্রতিবাদ করেছেন—

> *এরকম কিছু নেতা গণ নাট্যের সমূহ ক্ষতি করছেন। তারা গাইতে জানতেন না, নাচতেও না, অভিনয় করতেন না, লিখতেনও না। মনে হয় যারা গাইতো, নাচতো, অভিনয় করতো, লিখতো— তাদের তাঁরা তেমন সইতে পারতেন না। ... নিজের আখের গোছাবার জন্য কেউ যে পথনাটিকায় অভিনয় করতে যায় এটা জানতাম না।* [৩৭]

তৃতীয় অভিযোগটি ছিল অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও মারাত্মক। 'গণনাট্য সংঘে'র একাংশ অভিযোগ করলেন— উৎপল দত্ত মার্কসবাদী নন, তিনি স্তালিন বিরোধী অর্থাৎ ট্রটস্কি পন্থী। উৎপল দত্ত আজীবন ধরে মার্কসবাদ বিশ্বাস করে গেছেন, কমিউনিস্ট পার্টিকে ভালোবেসে গেছেন, তার

বিরুদ্ধে এরকম একটা অভিযোগ তিনি মানতে পারেননি। তার বিরুদ্ধে এরকম অভিযোগ করা হয়েছিল কারণ, পড়াশোনার প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁকের কারণে তিনি সব বই পড়তেন যেমন ট্রটস্কি পড়তেন তেমনি স্ট্যালিন ও পড়তেন। কিন্তু তখন কারো হাতে ট্রটস্কির বই দেখা মানে ভয়াবহ একটা ব্যাপার ছিল। তখন স্তালিন জিন্দাবাদ ছাড়া কিছুই বলা যেত না। ভয়ানক অবস্থা ছিল। কমিউনিস্টদের সামনে ট্রটস্কি নামও উচ্চারণ করা বারণ আছে। এটা উৎপল দত্তের কাছে অসহনীয় ছিল। সাক্ষাৎকারে উৎপল দত্ত জানান—

> *আমি কিন্তু ট্রটস্কিবাদী নই, আমি মনে করি, আমি প্রকৃত স্তালিনবাদী, কেননা আমি ট্রটস্কি পড়ে বুঝেছি যে সেটা কেন ভুল আর স্তালিন কেন সঠিক...।* [৩৮]

‘গণনাট্য সংঘের’ একটা অংশ উৎপল দত্তের গায় ট্রটস্কিবাদী লেবেল লাগিয়ে তাকে কোণঠাসা করার মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এইভাবেই উৎপল দত্তের চিন্তা ও কাজের সঙ্গে গণনাট্য নেতৃত্বের সংঘাত বেঁধেছিল প্রতিক্ষণে প্রতি পদে পদে। ‘গণনাট সংঘ’ উৎপল দত্তকে রাজনৈতিকভাবে আক্রমণ করেছিল। অবশেষে একদিন ‘গণনাট্য সংঘের’ নেতাদের তরফ থেকে তাকে সরাসরি চলে যেতে বলা হল এবং বলা হল তিনি যেন ‘গণনাট্য সংঘের’ সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রাখেন। উৎপল দত্ত ‘গণনাট্য সংঘ’ থেকে এভাবেই বিতাড়িত হলেন।

লিটল থিয়েটার পর্ব :

গণনাট্য সংঘের সঙ্গে উৎপল দত্ত পুরোপুরি সম্পর্কচ্ছেদ করলেন, এরপর তিনি ফিরে এলেন ‘লিটল থিয়েটার গ্রুপ’ ১৯৫১ সালে। এইসময় ‘লিটল থিয়েটার গ্রুপ’-এ উৎপল দত্ত প্রধানত ‘ধ্রুপদী’ নাট্যচর্চা করতেন। এই ‘ধ্রুপদী’ নাট্যচর্চা ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত বজায় ছিল। গিরিশচন্দ্র-মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথ-এর নাটক যেমন চলত তেমনি শেকসপিয়র-ইবসেন-গোর্কি প্রভৃতি নাট্যকারের নাটকের বঙ্গানুবাদগুলি তখন মঞ্চস্থ করে যাচ্ছিল উৎপল দত্তের থিয়েটার। স্মৃতিচারণে তিনি বলেছেন—

> *পুরাতন ক্লাসিককে মঞ্চে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা আমরা প্রয়োজনীয় মনে করেছিলাম... বাংলা নাটকের ঐতিহ্যের সঙ্গে আগে গভীরভাবে যুক্ত না হলে নূতন ঐতিহ্যের দিকে এক কদমও এগোনো যায় না, এটাও আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতাম।* [৩৯]

‘ধ্রুপদী’ নাট্যচর্চার পাশাপাশি পথনাটকের ঐতিহ্য তারা বজায় রেখেছিলেন। গণনাট্যে থাকাকালীন পথনাটকের সম্পর্কে যে শিক্ষা উৎপল দত্ত লাভ করেছিলেন, সেই শিক্ষার প্রতিফলন হচ্ছিল এই

সময়। পঞ্চাশের দশকের রাজনৈতিক চেতনা ও সমকালীন সমাজ দ্বন্দ্ব প্রতিফলিত হচ্ছিল ও প্রকাশিত হচ্ছিল মূলত পথনাটকের মধ্য দিয়ে। এইসময় পথনাটিকা সফলতার সঙ্গে তারা অভিনয় করে চলেছিলেন বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে। উৎপল দত্ত বলেন—

পাশাপাশি বজায় রেখেছিলাম পথনাটিকার ঐতিহ্য। [৪০]

পথনাটকের পাশাপাশি এই সময়ে মঞ্চনাটকেও তারা অভাবনীয় সাফল্য পেয়েছিলেন। 'ধ্রুপদী' নাটকগুলো এতটাই জনপ্রিয় হচ্ছিল যে তাদের সপ্তাহে তিন-চারদিন করে অভিনয় করতে হচ্ছিল। বেশিরভাগ অভিনয় হচ্ছিল কলকাতার বাইরে। এরকম পরিস্থিতিতে যখন অভিনয়ের সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে তখন তারা মনস্থির করল 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ'-এর নিজস্ব একটা থিয়েটার প্রয়োজন। উৎপল দত্ত জানান—

শো-এর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার পরেই আমাদের তখন মাথায় চেতনাটা জন্মালো, তাহলে নিজেজের থিয়েটার দরকার। তখন থিয়েটার খুঁজতে লাগলাম আমরা অ্যাকটিভ্‌লি। কেউ যদি আমাদেরকে কোথাও কোনও থিয়েটার দেয়! থিয়েটার তো পাওয়া যেত না! ... তারপর অজিত গাঙ্গুলী নাট্যকার— তিনি এসে মিনার্ভার ব্যবস্থাটা করে দিলেন। কেননা থিয়েটারের মালিক ওঁর পরিচিত ছিল। তখন আমরা মিনার্ভা নিলাম। [৪১]

১৯৫১ সালে জুন মাসে উৎপল দত্ত ও তার 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ'-এর সহকর্মীরা মিনার্ভা থিয়েটার লীজ নেয়। নাট্যকার অজিত গঙ্গোপাধ্যায় যোগাযোগ করিয়ে দেয় মালিকের সঙ্গে। প্রথমত মালিক লীজ দিতে রাজি না হলেও পরবর্তী সময়ে রাজি হয়ে যান। 'মিনার্ভা' থিয়েটার লীজ নেওয়ার আগে 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ' চরম আর্থিক সংকট ও দুর্দশার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। 'মিনার্ভা থিয়েটার' তারা ভাড়া নেয় এই আশা করে যাতে এখান থেকে তারা কিছুটা লাভের মুখ দেখতে পারে। কিন্তু লাভের পরিবর্তে লোকসান বেশি হতে শুরু করল। 'মিনার্ভা থিয়েটার' ভাড়া নেওয়ার আগে যে পরিমাণ তাদের লোকসান হচ্ছিল, 'মিনার্ভা থিয়েটার' ভাড়া নেওয়ার পরে তাদের লোকসান বরং আরও বেড়ে গেল। স্মৃতিচারণায় উৎপল দত্ত বলেছেন—

মিনার্ভা থিয়েটারে 'লিটল্ থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হবার পর এই অভাব-অনটন কমার পরিবর্তে বেড়ে গেল দ্বিগুণ। [৪২]

তবুও তারা চরম সংকটের মধ্যেও অভিনয় চালিয়ে গেছেন, গ্রুপকে সফল-সচল রেখেছেন। কারণ মঞ্চেতে বিপ্লবের কথা বলতে হবে, তার জন্য তারা অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন। আর এই সংকল্প নিয়েই অনেক সদস্য অনেক আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। যেমন—

শোভা সেন তার বাড়ি বন্ধক রেখে টাকা এনে দিলো অকাতরে। পরেও বারবার শোভা এবং তাপস সেন নিজ নমে হুণ্ডি কেটে টাকা এনে সংকট রুখেছে। লিটল থিয়েটারের সদস্যরা কখনো বা যে যতটুকু পেরেছে টাকা দিয়েছে। [৪৩]

এইভাবে প্রবল অর্থকষ্টের মধ্য দিয়েও শুধু আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা ও থিয়েটারের প্রতি ভালোবাসা, দায়বদ্ধতাকে সম্বল করে তারা 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ' 'মিনার্ভা থিয়েটারে নাট্য অভিনয় শুরু করল **১৯৫৯** সালে। চরম সংকটের মধ্যেও তারা পিছিয়ে আসেনি বরং শক্ত হাতে তা মোকাবিলা করেছেন। এভাবেই আরম্ভ হল বাংলা থিয়েটারের এক ঐতিহাসিক অধ্যায়।

মিনার্ভা থিয়েটার লীজ নেওয়ার পর উৎপল দত্ত চিন্তাভাবনা শুরু করলেন কীভাবে আধুনিক রাজনৈতিক নাটক মঞ্চস্থ করা যায়। যদিও পথনাটকের বিষয়বস্তু রাজনৈতিক ছিল কিন্তু তার সঙ্গে অনেক তফাত, তার ক্ষেত্র আলাদা নির্মাণ পদ্ধতি আলাদা তার উদ্দেশ্য আলাদা। মঞ্চের জন্য তিনি আধুনিক রাজনৈতিক নাটক-এর খোঁজ চালাচ্ছিলেন। তিনি সেইসব রাজনৈতিক নাটক খুঁজছিলেন যেসব নাটক আমাদের দেশের মানুষ সহজে বুঝতে পারবেন, যার আঙ্গিকে দেশের মানুষের কাছে অপরিচিত মনে হবে না, যার বিষয়বস্তু ঘটনা দেশের মানুষের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে যাবে। অনেক প্রচেষ্টার পর ব্যর্থ হলেন। তিনি বলেছেন—

অনেক খুঁজেও আমরা যে-নাটক চাই তা পাইনি, তাই নিজে নাটক লিখতে বাধ্য হয়েছিলাম। [৪৪]

মঞ্চে অভিনয় করার জন্য নাটক প্রয়োজন, সেই তাগিদে এবং শোভা সেন-এর প্রেরণা ও পরামর্শ মতো তিনি প্রথম মৌলিক নাটক লেখেন 'ছায়ানট'। প্রধানত তার মৌলিক নাটক শোভা সেন-এর ঘটনা ও নিরবচ্ছিন্ন প্রেরণা ও উৎসাহের ফল—

ভবিষ্যতে বৈপ্লবিক কিছু করতে গেলে আগে সহজ কিছুতে হাত পাকানো উচিত— এরকম একটা আইডিয়া মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল শোভা। [৪৫]

উৎপল দত্ত চিন্তাভাবনা করলেন শ্রমিক আন্দোলনকে আনতে হবে পেশাদার নাট্যশালায়। তার মতে বাংলার পেশাদার নাট্যশালায় তখনো পর্যন্ত শ্রমিক শ্রেণি আসেনি। বাংলা শ্রমিককে অচ্ছ্যুত করে রাখা হয়েছিল পেশাদার থিয়েটারে এমনকি গণনাট্য সংঘের নাটকগুলো ছিল—

কিছু চাষীর কান্না বা মধ্যবিত্ত পরিবারের বিলাপের মধ্যে। [৪৬]

তাই তিনি শ্রমিক শ্রেণিকে পেশাদার থিয়েটারে আনার প্রচেষ্টা করলেন তিনি কয়লা খনির শ্রমিক আন্দোলন ও তাদের সংগ্রামের কাহিনি নিয়ে লিখলেন 'অঙ্গার' নাটক। উৎপল দত্ত 'অঙ্গার' নাটকে তুলে ধরলেন শ্রমিক শ্রেণিকে এরপর রচনা করলেন 'ফেরারী ফৌজ' সেখানে দেখা গেল বিপ্লবীদের কার্যকলাপ। তারপর রচনা করলেন বিখ্যাত নৌ-বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে কল্লোল নাটক। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল উৎপল দত্তের দৃষ্টিভঙ্গি একটি সুনির্দিষ্ট অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে এবং সে অভিমুখ হল রাজনৈতিক অভিমুখ। এরপর উৎপল দত্ত লেখেন একের পর এক বিখ্যাত রাজনৈতিক নাটক— 'অজেয় ভিয়েতনাম', 'তীর', 'মানুষের অধিকারে', 'যুদ্ধং দেহী' প্রভৃতি বিখ্যাত রাজনৈতিক নাটকসমূহ।

১৯৬৭-৬৮ সালে উৎপল দত্তের জীবন চলছিল এক জন বিচ্ছিন্নতা পর্ব। এ সময় দাঁড়িয়ে উৎপল দত্ত বুঝতে পারছিলেন তার স্বপ্নের 'লিটল থিয়েটার' ভেঙে পড়তে চলেছে, অন্যদিকে 'মিনার্ভা' থিয়েটারকেও বেশিদিন ধরে রাখা সম্ভব নয় তাকে ছেড়ে দিতে হবে। তার থিয়েটার ক্রমশ গণআন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে, জনসাধারণের জীবন ধারার সঙ্গে সংযোগহীন হয়ে পড়ছে। **১৯৬৯** সালে উৎপল দত্তের জীবনে শুরু হল ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই। উৎপল দত্ত বুঝতে পেরেছিলেন 'লিটল থিয়েটার গ্রুপের' সদস্য থাকাকালীন পুনরায় জনসংযোগ করার জন্য তিনি এবং গ্রুপের **৯** জন বিশ্বস্ত সদস্য মিলে 'বিবেক নাট্য সমাজ' নাম দিয়ে আরেকটি দল গঠন করে ফেলেন এবং এই দলের মাধ্যমে যাত্রার কাজ শুরু করে দেন। এক সাক্ষাৎকারে উৎপল দত্ত বলেছেন—

> *আমরা বুঝতে পেরেছিলাম লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ টিকবে না। ওরা টিকতে দেবে না। ওরা চায় না লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ থাকুক। কিন্তু আমাদেরকে তো নাট্য-আন্দোলন করে যেতেই হবে। অভিনয় ক'রেই যেতে হবে। তো লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ উঠে গেলে আমরা তখন কী করব?... তখন লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের সদস্য থাকাকালীনই আমরা 'বিবেক নাট্য সমাজ' শুরু ক'রে দিই।* [৪৭]

'লিট্‌ল থিয়েটারের' পাশাপাশি **১৯৬৯** সাল থেকে 'বিবেক নাট্য সমাজ' শুরু হল। অচিরেই উৎপল দত্ত-এর 'রাইফেল' নাটকটি 'বিবেক নাট্য সমাজ' নিয়ে যাত্রার কাজ শুরু করে দিল। 'লিটল থিয়েটার' ভাঙনের সময় উৎপল দত্ত যে জনবিচ্ছিন্নতার মুখোমুখি হয়েছিল তা অনেকটা অতিক্রম করার সুযোগ পেয়েছিলেন এই যাত্রার মধ্য দিয়ে। যাত্রার মধ্য দিয়েই শিল্পী হিসেবে তিনি হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে বাস্তবিক যোগাযোগ রক্ষা করতে পেরেছিলেন। 'রাইফেল' যাত্রাপালা হিসেবে এত বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছিল যে উৎপল দত্ত **১৯৬৯** সাল থেকে নাটক

লেখার পাশাপাশি নিয়মিতভাবে প্রতিবছর একটি করে নতুন যাত্রাপালা লিখতে শুরু করেন। এরপর নানা যাত্রা কোম্পানি উৎপল দত্তের লেখাগুলি নিয়ে অভিনয় করতে শুরু করল, পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন উৎপল দত্ত নিজেই, ফলে স্বাভাবিকভাবেই 'বিবেক নাট্য সমাজের কাজ অনেক কমে গেল। **১৯৭১** সালে 'বিবেক নাট্য সমাজ' নাম পালটে রূপান্তরিত হল 'পিপ্‌ল্‌স্‌ লিটল থিয়েটার'-এ।

> *কিন্তু তারপর যখন 'লিট্‌ল থিয়েটার' গ্রুপ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল আমাদের চোখের সামনে, ওরা মিনার্ভা থেকে চলে গেল, মিনার্ভা শ্রমিকদের হাতে চলে এল... তখন আমরা পিপ্‌ল্‌স্‌ লিট্‌ল থিয়েটার নাম নিলাম। লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের উত্তরাধিকার হিসাবে আমরা নামটা claim করলাম।* [৪৮]

১৯৭০ সালে লেনিনের জন্মদিনে 'লেনিনের ডাক' নাটকটি 'লিট্‌ল থিয়েটার মিনার্ভাতে' শেষ অভিনয় করেছিল। প্রচুর টাকার ঋণ মাথার উপর নিয়ে উৎপল দত্ত ও তার সহকর্মীরা বেরিয়ে এলেন 'লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ' থেকে। 'মিনার্ভা'কে বিদায় জানালেন। উৎপল দত্তের কাছে মিনার্ভা থিয়েটার'-এর দিনগুলি, সোনালী দিনগুলি স্মৃতি হয়ে গেল। লিটল থিয়েটার গ্রুপে নাটকের যবনিকা পতন ঘটল।

> *লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ নাট্য-আন্দোলন থেকে বিদায় নিল। কিন্তু ততক্ষণে তার গর্ভে জন্ম নিয়েছে পিপ্‌ল্‌স্‌ লিট্‌ল থিয়েটার।* [৪৯]

পিপ্‌ল্‌স্‌ লিট্‌ল থিয়েটার পর্ব :

'লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের' গর্ভে জন্ম নিয়েছিল 'পিপ্‌ল্‌স্‌ লিট্‌ল থিয়েটার। এই 'লিট্‌ল থিয়েটারের' আদর্শে অবিচল থেকে পথ চলা শুরু করল 'পিপ্‌ল্‌স্‌ লিট্‌ল থিয়েটার'। অর্থাৎ 'লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপের' বৈপ্লবিক আন্দোলন, 'লিটল থিয়েটার গ্রুপের' নাটক মার্কসবাদ, লেনিনবাদ আলোচনা প্রভৃতি আদর্শকে সামনে রেখে পিপ্‌ল্‌স্‌ লিট্‌ল থিয়েটার-এর পথ চলা শুরু। একথা স্মরণীয় যে উৎপল দত্ত যে সময় 'পিপ্‌ল্‌স্‌ লিট্‌ল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেসময় থেকে তিনি নিয়মিত যাত্রাপালার কাজ শুরু করেন পালাকার ও পরিচালক হিসেবে। একই সময়ে তিনি চলচ্চিত্র অভিনেতা হিসেবেও নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে উদ্যোগী হন। উৎপল দত্ত চলচ্চিত্রে অভিনয় শুরু করেছিলেন পঞ্চাশের দশক থেকে। তখন তিনি চলচ্চিত্রের নিয়মিত অভিনেতা ছিলেন না। 'মাইকেল মধুসূদন' ছবিতে অভিনয় করে ব্যাপক সাফল্যের পরেও তিনি চলচ্চিত্রে অভিনয় করার বিশেষ সুযোগ পাননি কারণ এই চলচ্চিত্রে অনেক ইংরেজি সংলাপ ছিল। তাই অনেকে ভাবতে

শুরু করলেন যেসব চলচ্চিত্রে চরিত্রের ইংরেজি সংলাপ আছে সেইরকম চরিত্র ছাড়া তার অভিনয় সম্ভব নয়। চলচ্চিত্রে তার কাজ না পাওয়ার আরেকটি কারণ হিসেবে উৎপল দত্ত বলেন—

> *পরিচালকদের ধারণা থিয়েটারের অভিনেতারা ফিল্মের পক্ষে অচল... এইসব পরিচালকেরা কোন খোঁজ রাখেন না, রাখার চেষ্টাও করেন না। ব্রিটেনের সব অভিনেতাই মঞ্চ থেকে এসেছেন। ... মঞ্চের অভিনেতা ফিল্মে অচল, এ এক অদ্ভুত ধারণা। এই ধারণায় আমার কাজ না পাওয়ার অন্যতম কারণ।* [৫০]

পরিচালকদের এইরকম ধরনের মানসিকতার ফলে উৎপল দত্তের মধ্যে যথেষ্ট প্রতিভা ও সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সেরকমভাবে চলচ্চিত্রে অভিনয় করে ওঠা হয়নি। তবে যে চলচ্চিত্রে ইংরেজি সংলাপ থেকেছে তখন উৎপল দত্ত-র স্মরণ নেওয়া হয়েছে। বেশিরভাগ চলচ্চিত্রে ইংরেজি সংলাপগুলো ডাক্তারের বা উকিলের মুখ দিয়ে বলানো হত। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ বাংলা ছবিতে উকিলের ভূমিকায় অভিনয় করে গেছেন। সে সময় সারা বছরে সেরকম কাজ পেতেন না বললেই চলে তবুও তিনি যতটুকু পেতেন ততটুকু নিষ্ঠার সঙ্গে তা পালন করতেন। তাকে কৌতুক করে বললে শোনা যায়—

> *আমি হয়ে গেলাম বাংলা ছবির ডাক্তার অথবা উকিল। আমি সতেরোটা ছবিতে পরপর উকিলের ভূমিকায় অভিনয় করেছি। ... একদিন জহর রায় আমাকে বললেন— উৎপল, তুই এবার আদালতে প্র্যাকটিশ শুরু কর। যে সতেরোটা ছবিতে উকিলের ভূমিকায় অভিনয় করতে পারে, সে ওকালতি করবার অবশ্যই অধিকারী।* [৫১]

চোদ্দ বছর অতিক্রান্ত করলেন, সারা বছরে হয়তো কাজ পেতেন সব মিলিয়ে দশ দিন। সত্তরের দশক থেকে উৎপল দত্তের পরিস্থিতি পালটাতে শুরু করে। ১৯৭০ সালে মৃণাল সেনের বিখ্যাত ছবি ‘ভুবন সোম’-এ অভিনয় করলেন এবং সেই অভিনয় সকলকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করে। তিনি শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে মনোনীত হন এবং শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার স্বরূপ উৎপল দত্ত ‘ভরত’ পুরস্কারে ভূষিত হন। এরপর ‘ফরিয়াদ’ ছবিতে অভিনয় করার পর তাকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি, উচ্চ প্রশংসিত হন তিনি। এইসময় থেকে তিনি বাংলা ও হিন্দি ছবিতে নিয়মিতভাবে অভিনয় শুরু করেন।

উৎপল দত্তের জীবনের সামগ্রিক দিক ও উৎপল মানসকে বোঝার জন্য চলচ্চিত্রের মতো যাত্রা সম্পর্কে সেই সময় তার ভাবনাচিন্তা কী ছিল তা নিয়ে সামগ্রিক আলোচনার প্রয়োজন। উৎপল দত্ত যাত্রা জগতে যুক্ত হওয়ার আগে মহলার কাজ চলত অবৈজ্ঞানিকভাবে। তখন—

যাত্রা পরিচালকের মাধ্যম ছিল না, প্রধান অভিনেতারাই যাত্রা নির্দেশনার কাজ চালাতেন। [৫২]

সেসময় পালা সৃজনে অভিনেতারা কোনোরকম শৃঙ্খলা নিয়ম মানতেন না তাদের মধ্যে সবসময় স্বেচ্ছাচারিতার ভাব প্রকট হয়ে উঠত। উৎপল দত্ত যাত্রায় এসে প্রথমেই নিয়ম শৃঙ্খলায় যাত্রাদলকে বাঁধলেন, মহলায় শুরু করলেন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিল্পীদের পাঠ মুখস্থ করা বাধ্যতামূলক করলেন, শিল্পীদের অভিনয় শিক্ষায় আগ্রহী করে তোলেন। পরিচালক হিসেবে উৎপল দত্ত যাত্রায় যোগ দেওয়ার পর যাত্রা শিল্পে এক আমূল পরিবর্তন লক্ষ করা গিয়েছিল। যাত্রার বহু নামিদামি অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা স্বীকার করেছিলেন—

এতদিনে একজন প্রকৃত গুরু পাওয়া গেল, একজন যথার্থ শিক্ষক পাওয়া গেল। [৫৩]

উৎপল দত্ত মনে করতেন যাত্রাপালায় যারা অভিনয় করেন তাদের দক্ষতা তাদের অভিনয় ক্ষমতা চলচ্চিত্র ও নাট্যশালার থেকে অনেক বেশি। তিনি তাদেরকে আরও উন্নত ও আধুনিক অভিনেতা হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে শুরু করলেন। কেননা উৎপল দত্ত মনে করতেন—

বাংলার শ্রেষ্ঠ অভিনেতা-অভিনেত্রীরা যাত্রাতেই আছে। তারা চলচ্চিত্রে নেই, তারা নাট্যশালায় নেই, তারা নাট্য-আন্দোলনে তো নেই-ই। তারা সব যাত্রায়। [৫৪]

উৎপল দত্ত যাত্রায় শৃঙ্খলা-নিয়মানুবর্তিতা প্রতিষ্ঠা করা এবং শিল্পীদের আধুনিক শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি তিনি যেটা করেছিলেন সেটা হল— রাজনীতিকে সরাসরি যাত্রায় নিয়ে আসা। কিন্তু অভিনেতা অভিনেত্রীরা রাজনৈতিক কথা বলতে ভয় পাচ্ছিলেন, তাদের মনে হচ্ছিল এর ফলাফল কী হবে, লোকে ভালোভাবে নেবে কিনা এসব নিয়ে তারা সংশয় প্রকাশ করছিলেন। প্রাথমিকভাবে সমস্যা হলেও উৎপল দত্ত যাত্রার মধ্যে এমন এমন বিষয় সংযোগ করেছেন, এমন কথাবার্তা বলেছেন তাতে যাত্রাপাত্রা আরও ভালোভাবে চলেছে। এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন—

অনেক পালা হতে শুরু করল যেগুলো প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক পালা।... এবং যাত্রার অভিনেতারা সফলভাবে অভিনয় ক'রে সে-পালাগুলোকে Hit করালেন। [৫৫]

উৎপল দত্ত যাত্রা জগৎকে রাজনৈতিক চেতনা দেওয়ার পর দুটি বিষয়ের উপরে বিশেষ করে নজর দিলেন— প্রথমত শিল্পের অর্থাৎ শিল্পের ঘটনাবলি দেশীয় ভাবাবেগের সঙ্গে জড়িত থাকবে। দ্বিতীয়ত, যাত্রার কলাকুশলীদের সহজ সরল ভাষার ব্যবহার ও কৌশল, যাতে জনগণের সঙ্গে অতি সহজভাবে সংযোগ স্থাপন করা যায়। তিনি মনে করতেন শিল্প-সাহিত্যের বিষয়বস্তু

সব সময় বৈপ্লবিক হওয়া প্রয়োজন এবং তার আঙ্গিক হবে একান্তভাবে জাতীয়। মার্কসবাদী হিসেবে উৎপল দত্ত দেশীয় বৈপ্লবিক কাহিনি, বিভিন্ন আন্দোলনকে যাত্রায় আনার চেষ্টা করলেন, যাতে সেই বৈপ্লবিক কাহিনি ও সংগ্রামের কাহিনি অতি সহজেই মানুষের মধ্যে প্রচার করা যায় ও সামনে তুলে ধরা যায়। যাত্রার অভিজ্ঞতা থেকে তিনি লিখেছেন—

> *জাপানিদের কাছে বিপ্লবের বার্তা হয়তো কাবুকি-মারফৎ সবচেয়ে দ্রুত পৌঁছে দেয়া যাবে, বাংলার মানুষের কাছে যাত্রায়, আর দক্ষিণ ভারতে নৃত্য মারফৎ, মহারাষ্ট্রে তামাশায়, উত্তরপ্রদেশে নৌটংকিতে, গুজরাটে ভাওয়াইয়ে।* [৫৬]

যাত্রার উপাদান যেহেতু দেশজ তাই ভরপুর, বিভিন্ন বৈপ্লবিক কাহিনিকে কেন্দ্র করে যাত্রা নির্মিত হওয়ার জন্য উৎপল দত্ত ভাবছিলেন—

> *যাত্রার উপাদানকে থিয়েটারে নিয়ে আসা প্রয়োজন।* [৫৭]

তিনি থিয়েটার ও যাত্রাকে মেলানোর লক্ষে ধাবিত হলেন যাত্রাও থিয়েটারকে এক করা যায় কিনা তা নিয়ে মৌলিক ও নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছেন দীর্ঘ সময় ধরে। বলাবাহুল্য তিনি এই নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে গেছেন কীভাবে যাত্রা ও থিয়েটারের মেলবন্ধন ঘটানো যায়। এই প্রচেষ্টার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ তার বিখ্যাত নাটক 'টিনের তলোয়ার'।

পিপ্‌ল্‌স্ লিট্‌ল্ থিয়েটার স্বমহিমায় আত্মপ্রকাশ করেন 'টিনের তলোয়ার' নাটকটি নিয়ে। এ নাটকটি ১৯৭১ সালে মঞ্চস্থ হয়েছিল। এটা বোধহয় উৎপল দত্তের সবচেয়ে উপভোগ্য ও আকর্ষণীয় নাটক। বাংলা নাটকের ঐতিহ্যকে নিয়েই মূলত এ নাটকটি লেখা হয়। শুধুমাত্র অতীতের স্তুতি ও মহিমা কীর্তন করা নয়, রাজনৈতিক থিয়েটার ও রাজনৈতিক নাট্য আন্দোলনে উন্মেষ লগ্নের কাহিনি শুনিয়ে ছিল 'টিনের তলোয়ার'। এ নাটকে তিনি বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে অতীতকে মূল্যায়নের প্রবৃত্ত হলেন। বঙ্গীয় নাট্যশালার জন্ম দিনের সময়কার সামাজিক দ্বন্দ্ব ও তৎকালীন সমাজের চিন্তা ও বিভিন্ন সংঘর্ষগুলিকে অতি নিবিড়ভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করলেন আলোচ্য নাটকে। উনিশ শতকে ব্রিটিশ শাসন কীভাবে বিদ্রোহী নাটকের কণ্ঠ রোধ করেছিল এবং পিষে মারার চেষ্টা করেছিল এবং তার মধ্য থেকে কীভাবে বাংলা নাট্যশালা এই নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সদর্পে রুখে দাঁড়িয়ে ছিল তারই এক অবিস্মরণীয় সত্যনিষ্ঠ আলেখ্য টিনের তলোয়ার।

এরপর উৎপল দত্ত পরপর প্রযোজনা করলেন 'ব্যারিকেড' ১৯৭২ সালে। যেটি ১৯৭২ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস অত্যাচারকে জার্মানির পটভূমিকায় তুলে ধরা হয়েছিল। 'ব্যারিকেডের'

পরের নাটক ছিল ‘টোটা’ এটি প্রযোজনা করেছিলেন ১৯৭৩ সালে। ১৮৫৭ সালের ভারতীয় মহাবিদ্রোহের পটভূমিকায় উৎপল দত্ত এই নাটকটি লিখেছিলেন। ১৯৭৪ সালে তিনি প্রযোজনা করলেন ‘দুঃস্বপ্নের নগরী’। এই নাটকটি পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সন্ত্রাসের এক প্রামাণ্য ইতিহাস। ১৯৭১-৭৪ সালে ঘটে যাওয়া কংগ্রেসি সন্ত্রাসকে এ নাটকে উৎপল দত্ত তুলে ধরেছেন। এই নাটক এমন প্রভাব পড়েছিল যে যখনই নাটকটি অভিনীত হচ্ছিল তখনই আক্রান্ত হচ্ছিল। উৎপল দত্তের কথায়—

> *নাটকটা কার্যত ব্যান্‌ড হয়ে গেছিল। তা বলে থামেনি। অভিনয় হত। অন্য নামে। ‘কলকাতার কড়চা’, কত রকম নাম। পশ্চিমবঙ্গে বহু জায়গায় অভিনয় হয়ে গেল। শুধু নামটা পালটে দিত স্থানীয় কমরেডরা।* [৫৮]

১৯৭৫ সালের জুন মাসে জরুরি অবস্থা জারি হয় ভারত জুড়ে। এই জরুরি অবস্থার পটভূমিতে উৎপল দত্ত লেখেন ‘এবার রাজার পালা’ ১৯৭৫ সালে। ‘তিতুমীর’ নাটক মঞ্চস্থ করলেন ১৯৭৮ সালে। এইসময় কেন্দ্রে ক্ষমতায় ছিল অকংগ্রেসি সরকার যাদের সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হত। এই সময় যেসব নাটক তিনি প্রযোজনা করেছিলেন সেগুলির মধ্যে স্পষ্ট স্বৈরতন্ত্র বিরোধী ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী ভাবনা পরিলক্ষিত হয়। ‘তিতুমীর’ সেই ধরনের সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী নাটক, যার বিষয়বস্তু ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বাংলার মুসলিমদের আপসহীন সংগ্রাম।

১৯৮৩ সাল ছিল কাল মার্কস-এর মৃত্যু শতবর্ষ। কাল মার্কস-এর মৃত্যু শতবর্ষকে উপলক্ষ্য করে ও কাল মার্কসের জীবনের একটি বিশেষ অধ্যায়কে অবলম্বন করে উৎপল দত্ত নাটক লেখেন ‘শৃঙ্খল ছাড়া’ ১৯৮৩ সালে। নাটক সৃষ্টি হয়েছিল জার্মানির একটি পরিবহনকে অবলম্বন করে। ১৯৮৪ সালে উৎপল দত্ত লেকেন ‘কুশপুত্তলিকা’। এই নাটকে উৎপল দত্ত মার্কসবাদের বিচ্ছিন্নতা তত্ত্বের অসামান্য প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। তিনি উন্মোচন করেছেন ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণির নগ্ন চেহারা। ‘আজকের শাজাহান’ প্রযোজনা করেন ১৯৮৫ সালে। এ নাটকের বিষয়বস্তু ছিল এক নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ অভিনেতার জীবন আলেখ্য। ১৯৮৮ সালের শেষের দিকে উৎপল দত্ত প্রযোজনা করলেন সমাজ সংস্কাররমূলক নাটক ‘অগ্নি সজ্জা’। রাজা রামমোহন রায়ের সমাজের বিরুদ্ধে যে কুসংস্কার বিরোধী সংগ্রাম ছিল তা অবলম্বন করে উৎপল দত্ত এই নাটকটি রচনা করেন। ১৯৮৯ সালে উৎপল দত্ত প্রযোজনা করেন ‘নীল সাদা লাল’ নামক নাটকটি। এটি ফরাসি বিপ্লবের দ্বিশত বর্ষ উপলক্ষ্যে রচনা করেন। ১৯৮৯ সালের শেষ দিকে উৎপল দত্ত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নাটক প্রযোজনা করেন ‘একলা চলো রে’। দেশভাগের চক্রান্ত ও মহাত্মা গান্ধির

হত্যার ঘটনা নিয়ে এই নাটকটি তিনি রচনা করেন। ১৯৯০ সালে লিখলেন 'লাল দুর্গ' নামক নাটক। এই নাটকের পটভূমিকা হিসেবে আমরা দেখি লিভোনিয়া নামক একটি কাল্পনিক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। লিভোনিয়া আসলে রোমানিয়া। রোমানিয়া রাষ্ট্রপতি চেসেস্কু সমাজতন্ত্রের শত্রুর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন, ফলস্বরূপ চেসেস্কু ও তার স্ত্রীর করুণ পরিণতি আলোচ্য নাটকে দেখানো হয়েছে। ১৯৯১ সালে তার শেষ নাটক লেখেন 'জনতার আফিম'। উন্মত্ত সাম্প্রদায়িক অন্ধকার পরিবেশের বিরুদ্ধে লিখলেন এই নাটকটি। কিছু কিছু সুযোগ সন্ধানী ও সুবিধাবাদী মানুষ ধর্মকে আফিমের নেশার মতো কাজে লাগায় নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করার জন্য— সে কথাই উৎপল দত্ত এই নাটকে বলার চেষ্টা করেছেন।

উৎপল দত্তের শেষ অভিনয় ৩ আগস্ট ১৯৯৩ সালে কলকাতার রবীন্দ্রসদন মঞ্চে। 'একলা চলো রে' নাটক গান্ধিবাদী নেতা অনাথবন্ধু চক্রবর্তীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। এরপর থেকে তিনি আর কোনো নাটক রচনা করেননি ও অভিনয় করেননি কারণ শরীর তার সাথ দিত না। এসময় প্রকৃতপক্ষে উৎপল দত্ত খুবই অসুস্থ ছিলেন, তাঁর ব্লাডপ্রেসার, ডায়াবেটিসের সমস্যা তো ছিলই তারই সঙ্গে সঙ্গে ব্লাডপ্রেসার, স্নায়বিক সমস্যা, কিডনির সমস্যা, চোখের সমস্যায় জর্জরিত ছিলেন।

> *ইতিমধ্যে ওইদিকে শতকরা সত্তর ভাগ রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে আছে, ... ডাক্তারদের মত, দশ মিনিটেই জীবন শেষ হয়ে যেতে পারে, আবার দশ বছরও বাঁচতে পারে।* [৫৯]

শারীরিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তিনি নিরলসভাবে প্রতিবিপ্লবের মতো জটিল পরিশ্রমসাধ্য গ্রন্থ লিখেছিলেন ১৯৯৩ সালে যা আমাদের অবাক করে। অভিনয়ের মধ্যেই তিনি সারাটা জীবন কাটিয়ে দিয়েছিলেন। ক্লান্তি এসেছে, অবসাদ এসেছে, শরীর অসুস্থ হয়ে পড়েছে, কখনো কখনো কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছেন, বিনা বিচারে বন্দি অবস্থায় জেলে কাটিয়েছেন, রাজনৈতিক মতভেদের শিকার হয়েছেন, পুলিশ ও গুণ্ডার নির্যাতন সহ্য করেছেন। এতকিছু সামলে নিয়ে তিনি বারে বারে থিয়েটারের অভিনয়ের জগতে ফিরে এসেছেন, নাটক লিখেছেন, নাটক পরিচালনা করেছেন শত বাধা সত্ত্বেও নাটকের অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছেন। সমস্ত জীবনব্যাপী নাট্য সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। থিয়েটারই ছিল তার জীবনের প্রথম ও শেষ আস্তানা। শেষের দিকে তার শরীর অবসন্ন ও বেহার হয়ে পড়েছে, শেষ সময় ডাক্তারের কাছে কাতরভাবে অভিনয় করার জন্য অনুনয়-বিনয় করেছেন। 'আজকের শাহজাহান' নাটকের কুঞ্জ বিহারীর সংলাপ—

> *নাটক আমার জীবন, নাটক না করতে পারলে আবার বেঁচে থেকে লাভ কী?* [৬০]

এ সংলাপ যেন উৎপল দত্তের একান্ত মনেরই কথা।

কারাবাস ও মুচলেকা প্রসঙ্গ

নাটকের মধ্যে গণমানুষের স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে উৎপল দত্ত দু'বার কারারুদ্ধ হয়েছেন। প্রথমবার কারারুদ্ধ হন ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে নৌবিদ্রোহ কেন্দ্রিক নাটক 'কল্লোল'-এর জন্য। দ্বিতীয়বার কারারুদ্ধ হন ১৯৬৭ সালে উত্তরবঙ্গের আদিবাসী কৃষক বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে লেখা 'তীর' নাটকের জন্য। 'কল্লোল' নাটকে স্বাধীনতা সংগ্রামী নাবিক, মজুতদের বীরত্ব কথা যেমন উৎপল দত্ত তুলে ধরেছেন সেই সঙ্গে বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহী বেইমান কংগ্রেসি শাসকদের মুখোশ খুলে ফেলেছেন, তাদের দেশদ্রোহিতার কথা উন্মোচন করেছেন। 'কল্লোল' নাটক এতটাই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, গ্রাম-গঞ্জ-মফস্‌সল থেকে মানুষের ঢল নামত প্রতিনিয়ত। ফলে শাসকশ্রেণির নেতারা যেনতেন প্রকারে 'কল্লোল'-কে স্তব্ধ করে দিতে বদ্ধ পরিকর হয়ে উঠেছিল। তাদের নিয়োজিত গুণ্ডাদের দ্বারা বিভিন্নভাবে ভীতি প্রদর্শন করে 'কল্লোল'-কে বন্ধ করতে অতি সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু 'কল্লোল' তথা মিনার্ভা থিয়েটারকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল সি পি আই (এম)। ফলে শাসক দলের পরিকল্পনা ও অভিপ্রায় ব্যর্থ হল। শাসকগোষ্ঠী এবার ব্যর্থ মনোরথে 'কল্লোল'-কে ও মিনার্ভাকে তছনছ করে দিতে অন্য পথের আশ্রয় গ্রহণ করে। এক সাক্ষাৎকারে উৎপল দত্ত জানিয়েছেন—

> ''কল্লোল'-কে উঠিয়ে দেবার জন্য ওরা একেবারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিল। কিছুতেই যখন বন্ধ করা যাচ্ছে না, কোনো আইন হাতে নেই, তখন ওরা ...চেষ্টা করলো আমাকে গ্রেপ্তার ক'রে যদি থামানো যায়।''[৬১]

ছলে-বলে-কৌশলে উৎপল দত্তকে গ্রেপ্তারের জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করা ছাড়া তাদের আর উপায় ছিল না। সেইসময় উৎপল দত্তের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার নানা মিথ্যা উপাদান সংগ্রহ করে নাটকগোষ্ঠী এবং উৎপল দত্তকে গ্রেপ্তার করার প্রস্তুতি নিতে থাকল কংগ্রেসি শাসক দল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল মিনার্ভা থিয়েটারের অন্যান্য কর্মীদের হুমকি ও বিভিন্ন ভুয়ো ফোনে উৎপাত। উৎপল দত্তের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হল ও শেষে বিভিন্ন ইনফরমার সূত্রে ও খবর পেয়ে পুলিশ উৎপল দত্তকে গ্রেপ্তার করে। — ''অবশেষে '৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে আমি বিনা বিচারে কারারুদ্ধ হই।''[৬২]

উৎপল দত্ত কারারুদ্ধ হয়ে রইল বিনা বিচারে। এমতবস্থায় 'লিট্‌ল থিয়েটার'-এর অন্যতম প্রধান চিন্তা হয়ে দাঁড়াল কীভাবে 'কল্লোল' নাটকের অভিনয় চালিয়ে যাওয়া যাবে ও মিনার্ভা থিয়েটারকে রক্ষা করা যাবে। কলাকুশলীদের মধ্যে অনেক আলাপ আলোচনার পর গ্রুপের মিটিং-

এ স্থির হল 'কল্লোল' নাটক যেমন চলছে তেমনই চলবে— কোনভাবেই আত্মসমর্পণ করা চলবে না। 'কল্লোল' নাটকের প্রধান চরিত্র সার্দুল সিং-এর ভূমিকায় অভিনয় করতেন শেখর চট্টোপাধ্যায়। তার কাছে নানারকম হুমকি ও উড়ো ফোন আসা সত্ত্বেও এবং গ্রেপ্তারের ভীতিপ্রদর্শন করার পরেও তিনি অভিনয় চালিয়ে গেলেন মানসিক দৃঢ়তার সঙ্গে। 'কল্লোল' নাটক করার জন্য কারাবাসের পরিপ্রেক্ষিতে উৎপল দত্ত লিখলেন—

> "শাসক শ্রেণির কুৎসা চিরদিন পার্টির তথাকথিত দেশদ্রোহিতার বিশ্লেষণেই মূঢ়ভাবে সীমাবদ্ধ। নানা নাটক মারফৎ ইতিহাসের নানা ঘটনা তুলে ধরে কমিউনিস্ট পার্টির ত্যাগ ও আপসহীন লড়াইয়ের কথা তুলে ধরতে হবে। পক্ষান্তরে কংগ্রেসের অবিচ্ছিন্ন ও নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতার ধারাটাকেও সবলে ছুঁড়ে মারতে হবে কুৎসাকারীদের মুখে। স্বভাবতই ধনিকশ্রেণির পত্রিকাগুলো শৃগাল রবে সোচ্চার হল। তবে নেহাৎই গণ্ডমূর্খ বলে সমালোচকেরা যুৎসই কোনও জবাব পেলেন না, মূর্খতাই প্রকাশ করতে লাগলেন। তবে মূল সুরটি স্পষ্ট— এ-নাটকের অভিনয় বন্ধ করা উচিত, পুলিশ ঘোড়ার ঘাস কাটছে কেন?... সবচেয়ে ন্যাক্কারজনক ভূমিকায় অবতীর্ণ হল শোধনবাদী সিপিআই। লালঝাণ্ডাকে কেন নাটকে এত সম্মান দেখানো হয়েছে এমন প্রশ্ন তুলল না, কংগ্রেসী মাস্তানরা নয়— সিপিআই-এর সব পত্রপত্রিকা। কলকাতা-দিল্লী-বোম্বাই থেকে। নিজেদের অতীতকেও আর সহ্য করতে পারছিলেন না পুঁজিপতির এই লাল ঝাণ্ডাধারী কেরানিরা। তাঁরা সমস্বরে পুলিশকে উস্কানি দিতে লাগলেন গ্রেপ্তার ও নিষিদ্ধকরণে।"[৬৩]

উৎপল দত্তের গ্রেপ্তারের পর জোছন দস্তিদারকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাটকটি প্রকাশের জন্য। স্টেট্সম্যান ছাড়া সব ধরনের পত্রিকায় লিট্‌ল থিয়েটারের বিজ্ঞাপন নিষিদ্ধ করা হয় সুপরিকল্পিতভাবে। এত অত্যাচার, ভীতিপ্রদর্শনের পরেও সিপিএমের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে এক ব্যাপক আন্দোলন 'কল্লোল'-এর সমর্থনে। গ্রাম থেকে শহরে 'কল্লোল' নাটকের সমর্থনে পোস্টারে ভরে যায়। কমরেডরা মুখে মুখে বিভিন্ন পথসভা করে ও প্রচার চালিয়ে যেতে থাকেন। সমস্ত শিল্পী কলাকুশলী, সমস্ত প্রকার হুমকি মস্তানদের দেখানো মৃত্যুভয় সমস্ত বাধাবিপত্তি তুচ্ছ করে নাটকে অভিনয় করে যেতে থাকেন। এইসময় কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে মিনার্ভা পর্যন্ত বিশাল মশাল মিছিল করে গণনাট্যের শিল্পীরা। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, মলয় মুখোপাধ্যায়, সান্তনু বোস প্রভৃতি কলাকুশলীর দুঃসাহসিক আদর্শে 'লিট্‌ল থিয়েটার' স্বমহিমায় চলতে থাকল আর দিনের পর দিন শ্রমিক ও ছাত্ররা সদা পাহারায় নিযুক্ত থাকলেন সরকারি গুণ্ডাদের প্রতিরোধে। সর্বপ্রকার ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত ও বলপ্রয়োগকে ব্যর্থ করে কল্লোল নাটক এক নাগাড়ে চলেছিল ৮৫০ রাত্রিব্যাপী।

উৎপল দত্ত জেলখানায় থাকাকালীন দুটি নাটিকা অভিনয় করেছিলেন— 'কঙ্গর কারাগারে' ও স্তালিনের জন্মদিন উপলক্ষ্যে 'লৌহমানব'। নাটক দুটি অভিনীত হয় ওই বছরেই ৭ নভেম্বর। জোছন দস্তিদার ও ছাত্র ফেডারেশনের কয়েকজন কমরেড মিলে অভিনয় করেছিলেন। উৎপল দত্তের মুক্তির দাবিতে এবং 'কল্লোল' নাটকের সমর্থনে শুধুমাত্র দেশে নয় বিদেশেও সংস্কৃতির জগতে বিশেষ সাড়া পড়েছিল। সোভিয়েত রাশিয়ান কবি দোলমাতোভ্স্কি, জার্মান বিশিষ্ট নাট্যকার ফন কুবা ও জার্মান পরিচালক হান্স্ পের্টেন লন্ডনে ওয়াল্টার নান মার্কিন আন্ডারগ্রাউন্ড থিয়েটারের জোসেফ সেলবি 'কল্লোল' ও উৎপল দত্তের সমর্থনে বিশেষ বিবৃতি প্রদান করেন।

১৯৬৬ সালে সারা পশ্চিমবঙ্গব্যাপী খাদ্যের তীব্র সংকট দেখা দেয়। চারিদিকে শুরু হয় আন্দোলন ও বিদ্রোহ। ১৯৬৬-র মার্চ মাসেই এই খাদ্য আন্দোলনের সংগ্রামে জনগণ সরকারের উপরে চড়াও হয় ও সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। তারা সমস্ত রাজবন্দিকে ছিনিয়ে আনলেন কারাগার থেকে। তাদের সঙ্গে উৎপল দত্তও মুক্তি লাভ করেন। ৭ মে মনুমেন্টের ময়দানে 'কল্লোল' নাটকের সাফল্য উপলক্ষ্যে কল্লোল বিজয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। কমপক্ষে পাঁচ লক্ষ মানুষের সমাবেশ ঘটে ও তাদের সামনে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে ও নেতৃত্ববৃন্দকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় যারা 'কল্লোল' ও মিনার্ভাকে বাঁচিয়ে রাখতে আপ্রাণ পরিশ্রম করেছিলেন। মনুমেন্টের ময়দানে সেই বিজয় উৎসব অনুষ্ঠানে উৎপল দত্ত লিখেছেন—

> "মিছিল আসছিল চারদিক থেকে। রবীন্দ্রনাথের 'কিষাণের জীবনের শরিক যে জন' উদ্ধৃতি বিরাট পোষ্টারে লিখে বহন করে আনছিলেন সাংস্কৃতিক কর্মীরা। রোবসনের চিত্র আনছিলেন আরেক দল। গোর্কির শ্রমকঠিন মুখ জেগে ছিল আরেক মিছিলের মাথায়। ... আর নানা সহযোগী নাট্যসংস্থা ফুলে ফুলে ভরে দিলেন মঞ্চ ও আমাদের মন।"[৬৪]

উৎপল দত্ত দ্বিতীয়বার কারারুদ্ধ হন ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে 'তীর' নাটকের জন্য। উত্তরবঙ্গে নকশালবাড়ি বিদ্রোহ শুরু হয় ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে। তখন পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমল। যুক্তফ্রন্ট সরকারের নির্দেশে উত্তরবঙ্গের প্রসাদুজ্যোতে আদিবাসী কৃষকদের ওপরে নৃশংস পুলিশের গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উৎপল দত্ত 'তীর' নাটক করা জন্য মনস্থির করেছিলেন। নকশালবাড়ির আন্দোলনের শুরু থেকেই উৎপল দত্তের মধ্যে অতি বাম রাজনৈতিক আদর্শ ও অতি বাম রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন। নকশালবাড়ি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে মতভেদ শুরু হয় ও ক্রমে বাড়তে থাকে। ফলস্বরূপ ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে ১লা মে কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙে দ্বিখণ্ডিত হয় ও নতুন রাজনৈতিক দল কমিউসিস্ট পার্টি (মার্কসিস্ট-লেনিনিস্ট)। এই রাজনৈতিক দলের নেতা

ছিলেন চারু মজুমদার, জঙ্গল সাঁওতাল, কানু সান্যাল, সুশীতল রায়চৌধুরী প্রমুখ ব্যক্তিগণ। উৎপল দত্ত এই নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হন এবং মুক্তিকামী মানুষের স্বার্থে এই আন্দোলনকে যথার্থ বলে তিনি মনে করেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল সি পি আই (এম)-এর গণমানুষের মঙ্গলসাধানার্থে বৈপ্লবিক সত্তা স্তিমিত হয়ে আসছে। ফলে নকশালবাড়ির সশস্ত্র কৃষক অভ্যুত্থানের ঘটনাকে সরাসরি সমর্থন করেন এবং নকশাল আন্দোলনের সমার্থক হয়ে উঠলেন।

উৎপল দত্ত আদ্যন্ত মার্কসবাদে বিশ্বাসী হলেও, বামপ্রগতিশীল রাজনীতির একনিষ্ঠ সমর্থক হলেও কখনো কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে এভাবে ইতিপূর্বে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেননি। কিন্তু ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে নকশালবাড়ি আন্দোলনের ফলে উৎপল দত্ত একেবারে সর্বক্ষণ রাজনৈতিক কর্মীর মতো নকশাল বাড়ির রাজনীতির ধারক ও বাহক হয়ে পড়লেন। সেকথা উৎপল দত্ত নিজেই স্বীকার করেছেন—

> "After Din Badaler Pala begins my period of political deviation, crudle mistakes, insufferable arrogance. I sided with the growing circle of left-extremists within the CPI (M), who began to swear by immediate armed insurrection. Where the arms would come from nobody appeared to know."[৬৫]

'তীর' নাটক মঞ্চস্থ করার বিষয়ে 'লিটল থিয়েটার গ্রুপ'-এর অনেকের মধ্যে নানা মতভেদ ছিল, সবাই উৎপল দত্তের সঙ্গে সহমত পোষণ করেননি। উৎপল দত্তের নকশালবাড়ি সম্পর্কে অতি উৎসাহকে সংযত হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। অনেকে এই অতি বাম রাজনৈতিক লাইন নেওয়া ঠিক হচ্ছে কিনা, সে বিষয়ে উৎপল দত্তকে আরও গভীরভাবে ভেবে দেখার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু উৎপল দত্তের স্পষ্ট ভাষার ঘোষণা ছিল—

> "There are no lies in "The Arrow". I never deliberately lie in my plays. The heroism of the peasants and the wanton brutality of the police are true; it was a moment in class-struggle, a focussed hour of history, an enplosion of class-conflict in utter nakedness, without any of the disguises and apparent truce which are the necessary daily excercise of peasant associations."[৬৬]

'তীর' নাটক যেহেতু যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে তাদের বলগাহীন অত্যাচারের কথা তুলে ধরেছিলেন, স্বাভাবিকভাবেই উৎপল দত্ত কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়ের সরকারের শত্রুতে পরিণত হন। 'তীর' নাটকের মহড়া চলাকালে উৎপল দত্তের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি হয় ১২ নভেম্বর। তিনি আত্মগোপন করেন। ফলে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় সহকারী পরিচালক হিসেবে 'তীর' নাটকের

অভিনয় চালিয়ে যেতে থাকেন। ১২ নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত উৎপল দত্ত আত্মগোপন করে থাকায় তাঁকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারেনি। শেষপর্যন্ত তিনি স্বেচ্ছায় পুলিশের হাতে ধরা দিয়েছিলেন। তাঁর স্মৃতিমূলক প্রবন্ধ 'লিট্‌ল থিয়েটার ও আমি'তে তিনি বলেছেন—

> "অর্থাৎ আমি ধরা দিই স্বেচ্ছায়। বেলা দুটো থেকে পরদিন ভোর পর্যন্ত ক্রফোর্ড মার্কেটে গোয়েন্দা পুলিশের সদর দপ্তরে আমাকে জেরা করা হয়। সেসব ভয়ঙ্কর প্রশ্ন, মনে হচ্ছিল বোম্বাই-এর পুলিশ আমাকে কোনো সশস্ত্র অভ্যুত্থানের নেতা বলে ঠাউরেছেন। মাঝে মাঝে হেসে ফেলেছিলাম। আমি যে একজন সামান্য অভিনেতা এটা বোঝানো দায় হয়ে উঠেছিল। প্লেনে চড়িয়ে আমাকে নিয়ে এল কলকাতায়, দমদম থেকে সোজা দমদম জেলে।"[৬৭]

১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে উৎপল দত্ত যখন 'তীর' নাটক প্রযোজনার জন্য গ্রেপ্তার হলেন তখন তিনি ব্রিটিশ প্রযোজক 'গুরু' নামক চলচ্চিত্রের অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। প্রযোজক ছিলেন ইসমাইল মার্সেন্ট এবং জেম্‌স আইভরি। 'গুরু' চলচ্চিত্রের অভিনয় মহড়া যখন প্রথমে চলছিল তখন বোম্বে অবস্থানরত উৎপল দত্তকে ২৪ ডিসেম্বর রাতে মুম্বাইয়ের তাজ হোটেল থেকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ২৬ ডিসেম্বর কলকাতার দমদম জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। উৎপল দত্তের গ্রেপ্তারির কারণে 'গুরু' চলচ্চিত্রের প্রযোজক ও কর্তা ব্যক্তিরা মহাসংকটের সম্মুখীন হন। ফলে ১৯৬৮ সালে প্রযোজক ইসমাইল মার্সেন্ট কলকাতায় এসে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের চুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে চলচ্চিত্র অভিনয়ের শর্তের ধারা অনুসারে উৎপল দত্তকে কারামুক্ত করেন। কিন্তু সরকারের লোকজন কাগজে সই করতে না করতেই রেডিও মারফত প্রচার করে দেয় উৎপল দত্ত মুচলেকা দিয়েছেন। তাঁর কারামুক্তি ও 'গুরু' ছবিতে অভিনয় নিয়ে শত্রুরা অনেক কুৎসা করেছেন। প্রচার করেছেন তিনি আর কখনো রাজনৈতিক নাটক করবেন না এই শর্তে মুচলেকা দিয়েছেন। উৎপল দত্ত উপলব্ধি করেছিলেন 'তীর' নাটকের জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়নি, হয়েছিল অন্য কারণে, এর পিছনে ছিল শত্রু ও সরকারের এক গভীর ষড়যন্ত্র। উৎপল দত্ত তাঁর কারামুক্তি ও শত্রু দ্বারা প্রচারিত কুৎসার বিষয়ে বলেছেন—

> "মুক্তির প্রক্রিয়াটাও যেভাবে প্রচারিত সেরকম ঘটেনি। ফিল্ম কোম্পানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ অভিনেতার একদিন যেমন হাত বাঁধা থাকে, অন্যদিকে তার একটা সুযোগ থাকে অত্যাচার এড়াবার, বিশেষত যদি সেটা হয় বিরাট আন্তর্জাতিক কোম্পানি যারা প্রধানমন্ত্রীর ওপরও চাপ সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু সেই যে শত্রুর খিল খিল হাস্যসহ আস্ফালন, উৎপল দত্ত লিখে দিয়েছেন আর রাজনৈতিক নাটক করবেন না— তার জবাবে বলি, কাঁচকলা খাও। কিন্তু শত্রুর অপপ্রচারে লিট্‌ল থিয়টার টলেনি।"[৬৮]

মুচলেকা বিষয়ে উৎপল দত্তের বিরুদ্ধে তাঁর শত্রুরা ও সরকার পক্ষ থেকে এতটাই

অপপ্রচার ও তাঁর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল যে, উৎপল দত্তের জন্য শোভা সেনকে লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। উৎপল দত্ত ও শোভা সেনের অবর্তমানে লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপটিতে নানা সংকট দেখা দিল, তাদের অবর্তমানে বিপন্ন হয়ে পড়েছিল লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ। ফলত, শোভা সেনকে লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ থেকে যারা বহিষ্কার করে ছিল, তারাই আবার তাঁকে দলে ফিরিয়ে নিয়েছিল। তারা গভীরভাবে অনুধাবন করতে পেরেছিল যে শোভা সেন ও উৎপল দত্ত ছাড়া থিয়েটার চালু রাখা কোনোভাবেই সম্ভব নয়, তাই তাদের বহিষ্কারের নির্দেশ প্রত্যাহার করে স্বমহিমায় তাদের দলে আহ্বান করা হয়। বলা বাহুল্য, উৎপল দত্ত মুচলেকা কি দিয়েছিলেন বা কি লিখেছিলেন তা আজও রহস্যাবৃত ও অজানা। উৎপল দত্তের মুচলেকা প্রসঙ্গে শোভা সেন লিখেছেন—

> "এর জন্য উৎপলকে শুধু লিখে দিতে হল, এই শুটিং চলাকালীন উৎপল আর কলকাতায় আসতে পারবে না, কোন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেও জড়াবে না। প্রযোজকদের ক্ষতির কথা ভেবে এই সাময়িক আপস করতে আমাদের কিছু খারাপ মনে হয়নি। কারো সঙ্গে কনট্রাক্ট সই করলে সেখানেও একটা দায় থাকে। কিন্তু ব্যাপারটা যত সহজ ভেবেছিলাম ততটা সহজ হল না।"[৬৯]

উৎপল দত্তের মুচলেকা বিষয়ে তাঁর শত্রুদের যে অপপ্রচার ছিল, তা সর্বৈব মিথ্যা রটনা। কারণ তিনি কারাবাস শেষে মুচলেখা দিয়েও 'তীর' নাটক চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন কলকাতায়। মুচলেকা দেওয়ার পর জেল থেকে মুক্ত হয়ে তিনি লিখলেন 'মানুষের অধিকারে' নাটক ও প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করলেন, পরিচালনাও করলেন। এর পরবর্তী নাটকগুলি হল 'লেনিনের ডাক', 'যুদ্ধং দেহি', 'বর্গি এল দেশে' (পথনাটক) ইত্যাদি। যার মধ্যে সরাসরি রাজনীতির প্রসঙ্গ এসেছে ও রাজনীতির কথাই বলেছেন। এ থেকেই সহজেই অনুমেয়, উৎপল দত্ত রাজনৈতিক নাটক না করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যদি মুচলেকা দিতেন, তাহলে ফিরে এসে আবার নিশ্চয় রাজনৈতিক নাটক রচনায় ব্রতী হতেন না। উৎপল দত্তের দীর্ঘদিনের সহযোদ্ধা, অভিনেতা এই মুচলেকা সম্পর্কে জানিয়েছেন—

> "মুচলেকা দিয়ে কারামুক্তির সম্বন্ধে যা শোনা যায়, ওটার কোনো প্রমাণ নেই। কিন্তু মুচলেকার ব্যাপারটা কেউ আজ পর্যন্ত প্রমাণ করতে পারলেন না। যেটা আমি জানি, সেটা হচ্ছে এই যে, কোটি কোটি টাকার ইনভলভমেন্ট ছিল যাদের এখানে [গুরু চলচ্চিত্র নির্মাতাদের], তারা সরাসরি গেলেন ইন্দিরা গান্ধীর [তৎকালীন কংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী] কাছে, সত্যজিৎ রায়ের কাছে। এবং রিলিজটা করে নিলেন যাতে কাজটা করে নিতে পারেন। মুচলেকায় কি ছিল তা আজ পর্যন্ত বেরুল না কিন্তু। ছাপাও হলো না মাঝখান থেকে আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল।"[৭০]

শারিরীক বিপর্যয়

১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৪৭ বছর বয়সে উৎপল দত্তের ডায়াবেটিস রোগ ধরা পড়ল। সমস্ত জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম, শরীরের উপর ভয়ানক অত্যাচার এবং নিয়মকানুনে পরোয়াহীন ছিলেন। শরীরের উপরে খেয়াল না রাখা সেই সঙ্গে সঙ্গে শীরিরীক পরিশ্রমে ১৯৮৩-৮৪-র দিকে তাঁর শরীর ক্রমাগত খারাপ হতে থাকে। ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তাঁর শরীর আরো খারাপ হতে থাকে। ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তাঁর শরীর ক্রমাগত ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছিল এবং তিনি দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়েছিলেন। এই দুর্বলতা ১৯৯০-৯১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আরও চরম বিপর্যস্ত হতে থাকে ও ক্রমাগত ভীষণ খারাপের পর্যায়ে চলে যায়। যার অন্যতম কারণ ডাক্তারের দেওয়া পরামর্শ অবহেলা করা ও শারিরীক অসুস্থতা সত্ত্বেও অনিয়মিত ও বেপরোয়া জীবন যাপন। শোভা সেন সবচেয়ে কাছ থেকে সেই পরিস্থিতি উপলব্ধি করেছেন ও তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন- "নানা রকম উপসর্গ, ব্লাড প্রেশার ও ডায়াবেটিস, এই দুই রোগই ওর শরীরটাকে কব্জা করে ফেলেছে। ওকে সাবধানে রাখাও শক্ত, ডাক্তাররা যা যা করতে বলবে, মেনে চলতে বলবে, বা খেতে নিষেধ করবে, ও তা কিছুতেই মানবে না। ওভাবে বেঁচে থাকার কোনো অর্থই ও খুঁজে পায় না"।১

১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী তাঁকে কলকাতার বেলভিউ নার্সিং থেকে ডায়ালিসিসের জন্যে ভর্তি করা হয়। ফেব্রুয়ারী মাসে নার্সিংহোম থেকে বাড়ি ফেরার পর তাঁর শারিরীক অবস্থা ক্রমাগত ভীষণ খারাপ হতে থাকে। একই বছরের ৩-রা মার্চ আবার তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় এবং মার্চের ৪ তারিখ থেকে ডায়ালিসিস শুরু করা হয়। চার, পাঁচ দিন এক নাগাড়ে ডায়ালিসিসের পর ৯ই মার্চ একটু সুস্থবোধ করতে থাকেন। তাঁর কিডনির অবস্থা এতটাই খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে ডাক্তাররা পরামর্শ দিয়েছিলেন কিডনি পুনঃপ্রতিস্থাপন করতে হবে। কিডনি প্রতিস্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি ২২শে মার্চ বোম্বাই-এর উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। ওখানকার ডাক্তারবাবুরা তাঁকে পর্যবেক্ষণ করেও বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জানালেন তাঁর দুর্বল হার্ট ও দুর্বল নার্ভের কারনে কিডনি প্রতিস্থাপন কোনভাবেই সম্ভব নয়। ফলে সেখানেই ডায়ালিসিস চলতে থাকল ও শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হল অপারেশান না করে বাড়িতে ডায়ালিসিসের বন্দোবস্ত করা।

১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রচন্ড অসুস্থতা ও দুর্বলতা সত্ত্বেও রাজনৈতিক প্রবন্ধ 'প্রতি বিপ্লব'-এর মতো জটিল, পরিশ্রম সাধ্য দুরহ গ্রন্থ উৎপল দত্ত বিপুল উদ্যামে লিখতে শুরু করেন। তিনি হয়ত অনুভব করেছিলেন এহেন জটিল শারিরীক অসুস্থতার মধ্য দিয়ে তাঁর বেশিদিন হয়তো বেঁচে

থাকা সম্ভব নয়। তাই তিনি তাড়াতাড়ি শেষ করবার তাগিদ অনুভব করেছিলেন। যেদিন ডায়ালিসিস থাকে না সেদিন সকালে উঠে চা খেয়েই লিখতে শুরু করতেন। শরীর কোনভাবেই তাঁর সঙ্গ দিত না। ক্ষানিকখণ লিখতেন আবার ক্ষানিকখণ বিশ্রাম করতেন, এভাবেই ‘প্রতিবিপ্লব’ প্রবন্ধটি দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলে। এই সময় তাঁর শারিরীক পরিস্থিতির বর্ণনা শুনলে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। তাঁর রেটিনার পিছনে জল জমেছে, সেই সাথে ছিল উচ্চ ব্লাড প্রেশার ও ডায়াবেটিসের সমস্যা। কিছুদিন পরে শারিরীক পরীক্ষা করে জানা গেল ইউরিয়া ও ক্রিয়েটিনাইন অসম্ভব হারে বেড়ে গিয়েছিল। সেই সাথে সাথে নার্ভের সমস্যা। শ্রীমতি শোভা সেনের বর্ণনা অনুযায়ী—“তাঁর ডান কিড্নি, ডান চোখ এবং ঐদিকের ব্রেন-এর আর্টারি দুর্বল হয়ে গেছে, তার কোন চিকিৎসা নেই, ...ইতিমধ্যেই ওইদিকে শতকরা সত্তরভাগ রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে আছে, ... ডাক্তারদের মত, দশ মিনিটেই জীবন শেষ হয়ে যেতে পারে।”[২]

নাটকের প্রতি একান্ত প্রাণ ও নাট্যযোদ্ধা উৎপল দত্ত তাঁর শারিরীক অসুস্থতার জন্য বেশ কিছুদিন নাটক করতে না পেরে অত্যন্ত অস্থির ও মনোকষ্টে ভুগছিলেন। ডাক্তারদের নিষেধ সত্ত্বেও ডাক্তারের সাথে কথা বলে, অনুমতি নিয়ে ২১শে জুলাই ‘একলা চলো রে’ নাটকের অভিনয় করেছেন। এই ‘একলা চলো রে’ নাটক অভিনয়ই তাঁর শেষ অভিনয়। অত্যন্ত দুর্বল শরীর নিয়ে ১৮ই আগস্ট রাত্রি ৮টা পর্যন্ত ‘ব্যারিকেড’ নাটকে পুনঃপ্রযোজনার মহড়ায় তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন।

মহাপ্রয়াণ:

১৯শে আগস্ট উৎপল দত্তকে পি.জি. হাসপাতাল থেকে ডায়ালিসিস শেষ করে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। সেদিন সকলেও তিনি প্রবল শারিরীক কষ্ট ও জ্বর নিয়ে পরবর্তী নাটকের পাণ্ডুলিপি পরিমার্জনা করেছিলেন। আগের দিন রাত থেকেই প্রবল জ্বর, সেই জ্বরকে সঙ্গে করেই তিনি লিখে চলেছিলেন। হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে খুব জ্বর নিয়ে সামান্য ঘুমানোর চেষ্টা করেছিলেন। পরিবার পরিজন আত্মীয় বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে দিন-দিন ক্রমাগত দুশ্চিন্তা বেড়ে চলেছে, কতদিন উৎপল দত্ত এই অসুখ নিয়ে যুঝতে পারবেন! এই কতদিন শেষ হয়ে এল ১৯৯৩ সালের আগস্ট মাসের ১৯ তারিখ । কলকাতার টালিগঞ্জের কল্লোলে দুপুর ৩টে ৩০ মিনিটে। নিরন্তর ছুটে চলা নাট্য যোদ্ধা একবারেই থেমেছেন, মহাপ্রয়াণে। শোভা সেন উৎপল দত্তের জীবনের অন্তিম লগ্ন সম্পর্কে লিখেছেন- “বাড়িতে পৌঁছে আস্তে আস্তে গাড়ি থেকে নেমে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো। নিচে বসল না। একেবারে ওপরে এসে খেয়ে শুয়ে পড়বে। যেমন রোজকার রুটিন। কিন্তু দেখছি বেশ শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, সঙ্গে একটা অস্বস্তি খেতে বসে খেতে পারলো না। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ল।

আমি কাছে এসে একটু স্যুপ খাওয়ানোর চেষ্টা করলাম। জিভের নিচে সরবিট্রেট দিলাম। বিছানায় শুয়ে বুকের যন্ত্রণা বাড়ল। ওঠেও যন্ত্রণা। শুয়ে বসেও যন্ত্রণা, প্রচন্ড বুকের ব্যথা ও গলায় ঘর ঘর আওয়াজ- কষ্ট হচ্ছে ভীষণ। স্যুপটা দু-চামচ খেতে না খেতে গড়িয়ে পড়ল। তারপর আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে গেল। আমি ভাবলাম, যন্ত্রণা কমেছে, তাই ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু এ যে তার শেষ নিদ্রা বুঝতে পারিনি।"[৩]

মানুষের মুক্তি সংগ্রামে বিশ্বাসী উৎপল দত্ত চলে গেলেন- চিরতরে চলে গেলেন সেই অনাবিস্কৃত অজানা না ফেরার দেশে, যেখান থেকে কোন যাত্রী আর কখনো ফেরে না। রয়ে গেল সেই সব কিছুই, যা তিনি মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছিলেন, সমাজের জন্য ও শিল্পের জন্য।

উৎস নির্দেশ :

১. উৎপল দত্ত, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ‘গণশক্তি’, শারদ সংকলন, ১৯৯২, পৃ ৭৪

২. শোভা সেন, ‘প্রস্তুতি পর্বের উৎপল ও অগ্রজের অনুস্মৃতি’, ‘নন্দন’ ৩০ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৯৪, পৃ ৫৭

৩. উৎপল দত্ত, সুরজিৎ ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ‘দেশ’, ৩০ মার্চ ১৯৯১, পৃ ৩৫

৪. উৎপল দত্ত, সুরজিৎ ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ‘দেশ’, ৩০ মার্চ ১৯৯১, পৃ ৩৪

৫. শঙ্কর শীল, থিয়েটারে প্রবেশ, উৎপল দত্ত : মনন ও সৃজন, প্রতিভাস, সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ ১৩

৬. উৎপল দত্ত, ‘লিট্‌ল থিয়েটার ও আমি’, উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন, নৃপেন্দ্র সাহা (সম্পা), উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব ২০০৫ কমিটি, ৭ নভেম্বর ২০০৫, পৃ ৪৪৩

৭. সূত্র-৫, পৃ ১৪

৮. সৌভিক রায়চৌধুরী, ‘উৎপল দত্ত কিছু স্মৃতি ও আমাদের উত্তরাধিকার’, বনানী, ১৪ বর্ষ, ১৪ সংখ্যা, ১৪০০, পৃ ১৮

৯. তদেব, পৃ ১৮

১০. ‘College Notes and News’, St. Xavier’s Magazine, December 1948, পৃ ২৩

১১. সৌভিক রায়চৌধুরী, উৎপল দত্ত : ‘মুখের ভাষা থেকে লেখার কলমে’, ‘কলকাতা পুরশ্রী’, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৯৩, পৃ ৪

১২. সৌভিক রায়চৌধুরী, ‘থিয়েটারে সংলাপের পরই সর্বাধিক গুরুত্ব সংগীতের’ (শেষ সাক্ষাৎকার), ‘এপিক থিয়েটার’, উৎপল দত্ত স্মারক সংখ্যা, মার্চ ১৯৯৪, পৃ ১৯২

১৩. তদেব, পৃ ১৯২

১৪. সুরজিৎ ঘোষ, ‘যে নাটকের রাজনীতি ভুল তার সব ভুল’ (সাক্ষাৎকার), ‘দেশ’, ৩০ মার্চ ১৯৯১, পৃ ৩৫

১৫. উৎপল দত্ত, ‘প্রতাপ রায়কে যেমন মনে পড়ে’, উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন, নৃপেন্দ্র সাহা (সম্পা), উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব ২০০৫ কমিটি, ৭ নভেম্বর ২০০৫, পৃ ৪৬৫

১৬. দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, ‘উৎপলরঞ্জন : একটি সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ’, ‘এপিক থিয়েটার’, মার্চ ১৯৯৬, পৃ ৫৫

১৭. তদেব, পৃ ৫৫

১৮. সূত্র-৫, পৃ ১৫

১৯. সূত্র-৬, পৃ ৪৪০

২০. সূত্র-৩, পৃ ৩৫

২১. সূত্র-৫, পৃ ১৫, ১৬

২২. সূত্র-৬, পৃ ৪৪০

২৩. সূত্র-৩, পৃ ৩৫

২৪. সূত্র-৬, পৃ ৪৪০

২৫. সূত্র-৩, পৃ ৩৫

২৬. সূত্র-৬, পৃ ৪৪০

২৭. সূত্র-৫, পৃ ১৬

২৮. সূত্র-৬, পৃ ৪৪০

২৯. উৎপল দত্ত, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, 'শূদ্রক', 'শরৎ', ১৪০০, পৃ ১২৫

৩০. সূত্র-৬, পৃ ৪৪৩, ৪৪৪

৩১. তদেব, পৃ ৪৪৫

৩২. সূত্র-২৯, পৃ ১২৬

৩৩. তদেব, পৃ ১২৬

৩৪. সূত্র-৬, পৃ ৪৪৫

৩৫. তদেব, পৃ ৪৪৫

৩৬. তদেব, পৃ ৪৪৫

৩৭. তদেব, পৃ ৪৪৬, ৪৪৭

৩৮. শঙ্কর শীল, 'গণনাট্যের সান্নিধ্যে', উৎপল দত্ত : মনন ও সৃজন, প্রতিভাস, সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ ২৭

৩৯. সূত্র-৬, পৃ ৪৪৯

৪০. তদেব, পৃ ৪৪৯

৪১. সূত্র-২৯, পৃ ১২৯

৪২. সূত্র-৬, পৃ ৪৫১

৪৩. তদেব, পৃ ৪৫১

৪৪. তদেব, পৃ ৪৫১

৪৫. তদেব, পৃ ৪৫১

৪৬. তদেব, পৃ ৪৫১

৪৭. সূত্র-২৯, পৃ ১৩৬

৪৮. তদেব, পৃ ১৩৬

৪৯. সূত্র-৬, পৃ ৪৬২

৫০. শঙ্কর শীল, 'পিপলস লিট্‌ল থিয়েটার', উৎপল দত্ত : মনন ও সৃজন, প্রতিভাস, সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ ৮১, ৮২

৫১. তদেব, পৃ ৮২

৫২. উৎপল দত্ত, 'পর্বান্তর' পত্রিকায় সাক্ষাৎকার, 'এপিক থিয়েটার', মার্চ ১৯৯৫, পৃ ৮৫

৫৩. সূত্র-২৯, পৃ ১৩৭

৫৪. সূত্র-৫২, পৃ ৮২

৫৫. সূত্র-২৯, পৃ ১৩৮

৫৬. উৎপল দত্ত, 'ব্রেখ্‌ট্‌ ও মার্ক্‌স্‌বাদ' 'স্তানিস্‌লাভস্কি থেকে ব্রেখ্‌ট্‌', উৎপল দত্ত গদ্য সংগ্রহ প্রথম খণ্ড, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা), দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ ২৮৩

৫৭. সূত্র-২৯, পৃ ১৪০

৫৮. তদেব, পৃ ১৪৪

৫৯. শোভা সেন, 'স্মরণে বিস্মরণে : নবান্ন থেকে লালদুর্গ', কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ ৩৭৬

৬০. উৎপল দত্ত, 'আজকের শাজাহান' নাটক, উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র, সপ্তম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা-১০, জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃ ২২২

৬১. সূত্র-৫২, পৃ ৭৬

৬২. সূত্র-৬, পৃ ৪৫৭

৬৩. তদেব, পৃ ৪৫৭

৬৪. তদেব, পৃ ৪৫৮

৬৫. Utpal Dutt, 'Political Theatre', Towards a Revolutionary Theatre, Calcutta, 1995, M. C. Sarkar & Sons Pvt., P. 73

৬৬. তদেব, পৃ ৭৭

৬৭. সূত্র-৬, পৃ ৫৯

৬৮. তদেব, পৃ ৪৬০

৬৯. সূত্র-৫৯, পৃ ৮৯

৭০. দর্শন চৌধুরী, 'থিয়েটারওয়ালা উৎপল দত্ত', 'পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ১০ অক্টোবর (মহালয়া), ২০০৭, পৃ ৩৬০, ৩৬১

৭১. সূত্র – ৫৭, পৃ ৩৬৪

৭২. তদেব, পৃ ৩৭৬

৭৩. তদেব, পৃ ৩৮০, ৩৮১

তৃতীয় অধ্যায়

উৎপল দত্তের নাটকের রাজনৈতিক প্রসঙ্গ

আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা উৎপল দত্তের নির্বাচিত নাটকের বিস্তৃত বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে নাটকগুলিতে নিহিত ও আলোচিত উৎপল দত্তের সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনা, রাজনৈতিক ভাবাবেগ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগ্রাম, রাজনৈতিক অনুষঙ্গ প্রভৃতি উদ্‌ঘাটিত করার প্রয়াস করেছি। যেহেতু আমাদের আলোচনা সীমিত পরিসরে সীমাবদ্ধ রাখতে হয়েছে, তাই নাটক নির্বাচনে এমন অনেক নাটককে আলোচনার বাইরে রাখতে হয়েছে, যেগুলি আলোচিত হওয়ার যোগ্য ছিল। গবেষণার মূল লক্ষ্য ছিল উৎপল দত্তের সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনা, রাজনৈতিক আন্দোলন ও রাজনৈতিক অনুষঙ্গ প্রভৃতি বৃত্তান্তের প্রতিফলন। সুতরাং উৎপল দত্তের সময়কার অর্থাৎ ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রাজনৈতিক উত্থান-পতন ও রাজনৈতিক বিভিন্ন অনুষঙ্গের সার্বিক প্রতিফলন হয়েছে। উৎপল দত্তের সমসময়ে (১৯২৯-১৯৯৩ খ্রি.) যেসব গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনাবলি বাংলা তথা ভারতবর্ষ অথবা পৃথিবীর ইতিহাসে ঘটেছিল, যা নিয়ে সারা ভারতবর্ষসহ সারা পৃথিবী উত্তাল হয়ে উঠেছিল, সেইসব গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা নিয়ে উৎপল দত্ত যেসব নাটক রচনা করেছেন, সেইসব নাটক আলোচ্য অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এই অধ্যায়ে উৎপল দত্তের মোট ১০টি নাটক নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে রাজনৈতিক ঘটনা ও অনুষঙ্গের বিচার বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি। যথা— ১) ফেরারী ফৌজ, ২) কল্লোল, ৩) অজেয় ভিয়েৎনাম, ৪) তীর, ৫) মানুষের অধিকার, ৬) ব্যারিকেড, ৭) দুঃস্বপ্নের নগরী, ৮) এবার রাজার পালা, ৯) লেনিন কোথায়, ১০) একলা চলো রে।

ফেরারী ফৌজ

প্রথম অভিনয় : ২৮ মে ১৯৬১, মিনার্ভা,

প্রথম প্রকাশ : গ্রন্থম, ৯ আগস্ট, ১৯৬১

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের বাংলায় অগ্নিযুগের ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী আন্দোলনের পটভূমিতে এই নাটক লেখা হয়। এই দশকের প্রথম দিকে পূর্ব বাংলায় জেগে ওঠা যুবকদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ নিয়েই নাটকটি গড়ে উঠেছে। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম তখন তুঙ্গে। পূর্ব বাংলার যে বিপ্লবীরা সশস্ত্র আন্দোলনের পথ ধরেছিল তাদের জীবন কাহিনি নিয়েই এই নাটক। বাংলার বিপ্লবীদের এই কার্যকলাপ ব্রিটিশ শাসনাধীন অবিভক্ত

বাংলার ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থাকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল। উৎপল দত্ত সেই বিপ্লবী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বিপ্লবী ছবি ফুটিয়ে তুললেন নিপুণ দক্ষতায়। র‍্যাডিক্যাল পলিটিক্স বলতে যা বোঝায়— এই নাটকে উৎপল দত্ত তাঁর সার্থকতা ও ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে অঙ্কিত করলেন। নাটকটি প্রযোজিত হয় ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে। তৎকালীন বাঙালি দর্শকের কাছে এই নাটক ছিল সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা, বলা যায় তাদের চেতনায় এক বিদ্রোৎসাহী অগ্ন্যুৎপাত। এইরকম উত্তেজনাপূর্ণ, সংঘাতময়, ভায়োলেন্সে উত্তাল রাজনৈতিক নাটক বাঙালি দর্শক এর আগে প্রত্যক্ষ করেননি। উৎপল দত্ত বাংলার মানুষকে ১৯৩০-এর বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবীদের সংগ্রাম, তাদের আত্মত্যাগ প্রভৃতি সম্পর্কে অবহিত করলেন, বাঙালির সংগ্রামী অতীত, বিপ্লবীদের জীবনকথা সম্পর্কে দর্শককে সচেতন করলেন।

উৎপল দত্ত 'ফেরারী ফৌজ' নাটকের নামকরণ করেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা থেকে। উৎপল দত্ত নিজেও সে কথা স্বীকার করেছেন। 'ফেরারী ফৌজ' নাটকে 'নাট্যকারের কথা' অংশে তিনি বলেছেন—

> *'ফেরারী ফৌজ' নামটি সাহিত্যের দিগ্‌দর্শক প্রেমেন্দ্র মিত্রের দেয়া। তাঁর বিখ্যাত কবিতার নাম এ নাটকে যুক্ত করতে আদেশ দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন।* [১]

এই নাটকে ব্রিটিশ শাসন যুগের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দুটো দিক ফুটে উঠেছে। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে এক দিকে চলছিল আপসহীন লড়াই এবং আরেকদিকে চলছিল এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে আপস। এই সময়কার বাংলার বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য ছিল অত্যাচারী ইংরেজ ও রাজকর্মচারীদের হত্যা করে ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীর মনে ভয়-ভীতির সঞ্চার করা। যাতে তারা ভীত হয়ে এদেশ ছেড়ে চলে যায়। ভয়-ভীতি সঞ্চার করে সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে ইংরেজদের ভারত ছাড়া করার পরিকল্পনা ছিল এই বিপ্লবীদের। সেই গোপন বিপ্লববাদী দলের কাহিনি নিয়ে এই নাটকটি লেখা হয়েছে।

এই বিপ্লবী আন্দোলনকে দমন করতে সে সময়কার ব্রিটিশ সরকার ও তার অধীনস্থ রাজকর্মচারীরা চরম দমন-পীড়নের পথ গ্রহণ করেছিল। এই নাটকে সে সময়কার বিপ্লবী মানুষগুলোর আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাদের বীরত্ব ও আত্মবলিদানের কাহিনি বর্ণনা করেছেন। পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় উৎপল দত্ত যখন 'লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ'-এর হয়ে ইংরেজি নাটক করতেন, তখন ক্লিফোর্ড অডেটস্‌-এর একটি নাটক অভিনয় করেছিলেন— 'Till the day I die' যেটি ছিল বিপ্লবীদের আমৃত্যু সংগ্রামের কাহিনি নিয়ে রচিত। 'ফেরারী ফৌজ' নাটকে এই বিপ্লবী নাটকের কিছুটা ছায়াপাত ঘটেছে বলে মনে করা যেতে পারে।

নাটকের শুরুতেই আমরা দেখি পূর্ববঙ্গের মেঘনা নদী তীরবর্তী ভুবনডাঙ্গা গ্রাম। শান্ত, নিস্তরঙ্গ গ্রাম এতদিন এখনে বিপ্লবের কোনো গন্ধ ছিল না, সেখানেও জ্বলে উঠল আগুন। সবেমাত্র চট্টগ্রামের বীর বিপ্লবী যুবকদের ব্রিটিশের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ও জালালাবাদের সংগ্রাম শেষ হয়েছে। সমগ্র দেশের মানুষ উত্তেজনার আগুনে ফুটছে। সেই আগুনের আঁচ ভুবনডাঙ্গা গ্রামেও এসে উপস্থিত। এ নাটকে বিপ্লবীরা তাদের নেতা শান্তি রায়ের নির্দেশে একের পর এক ইংরেজ হত্যার ব্রত গ্রহণ করে এবং হত্যা করতে থাকে। কিন্তু বিপ্লবীদের অধিকাংশই তাদের নেতা শান্তি রায়কে কখনো চোখে দেখেনি। তারা নেতাকে চেনে না, তারা শুধু নেতার নির্দেশ শুনেছে ও হুকুম তালিম করেছে অন্ধভাবে। তাদের কাছে তাদের নেতা দেবতার সমান; নেতার নির্দেশ অকাট্য, শুধু নির্বিচারে আদেশ পালন করে যেতে হয়। তাদের মতে— "কীসের আপত্তি? শান্তিদার হুকুম—"[২] অথবা বিপ্লবী জ্যোতির্ময় এর মতে— "নর হ্যাভ্ ইউ। আউয়ার্স নট টু কোশ্চেন হোয়াই।"[৩] অর্থাৎ বিপ্লবী নেতা শান্তিদার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করাই বিপ্লবীদের একমাত্র কর্তব্য।

এই প্রশ্নহীন আনুগত্যের পরিবেশে বিপ্লবী অশোক চাটুজ্যে পুলিশ সুপার উইলমট সাহেবকে গুলি করে হত্যা করে গ্রামের গির্জার প্রাঙ্গণে। এই অন্ধ অনুসরণ ও প্রশ্নহীন আনুগত্যের পরিবেশে বিপ্লবী অশোক চাটুজ্যে একটু ব্যতিক্রমী। সে প্রশ্ন তোলে—

অশোক।। এই হত্যাকাণ্ডের আবশ্যকতা কি? প্রয়োজন কি? উদ্দেশ্য কি? একজন উইলমটকে মারলাম। তার জায়গায় আরেক পুলিশ সুপার আসবে। সে হবে উইলমটের চেয়েও হিংস্র, উন্মত্ত, নিষ্ঠুর। মেরে মেরে ইংরেজ রাজত্ব শেষ হবে?

কুমুদ।। একটা স্ফুলিঙ্গ থেকেই অগ্নিকাণ্ড হয়। আমাদের পিস্তলের আগুন থেকেই পুরো দেশে দাবানল লেগে যাবে।

অশোক।। অর্থাৎ আমরা এমনই অতিমানব যে আমাদের বীরত্বে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশব্যাপী ভ্যাড়ার সামিল জনতা ক্ষেপে উঠে ঢুঁ মারতে শুরু করবে। মাপ করবেন, অমন ধৃষ্টতা আমার নেই।

দেবব্রত।। চট্টগ্রামের অভিজ্ঞতা অনেকটা তাই বটে। গণজাগরণ তো হোলো না। মাঝখান থেকে—

[থেমে যান। কুমুদ তাঁর দিকে তাকায় রোষ ভরে]

কুমুদ।। জনতা ভ্যাড়ার সামিল একথা আমি বলিনি, অশোকদাই বলেছে। আমি বলছি জনতা নেতৃত্ব চায়।

অশোক।। সে নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা রাখো তুমি?

কুমুদ।। আমি রাখি না, শান্তি দা রাখেন।

বিপিন।। নিশ্চয়ই

অশোক।। মাস্টারদা যেখানে পারেননি, ভগৎ সিং যেখানে ব্যর্থ হয়েছেন? না, আমার মনে হয় শান্তিদাও পারেন না। কোনো লোক একা পারেন না। জনতা নিজেই পারে সে কাজ করতে। নিজের সংগঠন সৃষ্টি করতে। [৪]

অশোকের মতের সঙ্গে অন্য বিপ্লবীদের মত মেলে না। কিন্তু তারা যুক্তিপূর্ণ তর্কের পথে না গিয়ে অশোককে নানাভাবে আক্রমণ করতে থাকে। তারা বলে—

আসলে অশোকদা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। উইলমট হত্যাটা হজম হয়নি এখনো। [৫]

এসব অভিযোগের বিরুদ্ধে অশোক রুখে দাঁড়ায় এবং প্রতিবাদ করে সে বলে—

বিপ্লবের জন্য যদি মারতে হয় মারবো। প্রশ্ন হচ্ছে এপথে বিপ্লব আসবে কী? [৬]

অশোক কখনো সংগ্রামের বিরোধী নয়, সে সংগঠনের বিরোধীও নয়, সে সংগ্রামের পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তোলে। অন্য বিপ্লবীদের কাছে এসব প্রশ্নের কোনো মূল্য নেই, প্রয়োজনও নেই। অশোক তুলে ধরার চেষ্টা করে বিপ্লবী আন্দোলনের গভীর সংকটের কথা। অন্য বিপ্লবীরা এ সংকট নিয়ে কখনো মাথা ঘামায় না। কারণ তারা তাদের নেতার হুকুম তালিম করার যন্ত্র মাত্র। কিন্তু অশোক নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে, তাই আক্ষেপ করে তাকে বলতে শুনি—

বিপিন আমার কথাটা বুঝলে না। In fact, লক্ষ্য করছি, আজকাল কেউই আমার কথা বুঝতে পারছে না। [৭]

অশোক সাচ্চা বিপ্লবী পুলিশের হাতে ধরা পড়ে, পুলিশের শত নির্যাতনেও সে সংগঠনের কোনো কথাই ফাঁস করে না। পুলিশের শত অত্যাচারেও সে কোনো স্বীকারোক্তি দেয় না। পুলিশ অফিসার হিতেন দাসগুপ্ত অশোকের সামনেই তার স্ত্রীর শ্লীলতাহানি করে, তাতেও অশোক ভেঙে পড়ে না। তার কাছ থেকে কোনো তথ্য বার করতে না পেরে পুলিশ এক মোক্ষম চাল চালে। সুপরিকল্পিতভাবে বিপ্লবী অশোককে বিশ্বাসঘাতক সাজায়। তারা প্রচার করে অশোক পুলিশের কাছে সব কথা বলে দিয়েছে। তারা অশোককে দামি পোশাক পরিয়ে পুলিশের গাড়িতে পুলিশের বড় কর্তা জনসন সাহেবের পাশে বসিয়ে গোটা গ্রামে ঘোরায় যাতে গ্রামের মানুষ পুলিশের

প্রচারকে বিশ্বাস করে। পুলিশের এই পরিকল্পনা বিপ্লবীদের ও বিভ্রান্ত করে দেয়। তারা পুলিশের প্রচারকে বিশ্বাস করে ও অশোককে বিশ্বাসঘাতক বলে চিহ্নিত করে এবং শাস্তি স্বরূপ তার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয়। বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সুযোগ পেলেই অশোককে হত্যা করা হবে। প্রকৃত সত্য যে কী তা কেউ জানতে পারে না। যে শত্রুর কারাগারে ঘুমাতে পারে না, ঘুম পেলেই সে নিজেই দেয়ালে মাথা ঠোকে নিজেকে জাগিয়ে রাখার জন্য যাতে ঘুমের ঘোরে তার মুখ থেকে কোনো গোপন কথা না বেরিয়ে যায়, অথচ সেই বিপ্লবী অশোককে বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দেওয়া হয় বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে। প্রকৃত সত্য ও আক্ষেপ ধ্বনিত হয় অশোকের সংলাপে—

> *আমার বিশ্বাসঘাতকতার পুরো কাহিনীটা ওদের একটা ভাঁওতা, আমার মন ভেঙে দেয়ার একটা ষড়যন্ত্র। এবং ওরা কৃতকার্য যে হয়নি একথা বলতে পারি না। রাতের পর রাত আমার চোখে ঘুম নেই। আমি নিঃসঙ্গ, একা। দিন হলেই এইসব কাপড়জামা পরিয়ে বসিয়ে দেয় জনসন সাহেবের গাড়িতে। কিন্তু কেউ কি জানে তখন আমার পা থাকে সীটের সঙ্গে শেকল দিয়ে বাঁধা? পাশে থাকে সশস্ত্র প্রহরী? তারপর যখন ওরা জানতে পারল আমি দল থেকে বিতাড়িত, লাঞ্ছিত, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত, তখন আমাকে ছেড়ে দিতে আরম্ভ করল। জানে এখন আর আমার যাওয়ার জায়গা নেই। যেখানেই যাই, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসার আগেই প্রাণভয়ে ভীত মানুষটা পালিয়ে আসবে পুলিশ ক্যাম্পে; কারাগার তার কাছে আশ্রয় এখন।* [৮]

গোটা নাটকে অশোককে আমরা একজন সাচ্চা, উন্নতশীর, আদর্শবাদী বিপ্লবী হিসেবেই দেখি। নাটকের অন্তিমপর্বে দেখি শত অত্যাচার সে সহ্য করার পরেও বিশ্বাসঘাতকতা তকমা পাওয়ার পরেও বিপ্লবীদের সাহায্য করতে সে এগিয়ে আসে, তার ফলেই তার মৃত্যুও ঘটে। অগ্নিযুগে বিপ্লবীরা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে উগ্রসন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ করছিল তার সার্থক উদাহরণ হল অশোক চাটুজ্জ্যে। অনুশীলন সমিতির মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়ে বিপ্লবীরা আমৃত্যু সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে। উৎপল দত্ত আলোচ্য নাটকে দেখান বিপ্লবীদের মধ্যে অনেক অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও তারা বিপ্লবের পথ থেকে পিছিয়ে আসে না। ১৯৩০-এর বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবীদের পথ সঠিক ছিল কি না, তা নিয়ে বিদগ্ধ মহলে নানা প্রশ্ন উঠতে পারে; কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামের গুরুত্ব রাজনৈতিক বিচারে কোনো অংশেই কম নয়।

আলোচ্য নাটকে আমরা দেখতে পাই বিপ্লবীদের মধ্য থেকেই অনেকে বিশ্বাসঘাতকে পরিণত হয়েছিল। বিপ্লবীরা অশোককে বিশ্বাসঘাতক ভেবেছিল কিন্তু সে আদতে বিশ্বাসঘাতক

ছিল না। সে দলের জন্য আমৃত্যু সংগ্রাম করে গিয়েছিল। অপরদিকে বিপ্লবীরা যাকে বিশ্বস্ত কমরেড বলে ভাবত, কুমুদকে। সেই কুমুদই ছিল বিশ্বাসঘাতক। নাটকের অন্তিমলগ্নে কুমুদের বিশ্বাসঘাতকতায় শান্তি রায়সহ বিপ্লবী দলটি পুলিশের হাতে ধরা পড়ে এবং সংঘর্ষে তারা প্রাণ হারায়। সুযোগ সন্ধানী স্বার্থপর বিশ্বাসঘাতক মানুষের আত্মম্ভরিতা ও বাগাড়ম্বরিতা বেশিই হয়। কুমুদ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সে বলে—

> *একটা স্ফুলিঙ্গ থেকেই অগ্নিকাণ্ড হয়। আমাদের পিস্তলের আগুন থেকেই পুরো দেশে দাবানল লেগে যাবে।* [৯]

দলের গোপন কোনো আলোচনায় কুমুদকে দেখা যায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে—' কখনো অশোকের বিরোধিতা করা কখনো বা শান্তি রায়ের আদেশকে মেনে চলার পরামর্শ দিতে দেখা যায় অন্যান্য বিপ্লবীদের। পুলিশ ইনস্পেকটর হিতেন দাশগুপ্তের মেয়ে দেবযানী দাশগুপ্তের সঙ্গে তার প্রেমকাহিনি জানার পর বিপ্লবী দলের সকলে যখন আশঙ্কা প্রকাশ করে তখন সে ফেটে পড়ে উত্তর দেয়—

> *সে আমি জানি জানি, আমাকে আর বিপ্লব শেখাতে হবে না। সব জানি আমি।* [১০]

নাটকের শেষ লগ্নে আমরা দেখি বিপ্লবী নেতা শান্তি রায়ের নির্দেশে ও পরিকল্পনায় জাহাজঘাটায় স্টীমার কোম্পানির তেলের গুদামে জনসন সাহেবকে হত্যা করার পরিকল্পনা করা হয়। সেই পরিকল্পনার গোপন কথা কুমুদ মুখোপাধ্যায় সবকিছুই ফাঁস করে দেয় পুলিশের সাব ইনস্পেকটর প্রকাশ মুখুটির কাছে। দলের সমস্ত পরিকল্পনা নখদর্পণে সে জেনে নেয়। যখন শান্তি রায় আত্মপ্রকাশ করেন তখন তার সম্পর্কেও খুঁটিনাটি নানান তথ্য কুমুদ জেনে নেয়। সেই সমস্ত তথ্য সে পুলিশ অফিসারের কাছে প্রকাশ করে এবং সদলবলে বিপ্লবীদের হাতেনাতে ধরিয়ে দেয়—

প্রকাশ।। এই নোট্‌টা আপনি পাঠিয়েছিলেন থানায়?

কুমুদ।। হ্যাঁ।

প্রকাশ।। আপনার নাম?

কুমুদ।। কুমুদ মুখোপাধ্যায়।

প্রকাশ।। কখন আসার কথা?

কুমুদ।। রাত দুটোয়।

প্রকাশ।। সত্যি কথা বলছেন তো?

কুমুদ।। একটু পরে স্বচক্ষেই দেখবেন?

প্রকাশ।। মিথ্যে হলে বুঝবেন ঠেলা। শান্তি রায় থাকবে?

কুমুদ।। হ্যাঁ। তবে চিনতে পারবেন না, আমি জানি।

প্রকাশ।। কেন?

কুমুদ।। সে আপনাদের প্রিয়পাত্র, বন্ধু নীলমণি বাঁড়ুয্যে।

[সবাই সচকিত]

প্রকাশ।। তাহলে! তবে—। ভালরে ভাল। চিঠিতে আরো বলছেন ইনস্‌পেক্টর হিতেন দাশগুপ্ত সম্বন্ধে তথ্য জানতে পারব। কি তথ্য?

কুমুদ।। তাকে গুম করা হয়েছে। রাধারানীর ঘরে।

প্রকাশ।। দেবব্রত ঘোষের লুকিয়ে থাকার খবরটা আপনিই দিয়েছিলেন?

কুমুদ।। হ্যাঁ।

প্রকাশ।। থ্যাংকস। (ঘড়ি দেখেন) সময় বেশি নেই।

কুমুদ।। লুকিয়ে পড়ুন। দোহাই আপনাদের, লুকিয়ে পড়ুন। ওরা আসবার আগে।

[প্রকাশ মৃদুস্বরে নির্দেশ দেন। বন্দুকধারীরা এদিক ওদিক গা ঢাকা দেয়।]

প্রকাশ।। কেন এ কাজ করছেন?

কুমুদ।। কি?

প্রকাশ।। এ কাজ করছেন কেন?

কুমুদ।। সেটা আপনার না জানলেও চলবে।

প্রকাশ।। একটা দেশপ্রেমিক বীরকে আমাদের হাতে সঁপে দিচ্ছেন?

কুমুদ।। আপনি না পুলিশ অফিসার?

প্রকাশ।। ওহো! সেটা ভুলে গেসলাম। ভেতো বাঙালী তো, বেরিয়ে পড়ে হঠাৎ হঠাৎ।

কুমুদ।। আমার সর্বনাশ করছে ওরা। আমার সব কেড়ে নিয়েছে। মানুষের মনকে ওরা বিকৃত করে

দেয়। ... লুকিয়ে পড়ুন। আর দেখুন, আমি সিগনাল না দিলে ঢুকবেন না— প্লীজ! ।[১১]

উৎপল দত্ত 'ফেরারী ফৌজ' নাটকে বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনার উপস্থাপনায় ও চরিত্র সৃষ্টিতে চমকের পর চমক সৃষ্টি করেছেন। দর্শককে নাটকের রাজনৈতিক বক্তব্যের প্রতি আকৃষ্ট ও মনোযোগী করাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল। বারবণিতা রাধামণির চরিত্রটি খুবই জীবন্ত ও চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে। তার জীবিকার অন্ধকার পথের মধ্যেও সে এই বিপ্লবী দলের কর্মীদের সান্নিধ্যে জীবনে কোথাও না কোথাও একটুখানি যে আলোর সন্ধান পেয়েছে। জীবনের ঝুঁকি নিয়েও সে বিপ্লবীদের গোপন আস্তানা হিসেবে নিজের ঘরকে ব্যবহার করতে দিয়েছে। শুধু তাই নয় পুলিশ ইনস্পেকটর হিতেন দাশগুপ্তকে সে সুকৌশলে হত্যা করেছে তার গোপন আস্তানায়। নাটকের পঞ্চম দৃশ্যে দেখতে পাই বারাঙ্গনা রাধার ঘরে যখন পুলিশের তল্লাশি চলছে, তখন বিপ্লবীদের সহকর্মী রাধামণি পুলিশের কাছে বিপ্লবীদের যাবতীয় তথ্য ও নাম বলে দেয়—

রাধা।। সে তো জানি না। বাবুরা সব বলাবলি করছিল। বলো, কথা দাও আমাকে বাঁচাবে।

হিতেন।। হ্যাঁ, বাঁচাব, সব যদি বলো।

রাধা।। বলছি তো।

হিতেন।। কে কে আসে এখানে?

রাধা।। একজনের নাম শুনেছি দেবব্রত ঘোষ, তাকে সবাই মাস্টার মশাই বলে ডাকে।

হিতেন।। গুড হেভেন্‌স্! আমারও মাস্টারমশাই তিনি। তিনি ঐ ডাকাতদের দলে। আর কে?

রাধা।। জ্যোতির্ময় লাহিড়ী।

হিতেন।। জানতাম। এর ওপর নজর আছে আমাদের। আর?

রাধা।। কুমুদ মুখুজ্যে। বাচ্চা ছেলে।

হিতেন।। কুমুদ? জগন্নাথ মুখুজ্যের ছেলে কুমুদ। আমার মেয়েকে চিঠি লিখতো? সে! আশ্চর্য! (আনন্দে) আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম, খেঁদি। আর কে?

রাধা।। আর শান্তি রায়।

হিতেন।। অ্যাঁ। এ ঘরে।

রাধা।। হ্যাঁ। রোজ আসেন।[১২]

একটু পরেই দেখা যায় রাধারানী তার মোহিনী ক্ষমতা প্রয়োগ করে পুলিশ অফিসার হিতেন

দাশগুপ্তকে বিষ মেশানো পানীয় খাইয়ে অজ্ঞান করে দেয় এবং ঘরে লুকিয়ে থাকা বিপ্লবীদের বলে—

> *রাধা।। বিষ। অজ্ঞান হয়ে গেছে। সব জেনে গেছে। ওকে মেরে ফেলুন। এঘর থেকে ওকে জ্যান্ত বেরুতে দেবেন না ওকে সব বলেছি। সব বলে ফেলেছি। নইলে খেত না কিছুতেই।* [১৩]

নাট্যকার উৎপল দত্ত রাধার মতো স্বাধীনতার নামে রাজনৈতিক নারী চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন, যে পরাধীনতার হীনমন্যতার কলুষতার মধ্যে নিজের জীবনের অন্ধকারকে দেখতে পেয়েছিলেন। অগ্নিযুগে অনুশীলন সমিতির মধ্যে রাধারানীর মতো স্বাধীনতাকামী অনেক নারী চরিত্রের উপস্থিতি ছিল। যারা পুরুষের পাশাপাশি নিজেরাও বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছিল দেশ মাতৃকার স্বাধীনতার ব্রতে। রাধামণি সেই বিপ্লবীদের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

নাটকের সবচেয়ে বড়ো চমক— নাটকের শেষভাগে বিপ্লবী শান্তি রায়ের আসল পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হওয়া। নাটকের গোড়া থেকে যাকে দর্শক জেনে এসেছে পুলিশের বিশ্বস্ত গুপ্তচর হিসেবে, সেই নীলমণিই দেখা যায় আসলে শান্তি রায়। এই শান্তি রায় তার পূর্বের ক্রিয়া কর্মের জন্য ব্রিটিশ পুলিশের হাতে এগারো বছর রাজবন্দী হয়ে ছিল। সে কি করে সেই পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে তাদের ওই গুপ্তচর হয়ে গেল এবং গুপ্তচরের আড়ালে বিপ্লবী কাজকর্ম চালিয়ে গেল তা নিয়ে দর্শকদের কাছে একটু ধোঁয়াশা থেকেই যায়। যাইহোক, উৎপল দত্তের চমক সৃষ্টির নৈপুণ্য স্বীকার করতেই হয়। অগ্নিযুগে অনুশীলন সমিতির সশস্ত্র বিপ্লবীদের আত্মত্যাগের কথা উৎপল দত্ত এই নাটকে তুলে ধরেছেন। অনুশীলন দলের উদ্দেশ্য ছিল সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ইংরেজ শাসনকে এদেশ থেকে উৎখাত করা। শান্তি রায় চরিত্রটির মধ্যে বিপ্লবী নেতা মাস্টারদা সূর্য সেনের ছায়া পরিলক্ষিত হয়। তাকে বিভিন্ন ছদ্মবেশের আশ্রয় নিতে হয়। গোপনভাবে অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে হয় এবং বিপ্লবীদের সঠিক পথে নেতৃত্ব প্রদান করে বিপ্লবের অভিমুখ নির্ধারণ করতে হয়।

উৎপল দত্ত নাটকে শ্রেণিশত্রুর চক্রান্ত দারুণভাবে তুলে ধরেছেন। অশোক একজন সাচ্চা বিপ্লবী হওয়া সত্ত্বেও তাকে শ্রেণিশত্রুর চক্রান্তে বিশ্বাসঘাতকে পরিণত হতে হয়। সত্য ঘটনা না জেনে তারা অশোককে দেখা মাত্রই মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয়। বিশেষত, ছদ্মবেশী বিপ্লবী কুমুদ তার শাস্তির বিষয়ে অতি সক্রিয়তা দেখায়। উৎপল দত্ত শ্রেণি সংগ্রামের বিষয়টিকেও উপস্থাপনা করেন আলোচ্য নাটকের মধ্য দিয়ে। নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে আমরা দেখতে পাই সিরাজুলদের মতো মাঝিমাল্লারা বিপ্লবীদের যথাসাধ্য সাহায্য করেছে, তারাও বিপ্লবের অংশীদার হয়েছে।

বিপ্লবীদের কাজ সমাধা হওয়ার পর অর্থাৎ ইংরেজদের হত্যা করার পর তারা ইস্টিমারে করে পালাতে চাইলে সিরাজুল তাদেরকে সহায়তা করার সম্মতি জানায়। সিরাজুল বলে—

সিরাজুল।। পারুম। মাল্লাগো আর কইতে হইব না। শ্রমিক সম্প্রদায়ের দলে টানা দেখলাম অত্যন্ত সহজ। দুইখানা ইস্টীমারের প্রায় প্রত্যেকটা মাল্লা, সারেং, টিন্ডাল দলে আইছে। [১৪]

‘শ্রেণিসত্য’ বা ‘ক্লাসট্রুথ’ বিষয়টিকেও তিনি তুলে ধরেছেন আলোচ্য নাটকে। স্বাধীনতাযুদ্ধে ইংল্যান্ডের রানীরত্ন সিলভিয়া প্যাঙ্কহার্স্ট এবং বারাঙ্গনা রাধারানী দেবী এক হয়ে যায় যায়। নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে জ্যোতির্ময়ের কথায় সেকথা প্রকাশ পায়—

তুমি আশ্চর্য মাইয়া। ইংলন্ডের নারীরত্ন সিলভিয়া প্যাঙ্কহার্স্ট আর ভুবনডাঙার রাধারানী দেবী স্বাধীনতা যুদ্ধের ভ্যানগার্ড। [১৫]

ত্রিশের দশকের সাম্রাজ্যবাদী শাসক ও সশস্ত্র বিপ্লবীদের পারস্পরিক যে বিবাদ-দ্বন্দ্ব, সেই দ্বন্দ্বকে নিয়েই উৎপল দত্তের নাটক ‘ফেরারী ফৌজ’-এর ঘটনা পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে। সশস্ত্র বিপ্লবী ও সাম্রাজ্যবাদী শাসকের পারস্পরিক দ্বন্দ্বই ছিল সেইসময়কার প্রধান সামাজিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব। নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে। এই সময়ে পশ্চিমবাংলার জাতীয় জীবনে হতাশা ও রাজনৈতিক টালমাটাল অবস্থার সূত্রপাত হয়েছিল। সেই সঙ্গে কংগ্রেস সরকারের পুলিশের তাণ্ডব নেমে এসেছিল বিরোধী রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের ওপরে। এই রাজনৈতিক টালমাটাল অবস্থা ও বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের ওপরে অত্যাচারের পটভূমিকায়, উৎপল দত্ত ‘ফেরারী ফৌজ’ নাটকের মধ্য দিয়ে এই দেশের ব্রিটিশ পরাধীনতা থেকে মুক্তি আন্দোলনের পটভূমিকায় বাঙালির মুক্তি সাধনার কথা নাট্যকার বলেছেন ও বাঙালির চেতনাকে উদ্দীপ্ত ও জাগ্রত করতে চেয়েছেন। নাট্যকার উৎপল দত্তের এটি একটি বড়ো রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা। উৎপল দত্ত ‘ফেরারী ফৌজ’ নাটকে রাজনৈতিক বক্তব্যকে দর্শকের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলেন যাতে রাজনৈতিক থিয়েটারের প্রতি তারা আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর এই নতুন ধরনের, নতুন স্বাদের থিয়েটারের প্রতি বাঙালি দর্শককে আকৃষ্ট করে তোলাটা ছিল তাঁর এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের সশস্ত্র অধ্যায়কে উৎপল দত্ত বারে বারে তাঁর নাটকের বিষয় করেছেন। অতীতের সংগ্রামের প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান সংকটের দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণ করেছেন। ‘ফেরারী ফৌজ’ থেকে তার সূত্রপাত।

কল্লোল

প্রথম অভিনয় : ২৮ মার্চ ১৯৬৫, মিনার্ভা,

প্রথম প্রকাশ : গ্রন্থম, এপ্রিল ১৯৬১

'কল্লোল' নাটকের খসড়া উৎপল দত্ত তৈরি করেছিলেন ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে। আর এটি প্রথম অভিনীত হল ২৮ মার্চ ১৯৬৫ খ্রি., মিনার্ভা থিয়েটারে। বিখ্যাত রাশিয়ান নাট্যকার ও পরিচালক অখলোপকভ-এর নাটক 'দি ওশান' নাটকটি প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল Tretyakov-এর 'Roar China' নাটকের ছায়াপাত ঘটেছে 'কল্লোল' নাটকে। চীনা নৌসেনাদের বিদ্রোহ নিয়ে লেখা 'Roar China' নাটকটির অংশ বিশেষ পরিলক্ষিত হয় 'কল্লোল' নাটকে।

'কল্লোল' নাটকের বিষয়বস্তুরূপে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের বোম্বাই-এর নৌ বিদ্রোহকে গ্রহণ করা হয়; যা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভীত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। 'কল্লোল' যে শুধু একটা নাটক নয়, এটা হয়ে উঠেছিল ভারতবর্ষব্যাপী এক বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলন, এই নাটককে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গে ষাটের দশকে গড়ে উঠেছিল বামপন্থী রাজনীতির উত্তাল জনজোয়ার। 'কল্লোল'-কে বন্ধ করার জন্য শাসক শ্রেণির অত্যাচার, পুলিশি সন্ত্রাস, গুণ্ডাদের জুলুম প্রভৃতি নেমে এসেছিল নাট্যকর্মীদের ওপরে। আলোচ্য নাটকে উৎপল দত্ত দেখাতে চেয়েছেন কিছু স্বার্থপর, লোভী নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতায় কীভাবে সর্বাত্মক আন্দোলন দমিত হয়, ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় কীভাবে বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ, তাদের কঠোর সংগ্রাম, তাদের বলিদান স্বার্থপর মানুষের হাতে পড়ে অবদমিত হয়, তা তিনি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন আলোচ্য নাটকে। 'কল্লোল' সম্পর্কে উৎপল দত্ত তাঁর 'লিট্‌ল থিয়েটার ও আমি' প্রবন্ধে লিখেছিলেন—

> *কল্লোল নাটক স্বাধীনতা সংগ্রামে নাবিক ও মজদুরদের বীরত্বগাথাই শুধু বলেনি, বলেছিল কংগ্রেসি বেইমানদের দেশদ্রোহিতার কথা। অহিংস সত্যাগ্রহ যে আসলে সাম্রাজ্যবাদের দালালি, অস্ত্র ছাড়া যে জয় নেই, এ-কথাও বলার প্রয়াস হয়েছিল। ... নানা নাটক মারফৎ ইতিহাসের নানা ঘটনা তুলে ধরে কমিউনিস্ট পার্টির ত্যাগ ও আপসহীন লড়াইয়ের কথা তুলে ধরতে হবে। পক্ষান্তরে কংগ্রেসের অবিচ্ছিন্ন ও নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতার ধারাটাকেও সবলে ছুঁড়ে মারতে হবে কুৎসাকারীদের মুখে।* [১৬]

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের নৌবিদ্রোহের ঘটনাই 'কল্লোল' নাটকের অবলম্বন। নাটকের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের ঔপনিবেশিক কৌশল ও কূটনীতি এবং জাতীয় কংগ্রেসি নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস উৎপল দত্ত সুকৌশলে আলোকপাত করেছেন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাস থেকে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাস পর্যন্ত 'রয়্যাল ইন্ডিয়ান আর্মি'-র ভারতীয় নৌসেনারা উনিশবার বিদ্রোহ

করে। এইসব বিদ্রোহ ব্রিটিশ শাসকরা চরম নিষ্ঠুরতার সঙ্গে দমন করে। ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারির ব্যর্থ ও অসম্পূর্ণ নৌবিদ্রোহের পর আবার নৌবিদ্রোহ সংগঠিত হয় ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ব্যাপক ও বিস্তারিতভাবে। সেনাবাহিনীর মধ্যে ব্রিটিশ শাসকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের যে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ তা ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের নৌবিদ্রোহের মধ্য দিয়ে গর্জে উঠেছিল। নাটকটি 'খাইবার' নামক জাহাজকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। 'খাইবার'-এর নাবিকদের জীবন কাহিনি, তাদের সংগ্রামকে দেখানো হয়েছে। অবশ্য 'খাইবার' নামক জাহাজেই সব বিদ্রোহ সংঘঠিত হয়েছিল, তা নয়। 'খাইবার' এখানে প্রতীকধর্মী। 'খাইবার' এখানে সব বিদ্রোহী জাহাজের প্রতিনিধি।

নাটকের সময়কাল ১৯৪৬ খ্রি.। এইসময় দুশো বছর পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের প্রাক্ মুহূর্ত। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তখন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে, সারা দেশ স্বাধীনতা লাভের উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের টাটকা অভিজ্ঞতা, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের নেতৃত্বে 'আজাদ হিন্দ ফৌজের' দিল্লি চলো অভিযানের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, পরাজিত আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দিদের মুক্তি আন্দোলন, ছাত্র-শ্রমিক ধর্মঘট, সারাদেশে এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সবেমাত্র শেষ হয়েছিল। এইসব প্রেক্ষাপটগুলিতেই নৌবিদ্রোহকে দেখতে হবে।

ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি বোম্বাই-এর ভারতীয় নৌসেনারা ব্রিটিশ রাজ শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ১৯ ফেব্রুয়ারি 'তলোয়ার' জাহাজের সেনারা পোতাশ্রয়ের সমস্ত জাহাজ থেকে ব্রিটিশ রাজশক্তির প্রতীক 'ইউনিয়ন জ্যাক' পতাকা নামিয়ে দেয়। সেখানে তারা কংগ্রেস, মুসলিম লিগ, কমিউনিস্ট পার্টির পতাকা উত্তোলন করে। বোম্বাই-এর রাজপথ পরিক্রমা করতে থাকে উক্ত তিন পতাকা নিয়ে। তাদের দাবির মধ্যে ব্যক্তিগত ও চাকরিগত সুযোগ-সুবিধার পাশাপাশি ছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দাবিদাওয়ার কথাও। নৌসেনাদের রাজনীতিগত দাবিদাওয়ার মধ্যে ছিল তাদের ভালো খাবার দিতে হবে ও ইংরেজ নাবিকদের সঙ্গে বৈষম্য দূর করতে হবে। আরও দাবি ছিল 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'-এর ধৃত বন্দিদের মুক্তি দিতে হবে, ভারতীয় রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দিতে হবে, ইন্দোনেশিয়া থেকে ভারতীয় সৈনিকদের দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে। আর সর্বশেষ এবং প্রধান দাবি ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যেতে হবে, ভারতকে স্বাধীনতা দিতে হবে।

'কল্লোল' নাটকে এই ঐতিহাসিক ঘটনার জীবন্ত কাহিনি তুলে ধরা হল। নৌসেনাদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও আত্মবলিদানের কাহিনিই এই নাটকের প্রধান বিষয়। এই সংগ্রাম ও আত্মবলিদানের পাশাপাশি উৎপল দত্ত দেখালেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কুটিল ষড়যন্ত্র ও শাসন ও

শোষণের হিংস্র তাণ্ডব। সেই সঙ্গে সঙ্গে উৎপল দত্ত দেখালেন এদেশীয় রাজনীতি বিদ্বেষ চরম স্বার্থপরতা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের দু'মুখো নীতি ও বিশ্বাসঘাতকতা। নাটকের শুরুতেই দেখি সূত্রধারের দীর্ঘ ভাষণ। গোড়াতেই তার ভাষণের মধ্যে পরিষ্কার করে দিয়েছে নাটকের মূল বক্তব্যটি। নাবিকদের সশস্ত্র এবং অহিংস আন্দোলনের গুণকীর্তন করার সঙ্গে সঙ্গে সে উচ্চস্বরে ঘোষণা করেছে অহিংস আন্দোলনের অসাড়তা এবং তার প্রতি বিদ্রূপ প্রতিভাসিত হয়েছে।

> *শোনা গেল ওদের দিগন্ত কাঁপানো ঢক্কানিনাদ, ইতিহাস মিথ্যা, সংগ্রাম মিথ্যা, মিথ্যা মানুষের আত্মত্যাগ, সত্য শুধু অহিংস বিপ্লব, ভারত স্বাধীন হয়েছে বিনা রক্তপাতে।।...*
>
> *সারা ভারতে গুলিতে নিহত মজদুর আর কিষাণের ঝাঁক ওরা সবাই ছোটলোক, টাকা কড়ি কোথায়, কোথায় বিষয় আশয়, দেখতে কদাকার, গায়ে নেই দামী খদ্দরের পাঞ্জাবি, পুনার আকাশচুম্বী আগা খাঁ প্রাসাদে ওরা কি অনশন করেছিল? তাই ওদের রক্ত নয়, নয়া ইতিহাসে ওদের থাকবে না স্থান।* [১৭]

এরপর সূত্রধারের গানের মাধ্যমেই ভারতবর্ষব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সশস্ত্র যে স্বাধীনতা সংগ্রাম, যে আন্দোলন, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত করে দেয় নৌবিদ্রোহকে—

> *আজ বলবো ঐ নৌবিদ্রোহের কাহিনী চুপি চুপি।*
>
> *অহিংস ইতিহাসের চোখে ধুলো দিয়ে,*
>
> *এই নিভৃত কক্ষে আপনাদের বলি—*
>
> *কোত্থেকে এল এই স্বাধীনতা।*
>
> *যতই সাবান দিয়ে কেচে*
>
> *ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা ঊর্ধ্বে তুলি,*
>
> *আসলে ও-পতাকা রক্ত লাল,*
>
> *বোম্বায়ের নাবিকদের, ক্রুদ্ধ ছোটলোকদের রক্তে।।* [১৮]

নাটকের প্রথম দৃশ্যে আমরা দেখতে পাই ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় নাবিকদের নিয়ে যুদ্ধজাহাজ 'খাইবার' চলেছে ইতালির বিখ্যাত বন্দর জেনোয়ার দিকে এক যুদ্ধ যাত্রায়। সঙ্গে রয়েছে ব্রিটিশদের বৃহৎ নৌবহর, কিন্তু তারা 'খাইবার' জাহাজকে সামনে এগিয়ে দেয়, কারণ তাদের মনোভাব এমন ছিল যে সমস্ত আক্রমণ খাইবারের উপর দিয়েই হয়ে যাক। সূত্রধারের

গানে সেকথা প্রকাশ পায়—

শত্রুপক্ষের আগ্নেয়াস্ত্র বড় দুর্ধর্ষ

কালা নাবিকদের ওপর দিয়েই যাক তাদের অগ্নিবর্ষণ।

কালা নাবিকদের রক্ত রক্ত নয়। [১৯]

দ্বিতীয় দৃশ্যেই আমরা সার্দূলের কথাতেই জানতে পারি যে, ইউরোপের এক যুদ্ধে তারা ফ্রান্সের উপকূলে নাৎসিদের হাতে বন্দি হয়ে পড়েছিল। তারপর তারা নাৎসিদের অকথ্য অত্যাচার ও নিপীড়ন সহ্য করেছিল। সার্দূলের কথায়—

দিনের পর দিন জর্মন বন্দীশিবিরে গরম লোহার ছ্যাঁকা খেয়েও বেঁচে আছি। ঐ শীতে শুধু জল আর রুটি খেয়ে বেঁচে থেকেছি। [২০]

জার্মানিদের অত্যাচার বর্ণনা করতে গিয়ে সার্দূল আরও বলে—

আর মার যা মারলো না! কালা নাবিকদের উপর জর্মন নাৎসিগুলোর বেশি রাগ। বলে আমরা নাকি আধা মানুষ আধা বাঁদর।... চাবুক মেরে কুমীরের পিঠ করে দিয়েছে। [২১]

উৎপল দত্ত প্রথম দৃশ্য ও দ্বিতীয় দৃশ্যের এই অংশে সুকৌশলে ‘কালা নাবিক’ অর্থাৎ ভারতীয়দের প্রতি ব্রিটিশদের অত্যাচার ও নাৎসিদের অত্যাচারকে এক ও সমগোত্রীয় করে দেখিয়েছেন। নাবিকরা যেমন নাৎসিদের হাতে অত্যাচারিত হয়েছে, তেমনি ব্রিটিশরাও তাদের উপরে নির্মম অত্যাচার করেছে। ব্রিটিশরা ভারতীয়দের অত্যন্ত নীচ ও হীন মনোভাবে তাদের সঙ্গে আচরণ করত। সেই সঙ্গে চলত ভারতীয়দের উপরে অকথ্য অত্যাচার ও নোংরা ভাষায় গালাগালি। নাটকে আমরা ব্রিটিশ অফিসারদের ভারতীয়দের সম্পর্কে অনবরত বলতে শুনি—

তুমি তো ইন্ডিয়ান। ইন্ডিয়ান জাতটাই নোংরা। ওরা মোষের মতন কাদায় পড়ে থাকতে ভালোবাসে। অথবা, ‘ডার্টি নিগার সোয়াইন’।... স্বপ্নেও ভেবো না তোমাদের বিশ্বাস করবো। ইন্ডিয়ানদের বিশ্বাস করা আদৌ আর সম্ভব নয়। [২২]

ব্রিটিশ শাসকদের ভয়াবহ অত্যাচার ও অকথ্য গালিগালাজ ও বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে সমস্ত নাবিকেরা ধর্মঘটের ডাক দেয়। ধর্মঘটী নাবিকদের মূল ঘাঁটি ‘তলোয়ার’ জাহাজ থেকে সাংকেতিক বেতার বার্তায় ঘোষণা করা হয়—

যদি দেশকে ভালোবাসো

যদি সাম্রাজ্যবাদকে ঘৃণা করো,

তবে ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬

নৌবহরের হরতালে শামিল হও।[২৩]

নাটকের তৃতীয় দৃশ্যে আমরা দেখতে পাই নাবিকরা যখন হরতালের ডাক দিয়েছিল তখন 'খাইবার' জাহাজ যাচ্ছিল করাচির অভিমুখে। 'তলোয়ার'-এর আহ্বানে 'খাইবার' করাচিতে না গিয়ে বোম্বাই, বর্তমানে মুম্বাই ফিরে এল ও হরতালে যোগ দিল। 'খাইবার'-এর মধ্যে ব্রিটিশ অফিসাররা 'পিপিলস এজ' পত্রিকার একটা কপি হাতে পায়, এটি তাদের মতে রাজদ্রোহমূলক। এই পত্রিকার অংশ কীভাবে সামরিক জাহাজে এল তার কারণ অনুসন্ধান করতে ব্রিটিশ অফিসাররা নাবিকদের ওপরে চরম অত্যাচার চালায়, একজনকে বন্দিও করে। এহেন পরিস্থিতি সার্দূলের অসহনীয় হয়ে ওঠে। সে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, হাতে মেশিনগান তুলে নেয়, একজন অফিসারকে জখমও করে বাকিদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করে। তৃতীয় দৃশ্যটি খুঁটিয়ে বিচার করলে দেখা যায় জাহাজে পত্রিকার অংশ নিয়ে আনার বিষয়টি তাদের পূর্বপরিকল্পিত কৌশল যাতে ব্রিটিশ অফিসারদের সঙ্গে তাদের সংঘাত সৃষ্টি হয় ও যার ফলে তাদের বোম্বাই ফেরার পথ পরিষ্কার হয়। ১৮ই ফেব্রুয়ারি বেলা ২টো পনেরোয় সর্বাত্মক হরতাল সংগঠিত হবে তার পূর্ব পরিকল্পনা আগে থেকেই তাদের ছিল। এই দৃশ্যে সার্দূল সিং-এর সশস্ত্র প্রত্যাঘাতের দ্বারা একজন ইংরেজ অফিসারকে জখম করা ও আত্মসমর্পণে বাধ্য করার মাধ্যমে উৎপল দত্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করেন— অস্ত্র ছাড়া জয় নেই সাম্রাজ্যবাদকে দমন করতে গেলে দেশকে স্বাধীনতা দিতে গেলে সশস্ত্র প্রতিরোধ ছাড়া কোনো পথ নেই—

> *সার্দূল ।। ক্যাপ্টেন আর্মস্টং। আপনাদের ঠিক পাঁচ মিনিট সময় দেয়া হোলো, পাঁচ মিনিটের মধ্যে অস্ত্রগুলো ডেকে রেখে হাত তুলে দাঁড়াবেন। নইলে মেশিনগান চালিয়ে চালিয়ে আপনাদের তিনজনকেই শেষ করে দেব।*
>
> *[নীরবতা। তারপরই রেটিংরা আওয়াজ তোলে সাম্রাজ্যশাহী যে বরবাদ, ইনকিলাব জিন্দাবাদ।]*
>
> *ডেন।। স্ট্যান্ড ব্যাক। স্ট্যান্ড ব্যাক, ইউ জামড মিউটিনিয়ার্স, অর আই উইল ব্লো ইওর ব্রেনস্ আউট।*
>
> *আর্ন।। গানার সার্দূল সিং। এ কি করলে? ভারতীয় নৌবাহিনীর নামে কলঙ্ক লেপন করলে? ডেনহাম, অস্ত্রাগারে যাওয়ার চেষ্টা করো। সার্দূল সিং, আমি হুকুম দিচ্ছি তুমি এই মুহূর্তে টার্গেট থেকে নেমে এস।*
>
> *[ডেনহাম দৌড় মারতেই সার্দূলের মেশিনগান গর্জে ওঠে। ডেনহাম ছিটকে পড়ে যান। জাহাজীরা আবার আওয়াজ তোলে।]*

সার্দূল।। ক্যাপ্টেন আর্মস্টং, অস্ত্র ফেলে দিন বলছি নইলে দেখলেন তো, মেরে ফেলবো?

[ডেনহাম কাতরাতে কাতরাতে উঠে দাঁড়িয়েছেন।]

আর্ম।। রক্তপাত করলে? তোমরা বৃটিশ-রক্তপাত করলে। বেশ, এখনকার মতন আমরা আত্মসমর্পণ করলাম।। [২৪]

'খাইবার' জাহাজের নাবিকেরা স্লোগান তোলে ভারতের পরাধীনতা থেকে মুক্তির এবং ব্রিটিশের ভারত ছাড়ার প্রসঙ্গ নিয়ে।—

সাম্রাজ্যবাদী হো বরবাদ, ইনকিলাব জিন্দাবাদ। [২৫]

গোপনে অস্ত্রশস্ত্র সংগৃহীত হতে থাকে। সেগুলি সব গোপনে ফ্রন্টিয়ার বস্তিতে সার্দূল সিং-এর মা কৃষ্ণা বাঈ-এর কাছে জমা হতে থাকে—

ঝোলার মধ্যে ছ'টা কোল্ট রিভলবার আছে আর কার্তুজ। রেখে দাও। [২৬]

কিন্তু নীতির প্রশ্নে কিছু গোলমাল দেখা যায়। কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে মতবিরোধ তুঙ্গে ওঠে সার্দূলের ও জাহাজের নাবিকদের। নাবিকেরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নেমে পড়তে যায়। তা নিয়ে সার্দূলের সঙ্গে সাকসেনার তর্ক শুরু হয়—

সার্দূল।। ও মানে— মাপ করবেন কমরেড, আমরা সমুদ্রে থেকে বোধহয় ঘটনার খেই হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের ধারণা ছিল এটা স্বাধীনতার লড়াই। আমাদের ধারণা ছিল দাবী হবে একটাই— ভারত ছাড়ো— বিনা শর্তে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা।...

সাকসেনা।। দেখুন, এ লড়াই সারা ভারতের লড়াই। কংগ্রেসের নেতৃত্বে চলবে এই লড়াই। তাই কোনমতেই আমরা রক্তপাত ঘটতে দেব না। রক্তপাতে ইংরেজেরই লাভ। সংকীর্ণ দৃষ্টি ত্যাগ করুন। সারা ভারতের অহিংস লড়ায়ের সঙ্গে খাইবার-এর লড়াইকে মিলিয়ে দিন।

সার্দূল।। বোম্বায়ের সাধারণ মানুষ? তারা জানতে পারছে তো সব খবর?

সাকসেনা।। হ্যাঁ, কাল সাধারণ ধর্মঘট। তবে সেটা ভুল হয়েছে। অমার্জনীয় ভুল। বৃটিশ ফৌজে বোম্বাই এখন ঠাসা। গুলি চলবেই। তাই কংগ্রেস এই সাধারণ ধর্মঘটকে নিন্দা করছেন।

সার্দূল।। (জ্বলে ওঠে) কী বললেন? নাবিকদের সমর্থনে সাধারণ মানুষ রাস্তায় নামছে, তাকে— তাকে কংগ্রেস নিন্দা করছে?

সাকসেনা।। হ্যাঁ। আপনারা কি কংগ্রেসের নেতৃত্ব ছাড়াই লড়বেন নাকি? সে ক্ষমতা আছে? সর্দার

মগনলাল কাল সন্ধ্যেবেলায় বোম্বাই পৌঁছেছেন, তিনি নিজে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন। আপনারা কি তাঁকে বাদ দিয়েই লড়াই চালাবেন? [২৭]

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম যেমন 'খাইবার' জাহাজে চলে তেমনি জলের সংগ্রাম স্থলভাগেও সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ব্রিটিশরাও ফ্রন্টিয়ার বস্তিতে অত্যাচার চালাতে থাকে নাবিকদের মনোবল ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য। খাইবার জাহাজের নাবিকরা দুরবিন দিয়ে দেখে গোরা ফৌজরা কাসল ব্যারাক আক্রমণ করেছে, নিরস্ত জাহাজীদের ও তার পরিবারবর্গদের নির্মমভাবে গুলি করে মারছে। বিপদ বুঝে এবার বস্তির মানুষরাও নারী পুরুষ অবাধে হাতে অস্ত্র তুলে নেয়। এদিকে তলোয়ারের সঙ্গে খাইবার যোগাযোগ করে, কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ পায় না। নাবিকেরা নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেয়, পালটা গুলি চালাতে হবে, নিরস্ত্র জাহাজীদের প্রাণ বাঁচাতে হবে।—

সার্দূল।। টারেট আকবর ক্লিয়ার? টারেট আকবর ক্লিয়ার। টারেট হুমায়ুন ক্লিয়ার? টারেট হুমায়ুন ক্লিয়ার। টারেট আকবর, হুমায়ুন, ইনকিলাব ক্লিয়ার।

রাজ।। তলোয়ারের সাড়া নেই যে।

সার্দূল।। চেষ্টা করো। আবার চেষ্টা করো।

সিগ্‌ন্যালার।। হ্যালো তলোয়ার, হ্যালো তলোয়ার, হ্যালো তলোয়ার—

রাজ।। বেয়নেট চার্জ করে মারছে—

সার্দূল।। টারেট আকবর থ্রী ডিগ্রীজ আপ রেঞ্জ ওয়ান জিরো—

রাজ।। কি করছো? কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ ছাড়া গুলি চালাব? সাকসেনা কি বলে গেলেন শুনলে না?

সার্দূল।। ওখানে আমার কমরেডরা দাঁড়িয়ে মরছে! [২৮]

কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ অমান্য করে সার্দূল গুলি চালায়। নিরস্ত্র জাহাজীদের ওপর গোরা সৈন্যদের বর্বরোচিত আক্রমণ থেকে রক্ষা করে, সঙ্গে সঙ্গে গোরা সৈন্যদের পিছু হটতে বাধ্য করে—

দূরাগত কোলাহল চেপে খাইবার-এর কামান গর্জন করে ওঠে।... দুষমনের মেশিনগান পোস্ট ধ্বসে গেছে। টারেট হুমায়ুন রেঞ্জ নাইন ফোর অট অট অট টু গ্রীণ স্যালভো। দুষমন পালাচ্ছে। [২৯]

আসলে উৎপল দত্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে পরাজিত করতে ও তাদের থেকে দেশকে স্বাধীন করতে গেলে অস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা সজোরে তুলে ধরার চেষ্টা করেন, সশস্ত্র প্রতিরোধের পক্ষে তিনি সহমত পোষণ করেন।

'কল্লোল' নাটকে প্রাক্তন জাহাজী সুভাষ দেশাই চরিত্রটির মধ্য দিয়ে উৎপল দত্ত শ্রেণিসংগ্রাম বিষয়টিকে প্রস্ফুটিত করতে চেয়েছেন। কাসল ব্যারাক-এর বিপন্ন জাহাজীদের বাঁচাতে গিয়ে এবং গোরা ফৌজকে পিছু হটাতে গিয়ে ঢুকে পড়েছিল এক সংকীর্ণ প্রণালীতে। তৎক্ষণাৎ পাঁচটি ব্রিটিশ যুদ্ধ জাহাজ সেই প্রণালীর মুখ বন্ধ করে দেয়। খাইবার হয়ে পরে বহির্জগতের থেকে বিচ্ছিন্ন। প্রবল খাদ্যাভাব দেখা দেয়। জীবন বিপন্ন হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে সুভাষ দেশাই এগিয়ে আসে খাইবারের নাবিকদের রক্ষাকর্তা হিসেবে। এই পরিস্থিতিতে ওয়াটার ফ্রন্ট বস্তি থেকে সুভাষ দেশাই খাইবারে খাদ্য পৌঁছে দেয় গোপনে সাঁতার কেটে, তাঁর একটি হাত না থাকা সত্ত্বেও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সে খাবার পৌঁছে দেয় খাইবার জাহাজের ক্ষুধার্ত নাবিকদের কাছে।—

সুভাষ।। লক্ষ্মী গোনো। চাপাটি পঞ্চাশটা, শিক কাবাব— গোনো—

লক্ষ্মী।। এসব কেনো?

সুভাষ।। খাইবার জাহাজের জন্য খাবার দরকার হলে সাঁতরে গিয়ে দিয় আসবো। [৩০]

সুভাষ দেশাই জানে যে ওয়াটার ফ্রন্ট বস্তিকে রক্ষা করার জন্য খাইবার জাহাজ বিপদে পড়ে। তাই খাইবার জাহাজের নাবিকদের বিপদে সুভাষ দেশাই স্থির থাকতে পারে না, তার একটি হাত না থাকা সত্ত্বেও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শ্রেণি সংগ্রামে এগিয়ে আসে।

প্রত্যক্ষ সংগ্রামে যখন নাবিকদের কায়দা করা যাচ্ছে না, বিদ্রোহ আরও ক্রমাগত ব্যাপক আকার ধারণ করছে, বোম্বাই-এর সাধারণ মানুষ নৌবিদ্রোহের সমর্থনে রাস্তায় নামে, বামপন্থীরা নাবিকদের দাবির সমর্থনে পরপর দুদিন গোটা বোম্বাই-এ ধর্মঘটের ডাক দেয়, তখন কংগ্রেস নেতাদের সহায়তায় ব্রিটিশরা চক্রান্ত ও কৌশলের আশ্রয় নেয়। তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। কংগ্রেস নেতা মগনলাল বাজোরিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়ে ক্যাপ্টেন আর্মস্টং, অ্যাডমিরাল র‍্যাটট্রে ও ডেনহাম অ্যাডমিরাল র‍্যাটট্রে-র বাংলোয় জরুরি বৈঠকে উপস্থিত হন। সেখানে তৈরি হয় বিদ্রোহীদের দমন করার নানা রকম চক্রান্তের নকশা ও ক্ষমতা লাভের নির্লজ্জ লিপ্সা। আলোচনায় কংগ্রেস নেতা মগনলাল, উদ্দেশ্য ব্রিটিশ ও ভারতীয় ব্যবসায়ীদের স্বার্থেও বোম্বাই-এ গুলির লড়াই বন্ধ হোক। কংগ্রেস নেতা ও ব্রিটিশ অফিসারদের কথোপকথনে শাসক শ্রেণির অন্দরমহলের ধূর্ত ও নির্লজ্জ অভিসন্ধির স্বরূপ উন্মোচিত হয়।—

আর্ম।। আমি পড়ে দিচ্ছি, এতে বলছে বৃটিশ ব্যবসায়ীরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ বামপন্থীদের কবলে চলে যাচ্ছে, ফলে এই দেশে আর টাকা লগ্নী করা উচিত কিনা তারা ভাবছেন।

এখান থেকে ব্যবসা গোটানো উচিত কিনা তাঁরা বিবেচনা করছেন।

র‍্যাট।। কতকগুলো মুনাফাবাজ কি ভাবছে আর বিবেচনা করছে তা ভাবার আর সময় নেই। আমার কাজ বোম্বাইকে ঠেঙানো, ঠেঙাবো।... পুরো বম্বে বামপন্থীদের হাতে চলে গেছে, এ অবস্থায় গুলি চালাবো না?

মগন।। বামপন্থীদের হাতে যায়নি এখনো, যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। যত আপনি গুলি চালাচ্ছেন তত সেই সম্ভাবনা দৃঢ় হয়ে উঠেছে।

আর্ম।। হ্যাভ এ ড্রিঙ্ক স্যার।

মগন।। ড্রিঙ্ক-ফিঙ্ক পরে হবে। বৃটেনের লেবার পার্টির সরকার কী চায়? তারা কি এখানে কমিউনিস্টদের হাত জোরদার করে তবে স্বাধীনতা দেবে? তাহলে পরের দিনই আই সি-আই আর লিভার ব্রাদার্স-এর বিশাল সংগঠনকে দখল করে ওরা বৃটিশ মালিকদের জেলে পুরবে। আমরা জাতীয়করণ করলে ক্ষতিপূরণ দেব। জাতীয়করণও হয়তো করবো না বৃটিশ পুঁজির সঙ্গে আমাদের কোন কলহ নেই। বরং ভারতীয় পুঁজি আর বৃটিশ পুঁজি বেশ গলাগলি করেই বাঁচতে পারে।...

র‍্যাট।। ও, বি কোয়ারেট আর্মস্টং। বৃটিশ পুঁজি টিকবে ভাবছো কেন? কোথায় গ্যারান্টি?

মগন।। আমরা গ্যারান্টি। কংগ্রেস গ্যারান্টি।

র‍্যাট।। ইন্ডিয়ানদের আমি বিশ্বাস করি না।

মগন।। আপনার অবিশ্বাসে কিছু এসে যায় না। আপনার বাবারা বিশ্বাস করেন। তাই ওঁরা চান পুরো দেশের আন্দোলনের নেতৃত্ব থাকবে কংগ্রেস আর লীগের হাতে লাল ঝাণ্ডাওয়ালাদের হাতে না। [৩১]

উৎপল দত্ত স্পষ্টভাবে বলতে চেয়েছেন ব্রিটিশ পুঁজির স্বার্থ রক্ষার জন্যই তারা ভারতকে স্বাধীনতা দিচ্ছে। ভারত থেকে ব্রিটিশ পতাকা সরিয়ে নিচ্ছে এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের কৃতিত্ব ও নেতৃত্ব কংগ্রেসের হাত তুলে দিচ্ছে। ব্রিটিশ পুঁজি ও ভারতীয় পুঁজির স্বার্থ যাতে কোনোভাবেই বিঘ্নিত না হয় সে ব্যাপারে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশ অফিসারদের গ্যারান্টি দিচ্ছে।

নাটক এগোবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখতে পাই বিদ্রোহকে দমন করার জন্য হীন চক্রান্ত ও নির্লজ্জ কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। কংগ্রেস নেতা মগনলালের মতে সঠিক রণকৌশল হল খাইবারের ওপরে গুলি না চালিয়ে সুকৌশলে খাইবারকে অন্য জাহাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করা। আবার সাকসেনার নেতৃত্বে অন্যসব জাহাজের নাবিকেরা যেসব দাবি তুলেছে সেগুলোর কয়েকটা আপাতত মেনে নিতে হবে কৌশল হিসেবে। খাইবার ছাড়া বাকি জাহাজের নাবিকেরা এটাকে

তাদের জয় হিসেবে গ্রহণ করবে ও তারা ধর্মঘট তুলে নেবে এবং খাইবার জাহাজ অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। এটা ছিল মগনলালের পরামর্শ।

এরপর দেখি ধর্মঘটি নাবিকদের মূল ঘাঁটি তলোয়ার জাহাজ থেকে খাইবারকে জানানো হয় যে নাবিকদের অধিকাংশ দাবি কর্তৃপক্ষ মেনে নিয়েছে। নাবিকরা এটা তাদের জয় হিসেবে দেখছে তাই তারা ধর্মঘট তুলে নিয়েছে। একথা শুনে খাইবর জাহাজের নাবিকেরা স্তম্ভিত হয়ে যায়। তারা অপ্রত্যাশিত হয়ে পড়ে। তারা অস্ত্র ত্যাগ করতে চায় না, কারণ এটা তাদের ছিল স্বাধীনতার লড়াই।—

রাজ।। কি লাভ হবে? এখন আমরা একা।

সার্দূল।। অত লাভ লোকসান হিসেব করে লড়াই করতে আসিনি।

গফুর।। আমারও তাই মত।

অগ্নি।। তোমার মা মারা গেছেন বলে তুমি বেশী রেগে আছ।

রাজগুরু।। সার্দূল, এতগুলো জীবন!

সার্দূল।। এই কটা জীবন! কি এমন অমূল্য জীবন? দেশের স্বাধীনতার পাশে খুব কি মহামূল্য এই জীবন ক'টা?

সশস্ত্র প্রতিরোধের পথ থেকে সার্দূল সিং সরে আসে না। তার কাছে ব্যক্তিগত সম্পর্কের চেয়ে স্বাধীনতা, দেশের মুক্তি অনেক বেশি মূল্যবান। সার্দূলের এই অনমনীয় মনোভাবে অন্য জাহাজীরা বিস্মিত হয়ে যায়, অনেকে ক্ষুব্ধও হয়। অন্য জাহাজীরা এটাকে গোয়ার্তুমি, সমস্যাকে জিইয়ে রাখা, অপরিণত চিন্তা বলে তাকে তিরস্কার করে। মগনলাল তাকে জানায় যে সার্দূল সিং-এর মাকে গ্রেফতার করা হয়েছে, আলোচনায় না বসলে তার মাকে হত্যা করা হবে। তবুও সে তার অস্ত্র ত্যাগ করতে চায় না। কারণ তার কাছে দেশের মূল্য সমস্ত সম্পর্কের চেয়ে প্রধান হয়ে দাঁড়ায়।—

মগন।। কিন্তু একটা জিনিস শুনেছ? আমাদের বাবা আর তোমার মাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে হস্টেজ হিসাবে। অর্থাৎ আলোচনায় না বসলে, যুদ্ধে মাতলে ওদের গুলি করে মারবে। এবার কি বলবে সার্দূল?

সার্দূল।। যা বললাম তাই। মা-বাবা বুঝি না। অস্ত্র ছাড়বো না, লড়াই থামবে না।

রাজ।। সার্দূল! এদিকে এস। কী করছো? তুমি উন্মাদ।...

সার্দূল।। না। তাঁকে বাঁচানোর চেয়েও বড় হোলো লড়াইটাকে বাঁচানো। ভারতের সংগ্রামী মানুষ যেন এ কথা বলতে না পারে জাহাজীরা নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য স্বাধীনতার লড়াইকে বিসর্জন দিয়েছিল। [৩২]

সার্দূল সিং-এর অদম্য জেদ ও অস্ত্র পরিত্যাগ না করার সংকল্পকে দমিত না করতে পেরে কংগ্রেস নেতাদের সহায়তায় ব্রিটিশরা এক ধূর্ত কৌশলের আশ্রয় নেয়। নৌসেনাদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চেয়েছিল এবং নৌসেনাদের কংগ্রেসের তরফ থেকে গ্যারান্টি দিয়ে বলা হয়েছিল তাদের গায়ে কেউ হাত দেবে না। কিন্তু সেই গ্যারান্টি রক্ষা তো দূরর কথা, তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছিল—

রাজ।। র‍্যাটট্রের সঙ্গে আলোচনায় আমরা যাবো। ওঁরই বাংলোয়। তবে গ্যারান্টি চাই আমাদের গায়ে হাত দেওয়া হবে না।

মগন।। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস গ্যারান্টি।

রাজ।। সাকসেনাজী গ্যারান্টি দিন।

সাক।। কংগ্রেস নিজে দিচ্ছে, সেখানে—

রাজ।। কংগ্রেসের চেয়ে আপনি আমাদের ঢের বেশী কাছের লোক।

সাকসেনা।। বেশ, গ্যারান্টি দিচ্ছি— আপনাদের গায়ে হাত দেওয়া হবে না। [৩৩]

সর্দার মগনলাল (ইতিহাসের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল) মহেশ সাকসেনা (ইতিহাসে স্ট্রাইক কমিটির সভাপতি এস. এস. খান) এবং ব্রিটিশ কমান্ডিং অফিসার র‍্যাটট্রেরা একসঙ্গে ষড়যন্ত্র করে হাত মিলিয়ে নৌসেনাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। তাদের দেশ স্বাধীনতার সংকল্পকে বানচাল করে দিয়েছিল। র‍্যাটট্রের বাংলোয় যখন আলোচনার জন্য খাইবারের নাবিকরা উপস্থিত হয় তখন তারা কিছু বুঝে ওঠার আগেই সশস্ত্র ব্রিটিশ ফৌজ তাদের ঘিরে ফেলে, গ্রেফতার করে ও জেলে পাঠায়। সব গ্যারান্টি নিমেষে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের এই গ্যারান্টি এক মিথ্যা, আপসকামী ধর্মঘটি নেতৃবৃন্দের গ্যারান্টি ছিল অন্তঃসারশূন্য। আসলে সশস্ত্র নৌবিদ্রোহকে দমন করার উদ্দেশ্যে এইসব গ্যারান্টি ছিল এক একটা ধূর্ত কৌশল মাত্র। শুধুমাত্র নিজ স্বার্থ সিদ্ধির এক কৌশল। নাটকটি ব্যক্তিগত ও অর্থনৈতিক আন্দোলন নিয়ে শুরু হলেও তা ক্রমে রাজনৈতিক আন্দোলনে পর্যবসিত হয়। সার্দূল সিং-এর নেতৃত্বে জাহাজের নাবিকদের সব দাবি এসে সংহত হয়েছিল ভারতের স্বাধীনতার সংকল্পে। সেই স্বাধীনতা সংকল্প ধুলোয় লুণ্ঠিত

হয় এক স্বার্থপর শ্রেণির বিশ্বাসঘাতকতায়। উৎপল দত্ত অত্যন্ত নিপুণভাবে অহিংস আন্দোলনের অসারতা ও সহিংস আন্দোলনের স্বার্থকতা তুলে ধরেছেন আলোচ্য নাটকে। অহিংস আন্দোলনকারী কংগ্রেসিদের হীন চক্রান্ত ও বিশ্বাসঘাতকতা কীভাবে সেদিন সহিংস আন্দোলনকারী নাবিকদের সব আন্দোলনকে ভেস্তে দিযে স্তব্ধ করে দিয়েছিল, ইতিহাসের সেই কালো যবনিকা তিনি 'কল্লোল' নাটকে অতি নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন।

অজেয় ভিয়েতনাম

প্রথম অভিনয় : ৩১ আগস্ট ১৯৬৬, মিনার্ভা,

প্রথম প্রকাশ : জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, আগস্ট ১৯৬৬।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসীন শক্তির বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের মানুষের যে 'রক্তক্ষয়ী মুক্তিসংগ্রাম চলছিল, ভিয়েতনামের উপরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নৃশংস আক্রমণ ও ভিয়েতনামবাসীদের প্রবল প্রতিরোধ আন্দোলন, তা সারা বিশ্বের রাজনীতিকে তোলপাড় করে তুলেছিল। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ সাম্রাজ্যবাদকে ধিক্কার জানাচ্ছিল, ভিয়েতনামী জনগণের দুঃসাহসিক প্রতিবাদ প্রতিরোধকে সমর্থন জানাচ্ছিল পৃথিবীর বিবেকবাণ মানুষেরা। এই রাজনৈতিক উত্তাল পরিস্থিতিতে উৎপল দত্তের লেখনীও থেমে থাকেনি, তিনি এগিয়ে এলেন তাঁর নাটক নিয়ে বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদের শরিক হিসেবে। তাঁর নাটকের মধ্যেই তিনি এই জঘন্য রাজনীতির প্রতিবাদের ভাষা ফুটিয়ে তুললেন।

হ্যানয় থেকে প্রকাশিত 'ভিয়েৎনাম কুরিয়ার' পত্রিকার একটি রিপোর্টকে অবলম্বন করে এই নাটকটি লেখা হয়েছিল। আক্রান্ত ভিয়েতনামী গ্রামবাসীদের ওপরে মার্কিন সেনাদের নৃশংস অত্যাচারের খতিয়ান নিয়েই এই নাটক। 'নিউইয়র্ক টাইমস্'-এর ক্লার্ক সাহেব মিনার্ভায় যখন 'অজেয় ভিয়েতনাম' অভিনীত হচ্ছিল তখন এই নাটক দেখতে আসেন। নাটক দেখে তিনি উৎপল দত্তের উদ্দেশ্যে বলেন যে— তারা এসব মিথ্যা প্রচার করছেন, মার্কিন সেনারা এই নৃশংস অত্যাচার কখনই করতে পারে না। জবাবে উৎপল দত্ত বলেন—

> *"আমরা হ্যানয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে এ নাটক করেছি, আর আপনারা মার্কিনরা হচ্ছেন দুনিয়ার পয়লা নম্বরের মিথ্যাবাদী।* [৩৪]

'অজেয় ভিয়েতনাম' নাটকটি দাঁড়িয়ে আছে বীভৎসতার ওপরে। ভিয়েতনামের মানুষের ওপরে নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে মার্কিন সেনাবাহিনীর অত্যাচারই এর প্রধান উপজীব্য বিষয়। সেই

সঙ্গে ভিয়েতনামী জনগণের সশস্ত্র প্রতিবাদ প্রতিরোধকেও দেখানো হয়েছে। বাংলা নাটকে এরকম ভয়ংকর ও বীভৎস অত্যাচারের দৃশ্য খুবই কম দেখা যায়। দুটি যুযুধান পক্ষ— একদল লড়ছে দেশের জন্য, আক্রান্ত মাতৃভূমির জন্য নারী শিশু ও দেশকে বাঁচানোর জন্য। আরেক দল হল আক্রমণকারী, তারা লড়ছে অন্যদেশের বুকে বসে তাদের সবকিছু কেড়ে নেওয়ার জন্য। সৈন্যদের এই মানসিক ফারাক অতি সুন্দরভাবে নাটকটির মধ্যে উৎপল দত্ত সুচিত্রিত করেছেন। ১৯৬০-এর দশকে বাংলার রাজ্য ও রাজ্যনীতিতে এক বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল আলোচ্য নাটকটি।

নাটকের শুরুতেই আমরা দেখতে পাই মার্কিনী অফিসারদের তৎপরতা। দক্ষিণ ভিয়েতনামের কুচি নামক শহরে মার্কিন জেনারেলের দফতরে জেনারেল কিট্‌স কোল্টন একটা ফাইল খুলে খুব দ্রুত লেখালেখি করতে থাকেন, পিছনের জানালাগুলো বালির বস্তা দিয়ে ঠাসা। বালির বস্তা দিয়ে ভিয়েতনামীদের তীব্র প্রতিঘাত ও প্রতিরোধকে ঠেকাতে চাইছেন। এই দৃশ্যেই তার কথা থেকেই জানা যায় সায়গন থেকে মাত্র ৩২ কিলোমিটার দূরে এই কুচি শহর, সেখানে হেলিকপ্টারে চড়ে আসতেই সময় লাগছে নয় ঘণ্টা। ভিয়েতনামীদের সশস্ত্র প্রতিরোধের সামনে পড়ে তাদের ঘুর পথে আসতে হচ্ছে। উৎপল দত্ত এখানে ভিয়েতনামী কমিউনিস্ট যোদ্ধাদের বীরত্ব ও গৌরবের জয়গান করেছেন—

> *জেনারেল : আপনারা অত্যন্ত ক্লান্ত আমি জানি। রাত বারোটায় সায়গন থেকে হেলিকপ্টারে উড়ে বত্রিশ কিলোমিটার দূরে এই কু-চি শহরে আসতে ন'ঘণ্টা সময় লেগেছে। কেন এত ঘুরে আসতে হয় সবাই জানেন।*
>
> *ফিনি : হলদে শয়তানরা রাইফেল দিয়ে হেলিকপ্টার নামাবে নইলে—।* [৩৫]

চারজন সামরিক অফিসার জেনারেলের ঘরে ঢোকেন ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের হো-বো গ্রামে অপারেশন কীভাবে শুরু হবে, তাই নিয়ে আলোচনায় বসেন।

এই চারজন অফিসারদের মধ্যে মার্ক হুইলার, যিনি ভিয়েতনামে নতুন এসেছেন, তিনি হো-বো গ্রামে সমস্ত অপারেশানের নেতৃত্ব দেবেন এবং অপারেশনের নাম দেওয়া হয় 'অপারেশান ক্রিমপ্।'[৩৬] জেনারেল তাকে ভিয়েতনামের বর্তমান পরিস্থিতি বুঝিয়ে দেন। জেনারেলের নির্দেশে একটি চার্ট আসে, সেখানে লেখা থাকে ১৯৬১ থেকে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত যুদ্ধে মার্কিনদের যে ক্ষয়ক্ষতি তার হিসাব নিকেশ দেখিয়ে দেয় জেনারেল। —

> *জেনারেল ।। ফর দি ইনফর্মেশন অব দিস ভেরি আমেরিকান ইয়ংম্যান— পাঁচ বছরে ওরা এক লক্ষ*

তেইশ বার আমাদের আক্রমণ ক'রে চার লক্ষ ষোলো হাজার লোককে মেরে গেছে। সত্তর হাজার সাতশ উনসত্তরটি অস্ত্র নিয়ে গেছে কেড়ে। [৩৭]

এরপরে আমরা আর একটি চার্ট দেখতে পাই সেখানে ভিয়েতনামী বন্দিদের কীভাবে জিজ্ঞাসা করা হবে তার একটা বিস্তারিত নির্দেশনামা। আমেরিকান সেনা অফিসাররা ভিয়েতনামী বন্দিদের উপরে বীভৎস শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চালাত, উৎপল দত্ত সেই অত্যাচারের দৃশ্য নাটকের ভাষায় অতীব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। যা পড়ে ও দেখে পাঠকবর্গ বীভৎসতার আতঙ্কে শিহরিত হয়। মার্কিন সেনা অফিসাররা ভালো মতোই জানেন যে ভিয়েতনামী মুক্তিযুদ্ধের মানুষরা অর্থাৎ গেরিলারা গ্রামবাসীদের প্রত্যক্ষ সাহায্য পায় বলেই তারা লড়াই চালিয়ে যেতে পারে। অতএব গ্রামবাসীদের জেরা করে বার করতে হবে গেরিলারা কোথায় লুকিয়ে আছে। স্বীকারোক্তি না পাওয়া পর্যন্ত অত্যাচারের বীভৎসতা ক্রমাগত বাড়তেই থাকে। তাদের চার্টের নির্দেশনামা এইরকমই—

প্রথম— ছুরি, একটু একটু ক'রে ঢুকিয়ে। দ্বিতীয়— কাঁটাতারের ফাঁস, গলায় পরিয়ে চাপ। তৃতীয়— বন্দুকের কুঁদো দিয়ে হাতের আঙুল ছেঁচে দেয়া। চতুর্থ—

ফিনি।। কোনো লাভ হয় না, স্যার, বিয়েন হোয়াতে আমরা সঙীন গরম ক'রে সারা গায়ে ছেঁকা দিয়েছি, তবু কেউ কিছু বলেনি।

জেনারেল।। বলার ওপর অত জোর দিচ্ছেন কেন, কর্ণেল, আমরা তো জানি বলবে না। তবু যন্ত্রণা দিতে হবে। টর্চার থেকে গবেষণার আনন্দ যদি না পান, হলদে উলঙ্গ দেহগুলোকে ছটফট করতে দেখে যদি একটা বৈজ্ঞানিক শিহরণ না জাগে শিরদাঁড়ায়, তবে বুঝবেন ভিয়েতনামে লড়বার মতন স্নায়ু তৈরী করা হয়নি এখনো— এক্ষুনি বদলির আবেদন করুন। চতুর্থ— চোখের সামনে ফ্লেমথ্রোয়ারের ফিউম ছেড়ে চোখ গলিয়ে দেয়া। পঞ্চম থেকে একাদশ— মনস্তাত্ত্বিক চাপসৃষ্টি, যথা মায়ের সামনে ছেলেকে, স্বামীর সামনে স্ত্রীকে, বা অন্যান্য আত্মীয়ের সামনে আত্মীয়কে নির্যাতন।

নাইট।। প্লেই মে-তে একটা মেয়েকে স্বামীর সামনে ধর্ষণ করিয়েছিলাম।

জেনারেল।। মোস্ট সায়েন্টিফিক। দ্বাদশ বিষয়টি লক্ষ্য করুন— মার্কিন মিলিটারী ইনটেলিজেন্স্-এর আবিষ্কার— ইলেকট্রিক শক। এই ব্যাটারী আপনাদের কিট্-এর সঙ্গে দেয়া হবে। মেড বাই স্টক্টন ইলেকট্রিক্যাল্স্, নিউ ইয়র্ক।

ঐ তার দুটো বেঁধে দিতে হবে— চার্ট দেখুন— মেয়েদের স্তনে আর পুরুষদের জননেন্দ্রিয়ে। মন্তব্য— আগে এক বালতি জল ঢেলে নেয়া প্রয়োজন সাবজেক্ট-এর গায়ে। [৩৮]

এরপর যে চার্টটি আসে সেটি যুদ্ধে গ্যাস বোমা ব্যবহার বিষয়ক। মার্কিনী তথ্য অনুসারে এই গ্যাস বোমা ব্যবহার করে তারা ভিয়েতনামে প্রায় চার লক্ষ লোককে পঙ্গু করে দিতে সমর্থক হয়েছেন। গ্যাস দুটির নাম-ক্লোরোঅ্যাসেটোফেনোন ও ফেনারসাক্সি ক্লোরাইড। যে দুটি সংক্ষিপ্ত নাম— সি-এন ও ডি-এম। এই গ্যাসে ফসল যেমন নষ্ট হয়ে যায় সেই সঙ্গে শিশু ও বৃদ্ধরা বেশি করে মারা যায়। ফসল নষ্ট করতে পারলে ভিয়েতনামীরা অন্নাভাবে দুর্বল হয়ে পড়বে আবার শিশুদেরকে হত্যা করতে পারলে তাদেরকে মানসিকভাবেও দুর্বল করে দেওয়া যাবে। সঙ্গে গ্যাসের প্রতিক্রিয়ার প্রচুর লোকের প্রাণহানিও হবে। আসলে মার্কিনীরা ভিয়েতনামী কমিউনিস্টদের উপরে বীভৎস অত্যাচার করে তাদেরকে নিঃশেষ করে দেওয়াই ছিল যেন তাদের মুখ্য উপজীব্য বিষয়। মার্কিনী সাম্রাজ্যবাদীদের এই কুৎসিত অত্যাচারী লোভ দেখে সমস্ত পৃথিবীর বিবেকবান মানুষ আতঙ্কে শিউরে ওঠে। জেনারেল কিট্স কোল্টন-এর সংলাপে সেই অত্যাচারের বীভৎসতার পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি—

> *গেরিলাদের সঙ্গে লড়বেন, অথচ নির্বিচার হত্যা করতে দ্বিধা করবেন। এভাবে হবে না। জেন্টল্মেন, মার্কিন সরকারের নির্দেশ— কিল অল, বার্ণ অল, ডেস্ট্রয় অল। আমরা জানি এ যুদ্ধ জিততে পারবো না। কিন্তু এশিয়ার বুকে এমন দাগ রেখে যেতে হবে— এমন বীভৎস একটা ক্ষত রেখে যেতে হবে, যে দুনিয়ার শত্রু চীনা কমিউনিস্টরা... (জেনারেলের বিকারগ্রস্ত মুখের মাংসপেশী কাঁপছে, মুখ থেকে ফেনা ঝরতে শুরু করে) ইন্দোনেশিয়ায় যেমন কমিউনিস্টদের বাচ্চাগুলোকে তলোয়ারে গেঁথে... কাউকে রেহাই দেবেন না... মেয়েগুলোকে ধরে, স্তন ছিঁড়ে... দেশটার নাড়িভুঁড়ি বার করে দিন...* ৩৯

ভিয়েতনামীদের উপরে মার্কিনী সেনা অফিসারদের অত্যাচারের যে নির্দেশনামা তার বাস্তবায়ন ঘটে তৃতীয় দৃশ্যে। এই দৃশ্যে মার্কিনী সেনাবাহিনী এসে হাজির হয় হো-বো গ্রামে, নেতৃত্বে ছিলেন হুইলার। এ দৃশ্যটি পুরোটাই অত্যাচারের দৃশ্য। মার্কিন সেনাদের দ্বারা ভিয়েতনামী নারীদের ধর্ষণ, নারীদের সার্চ করার নামে তাদের উলঙ্গ করিয়ে প্যারেড করানো, ভিয়েতনামী যোদ্ধাদের একটু একটু করে ছুরি ঢুকিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ, ক্লেমথ্রোয়ার-এর ফিউম চড়িয়ে তাদের চোখ গলিয়ে দেওয়া, নারীর স্তনে ইলেকট্রিক শক দেওয়া— এসব সবই চলতে থাকে একের পর এক। অত্যাচারের কোনো কিছুই বাদ যায় না। ধর্ষণ ও অত্যাচারের এই দৃশ্যের মধ্য দিয়ে উৎপল দত্ত সুকৌশলে দর্শকদের কাছে রাজনৈতিক বিশেষ বার্তা পৌঁছে দিতে সক্ষম হন। কর্ণেল হুইলার যখন ভিয়েতনামী নার্স মাও-কে ধর্ষণ করেন তখন ড: ভিন হুইলারকে উদ্দেশ্য করে বলেন—

এই মেয়েটিকে যে জোর করে ভোগ করলেন সে বিষয়ে আমার কোনো বক্তব্য নেই, অসভ্য এশিয়ার মেয়ে বরং আমেরিকার স্পর্শে এসে সভ্যতা শিখলো, আকছার শিখছে পুরো ভিয়েতনাম জুড়ে। [৪০]

উক্তিটির মধ্য দিয়ে ধর্ষণ দৃশ্যের বীভৎসতা দর্শকদের মনকে ভেদ করে তাদের কাছে প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে আমেরিকানদের দুরাচারিতা, বর্বরতা। দর্শকের মনের মধ্যে এক রাজনৈতিক চিন্তা উঁকি দিয়ে ওঠে। আবার ভিয়েতনামী নারীদের উলঙ্গ করে প্যারেড করানোর সময় মার্কিন ফৌজের হিংস্র কামাতুর শ্বাপদ সুলভ উল্লাস দেখে ড: ভিন চিৎকার করে ওঠেন—

সভ্যতা— সভ্যতা শেখাচ্ছে সভ্যতা সভ্যতা— সভ্যতা— [৪১]

এই দৃশ্যের মধ্য দিয়ে দর্শকদের মনে পাশবিকতার পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ জন্মায়। আমেরিকানদের প্রতি একটা ঘৃণা তিনি দর্শকদের মনের মাঝে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হন।

মার্কিনী সেনাবাহিনীর নৃশংস ও বীভৎস অত্যাচারের পরও ভিয়েতনামীদের আপসহীন সংগ্রাম, দেশ রক্ষার জন্য জীবনকে বাজি রেখে তাদের লড়াই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। শত অত্যাচারেও তাদেরকে অবদমিত করা যায়নি। তারা তাদের পবিত্র মাতৃভূমি রক্ষার লড়াইয়ে অবিচল থেকেছে ও বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছে। গ্রামের গেরিলা 'কাস্ত্রোব্যাটেলিয়ান'-এর নেতা ছদ্মবেশী ত্রাক-এর নেতৃত্বে শেষ পর্যন্ত তারা জয় লাভ করে। নাটকের শেষ অংশে দেখা যায় মার্কিনী সেনাদের অত্যাচারের মধ্যেই মাদাম লান হু এসে উপস্থিত হন। ইনিই আসলে ত্রাক।—

হুইলার।। (হেসে) আসুন মাদাম হু! ত্রাককে এনেছেন তো সঙ্গে?

হু।। হ্যাঁ, এনেছি। আমিই ত্রাক! (টমি গান তুলে ধরেন) হাত মাথার ওপরে! প্রত্যেকে! [৪২]

আমেরিকানদের এই অপ্রত্যাশিত চমকের ঘোর কাটতে না কাটতে দেখা যায় 'কাস্ত্রোব্যাটেলিয়ান'-এর গেরিলারা চারিদিক দিয়ে ঘিরে ফেলেছে মার্কিন অত্যাচারী হানাদারদের, বেতার সংযোগ ছিন্ন করে দিয়েছে, সেনাদের অস্ত্র দখল করে নিয়েছে ও তাদের বন্দি করেছে। গেরিলা বাহিনীর অপ্রত্যাশিত ও সাংঘাতিক আক্রমণে হো-বো এলাকার যুদ্ধে আড়াই হাজার মার্কিন সেনার মধ্যে দু'হাজার হতাহত বা বন্দি হয়েছে।

ভিয়েতনামীদের উপরে মার্কিনীদের এই অত্যাচার পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে এক বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করেছিল। পৃথিবীর বিবেকবান মানুষেরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ভিয়েতনামী কমিউনিস্টদের এই প্রতিবাদকে সমর্থন জানিয়ে তাদের পাশে থেকেছিল। বিবেকবান মানুষ

হিসেবে উৎপল দত্তের প্রতিবাদের ভাষা প্রতিভাসিত হয় আলোচ্য নাটক 'অজেয় ভিয়েতনাম'-এর মধ্য দিয়ে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পাশে অন্য কিছু ধনতান্ত্রিক দেশের সমর্থন থাকলেও, দুনিয়ার সিংহভাগ মুক্তিকামী মানুষ সে সময় ভিয়েতনামের জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সমর্থন জানিয়েছিল। ১৯৬০-এর দশকে পশ্চিমবঙ্গের বিবেকবান বুদ্ধিজীবী মানুষ ও সাধারণ জনগণও আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে স্লোগান তুলেছিল—

আমার নাম তোমার নাম ভিয়েতনাম- ভিয়েতনাম'। [৪৩]

সেদিন ভিয়েতনামী গেরিলা সৈন্যদের পাশাপাশি ভিয়েতনামের সাধারণ মানুষ, স্ত্রী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ সবাই মিলে ইয়াঙ্কি সৈন্যদের বিরুদ্ধে যে লড়াইয়ে নেমেছিল, তা পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব নজির সৃষ্টি করে।

তীর

প্রথম অভিনয় : ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৬৭, মিনার্ভা,

প্রথম প্রকাশ : উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র (৩য় খণ্ড), মিত্র ও ঘোষ, আগস্ট ১৯৯৫।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের বাংলার রাজনীতির ও রাজনৈতিক সংঘর্ষের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উৎপল দত্তের 'তীর' নাটকটি। উৎপল দত্ত একসময় নিজেকে অতি বাম রাজনীতির মধ্যে নিজেকে ক্রমে জড়িয়ে ফেলেন। অতিবাম রাজনৈতিক চিন্তা সেই মুহূর্তে মেহনতী মানুষের মুক্তির সংগ্রামের সঠিক পন্থা বলে তিনি মনে করতে থাকেন। এই অতি বাম রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা থেকেই 'তীর' নাটকের সৃষ্টি।

১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে কংগ্রেসকে পরাজিত করে বামপন্থী রাজনৈতিক দলের জোট 'যুক্তফ্রন্ট' পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতা দখল করে। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে উত্তরবঙ্গের নকশালবাড়ি অঞ্চলে কৃষকদের সশস্ত্র আন্দোলন শুরু হয়। বেনামি জমি উদ্ধার, খাস জমি বন্টন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে কৃষক খেতমজুরদের সঙ্গে প্রশাসনের, পুলিশের সংঘর্ষ বাঁধে, এতে অনেক আদিবাসী রমণী ও শিশু নিহত হয়। এই রাজনৈতিক ঘটনাবৃত্তান্ত, যা সারা পশ্চিমবঙ্গসহ গোটা ভারতবর্ষের কৃষক আন্দোলন ও রাজনীতিকে নাড়িয়ে দিয়েছিল, আর বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই উৎপল দত্ত সৃষ্টি করলেন 'তীর' নাটকটি। বিপ্লবী নেতা চারু মজুমদারের মতাদর্শ, জীবন দর্শন, সশস্ত্র বিপ্লববাদ 'তীর' নাটকের নাট্যবিষয় ও কেন্দ্রীয় ভাবনা হয়ে উঠল। 'তীর' নাটক সম্বন্ধে উৎপল দত্ত 'লিট্‌ল থিয়েটার ও আমি' প্রবন্ধে মন্তব্য করেছিলেন—

মনে করেছিলাম প্রসাদুজ্যোতে পুলিশের নৃশংস গুলিচালনার বিরুদ্ধে আমাদের মুখ খুলতেই হবে। যেই সরকারে থাকুক না কেন! আরো ভেবেছিলাম কৃষক যোদ্ধার বীরত্ব অমর গাথা হয়ে থাকবে, পথটা যদি ভুলও হয় তবুও থাকবে। [৪৪]

'তীর' নাটকের তথ্য সংগ্রার্থে উৎপল দত্ত ও তার সহযোগী তাপস সেন, নির্মল গুহরায় নকশাল বাড়ি গিয়েছিলেন। সেখানে পনেরো দিন ছিলেন। তারা নকশাল নেতা চারু মজুমদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও তার রাজনীতির দ্বারা উজ্জীবিত হন। সেখানকার গ্রামে ঘুরে ঘুরে ওরাওঁ, রাজবংশী, গোর্খা, বাঙালি মানুষজনদের সঙ্গে কথা বলে সংগ্রামী কৃষকদের মুখে তাদের অভিজ্ঞতার কথা শুনে উৎপল দত্ত 'তীর' নাটক লিখলেন ও তার মহলা শুরু করলেন। 'তীর' নাটকের তথ্যসংগ্রহের প্রসঙ্গে উৎপল দত্ত 'লিট্‌ল থিয়েটার ও আমি' প্রবন্ধে মন্তব্য করেছেন—

নাটকের মালমশলা সংগ্রহার্থে তাপস, নির্মল গুহরায় ও আমি যাই শিলিগুড়ি, নকশালবাড়ি, প্রসাদুজ্যোত আলিপুরদুয়ার। ... চারু মজুমদার, সৌরীন বসু এবং তিলক রায়ের কাছে থেকে দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নিই, কৃষক-কমরেডদের গান রেকর্ড করি, গুলিচালনার দিনকার অভিজ্ঞতা শুনি অনেকের মুখে। [৪৫]

আমরা এখন 'তীর' নাটকের রাজনৈতিক কার্যাবলি, রাজনৈতিক হত্যা, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক বক্তব্যগুলির উপরে আলোকপাত করব। নাটকের শুরুতেই আমরা দেখি নির্বাচনের প্রস্তুতি চলছে। যুক্তফ্রন্ট সরকার এখনও গঠিত হয়নি। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা নকশাল বাড়ির বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে কৃষকদের সঙ্গে মিটিং করছেন, নেতাদের বক্তব্য মন দিয়ে শুনছেন কৃষকরা। এখানকার কৃষক ও মজদুররা দীর্ঘদিন ধরে বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। যে কমিউনিস্ট নেতা শিবেন রায় কৃষকদের সঙ্গে মিটিং করছেন, তিনি ১৯৬২-এর ভারত চীন যুদ্ধের সময় এই কৃষকদেরই একজনের ঘরে আত্মগোপন করেছিলেন। কৃষকদের মধ্যে আছে রাজবংশী, সাঁওতাল, ওরাওঁ, নেপালী ও বাঙালি জনজাতির মানুষ। আর একজন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট নেতা দেবী দাস, তাঁকেও দেখা যায় কৃষকদের সঙ্গে কথা বলতে ও নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে। দেবী দাস সশস্ত্র সংগ্রামে বিশ্বাসী। মারের বদলে মার, অস্ত্রের বদলে পালটা অস্ত্র নিয়ে সংগ্রামের নীতিতে বিশ্বাসী। জোরদার সত্যবান সিং-এর ভাড়াটে গুণ্ডা বাহিনীর হাতে তার প্রিয় কমরেড দুখুরু-র মৃত্যু সংবাদে সে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠে—

দেবী।। আর বাবুগিলা বসি বসি কি করিবার ধচ্চেন করে? অস্ত্রগুলো কি শুধু মাথার ওপরে নাচাবার জন্য? স্লোগানের সঙ্গে তাল ঠোকার জন্যে? [৪৬]

শিবেন রায়ের মতামত একটু ভিন্ন। তিনি সুকৌশলে লড়াই করে ক্ষমতা দখলে বিশ্বাসী ও অস্ত্র ধারণের পক্ষপাতী হলেও তিনি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন। তার মতামত হল—

শিবেন।। আমরা জিতব। সরকারের মধ্যে পর্যন্ত আমরা থাকব। তখন? তখন আপনাদের সামনে নূতন পথ খুলে যাবে না? এখন ধান কাড়তে গেলে পুলিশ আসে; তখন আমরা থাকবো মন্ত্রীসভার মধ্যে, পুলিশকে আসতেই দেব না। আর পুলিশের সাহায্য না পেলে, ঐ সত্যবান সিংরা একদিনও টিঁকতে পারবে? ... তখন শুরু হবে আরো বড় লড়াই। ধানের লড়াই নয়, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লড়াই। মনে রাখবেন, জনতা রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল না করলে ভূমি সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত রাইফেল হাতে নিয়েই ফয়সালা করতে হবে— এটা যেন ভুলবেন না! মুক্ত অঞ্চল ও মুক্তি ফৌজ গড়তে হবে। সেটাই চীনের পথ— চেয়ারম্যান মাও-ৎসে-তুং-এর শিক্ষা।

শিবেন।। মনে রাখবেন সবাই আমরা আপনাদের হাতে একটা অস্ত্র, শ্রেণীসংগ্রামের হাতিয়ার। [৪৭]

আন্দোলনের পন্থা অথবা জোরদারের হাতিয়ার গুণ্ডাদের হাতে, কৃষকরা খুন হচ্ছে, জোরদারের বাহিনীরা ধান লুঠ করছে, এইসব সংবাদের প্রতিক্রিয়ায় দেবী দাস ও শিবেন রায় দুই মার্কসবাদী নেতার বক্তব্য বা মতামতে একটু ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। আসলে এই সময়ে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে একটি অংশে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল সশস্ত্র বিদ্রোহের অদম্য ঝোঁক, অতি বাম পন্থা। উৎপল দত্ত এই সত্যকে সুকৌশলে সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দেবী দাস অস্ত্রের উপাসক; অপরপক্ষে শিবেন রায় গণতান্ত্রিক সংগ্রামে বিশ্বাসী। অথচ দুজনেই একই পার্টির সদস্য।

দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যায় জোরদার সত্যবান সিং-এর গৃহের প্রাঙ্গন। সেখানে কৃষক মজুররা তাদের মজুরি নিতে এসেছে। কিন্তু জোরদারের লোকেরা মিথ্যা হিসাব দেখিয়ে তাদের প্রাপ্য মজুরির বহু অংশ যেমন মেরে দিচ্ছে তেমনি তাদের প্রাপ্য ধান তারা আত্মসাৎ করছে। সেই সঙ্গে ক্রমবর্ধমান দেনার দায়ে কৃষক মজদুরদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলছে অন্যায়ভাবে। জোরদারের লোকেদের অন্যায় হিসেব যখন চরমে ওঠে তখন আর সহ্য করতে না পেরে কৃষকদের মধ্যে বির্সা ওরাওঁ প্রতিবাদ করে বলে ওঠে—

বির্সা।। আমাদের হাতে আজ তীরধনুক নেই বলেই, একটা অসহায় মেয়েকে জমি থেকে— ...

....

বির্সা।। আমরা বোকা, তাই আপনাদের তীর চালিয়ে না মেরে; ভোট দিচ্ছি। [৪৮]

এখান থেকেই আমরা লক্ষ করি জোরদার জমিদার ও শাসক শ্রেণির কৃষকদের নির্মম শোষনের চিত্র ও বলগাহীন ষড়যন্ত্রের এক নগ্নরূপ। যেনতেন প্রকারেণ শ্রমিক কৃষকদের শোষণ করাই এই জোরদার শ্রেণির একমাত্র উদ্দেশ্য। আবার বির্সা ওরাওঁ তার মন্তব্যের মধ্য দিয়েও ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনের আগে যে অতি বাম মানসিকতা মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরে দানা বাঁধছিল সেই তথ্যও উন্মোচিত হয়। সশস্ত্র সংগ্রাম অন্যায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র দিয়ে জবাব— এই অতি বাম মানসিকতা উৎপল দত্ত প্রতিষ্ঠা করেন দ্বিতীয় দৃশ্যে। বলাবাহুল্য তিনিও এই সময় এই অতি বাম মানসিকতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন।

জমিদারি অত্যাচার শোষণ শাসনের চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায় 'বিরহ' নামক তৃতীয় দৃশ্যে। সেখানে দেখা যায় গ্রামের কৃষক বৈশাগুর মেয়ে দেবারীর সঙ্গে আর এক কৃষক কেরকেটুর ছেলে জোনাকুর বিয়ের অনুষ্ঠানে। সেখানে সবাই যখন বিয়ের আনন্দ উৎসবে মত্ত সেসময় জোদ্দার সত্যবান সিং সপারিষদ হাজির হন সেখানে। বিয়ের আনন্দ উৎসবের মধ্যে সত্যবান সিং কেরকেটুর প্রতি নির্মম আঘাত হেনে বলেন, কেরকেটুর যে জমির মামলাটা ছিল সেটা হেরে গেছে। আদালত রায় দিয়েছে, ও জমি আসলে সত্যবানের ছেলে জীমূতের। সত্যবান সিং সেই সঙ্গে আরও বলেন—

> *সত্যবান।। ... অর্থাৎ ৫৯ সালে জমিটা বে-আইনী দখল করেছিল কেরকেটু কাকা। সেই বৎসর থেকে আজ পর্যন্ত প্রতি বছরের ত্রিশ মণ করে ধান আমার পাওনা হোলো। সাত বছরে সেটা দাঁড়াচ্ছে দুশ'দশ মণ ধান। অথবা টাকার অংকে সরকারি দরে, মণ প্রতি বাইশ টাকা হিসেবে চার হাজার ছ'শ কুড়ি টাকা।...*
>
> *তা ছাড়া ঐ ঘরটার ভাড়া ধরা হয়েছে মাসে দুটাকা হিসেবে প্রতি বছর চব্বিশ টাকা। সুতরাং সাত বছরে একশ আটষটি টাকা।* [৪৯]

সত্যবান সিং মামলার বিষয়ে আরো জানান—

> *সত্যবান ।। এর সঙ্গে মামলার খরচ যোগ হবে, বুঝলে কেরকেটু কাকা? আমার ব্যারিস্টারের ফী, স্ট্যাম্প, এফিডেভিট ইত্যাদি সব মিলিয়ে এক হাজার ন'শ চৌত্রিশ টাকা পঁচাত্তর পয়সা। সব যোগ করলে দাঁড়ায় ন হাজার ছ'শ তিরানব্বই টাকা, পঞ্চাশ পয়সা।* [৫০]

এই বিশাল ঋণের কথা শুনে কেরকেটু অসুস্থ হয়ে পড়ে। বিয়ে বাতিল হয়ে যায়। সত্যবান সিং যাওয়ার সময় এটাও জানিয়ে যান আইন অনুযায়ী ঋণ মৃত্যুর পরেও চলে তাই তিনি ঋণ শোধ না করতে পারলে তার ছেলে জোনাকুর উপরে এই ঋণের বোঝা বর্তাবে। এখানে উৎপল দত্ত

জমিদার জোতদারদের ভয়াবহ শোষণ, যেকোনো প্রকারে সম্পত্তি হরণ ও কৃষকদের সর্বস্বান্ত হওয়ার ঘটনা অতি নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

ক্ষমতালোভী ক্ষমতার অলিন্দে থেকে অভ্যস্ত সত্যবান সিং আসন্ন নির্বাচনের আঁচ বুঝেই কংগ্রেস ত্যাগ করে বাংলা কংগ্রেসে যোগ দেয় এবং নির্বাচনে দাঁড়ায়। 'যুক্ত ফ্রন্ট' নামক দৃশ্যে দেখা যায় জোরদার সত্যবান সিং ভোটে জয়লাভ করেছেন, কমিউনিস্ট প্রার্থী শিবেন রায়ও জিতেছেন এবং মন্ত্রী হয়েছেন। যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হবে তার সঙ্গে জোরদার সত্যবান সিং-এর পার্টি বাংলা কংগ্রেসও থাকবে। কমিউনিস্টরা জিতেছে শুনে কৃষকরা উল্লসিত হয়ে পড়ে—

> *উপাসু।। কংগ্রেসের তিরপাতিরপি শেষ! ঢিপির পেট কংগ্রেসিরা পলায়ন করিতেছে। কংগ্রেস হেরে ভূত। শিবেনদা মন্ত্রী হয়েছেন। [উল্লাসে ফেটে পড়ে গ্রাম; রাস্তার ওপর নাচ শুরু হয়ে যায়। অন্নেশ্বরীকে ধরে নিয়ে রাস্তায় ওঠেন কেরকেটু।]*
>
> *অন্নেশ্বরী।। শিবেন মন্ত্রী হয়েছে!*
>
> *গজুয়া।। হ্যাঁ, ভেতর থেকে লড়বে শিবেন, বাইরে আমরা। মনে আছে— বলে গিয়েছিল?*
>
> *গোব্রিয়েল।। এবার তাহলে বিপ্লব শুরু! শিবেন দা বলে গিয়েছিল!*
>
> *বির্সা।। শালা সত্যবান সিং-এর গুদাম ভেঙে চাল বার ক'রে নেব এবার!* [৫১]

কিন্তু কৃষকরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় যখন তারা দেখে যে তাদের নেতা শিবেন রায় জোরদার সত্যবান সিং-এর সঙ্গে কোলাকুলি করছেন, দুজনে এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছবি উঠছেন রিপোটারদের সামনে। কৃষক মজদুররা আরো অবাক হয়ে যায় যখন তারা শোনে তাদের নেতা শিবেন রায় বলছেন—

> *শিবেন।। ... সে খাদ্যনীতির মূল কথাটা হোলো— মজুতদার-জোতদার-অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে এখুনি আমরা কোনো বলপ্রয়োগ করতে চাই না। আমরা তাঁদের কাছে আবেদন রাখছি— যে লক্ষ লক্ষ টন চাল আপনারা মজুত করেছেন, বাংলার মানুষের, বাংলার শিশুদের শুষ্ক, ক্ষুধার্ত মুখ চেয়ে, সে চাল আপনারা বাজারে ছেড়ে দিন। আমরা বিশ্বাস করি, মজুতদার-জোতদাররাও মানুষ। তাঁদের হৃদয় পরিবর্তনের জন্য আমরা অপেক্ষা করব।* [৫২]

অথচ এই শিবেন রায় ভোটের আগে অন্নেশ্বরীকে কথা দিয়ে গিয়েছিলেন যে সত্যবান সিং-কে গাছে বেঁধে চাবুক মারবে, তার চোখ অন্ধ করে দেবে। আবার দেখা যায় বক্তৃতার শেষে শিবেন রায় তার বিশ্বস্ত কমরেড দেবী দাসকে নিভৃতে বলে যান, তিনি যা বলেছেন শুধু কৌশল হিসেবে। তিনি আরও বলেন—

শিবেন।। তাহলে আমরা মন্ত্রীসভায় ঢুকেছি কি করতে? পুলিশ আসবে না। এতক্ষণ শুনলেন না? [৫৩]

পরের দৃশ্যে দেখা যায় বিপ্লবী কৃষক নেতা দেবী দাসের নেতৃত্বে কৃষকরা সংগঠিত হতে থাকে। তারা মাও-ৎসে-তুং-এর চিন্তাধারার সঙ্গে আস্তে আস্তে পরিচিত হতে থাকে। দেবী দাসের নেতৃত্বে বিপ্লবী পরিষদ গঠিত হতে থাকে বিভিন্ন এলাকায়, তারা অস্ত্র শিক্ষা করতে থাকে ও অস্ত্র বিদ্যায় ক্রমশ পারদর্শী হতে থাকে। জনযুদ্ধের যে দশটি নীতি, সেই দশটি নীতি সম্পর্কে তারা অবহিত হতে থাকে ও দশটি নীতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। তাদের জননেতা শিবেন রায় যেহেতু কথা দিয়ে গেছে যে পুলিশ আসবে না তাই কৃষক শ্রেণি জোটবদ্ধ হয় ও সশস্ত্র সংগ্রাম চালানোর জন্য প্রস্তুত হয়। জোরদার সত্যবান সিং-এর বাড়ি আক্রমণ করে সব মজুত করা চাল ছিনিয়ে নিয়ে বিপ্লবী পরিষদে জমা করে সত্যবান সিংকে বাড়ি ছাড়া করার জন্য। কৃষকরা সশস্ত্র আক্রমণ চালাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়।

এরপর 'বিদ্রোহ' নামক দৃশ্যে আমরা দেখি কৃষকরা দলবদ্ধভাবে পরিকল্পনা মাফিক সত্যবান সিং-এর বাড়ি আক্রমণ করেন। চতুর্দিকে মাদল ও নাগড়ার শব্দ। সেই সঙ্গে আকাশ-বাতাস কাঁপানো চাষি মজুরদের হুংকার—

চাষী মজুর এক হও! আপন হাতে রাজ নাও! [৫৪]

কৃষকদের পরিকল্পনামাফিক আক্রমণে সত্যবান সিং-এর লোকজন দিশেহারা হয়ে পড়ে ও সত্যবান সিং প্রাণে বাঁচতে পলায়ন করেন। কৃষকরা সত্যবান সিং-এর মজুত করা গোলাভরা চাল সব লুঠ করে ও তাদের বিপ্লবী পরিষদে জমা করে। কৃষকদের অন্নের জন্য যে তীব্র হাহাকার ও আকুল ক্রন্দন তার পরিসমাপ্তি ঘটে।

ঝিমোশ্বরী এক ব্যতিক্রমী চরিত্র। সে সত্যবান সিং-এর রক্ষিতা হয়ে থেকে বিপুল ঐশ্বর্য ও সম্পদের মধ্যে থেকেও শ্রমিক-কৃষকদের সশস্ত্র বিপ্লবে সেও পরোক্ষভাবে সহযোগিতা করে। শ্রেণিশত্রুর বিরুদ্ধে শ্রেণিসংগ্রামে সেও এগিয়ে আসে। কৃষকের সশস্ত্র হামলার সময় যখন সত্যবান সিং দিশেহারা হয়ে পড়ে এবং তার কাছ থেকে যখন বন্দুকটা পড়ে যায় ঝিমোশ্বরী সত্যবানের বন্দুকটা লুকিয়ে ফেলে। আবার ঝিমোশ্বরী রবিরামের গা ঘেষে দাঁড়ায়। হুলুস্থুল কাণ্ডের মধ্য বন্দুকটা তার লক্ষ্য। শেষে দেখা যায় ঝিমোশ্বরী লুকোনো বন্দুকগুলো বার করে দেয় তাদের নেতা দেবী দাসের সামনে। তারপর সকলের মুখের দিকে তাকায় প্রশংসা ও অনুমোদনের আশায়। উৎপল দত্ত এখানে ঝিমোশ্বরীর চরিত্রের মধ্য দিয়ে সুকৌশলে শ্রেণিশত্রুর বিরুদ্ধে শ্রেণিসংগ্রামে শামিল হওয়ার বিষয়টিকে প্রস্ফুটিত করেছেন।

এরপর কৃষক বিদ্রোহ একে একে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে উত্তরবঙ্গের সর্বত্র। সশস্ত্র পুলিশও বিদ্রোহ দমন করতে থাকে কঠোর হাতে। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে মে ঘটনায় দেখা যায় গ্রামের লৌকিক পূজা উপলক্ষ্যে নারী পুরুষরা জড়ো হয়েছিল। মেয়েদের দেখা যায় গ্রামের পথ ধরে গান গাইতে গাইতে এগিয়ে চলেছে। এমত অবস্থায় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী নিরস্ত্র কৃষক নারীদের উপরে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে আটজন নারী ও দুজন শিশুসহ মোট দশ জনকে নির্মমভাবে হত্যা করল। এই হত্যাকাণ্ড এতটা নৃশংস ও এতটা বীভৎস ছিল সমসময়ের পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবাসীর বিবেকবান মানুষের অন্তরকে নাড়িয়ে দেয়, উত্তাল হয়ে ওঠে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতীয় রাজনীতি। ঘটনার বীভৎসতায় ও নৃশংসতায় আঁতকে উঠেছিল আমজনতা—

> *মেয়েরা কিছু বুঝবার আগেই চারিপাশ থেকে সবগুলো রাইফেল গর্জন করে ওঠে— দেহগুলো ছিটকে ছিটকে চলে যায় এদিকে ওদিকে—। নৃশংসতম, অকারণ এ গুলিবর্ষণ : মৃতদেহের ওপরও চলে গুলিবর্ষণ কিছুক্ষণ। তারপর সব থামে। সব দেহ স্থির, শুধু সোমারি, একবার পিঠের বাচ্চাটাকে ধরার চেষ্টা করে, উপুড় হয়ে পড়ে যায়। আর দেবারী বুকে হেঁটে গিয়ে একটা তীর, তারপর একটা ধনুক টানতে চেষ্টা করে কাশবন থেকে। তারপর স্থির হয়ে যায়।* [৫৫]

নির্বিচারে ও নির্মমভাবে কৃষক রমণীদের হত্যার প্রতিশোধ তারা নিয়েছিল। বারোতম দৃশ্যে আমরা দেখি এই নির্মম হত্যার প্রতিশোধ নিতে কৃষকরা রাস্তার উপরে এক বিশেষ পদ্ধতিতে বাঁশের মাচা তৈরি করে। পুলিশের গাড়ি যখন সেই মাচার উপর দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে তখন তাদের বিশেষ সংকেত ও কৌশলের মাধ্যমে তারা গাড়িটিকে উল্টে ফেলতে সক্ষম হয় ও আরোহী পুলিশ কর্মীদের উপরে বন্দুক ও তীর নিক্ষেপ করে তাদেরকে হত্যা ও পলায়নে বাধ্য করে।

পুলিশের আক্রমণ ও কৃষকদের প্রতিবাদ ও প্রত্যাক্রমণের মধ্য দিয়ে নাটক এগোতে থাকে। পুলিশের বন্দুকের জবাব তারা তীর ধনুক দিয়েই দিতে থাকে। অজানা উৎস থেকে ছুটে আসা তীরের সামনে পুলিশ বাহিনী বিধ্বস্ত ও নিহত হতে থাকে রাইফেলধারীরা পলায়নে বাধ্য হয়। এরপর দেখি এই বিদ্রোহকে সমূলে উৎপাটিত করতে সরকারপক্ষ বিশেষভাবে তৎপর হয়। তারা আর পুলিশের উপর ভরসা করতে পারেন না। সরকার পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয় EFR অর্থাৎ ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেল্‌স-এর বাহিনী দ্বারা এই বিদ্রোহকে দমন করতে হবে ও সমূলে উৎপাটিত করতে হবে। সরকার পক্ষ থেকে আরও দাবি করা হয়, এই বিদ্রোহকে না নিঃশেষ করতে পারলে সারা ভারতবর্ষব্যাপী তা দাবানলে পরিণত হবে এবং এই বিদ্রোহকে দমন করার জন্য তারা বিশেষ দক্ষ অফিসারকে নিয়োগ করেন। এখানে লক্ষণীয় এই বিদ্রোহ দমনের প্রস্তাব রাখেন সরকারের পক্ষ হয়ে শিবেন রায়—

শিবেন।। যুক্তফ্রন্ট সরকার এ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন, কারণ বড় রাস্তা ধরে, তাও যতক্ষণ বেলা থাকে— খানিক টহল দেয়া ছাড়া পুলিশ আজ পর্যন্ত কিছু করতে পারেনি। করার মতন মনোবল নাকি ওঁদের নেই। সুতরাং এ অঞ্চলের পুলিশ ও ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেল্‌স্‌-এর জয়েন্ট অপারেশনের সর্বোচ্চ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে লেফ্‌টেনান্ট কর্ণেল ত্রিলোক সিংকে। — এবার সরকার আশা করেন যে... নকশাল বাড়ির স্ফুলিঙ্গটা ভারতব্যাপী দাবানলে পরিণত হওয়ার আগেই নিভে যাবে। ওদের: ... ওদের শেষ করে দিন। শুট টু কিল। [৫৬]

'তীর' নাটকটি একান্তভাবে জোরদার জমিদারদের অত্যাচার, কৃষকের প্রতিরোধ ও পুলিশের জুলুমে আবদ্ধ ছিল। উৎপল দত্ত দেখিয়েছেন জোরদার জমিদারের দল কীভাবে কৃষকদের ধান কেড়ে নিচ্ছে, কীভাবে তারা নিরন্ন মানুষদের মুখের অন্ন কেড়ে নিয়ে চাল মজুত করে চলেছে, কীভাবে দরিদ্র কৃষকদের অভুক্ত ও শোষিত করে রেখেছে। সাঁওতাল, ওরাওঁ, নেপালি, রাজবংশী প্রভৃতি জনজাতির মানুষ কীভাবে দিনের পর দিন চরম অন্যায়ের শিকার হয়েছে এই জমিদার জোরদারদের কাছে, কীভাবে শোষিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে, কীভাবে সুদের জালে ক্রমাগত জড়িয়ে পড়েছে তা উৎপল দত্ত সুকৌশলে তুলে ধরেছেন। এই অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদস্বরূপ উত্তরবঙ্গের জনজাতি একসময় সশস্ত্র বিদ্রোহে ফেটে পড়ে, যা বাংলা তথা ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন করে দেয়। 'তীর' নাটকে কৃষক-শ্রমিকদের বীরত্ব এবং পুলিশ, জমিদার ও জোরদার শ্রেণির বলগাহীন সন্ত্রাসের বাস্তব রূপ অঙ্কন করলেন উৎপল দত্ত। 'তীর' নাটক সম্পর্কে উৎপল দত্ত বলেছেন—

তীর নাটকে কোনো মিথ্যার অস্তিত্ব নেই। আমি আমার নাটকে কোনো দিনও মিথ্যা প্রচার করিনি। কৃষকদের বীরত্ব ও পুলিশের বলগাহীন নিষ্ঠুরতা ছিল বাস্তব সত্য; এটা ছিল শ্রেণী সংগ্রামের একটি মুহূর্ত, ইতিহাসের একটি আলোকিত অধ্যায়, শ্রেণী-সংঘর্ষের এক নগ্ন বিস্ফোরণ যেখানে তথাকথিত কৃষক-দরদীদের নিয়মিত আপস ও নানা মুখোশের কোনো চিহ্ন ছিল না।... আন্দোলনটার সময় ভুল ছিল কিনা, নেতৃত্ব অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় ছিলেন কিনা, এ সবের চেয়ে অনেক বৃহৎ সত্য ছিল জনতার বীরত্ব ও সাহস— এটাই বিপ্লবী থিয়েটারের প্রধান উপাদান। [৫৭]

উৎপল দত্তের 'তীর' নাটকের মধ্যে দিয়ে তাঁর অতি বাম মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে। একসময় উৎপল দত্তের মনে হয়েছিল, সংগ্রামই মুক্তিকামী মানুষের মুক্তির একমাত্র উপায়। উৎপল দত্ত ক্রমে ক্রমে অতি বাম রাজনীতির মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন এবং সেই অতি বাম রাজনৈতিক চিন্তাকে সেই সময়ের মেহনতি মুক্তিকামী মানুষের মুক্তির লড়াইয়ের সঠিক পথ বলে মনে করতে থাকেন। তাঁর অতি বাম মানসিকতার ফসল হল এই 'তীর' নাটকটি। উত্তরবঙ্গের

কৃষকদের সংগ্রামের কাহিনি প্রকাশ পেল এবং প্রতিষ্ঠিত হল তাঁর অতি বাম রাজনৈতিক চিন্তা। উৎপল দত্তের সঙ্গে সি.পি.আই (এম)-এর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা সত্ত্বেও এই সময় তিনি সি.পি.আই (এম)-কে প্রবলভাবে সমালোচনা করতে শুরু করেন। 'তীর' নাটকটি প্রস্তুতির সময় উৎপল দত্ত অতি বাম রাজনীতিকেই সঠিক পন্থা মনে করেছিলেন। এই সময় তিনি নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে পুরোপুরি যুক্ত করে ফেলেছিলেন। তাঁর নকশাল আন্দোলন ও নকশাল চিন্তাধারা তথা অতি বাম চিন্তা ধারা প্রতিফলিত হয়েছে 'তীর' নাটকে। 'তীর' নাটক সম্পর্কে উৎপল দত্ত তাঁর স্মৃতিচারণামূলক 'লিট্‌ল থিয়েটার ও আমি' প্রবন্ধে বলেছেন—

> *যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার পরই নকশালবাড়ি বিদ্রোহ, জুন' ৬৭ এবং রাজনৈতিক বিভ্রান্তির মধ্যে লিট্‌ল্ থিয়েটারের পদক্ষেপ।... পুলিশের নৃশংস গুলিচালনার বিরুদ্ধে আমাদের মুখ খুলতেই হবে, যেই সরকারে থাকুক না কেন!* [৫৮]

মানুষের অধিকার

প্রথম অভিনয় : ১৪ জুলাই, ১৯৬৮, মিনার্ভা।

প্রথম প্রকাশ : গন্ধর্ব, শারদীয় ১৯৬৮। পরে এপিক থিয়েটার, অষ্টম সংখ্যা, ১৯৬৮।

'লিটল থিয়েটার গ্রুপ' পর্বে মিনার্ভাতে অভিনয়ের সময় 'অজেয় ভিয়েৎনাম' এবং 'তীর' নাটকের পরেই উৎপল দত্ত 'মানুষের অধিকার' নাটকটি প্রযোজনা করেন। এই নাটকটি প্রযোজনা করে তিনি প্রমাণ করেছিলেন আন্তর্জাতিক ভাবনার শরিক তিনি। কালো মানুষের উপরে সাদা মানুষের অত্যাচার সারা পৃথিবীজুড়ে এক অনিবার্য সত্য। এই অত্যাচারের প্রতিবাদে যখন সারা দুনিয়া সরব তখন তিনি 'মানুষের অধিকার' নাটকটি রচনা করলেন। দেশে-দেশে, কালে-কালে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের প্রতি শ্বেতাঙ্গ মানুষদের অন্যায় অত্যাচার, ঘৃণা ইতিহাসের পাতায় ছড়িয়ে আছে। উৎপল দত্ত ইতিহাসের পাতা থেকে সেরকমই একটি ঘটনাকে তুলে আনলেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও মুক্ত সমাজের আড়ালে যে জাতি বিদ্বেষ, কৃষ্ণাঙ্গ বিদ্বেষ ও নিগ্রো বিদ্বেষের মতো বিষ-বাষ্প লুকিয়ে ছিল, তার বিরুদ্ধে এই নাটকটি এক প্রচণ্ড ঘৃণা ও প্রত্যাক্রমণের কাহিনি নিয়ে রচিত।

১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে এই নাটক মঞ্চস্থ হয়। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের একটি মামলার নির্যাসকে উৎপল দত্ত সমকালীন করে তোলেন ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে ডেট্রয়েট শহরের ঘটনাকে সামনে নিয়ে এসে। নাটকের প্রথম দৃশ্যে দেখা যায় ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে গোটা আমেরিকার সঙ্গে

এই ডেট্রয়েট শহরেও শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের বিরোধ এক ভয়াবহ ও তীব্র রূপ নিয়েছিল। কৃষ্ণাঙ্গরা আজ জেগে উঠেছে। তারা পড়ে পড়ে শুধু মার খাওয়া নয়, বরং মারের বদলে পালটা মারের নীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা অস্ত্র ধারণ করেছে ও রাস্তায় নেমেছে। ডেট্রয়েট শহরের একটি অংশে শ্বেতাঙ্গদের অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমেরিকার কৃষাঙ্গ মানুষের দল মুক্তাঞ্চল গড়েছে। সেখানে শ্বেতাঙ্গ মানুষদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। শ্বেতাঙ্গ পুলিশ সাতদিন ধরে সেখানে ঢোকার চেষ্টা করেছে ট্যাঙ্ক ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে, কিন্তু পারছে না। গ্যান্‌ভিল নামক এক ভিয়েতনাম ফেরত মার্কিন যোদ্ধাকে ব্র্যান নামক এক কৃষ্ণাঙ্গ ধরে নিয়ে আসেন। কারণ সে রাজপথের উপরে এনিটা হুইটনি নামক এক কৃষ্ণাঙ্গ কিশোরীকে ধর্ষণ করেছে। কিন্তু গ্র্যান্‌ভিল সে অভিযোগ অস্বীকার করে।–

স্টিভ ।। বে-আইনী প্রবেশ— কৃষ্ণাঙ্গ অঞ্চলে?

ব্র্যান।। ধর্ষণ!— হানড্রেট এন্ড থার্টি স্ট্রীটে রাজপথের ওপর এনিটা হুইট্‌নী নাম্নী এক কৃষ্ণকায়া কিশোরীকে ছিঁড়ে খাচ্ছিল পশুর মত।

মার্থা।। (মেরিনকে প্রশ্ন করে) নাম?

মেরিন।। অগাস্টাস ডেভিড গ্র্যান্‌ভিল।

মার্থা।। র‍্যাংক্?

গ্র্যানভিল।। মেজর, ইউ. এস. মেরিন্‌স্।

মার্থা।। আপনি কি আপনার অপরাধ স্বীকার করছেন?

মেরিন।। লিস্‌ন্ নিসার হুড্‌লামস! কি জন্য এখানে সশস্ত্র জমায়েত! বা— আমার গায়ে হাত?

স্টিভ।। নোটিশ দেখেন নি? চশমা লাগবে? এটা ডেট্রয়েট শহরে মুক্ত অঞ্চল,— কৃষ্ণশক্তির অধীন।

গ্র্যান্‌ভিল।। আমি ভিয়েৎনাম ফেরত যোদ্ধা। দেশের জন্য লড়াই করে অবসন্ন দেহে ফিরছি গৃহে— । [৫৭]

কৃষ্ণাঙ্গরা শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে শুরু করেছে, অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে। সারা পৃথিবী জুড়ে শ্বেতাঙ্গদের দ্বারা কৃষ্ণাঙ্গ নারীরা অনবরত ধর্ষিত হয়ে আসছে তারও প্রতিবাদ তারা জানিয়েছে, বিশ্বের সমস্ত কৃষ্ণাঙ্গ নারীকে তারা নিজেদের বোনের মর্যাদা দিয়েছেন। পৃথিবী জুড়ে শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারে যত কৃষ্ণাঙ্গ শিশুরা অত্যাচারিত ও নিহত হয়েছে সেইসমস্ত শিশুকেও তারা নিজের সন্তান জ্ঞান করে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে ধর্ষণের অভিযোগ মিথ্যা বলে দাবি করে। তখন কৃষ্ণাঙ্গ নেত্রী মার্থা বলেন যে শ্বেতাঙ্গরা এদেশে না হলেও চীনে বা ভারতে, কঙ্গোয় বা ব্রাজিলে ধর্ষণ করেছে। এইসব দেশের বোনরা আর যাতে এই শ্বেতাঙ্গদের হাতে

নির্যাতিত, অত্যাচারিত ও ধর্ষিত না হয় তার জন্য এদেরকে খতম করা উচিত।–

স্টিভ।। তাহলে তো একে এখুনি শেষ করতে হয়।

মার্থা।। কটি হলদে শিশুর মাথা এনেছেন সঙ্গে করে— বৈঠকখানায় ঝোলাবার তরে? কটি রমণীর স্তনাগ্র?

গ্র্যান্‌ভিল।। কালোদের কাছে জবাবদিহির শিক্ষা পাইনি এখনো।

স্টিভ।। তবে শুনুন, ধূরসবর্ণ নারীধর্ষক! গত সাত দিন ধরে ট্যাংক নিয়ে এ পাড়ায় ঢুকতে পারেননি। আজ একা ঢুকে এনিটা হুইট্‌নীর পবিত্র দেহকে কলুষিত করেছেন— আপনার নোংরা, ফ্যাকাশে দেহের স্পর্শে!— কিন্তু সে জন্যেও নয়— আমার এক ভগ্নীকেও বলাৎকার করে মেরে ফেলেছেন ইতিপূর্বে। আর আমার এক শিশু সন্তান! বয়স চার কি পাঁচ— তাকেও হত্যা করেছেন ক্লেমথ্রোয়ার ছেড়ে!

গ্র্যান্‌ভিল।। তুমি উন্মাদ! তোমাকে আমি চিনিই না। তোমার ভগ্নী বা সন্তানকে চক্ষেই দেখিনি।

স্টিভ।। মিছে কথা কইলে পরে জিভ যাবে খসে। বোনটির আমার অল্প বয়স— ভেবেছিলাম আমেরিকার উদার রাত্রি তার গায়ে দেবো জড়িয়ে।– নিউইয়র্কের নিয়নবাতি দিয়ে গড়ে দেবো তার মুকুট! আমেরিকার হৃদপিণ্ডের স্পন্দন দিয়ে বাজাবো দামামা,— তারপর সেটাকে রেকর্ড করিয়ে— ভেবেছিলাম আমার বোনের হাত ধরে নাচবো তার তালে তালে— লেনক্‌স এভিন্যুর ওপর।– তুমি তাকে ধর্ষণ করেছো সৈনিক।

গ্র্যান্‌ভিল।। মিথ্যা! মিথ্যা— এ অভিযোগ : শুনুন সবাই কোথায় ধর্ষণ করেছি তোমার বোনকে? এই শহরে আমার এই প্রথম পদার্পণ।

স্টিভ।। এ শহরে নয়— ভিয়েৎনামে। আমার সন্তান ও ভিয়েৎনাম! কতো রাত তার হাত ধরে বেড়িয়েছি আমার স্বপ্নের আমেরিকায়— আকাশে ছড়ানো যখন রূপোর শিশির বিন্দুর মত তারা আর মার্কিন শ্রমিকের হাতে গড়া সোনার শহরে যখন চোখ ঝলসানো আলোকমালা! [৬০]

উৎপল দত্ত আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গদের যন্ত্রণা এবং প্রতিবাদ ও প্রতিরোধকে সারা পৃথিবীর নির্যাতিত মানুষের সংগ্রামের সঙ্গে একাত্ম করে তোলেন। আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষদের লড়াই সমগ্র বিশ্বের সমগ্র কৃষ্ণাঙ্গদেরও লড়াই। ব্রাজিল, কঙ্গো, ভারত, ভিয়েতনামের মানুষের যন্ত্রণা, তাদেরও যন্ত্রণা। বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তের কৃষ্ণাঙ্গ বোন ও সন্তান, যেন তাদেরই নিজস্ব সন্তান। কৃষ্ণাঙ্গদের সংগ্রাম কোনো বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদ নয়। শুধু আমেরিকার এক প্রান্তে আবদ্ধ লড়াই নয়।

এই লড়াই ও সংগ্রাম বিশ্বের সব শোষিত-নির্যাতিত ও নিপীড়িত মানুষের বৈপ্লবিক যুদ্ধের অবিচ্ছিন্ন অংশ।

যুদ্ধ ফেরত এই শ্বেতাঙ্গ যুবক গ্র্যান্‌ভিলের জন্য সকলে অনুকম্পা বোধ করল। আর্জি জানায় গ্র্যান্‌ভিলকে প্রাণে না মেরে তাকে ক্ষমা করে দিতে। তখনই কৃষ্ণাঙ্গদের নেতা স্টিভ এইসব অত্যাচারী শ্বেতাঙ্গ যুবকদের ১৯৩১ সালে আমেরিকার দক্ষিণে এলাবামা রাজ্যের পেন্টরক রেল স্টেশনে ঘটে যাওয়া একটি ধর্ষণের কাহিনি শোনায়। তারা শোনায় কী করে শ্বেতাঙ্গদের কাছে কৃষ্ণাঙ্গরা নিরাপরাধা হওয়া সত্ত্বেও নানারকম শারীরিক ও মানসিকভাবে অত্যাচারিত হয়েছে, তার ঘটনাবৃত্তান্ত। শোনায় আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গদের উপরে শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচারের নানান ঘটনা পরম্পরা। নাটকের মূল বিষয় এই স্কটস্‌বরো মামলার বিচার দৃশ্য। সেখানে ধর্ষক রূপে অভিযুক্ত এক নিগ্রো যুবক হেউডপ্যাটার্সন। আর ধর্ষিত হয়েছিল শ্বেতাঙ্গ দুই মহিলা রুবি বেট্‌স্‌ ও ভিক্‌টোরিয়া। ১৯৬৭-এর এই ডেট্রয়েট শহরের ঘটনা এই নাটকের প্রস্তাবনা ও পরিশিষ্টরূপে যুক্ত করে মূল ঘটনাকে সমকালীন মাত্রায় নিয়ে এসেছেন উৎপল দত্ত।

নাটকের কাহিনি প্রবেশ করে ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে, সেখানে দেখা যায় আমেরিকার দক্ষিণে অবস্থিত এলাবামা রাজ্যের পেন্টরক রেল স্টেশন। সেখানে স্টেশন মাস্টারের কাছে খবর যায় কয়েকজন নিগ্রো যুবক ট্রেনের মধ্যে কিছু শ্বেতাঙ্গ যুবককে প্রহার করেছে এবং তারা পরের ট্রেনেই এই পেন্টারক স্টেশনে আসছে। শ্বেতাঙ্গ স্টেশন মাস্টার ক্রস্‌বি দ্রুত খবর দেয় স্থানীয় সব জোরদারদের কাছে। নিগ্রোদের পেটানো হবে এই খবর শুনে জোরদাররা স্টেশনে এসে উপস্থিত হয় অতি দ্রুততার সঙ্গে। তাদের কথাবার্তায় ফুটে ওঠে নিগ্রো পীড়নের পাশবিক উল্লাস ও আনন্দ। নিগ্রোদের পীড়নের মধ্য দিয়েই শ্বেতাঙ্গরা এক অনাবিল আনন্দ খুঁজে পায়। তাদের সংলাপ থেকে তা বোঝা যায়—

বিল্‌ ।। বোসো, বোসো।

একটু খাও। ব্যাপারটা কিছু না। ফাঁস, একটু আগুন, একটা চীৎকার— ব্যাস। ঐ চীৎকারটায় একটু গায়ে কাঁটা দেয়। তাই ডেটাটুরের সেই ভাগচাষীটাকে মারার সময়ে ব্যান্ডপার্টি নিয়ে গেছলাম। ওরা জাতীয় সংগীত বাজাচ্ছিল খুব জোরে, তাই চীৎকার-ফীৎকার চাপা পড়ে গেল।...

গ্রীন।। বিল! ফাঁস কেন? বড় হ্যাঙ্গামা।

বিল্‌।। তবে কি চাও?

গ্রীন।। এক এক গুলি ব্যাস্।

বিল্।। দ্যেৎ তাতে মজা কোথায়?

প্রেন্ডিক।। গ্রীন জর্জিয়ান জমিদার। ওদিকে গুলিটাই বেশী চলে। এখানে গ্রীন, আমরা একটু ছড়িয়ে বসে উপভোগ করতে চাই।

গ্রীন।। করতে চান করুন। তবে গুলি করলে চট করে হয়ে যায়।

প্রেন্ডিক।। চট করে করার নীতিটা উত্তরের কারখানা-সভ্যতা থেকে আমদানী। দক্ষিণে-জীবন একটু মন্থরগতি। মৃত্যুটাও তেমনি হলে ভালো হয়। [৬১]

কিছুক্ষণের মধ্যেই ন'জন নিগ্রো কিশোরকে দড়ি দিয়ে বেঁধে স্টেশনে নিয়ে আসে এলাকার ডেপুটি শেরিফ হিল ও জোরদাররা। নিগ্রোদের হত্যা করার বাসনায় তারা অস্থির হয়ে ওঠে। নিগ্রোহত্যার জন্য যেন তাদের হাত নিশপিশ করতে থাকে ও হত্যা দেখার জন্য কিছু মানুষের চোখ উৎসুক হয়ে ওঠে। হিল জেরা শুরু করে নিগ্রো কিশোরদের, তারা জানায় তারা ট্রেনে চড়ে মেমফিস শহরে যাচ্ছিল কাজের সন্ধানে। এমতাবস্থায় হে-উড প্যাটারসন নামক এক কৃষ্ণাঙ্গ যুবক স্বীকার করে যে তারা শ্বেতাঙ্গ কৃষক মেরেছিল কেন-না শ্বেতাঙ্গ যুবকরা আগে প্রহার করেছিল। অন্যদিকে জোতদাররা দুটি শ্বেতাঙ্গ মেয়েকে ডেপুটি শেরিফ হিলের কাছে হাজির করে এবং দাবি করে ওই নিগ্রো যুবকরা এই শ্বেতাঙ্গ কিশোরীদের ধর্ষণ করেছে। দুই শ্বেতাঙ্গ কিশোরী ভিকটোরিয়া প্রাইজ ও রুবি বেটস— এরা দুজনও অভিযোগ করে যে তারা নিগ্রোদের দ্বারা ধর্ষিত হয়েছে। বাইরে উপস্থিত উন্মত্ত জনতার পাশবিক উল্লাসে মত্ত তারা অপেক্ষা করতে থাকে এই নিগ্রো যুবকদের তারা যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু উপহার দেবে। এমতাবস্থায় ডেপুটি শেরিফ হিল নিগ্রো আসামীদের থানায় নিয়ে যেতে চাইলে এলাকার শেরিফ ওয়ারেন বাধা দেন এবং বিচারের দায়িত্ব আদালতের উপর ন্যস্ত করেন। এই ঘটনা নিয়েই শুরু হয় **১৯৩১** খ্রিস্টাব্দের স্কট্স্বরো মামলা।

ডেকাটুর শহরের আদালতে মামলা শুরু হয়। জেরা, সওয়াল জবাব, সাক্ষ্য, সাক্ষ্যপ্রমাণ, ঘটনার বিবরণ, তথ্য প্রমাণ সব নিয়ে আদালতে চলতে থাকে বিচারের পর্বগুলি। কালো মানুষের উপরে শ্বেতাঙ্গদের বহুদিন ধরে চালিয়ে আসা নির্মম নির্যাতনের আরো একটা অধ্যায় যেন এতদিনের মুখোশের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে। বিচারের ফলাফল যেন আগে থেকেই তৈরি। প্রচুর শ্বেতাঙ্গ দর্শক এসেছে নিগ্রোদের নির্মম পীড়ন দেখতে। তারা উত্তেজিত, উল্লিখিত ধর্ষণের বিচার দেখতে লালায়িত। একজন বলে—

ধর্ষণের মামলা দেখতে বেশ লাগে। এমন সব কথা বলে যে শরীর গরম হয়ে ওঠে। [৬২]

আরো কিছু দর্শকদের মুখ দিয়ে শুনতে পাই—

দর্শক-১।। অনেক আগে পৌঁছে গেছি। টিফিন প্যাকেটটা এনেছিস তো?

দর্শক-২।। হ্যাঁ, হ্যাঁ, খাবো আর দেখবো।

গ্রীন।। যা বলেছিস; একে নিগার, তার ধর্ষণের মামলা!

দর্শক-৩।। বাইরে বিরাট পোস্টার মেরে এলাম, "এলাবামায় নিগাড়দের ঠাণ্ডা করো! [৬৩]

নাটকটির মূল ঘটনা আবর্তিত হয়েছে আদালতের বিচার দৃশ্যে। আসামী পক্ষের উকিল মিস্টার স্যামুয়েল লিবোভিট্স এবং সরকারি পক্ষের উকিল টম নাইট। সেখানে বিভিন্ন চরিত্রের উপস্থিতি তাদের সাক্ষ্য প্রমাণ দান, লিবোভিট্স-এর অসামান্য সওয়াল ও উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়ে বিচার এগিয়ে যেতে থাকে। সাক্ষীরা হলেন সকলেই নাইটের শেখানো সাক্ষী। নাইট যখন প্রশ্ন করেন তখন সুকৌশলে সাক্ষীদের মুখে উত্তরটাও গুঁজে দেন। কিন্তু লিবোভিট্স-এর বুদ্ধিদীপ্ত তর্ক-বিতর্ক, গভীর অনুভব ও মেধাসম্পন্ন জেরা ও সওয়ালের দ্বারা সকল সাজানো সাক্ষীদের তছনছ করে দেন। কখনো জেরা করতে করতে সাক্ষীর অগোচরে অন্য প্রসঙ্গে চলে যান, আবার কখনো কখনো কথার মারপ্যাঁচে সাক্ষীর সতর্কতাকে চূর্ণ করে দেন, কখনো সাক্ষীর উপরে চাপ সৃষ্টি করেন, কখনো সত্যি কথাটা সাক্ষীকে বলতে বাধ্য করেন বিভিন্ন যুক্তি-তর্কের মধ্য দিয়ে, আবার কখনো অকাট্য প্রমাণ দর্শিয়ে সাক্ষীকে নিরুত্তর করে দেন। তবুও বিচারের নামে যে প্রহসন চলে সেটা দেখা যায় বিচারপতি ক্যালাহ্যান-এর ভূমিকায়। তিনি একজন বিচারপতি হওয়া সত্ত্বেও সদাসর্বদা তার অন্তরে জাগ্রত নিগ্রোবিদ্বেষ। সরকার পক্ষের আইনজীবী নাইট-এর মতো সোচ্চারভাবে বর্ণবিদ্বেষী হতে পারছেন না, কারণ তিনি একজন আইনজীবী। আবার অন্তরে চিরকাল পুষে রাখা নিগ্রোবিদ্বেষকেও ভুলে থাকতে পারছেন না। নিগ্রোবিদ্বেষ বিচারপতি ক্যালাহ্যান-এর মধ্যে কতটা পরিমাণ বিষবাষ্পের ন্যায় ছড়িয়ে আছে, তা তার উক্তি থেকেই বোঝা যায়—

লিবো।। মাননীয় মিস্টার ক্যালাহ্যান ঐ "নিগার" শব্দটি যেন এটর্নি জেনারেল আর ব্যবহার না করেন এই হুকুম দিন।

ক্যালা।। কেন?

লিবো।। কথাটা ঘৃণ্য জঘন্য গালাগাল।

ক্যালা।। মিস্টার লিবোভিট্স, দক্ষিণে দৈনন্দিন ব্যবহার হয়। গালাগালি নয়।

লিবো।। দৈনন্দিন কেন, প্রতি সেকেণ্ডে ব্যবহার হলেও ওটা গালাগাল। অভিধানে ওটাকে গালাগাল বলা হয়েছে, দেখতে পারেন।

ক্যালা।। অভিধান জানি না, এলাবামায় কথাটির কোনো অবজ্ঞাসূচক অর্থ নেই। ওকথা নিষিদ্ধ করা যায় না। যার যেমন অভিরুচি বলতে পারেন।। [৬৪]

বিচারপতি প্রাথমিক পর্বে নিরপেক্ষভাবে বিচার শুরু করেন। নাটক এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে বিচারপতির মুখোশ খুলতে থাকে। নিগ্রোবিদ্বেষ ক্রমশ বেরিয়ে আসে, এবং বিচারের শেষপর্বে মুখোশ ছিঁড়ে ফেলে একজন বর্ণবিদ্বেষী হয়ে ওঠেন। একজন আইন রক্ষক হয়েও আইনের রক্ষার নামে প্রহসনের মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। যখন দেখেন লিবোভিট্‌স-এর জেরার সামনে সরকারি পক্ষের উকিল নাইট ও তার সাজানো সাক্ষীরা দিশেহারা হয়ে যাচ্ছে তখন বিচারপতি ক্যালহ্যান আসরে নামেন। তিনি বুঝতে পারেন এভাবে বিচার চলতে থাকলে লিবোভিট্‌স-এর যুক্তি তর্ক খণ্ডন করে আসামীকে শাস্তি দেওয়া একপ্রকার অসম্ভব। তখন তিনি সুচতুরভাবে নিজ ক্ষমতা প্রয়োগ করে মামলার কাজে প্রভাব বিস্তার করা শুরু করেন। কারণ তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নিগ্রোদের শাস্তি দেওয়া। প্রথম সাক্ষীকে লিবোভিট্‌স বিভিন্ন কথার মারপ্যাঁচে ও যুক্তিতর্কে পর্যুদস্ত করার পর নাইট যখন সাক্ষীর মুখে উত্তর গুঁজে দিয়ে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন তখন লিবোভিট্‌স অবজেকশান জানান। কিন্তু বিচারপতি ক্যালাহ্যান নিজ ক্ষমতা প্রয়োগ করে সেই আপত্তি খারিজ করে দেন।–

লিবো।। অবজেকশন! নিজেই তো সব বলছেন এটর্নি জেনারেল! প্রশ্ন করার দরকার কি? জবাবগুলো নিজেই জুরিকে বলুন সরাসরি।

ক্যালা।। ওভাররুলড়!

লিবো।। আই বেগ ইওর পার্ডন?

ক্যালা।। বললাম আপনার আপত্তি নাকচ হলো।

লিবো।। এই আপনার রায়? এটর্নি জেনারেল সম্পূর্ণ বে-আইনীভাবে সাক্ষীকে উত্তরগুলো ধরিয়ে দিচ্ছেন–

ক্যালা।। মিস্টার লিবোভিট্‌স, আপনার আপত্তি খারিজ হয়েছে, বসুন। [৬৫]

বিচারের নামে প্রহসনের মাত্রা ক্রমশ বাড়তে থাকে নাটক এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে। তৃতীয় সাক্ষীর ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই ক্যালাহ্যান একেবারে সক্রিয় হয়ে সরকারি উকিল নাইটের সঙ্গে সঙ্গ

দিতে থাকেন। নাইট প্রত্যেক সাক্ষীকে প্রভাবিত করতে থাকেন ও তাদের উত্তর সাজিয়ে দেন। এরকম প্রতিটি প্রশ্নেই লিবোভিট্‌সের তরফ থেকে যখন অবজেকশান জানানো হয় বিচারপতি সেই লিবোভিট্‌সের অবজেকশান সরাসরি খারিজ করে দেন। আবার যখন লিবোভিট্‌সের যুক্তিতর্ক নাইটের পক্ষ থেকে আপত্তি জানানো হয় তখন ক্যালাহ্যান প্রত্যেকটা আপত্তিকে সসম্মানে মঞ্জুর করেন। বিচারপতি ক্যালাহ্যান কতটা পক্ষপাতদুষ্ট তা তাদের কথোপকথন থেকেই স্পষ্ট—

নাইট।। অবজেকশান!

ক্যালা।। সাসটেন্ড!

লিবো।। কি কারণে?

ক্যালা।। প্রত্যেকবার কারণ দর্শাতে আমি বাধ্য নই। নিন প্রশ্ন করুন।

লিবো।। মিস্টার গিলি, আপনাকে নিগ্রোরা চুপ ক'রে থাকতে বলেছিলো?

গিলি।। হ্যাঁ।

লিবো।। আপনি কি বললেন?

গিলি।। কিছুই বলিনি।

লিবো।। পেন্টরক স্টেশনে নেমে আপনি নিশ্চয়ই প্রথমে ছুটলেন পুলিশে খবর দিতে?

গিলি।। আজ্ঞে না।

লিবো।। সে কি? অমন একটা কাজ পুলিশকে না ব'লে আপনি গেলেন কোথায়?

গিলি।। খেতে।

লিবো।। ও, তাই বুঝি আপনার জবানবন্দী দেরীতে লিপিবদ্ধ হয়?

গিলি।। হ্যাঁ।

লিবো।। তা অমন বীভৎস দৃশ্য দেখে সেটা লোকের কর্ণগোচর না ক'রে আগে খাওয়া-দাওয়া করতে গেলেন?

নাইট।। অবজেকশান!

ক্যালা।। সাসটেইন্ড!

লিবো।। কি কারণে?

ক্যালা।। বলবো না।

লিবো।। বিচারপতি, কারণ আপনাকে বলতে হবে।

ক্যালা।। বলবো না। অন্য প্রশ্ন করুন।

লিবো।। বিচারপতি, অরভিল গিলি ও পক্ষের একজন মূল সাক্ষী, প্রত্যক্ষদর্শী। তাকে কিছুতেই প্রশ্ন করতে দিচ্ছেন না, এটা বড়ই পরিতাপের বিষয়।

ক্যালা।। প্রশ্ন করতে দিচ্ছি না নয়, বে-আইনী প্রশ্ন করছেন বাধা দিচ্ছি।

লিবো।। (চেঁচিয়ে) কিসে বে-আইনী?

ক্যালা।। মিস্টার লিবোভিট্স, আদালতে গলা তুললে আমিও ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবো। [৬৬]

তৃতীয় সাক্ষী অরভিল গিলিকে জেরা করার সময় এমন একটা সময় আসে যে বিচারপতি ক্যালাহ্যান-এর মুখোশ একেবারেই খসে পড়ে। লিবোভিট্স সাক্ষীকে প্রশ্ন করলেই নাইট অবজেকশান জানান এবং এক মুহূর্ত দেরি না করে তৎক্ষণাৎ বিচারপতি ক্যালাহ্যান নাইটের আপত্তি মেনে নেয়। একটা সময় দেখা যায় লিবোভিট্সের প্রশ্নবাণ ঠেকাতে বিচারপতি ক্যালাহ্যান বিচারপতির সমস্ত আদর্শ নীতি নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়ে স্বয়ং লিবোভিট্সের প্রশ্নে অবজেকশান জানিয়ে বসেন। অবজেকশান জানানোর কথা ছিল নাইটের কিন্তু নাইট অবজেকশান জানাতে ভুলে গেলে বিচারপতি সমস্ত ধৈর্য্য ও সংযম হারিয়ে ফেলে নিজেই অবজেকশান জানান। নিজের অন্তরের বিষাক্ত নিগ্রোবিদ্বেষ নির্লজ্জভাবে বেরিয়ে আসে সকলের সামনে—

লিবো।। মালগাড়িতে আপনি একা শ্বেতাঙ্গ ছেলে ছিলেন?

গিলি।। হ্যাঁ।

লিবো।। আর কে ছিলো?

গিলি।। দু'টি শ্বেতাঙ্গ মেয়ে। আর প্যাটারসন এবং তার নিগ্রো সঙ্গীরা।

লিবো।। আপনি কখনো নিগ্রোদের সঙ্গে মারামারি করেছেন?

নাইট।। অবজেকশান!

ক্যালা।। সাসটেইন্ড!

লিবো।। আচ্ছা, আপনি ঘটনার দিন কোনো নিগ্রোর হাতে মার খেয়েছিলেন?

নাইট।। অবজেকশান!

ক্যালা।। সাসটেইন্ড!

লিবো।। ঘটনার দিন আপনার সঙ্গে নিগ্রোদের কোনো বচসা হয়?

নাইট।। অবজেকশান!

ক্যালা।। সাসটেইন্ড!

লিবো।। প্যাটারসনকে ঘৃণা করার অন্য কোনো কারণ ঘটে?

ক্যালা।। অবজেকশান!

নাইট।। হ্যাঁ, অবজেকশান!

ক্যালা।। সাসটেইন্ড!

লিবো।। মিস্টার ক্যালাহ্যান; আপনি আমাকে কোনোমতেই এগুতে দেবেন না ঠিক করেছেন?

ক্যালা।। অর্থাৎ?

লিবো।। বিচারপতি নিজেই অবজেকশান তুলছেন এ অভিজ্ঞতা আমার জীবনে প্রথম।

ক্যালা।। প্রশ্নটা এমন বে-আইনী যে আমি থাকতে পারিনি।

লিবো।। কিসে বে-আইনী?

ক্যালা।। এ মামলার সরকারী রিপোর্টে কোথাও কোনো মারামারির উল্লেখ নেই। অথচ আপনি বারবার শুনানীটাকে ঐ পথে চালিত করার চেষ্টা করছেন। [৬৭]

সমগ্র আমেরিকার শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে সঙ্গে সরকার পক্ষের উকিল নাইট এবং বিচারপতি ক্যালাহ্যান চাইছিলেন হে-উড প্যাটারসনকে দোষী সাব্যস্ত করে নানারকমভাবে অত্যাচার করতে। নানারকম অত্যাচারের মধ্য দিয়ে নিগ্রোপীড়নের আনন্দ উপভোগ করতে চাইছিলেন। বিচারপতি ক্যালাহ্যান ভালো করেই জানেন লিবোভিট্স যদি মামলা চালিয়ে যান তাহলে হে-উড প্যাটারসনকে কোনোভাবেই শাস্তি দেওয়া যাবে না। তাই বিচারপতি ক্যালাহ্যান একসময় বলে ওঠেন—

না পারলে মামলা ছেড়ে দিন। অন্য প্রশ্ন করুন। [৬৮]

বিচারপতি ক্যালাহ্যান চাইছিলেন লিবোভিট্স মামলাটা ছেড়ে দিক তাহলেই নিগ্রো যুবক হে-উড প্যাটারসনকে ইলেকট্রিক চেয়ারে পাঠানো যাবে। এমতাবস্থায় দুঁদে আইনজীবী লিবোভিট্স

ততোধিক ধূর্ত কায়দায় জেরা শুরু করেন। জেরার মধ্য দিয়ে কিছুটা শ্বেতাঙ্গ প্রীতি দেখাতে থাকেন ও নিগ্রো নিন্দা শুরু করেন। এরফলে সাক্ষীর সতর্কতা চূর্ণ করতে থাকেন, এতক্ষণ সাক্ষী যে নির্জলা মিথ্যা কথা বলে যাচ্ছিলেন পরস্পর, লিবোভিট্সের প্রশ্নবাণে দিশেহারা হয়ে সাক্ষীর মুখ থেকে আসল সত্য বার করতে থাকেন। কিন্তু এমতাবস্থায় এগিয়ে আসেন বিচারপতি ক্যালাহ্যান। তিনি সরকারি পক্ষের উকিল নাইটের মতো নিজেও একজন বিচারপতি হয়ে সাক্ষীর মুখে উত্তর গুঁজে দিতে শুরু করেন—

লিবো।। আমি মরে গেলেও বিশ্বাস করি না, দক্ষিণের শ্বেতাঙ্গরা এত হীনবল, এমন নপুংসক যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেয়েদের ধর্ষিত হতে দেখবে। আমি বলছি কি হয়েছিল। ধর্ষণ হয়নি, হয়েছিল ছেলেতে ছেলেতে মারামারি।

গিলি।। না, ধর্ষণ হয়েছিল।

লিবো।। তারপর শ্বেতকায় ছেলেদের নিগ্রোরা মেরে ট্রেন থেকে নামিয়ে দেয়। তোমাকে রুগ্ন বলে ছেড়ে দেয়।

গিলি।। না।

লিবো।। তোমার জবানবন্দী আগাগোড়া মিথ্যা।

গিলি।। না।

লিবো।। নো মোর কোয়েশ্চেনস।

নাইট।। অরভিল চ্যাটানুগা থেকে স্টিভেনস কতদূর?

গিলি।। পঁচিশ মাইল।

নাইট।। এর মধ্যে কেউ ট্রেন থেকে ওঠানামা করেছিল?

গিলি।। না।

নাইট।। ভালো ক'রে ভাবো।

গিলি।। না।

ক্যালা।। তোমার বন্ধুরা?

গিলি।। হ্যাঁ, হ্যাঁ। স্টিভেনসনের আগে ওরা নেমে যায়।

নাইট।। নো মোর কোশ্চেনস!

লিবো।। বাঃ বিচারপতি নিজেই!! গিলিকে রক্ষা করতে পুরো এলাবামা রাষ্ট্র এগিয়ে আসছে, আমার পক্ষে এগুনো অসম্ভব। [৬৯]

বিচারের যে নির্লজ্জতা, বিচারের নামে যে প্রহসন সেটা ক্যালাহ্যান বিচারপতির আসনে বসেই তিনি দেখিয়ে দিলেন। তিনি একজন বিচারপতি হওয়া সত্ত্বেও নির্লজ্জ পক্ষপাতিত্ব করতে থাকেন। এই পক্ষপাতিত্বের এক এবং একমাত্র উদ্দেশ্য নিগ্রো যুবক হে-উড প্যাটারসনকে শাস্তি দেওয়া, তাকে ইলেকট্রিক চেয়ারে পাঠিয়ে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু উপহার দেওয়া। শুধু বিচারপতি নয়, আদালতে উপস্থিত দর্শকরাও শুরু থেকেই নানারকম উত্তেজনাপূর্ণ আচরণ করতে থাকেন, দুঁদে আইনজীবী লিবোভিট্‌সের উদ্দেশ্যে কুৎসিত গালাগালি ও তাকে ভীতি প্রদর্শন করতে থাকেন। এমনকি বাইরে বেরিয়ে এলে তার প্রাণনাশের হুমকি পর্যন্ত দিতে থাকেন। বিশাল জনতা এসে হাজির হয় আদালতের দরজায় এবং তারা প্রকাশ্যেই বলতে থাকে নিগ্রো যুবক প্যাটারসন এবং উকিল লিবোভিট্‌সকে হত্যা করবেন। বিচারের ফলাফল আগে থেকেই জানা। তাদের বিচারে নিগ্রো যুবক দোষী সাব্যস্ত হবেই এবং সে তার উপযুক্ত শাস্তি পাবে। আর সেই শাস্তি উপভোগ করার জন্য স্কটস্‌বরো থেকে এক বিশাল জনতা আদালতের দরজায় এসে উপস্থিত।

নাটক যত এগোতে থাকে বিচারের নামে প্রহসন তত বাড়তে থাকে। বিচার ব্যবস্থাকে যেন সার্কাসে পরিণত করেন বিচারপতি ক্যালাহ্যান ও সরকারি পক্ষের উকিল নাইট। সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত হয় ভিক্টোরিয়া প্রাইজ, তার অভিযোগ হে-উড প্যাটারসন তাকে ধর্ষণ করেছে। ভিক্টোরিয়া প্রাইজের সাক্ষ্যের গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ সাক্ষ্যদানের উপরেই নির্ভর করছে প্যাটারসন সাজা পাবে, না মুক্তি লাভ করবে। সরকার পক্ষের উকিল নাইট, তাকে যেভাবে শিখিয়েছিল ভিক্টোরিয়া প্রাইজ সেইভাবেই দীর্ঘ বিবৃতি দেয়, যার মর্মার্থ এটাই— প্যাটারসন তাকেই ধর্ষণ করেছে।

লিবোভিট্‌স জেরা করতে ওঠেন ভিক্টোরিয়াকে। একের পর এক পুলিশি রিপোর্ট, মেডিকেল রিপোর্ট, বিভিন্ন হোটেলের তালিকা সব আদালতে পেশ করতে থাকেন। বিভিন্ন প্রমাণাদির সাহায্যে তিনি ভিক্টোরিয়া প্রাইজকে এগোরো বার মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেন এবং তিনি প্রমাণ করেছেন যে ভিক্টোরিয়া প্রাইজ একজন পেশাদার বারাঙ্গণা এবং প্রমাণ করে দেন প্যাটারসন ভিক্টোরিয়া প্রাইজকে ধর্ষণ করেছিল বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে সেই অভিযোগ আগাগোড়াই মিথ্যা। সবই ছিল সাজানো অভিযোগ— নিগ্রো যুবক প্যাটারসনকে বিপদে ফেলার জন্য শেখানো

অভিযোগ। লিবোভিট্স যখন ভিক্টোরিয়াকে নাস্তানাবুদ করেন তখন বিচারের নামে প্রহসনেরও প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হন বিচারপতি ক্যালাহ্যান। তার হিংস্র জাতিবিদ্বেষ সক্রিয় হয়ে ওঠে। বিচারকের চেয়ারে বসে ক্যালহ্যান সরকারি পক্ষের ওকালতি শুরু করেন। প্যাটারসনকে মোক্ষম প্যাঁচে ফেলার নানারকম চেষ্টা ক্যালাহ্যান করতে থাকেন—

ক্যালা।। ডেকাটুরের জুরির মধ্যে বর্ণবিদ্বেষ নেই। জবাব দাও, পাট্যারসন, তুমি সত্যি কথা বলছো আর শ্বেতাঙ্গ শেরিফ মিথ্যেবাদী?

লিবো।। ডোন্ট আনসার দ্যাট! বিচারপতি— সেকেন্ড এমেন্ডমেন্ট! আসামীকে এমন কিছুই বলতে বাধ্য করা যায় না যা ওর নিজের বিরুদ্ধে যায়!

ক্যালা।। আবার আপনি বই পড়া আইন বিদ্যা তিড়িং বিড়িং শুরু করেছেন!

লিবো।। তা স্যার আইন তো বই পড়েই শেখে, দৈববলে শেখা যায় না।

ক্যালা।। প্যাটারসনকে জবাব দিতে হবে।

লিবো।। ফোর্থ এমেন্ডমেন্ট!

নাইট।। জবাব দাও, প্যাটারসন, শ্বেতাঙ্গ মিথ্যেবাদী?

লিবো।। ডোন্ট আন্সার দ্যাট, সেকেন্ড এমেন্ডমেন্ট!

ক্যালা।। মিস্টার লিবোভিট্স আপনি ক্রমান্বয়ে ইচ্ছা পূর্বক বাধা সৃষ্টি করছেন। [৭০]

ক্যালাহ্যান নিজে একজন বিচারপতি তা তিনি ভুলে গেছেন, তিনি প্যাটারসনকে শাস্তি দিতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। প্যাটারসনকে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসিয়ে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিতে যেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বিচারপতির নীতি-নৈতিকতা, নিরপেক্ষতা, সততা ক্রমে ক্রমে মুছে গেছে ক্যালাহ্যানের মন থেকে। ক্যালাহ্যানের এহেন আচরণ দেখে মিস্টার লিবোভিট্স বলে ফেলেন—

আপনার জন্মের আগে থেকে আমি আদালতে কথা কইছি। এ রকম বে-আইনি, বিদঘুটে, উদ্ভট বিচার জীবনে দেখিনি। বিচারক খোলাখুলি সরকার পক্ষের ওকালতি করছেন! [৭১]

স্বয়ং বিচারপতি যখন পক্ষপাতিত্বের শিকার হয় তখন বোধহয় বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে। শেষপর্যন্ত বিচারপতি ক্যালাহ্যান ও উকিল টম নাইট-এর ষড়যন্ত্রে নিগ্রো যুবক হে-উডকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়—

ক্যালা।। জুরি তোমাকে ধর্ষণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। এলাবামা রাজ্যের আইন অনুসারে

আমি তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দিলাম। আগামী ফেব্রুয়ারী মাসের ৮ তারিখে কিলবি কারাগারে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী হবে। [৭২]

এই স্কটস্‌বরো মামলাকে কেন্দ্র করে, নিগ্রোদের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের এই বর্ণনায় সারা বিশ্বের রাজনীতিতে প্রবল ঝড় বয়ে গিয়েছিল। প্রতিবাদে প্রতিরোধে মুখর হয়েছিল বিশ্বের নানা প্রান্তের বিবেকবান মানুষেরা। ভারত থেকে ভিয়েতনাম, ব্রাজিল থেকে কঙ্গো, চীন থেকে জাপান প্রতিটি দেশের কোনায় কোনায় কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের প্রতিবাদের সুরে মুখরিত হয়েছিল আকাশ-বাতাস। পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে উথাল-পাতাল করে দিয়েছিল এই ঘটনাটি। শুধুমাত্র পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে নয়, পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতেও গভীর প্রভাব ফেলে ছিল আমেরিকার এই কৃষ্ণাঙ্গ পীড়নের ঘটনাবৃত্তান্ত। 'লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ'-এ যখন 'মানুষের অধিকার' নাটকটি রাতের পর রাত অভিনীত হচ্ছিল এবং দর্শকদের মনে এর বিরাট প্রভাব পড়তে শুরু করে তখন কিছু পত্র-পত্রিকা এই নাটকের বিরুদ্ধে নানারকমভাবে অভিযোগ তুলতে শুরু করে। এমনকি নাটক যাতে বন্ধ করা হয় তার জন্য বিভিন্ন রকমভাবে প্রচেষ্টা করতে থাকে। সেকথা উৎপল দত্ত স্মৃতিচারণামূলক প্রবন্ধ 'লিট্‌ল থিয়েটার ও আমি'-তে বলে গেছেন—

> *"দেশব্রতী" পত্রিকা হঠাৎ জেহাদ ঘোষণা করল নাটকটার বিরুদ্ধে, সপ্তাহের পর সপ্তাহ হাস্যকর ও নির্বোধ সব অভিযোগ তুলতে লাগল। প্রথম দৃশ্যে 'ব্ল্যাক পাওয়ার' কথাটা কেন লেখা ছিল পর্দায়? ওটা নাকি প্রবল প্রতিক্রিয়াশীল এক শ্লোগান।* [৭৩]

'মানুষের অধিকার' নাটকের মধ্যে দিয়ে তিনি দেখালেন 'অজেয় ভিয়েৎনাম' নাটকের মতো আন্তর্জাতিক ভাবনার শরিক তিনি। শুধু সমসাময়িক ভারতীয় বা পশ্চিমবঙ্গীয় রাজনীতি নয়, বিশ্বে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাগুলি, যা নিয়ে সারা পৃথিবী তোলপাড় হয়েছিল এবং ভারতবর্ষের রাজনীতিও প্রভাবিত হয়েছিল সেরকম ঘটনা নিয়ে তিনি নাটক সৃষ্টি করেছেন। 'মানুষের অধিকার' নাটকটি তাঁর সেই আন্তর্জাতিক ভাবনারই ফসল। আমেরিকার একটি অংশের এককালীন বর্ণবিদ্বেষের একটি ঘটনাকে অবলম্বন করে নাট্যকার উৎপল দত্ত সর্বদেশের সর্বকালীন বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। এই ঘটনাকে দেশ-কালের গণ্ডি অতিক্রম করে অনায়াসে শিকল পরা পরাধীন সব মানুষের কথা রূপেই হাজির করেছেন। ভারতবর্ষে উৎপল দত্ত এই প্রথম 'স্কট্‌সবরো' মামলাকে অবলম্বন করে বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে তাঁর জেহাদ ঘোষণা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে অন্যায়ভাবে শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গদের উপরে অত্যাচার করে। তাই লিবোভিট্‌সের মতো একজন বিখ্যাত উকিলের জোরালো সওয়ালের পরেও আসল ঘটনা উদ্‌ঘাটিত হলেও মার্কিন প্রশাসনের বর্ণবিদ্বেষের ক্রমাগত কৌশলে কৃষ্ণাঙ্গরা বিনা কারণে শাস্তি পায়।

তবে এ নাটক শুধুমাত্র দেশে দেশে বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে অত্যাচারিত মানুষের মাথা তুলে দাঁড়ানোর নাটক নয়। যেখানেই মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায় অবিচার, মানুষের প্রতি মানুষের শোষণ সেখানে মানুষ তার নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার পথনির্দেশক হল নাটক। মানুষের ছদ্ম সততার আড়ালে অসহায় মানুষের প্রতি যে অত্যাচার ও অন্যায় অনবরত ঘটে চলে তারই প্রতিবাদের নাটক। এই নাটক শুধু বিচারের নাটক নয়, মানুষের অধিকার রক্ষার ও অধিকার প্রতিষ্ঠার এক জীবন্ত দলিল।

ব্যারিকেড

প্রথম অভিনয় : ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৭২, কলামন্দির, কলকাতা

প্রথম প্রকাশ : ১ মে ১৯৭৭, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ।

উৎপল দত্ত 'ব্যারিকেড' নাটকটি প্রযোজনা করেন ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৭০-এর গোড়ার দিকে পশ্চিমবঙ্গে তখন নির্বাচনের নামে চলছে প্রহসন, কংগ্রেস বিরোধী কোনো রাজনৈতিক দলকেই বা কোনো সরকারকেই তখন টিকতে দেওয়া হচ্ছে না। ক্ষমতা দখলের নির্লজ্জ প্রচেষ্টায় যেনতেন প্রকারে মন্ত্রীসভাকে ভেস্তে দেওয়া হচ্ছে। চারিদিকে খুন-জখম ও ধর্ষণ যেন নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। পশ্চিমবঙ্গের বাতাস বারুদের গন্ধে ভরপুর, আকাশ বোমা-বন্দুকের গর্জনে কম্পমান। এরকম রাজনৈতিক টালমাটাল অবস্থায় উৎপল দত্ত লিখলেন কালজয়ী নাটক 'ব্যারিকেড'। নাটকটি ১৯৩১-৩৩ খ্রিস্টাব্দের জার্মানির পটভূমিতে রচিত হয়। ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদের অভ্যুত্থানের মুহূর্তে নাৎসি জার্মানিদের অত্যাচারে সেখানকার সোশ্যালিস্ট দলের তথা গণতন্ত্রপ্রেমী সাধারণ মানুষের উপরে অত্যাচার, হত্যা, নির্যাতন ও নারী ধর্ষণের যে বিপর্যয় সেই প্রেক্ষাপট তৈরি করা হয়েছে। নাৎসি নেতা আডলফ হিটলারের অভ্যুত্থান ঘটেছিল জার্মানির এইরকম একটা অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে। জার্মানিতেও নির্বাচনের নামে একইরকম প্রহসন, যে কোনো উপায়েই তাদের ক্ষমতা দখল, গণতন্ত্রকে শেষ করে ক্ষমতা দখলের নির্লজ্জ প্রচেষ্টা। জার্মানিতে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে ব্যাপক জালিয়াতি ও সন্ত্রাসের মধ্য দিয়ে হিটলার ও নাৎসি পার্টি ক্ষমতা দখল করে। একইরকমভাবে ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের পশ্চিমবাংলার কুখ্যাত যে নির্বাচন সে নির্বাচনেও প্রহসন, খুন-জখমের মধ্য দিয়ে কংগ্রেস দল ক্ষমতা দখলের মরিয়া প্রচেষ্টা চালায়। পশ্চিমবাংলার ১৯৭০-৭২ খ্রিস্টাব্দের অবস্থার সঙ্গে জার্মানির ১৯৩১-৩৩ খ্রিস্টাব্দের রাজনৈতিক পরিবেশ পরিস্থিতি একেবারে হুবহু যেন মিলে গিয়েছিল। আডলফ হিটলারের মধ্যে তদানীন্তন

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির প্রভূত মিল লক্ষ করা যায়। জার্মানির নাৎসি পার্টি যেন ভারতীয় কংগ্রেস দল— একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ।

রাষ্ট্রশক্তির সহায়তা নিয়ে পুলিশ প্রশাসন ও গুণ্ডাদের যে দুর্বিষহ দিনগুলি পশ্চিমবঙ্গের মানুষ প্রত্যক্ষ করেছিল সেই রাজনৈতিক সন্ত্রাসের ঘটনাবলি উৎপল দত্ত সোজাসুজি নিয়ে এলেন নাটকের বিষয় হিসেবে। সমকালের জীবন্ত ছবি তুলে ধরলেন আলোচ্য নাটকে। সেইসময় ফরোয়ার্ড ব্লক দলের নেতা শ্রদ্ধেয় হেমন্ত বসু নিজের বাড়ির সামনেই অজ্ঞাত আঁততায়ী দ্বারা নৃশংসভাবে খুন হলেন। কিন্তু কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে প্রচার করা হয়েছিল যে, কমিউনিস্ট দলের লোকেরাই তাঁকে হত্যা করেছে। উৎপল দত্ত তাঁর 'ব্যারিকেড' নাটক ঠিক সেই সময়কার জার্মানির একইরকম একটি ঘটনাকে জুড়ে দিয়েছেন। শেষপর্যন্ত তিনি প্রমাণ করে দিয়েছিলেন প্রকৃত হত্যাকারী কারা ছিল।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে সি.পি.আই(এম) একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতা দখল করে। এরপর কংগ্রেস ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে, তখন ব্যাপক অত্যাচার রিগিং করা ছাড়া তাদের সামনে আর কোনো রাস্তা ছিল না। ছাত্র হত্যা, বিচারপতি হত্যা সবকিছুর দায় কমিউনিস্টের উপরে চাপিয়ে দিতে শুরু করল ও কমিউনিস্টদের নির্বিচারে হত্যা ও নির্যাতন করতে শুরু করল। সেটা রাস্তার মোড়ে অথবা জেলের ভিতরে, পাড়ার গলিতে অথবা থানার লকআপে। তিনি স্বচক্ষে নারী ধর্ষিত হতে দেখলেন কলকাতার থানার লকআপে অথবা বাসন্তীতে। তা নিয়ে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে বড়ো বড়ো সংবাদপত্রগুলির শুরু হয়েছিল নির্লজ্জ বেসাতি। অথচ এই অত্যাচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবীরা একপ্রকার নিশ্চুপ অবস্থায় ছিলেন যা উৎপল দত্তকে ক্রুদ্ধ করে তুলেছিল। এমতাবস্থায় উৎপল দত্ত প্রত্যাঘাতের পথে হাঁটলেন তাঁর নাটক নিয়ে। তাঁর ভাষায়—

> *তখন চতুর্দিকে ফ্যাসিস্ট শক্তির উত্থান ঘটেছে, সি.পি.আই(এম)-এর একজন সদস্যও তখন নিজের বাড়িতে থাকতে পারছেন না, তাঁরা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে যেতে পারছেন না, এহেন অবস্থায় প্রচণ্ড ক্রোধে আমি নাটক লিখলাম— 'ব্যারিকেড'। বহিরঙ্গের দিক থেকে নাটকটি ছিল হিটলারের অভ্যুত্থান নিয়ে, রাইখস্টাগ অগ্নিকাণ্ডের মামলা নিয়ে, এবং সেই সন্ত্রাসের পটভূমিতে জার্মান বুদ্ধিজীবীদের নপুংসকতা নিয়ে।* [৭৪]

নাটকের শুরুতেই দেখি নাটকের সূত্রধার ও একজন বাঙালি শ্রমিক কলকাতার রাস্তায় কথা বলছে। সূত্রধার লাল ফৌজের বিপ্লবী গান গাইছে। শ্রমিক তাকে জিজ্ঞাসা করে, কলকাতায় দাঁড়িয়ে বিদেশি গান কেন? উত্তরে সূত্রধার বলে—

বিপ্লবের গানে আবার 'দেশী-বিদেশী' কি? তুমি কি বিপ্লবের ব্যাপারে বিলাতি বর্জন করো নাকি? আমি মনে করি পুরো বিশ্বটাকে কলকাতার আঙিনায় এনে হাজির করতে পারলে তবে আমি বাঙালি। [৭৫]

নাটকে জার্মানির রাজনীতির মধ্য দিয়ে কলকাতার রাজনীতিকে তুলে ধরা হবে। সূত্রধারের উক্তিতে ও নাটকের এই গৌরচন্দ্রিকার মধ্য দিয়ে তার একটি প্রাথমিক আভাস পাওয়া যায়। সূত্রধার নাটকের প্রদত্ত নাম প্রসঙ্গে বলে—

যদিও ব্যারিকেড কথাটাও বিদেশী। কিন্তু দুনিয়ার সব মজদুর জানে কথাটার মানে, কারণ ডাস্টবিন, পাইপ আর ইঁট ফেলে যখন রাস্তা অবরোধ করে লড়তে হয় তখন নিউইয়র্কের হার্লেম আর কলকাতার খিদিরপুর এক হয়ে যায়। [৭৬]

এরপরই শ্রমিক আবার যখন সূত্রধারকে জিজ্ঞাসা করে জানতে চায় আজকের পালায় কোন কোন চরিত্র আছে। সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় মঞ্চের উপরের পর্দা উঠে যেতেই কিছু জীবন্ত মানুষের মুখ। এরা হলেন নাৎসি নেতা রোহান লিপার্ট, ফ্রাইয়েৎসাইটুং পত্রিকার সম্পাদক ও মালিক হাইনরিশ্ লান্টু, বিচারপতি আলকেট ফস, ডাক্তার হেরমান স্ট্রবেল, গৃহবধূ ইংগেবরৎসাউবিৎস প্রভৃতি। এরপর বাঙালি শ্রমিক প্রাচীরের কাছে গিয়ে তাদের পরিচয় জানতে চায় এবং জার্মান চরিত্ররা বাঙালি শ্রমিককে নিজ নিজ পরিচয়ও জানায়। এক মুহূর্তে বার্লিন ও বাংলা এক সূত্রে বাঁধা পড়ে যায়। নাটকের কাহিনি, পাত্রপাত্রী, ঘটনার দ্বন্দ্ব, সংঘাত এবং রাজনৈতিক ঘটনাবলি সবই জার্মানির পরিবেশে রচিত হলেও ১৯৭০-৭২ খ্রিস্টাব্দের পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ঘটনাবলির সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। জার্মান চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে বাঙালি চরিত্রের ছায়াপথ লক্ষ করা গিয়েছিল।

সূত্রধার ও বাঙালি শ্রমিকের কথোপকথনের পরেই নাট্যকাহিনি প্রবেশ করে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের জার্মানির রাজনৈতিক পটভূমিতে। সেখানে দেখা যায় আডলফ হিটলার প্রধানমন্ত্রীর পূর্ণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন। আডলফ হিটলারের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার রাস্তা জার্মান সাধারণ নাগরিকদের কাছে অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং ভয়ংকর। ক্ষমতার লোভ ও লালসার একটার পর একটা নির্বাচন করা, যতক্ষণ না প্রধানমন্ত্রীত্বের আসন গ্রহণ করছে ততক্ষণ মন্ত্রীসভা ভেঙে দেওয়া, বিরোধী দলের উপরে অকথ্য অত্যাচার, নৃশংস নির্যাতন প্রভৃতি কিছুই বাদ দিল না। বাদ যায়নি বৃদ্ধ হত্যা থেকে নারী ধর্ষণ। কীভাবে হিটলার প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন তার নেপথ্য কাহিনি তুলে ধরেছিলেন সত্যের পূজারি, সত্যান্বেষী রিপোর্টার অটো বিরখোলৎস। তাঁর পত্রিকার রিপোর্ট থেকে নাৎসিদের অত্যাচারের কাহিনির আভাস আমরা পেয়ে থাকি—

এ বড় বিচিত্র দেশ। এখানে অনবরত নির্বাচন হয়। তিন বছরে জার্মেনিতে পাঁচবার নির্বাচন হয়ে গেল। ১৯৩০ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর নির্বাচন হ'ল। তাতে আইনসভার ৬০৮ টা আসনের মধ্যে হিটলারের নাৎসি পার্টি পেল ১০৭ টা আর শ্রমিক পার্টিগুলি পেল ৩৫০। ৩৫০ থেকে ১০৭ স্বভাবতই বেশি: তাই রাষ্ট্রপতি হিটলারকেই ডেকে পাঠালেন মন্ত্রিসভা গড়বার জন্য। কিন্তু লোকে অঙ্কশাস্ত্র বোঝে না, তারা ক্ষেপে উঠে গণ্ডগোল লাগাতে আইনসভা ভেঙে দিয়ে আবার নির্বাচন ১৯৩২ সালের মার্চে। আবার হিটলার হারলেন। তাই ফের আইনসভা ভেঙে দিয়ে ফের নির্বাচন ১০ই এপ্রিল ১৯৩২, এবং তাতে ফের হিটলার হেরে গেলেন। তখন ফের আইনসভা ভেঙে দিয়ে ফের নির্বাচন ৩১ শে জুলাই ১৯৩২, এবার নাৎসি পার্টি পেল ২৩০টি আসন, শ্রমিক পার্টিগুলি ২২২টি। কিন্তু গোল বাধলো ছোট, ছোট দলগুলো, সব গিয়ে জুটলো কমিউনিস্ট পার্টির ছত্রছায়ায়। ফলে আইনসভায় ২৩০ জন নাৎসির বিরুদ্ধে দাঁড়ালো ৩৭৮ জন নানা পার্টির সদস্য। সুতরাং আবার গণতন্ত্রকে রক্ষা করবার জরুরী প্রয়োজন দেখা দিল। ৩০শে আগস্ট আইনসভার প্রথম অধিবেশনেই আইনসভা বাতিল করে দিয়ে ফের নির্বাচন— ৬ই নভেম্বর ১৯৩২। এবার নাৎসিরা পেল ১৯৬টা আসন, শ্রমিক পার্টিগুলো ২২১। আর অন্যান্য দলগুলো কমিউনিস্ট পার্টিকে সমর্থন করতে আইনসভায় শক্তি দাঁড়ালো— নাৎসি ১৯৬, নাৎসি-বিরোধী ৪১২। এখন একথা ইস্কুলের শিশুও জানে ৪১২-এর চেয়ে ১৯৬ বেশি। তাই আজ সকাল শোয়া দশটায় ঐ ১৯৬-এর নেতা হিটলারকে প্রধানমন্ত্রী করা হয়েছে, এবং আইনসভা ভেঙে দিয়ে ফের পুনরায় আবার নির্বাচন ধার্য হয়েছে, আগামী ৫ই মার্চ। [৭৭]

হিটলারের ক্ষমতা দখলের খুঁটিনাটি ও তৎকালীন জার্মান রাজনীতির পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এই বিবরণে। নির্বাচনের নামে নির্লজ্জ প্রহসন পরিলক্ষিত হয়, যেমনটা কলকাতায় পরিলক্ষিত হয়েছিল ১৯৭০-৭২ খ্রিস্টাব্দে। কলকাতার ইতিহাসে সে-সময়ও রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য কমিউনিস্টদের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ, বোমা-পিস্তলের শব্দ, বহু রাজনৈতিক হত্যা দিনের পর দিন ঘটে চলেছিল। ঠিক যেমনটা ঘটেছিল বার্লিনের রাস্তায়। দিনের পর দিন চলত নাৎসি ও কমিউনিস্টদের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ। বার্লিন প্রত্যক্ষ করেছিল একের পর এক রাজনৈতিক খুন ও প্রতিহিংসা। সত্যান্বেষী রিপোর্টার অটো বিরপোলৎস-এর রিপোর্ট থেকে আমরা আরও জানতে পারি—

বার্লিনের রাস্তায় রাস্তায় চলছে নাৎসি আর কমিউনিস্টদের মধ্যে যুদ্ধ। গত ছ'মাসে ৪৬১ টা খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেছে পিস্তল, বোমা, ছুরি আর বিয়ারের বোতল নিয়ে। এক মাসে এ শহরে ৮৩টি রাজনৈতিক খুন হয়ে গেছে। সকলে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার আগ্‌লাচ্ছে; সন্ধ্যের পর বার্লিনের রাজপথে লোক হাঁটে না। [৭৮]

নাৎসিদের প্রচারের একটা মূল ধারা ছিল, যেটা হল আবেগের রাজনীতির প্রচার। মানুষের

আবেগে প্রবল উন্মাদনা সৃষ্টি করে তার যুক্তি, বুদ্ধিকে নিষ্ক্রিয় করে আবেগকেই প্রাধান্য দেওয়া। বার্লিনের বিখ্যাত সংবাদ পত্র 'ফ্রাইয়েৎসাইটুং'-এ খবর আসে শ্রদ্ধেয় ও সর্বজন বন্দিত জননেতা ও দেশপ্রেমিক সত্তর বছরের বৃদ্ধ য়োসেফ ৎসাউরিৎস প্রকাশ্য দিবালোকে তার বাড়ির সামনে নৃশংসভাবে খুন হয়েছিলেন। এই খুনের জন্য নাৎসি নেতা লিপার্ট প্রকাশ্য জনসভায় কমিউনিস্টদের দায়ী করেছেন। কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে জনতাকে উত্তেজিত করেছেন এবং আসন্ন নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টিদের সমূলে উচ্ছেদ করার আহ্বান জানিয়েছেন যোসেফ ৎসাউরিৎস এই হত্যাকাণ্ডের খবর বার্লিনের বিখ্যাত সংবাদপত্রের সম্পাদক লান্টকে জানান নাৎসি নেতা লিপার্ট পত্রিকার সম্পাদক লান্ট নিজেকে সদা সর্বদা সত্যের পূজারি বলে মনে করেন। কিন্তু তিনি লিপার্টের কথা শুনেই সত্যতা বিচার না করে সিদ্ধান্তে আসেন য়োসেফ ৎসাউরিৎস-কে খুন করেছেন কমিউনিস্টরা। যদিও তার এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে অকাট্য কোনো তথ্য প্রমাণ নেই। য়োসেফ ৎসাউরিৎস-এর এই হত্যাকাণ্ড দেখে দর্শকদের মনে পড়ে যায় কলকাতায় তখন সদ্য ঘটে যাওয়া ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা হেমন্ত বসু হত্যাকাণ্ডের কথা। যিনি তার বাড়ির কাছে আততায়ী দ্বারা নিহত হন। এবং কিছু পত্র-পত্রিকা একইরকমভাবে ব্যাপক প্রচার শুরু করে দেয় এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী একমাত্র সি.পি.আই(এম)। তখনকার কলকাতার রাজনৈতিক পরিবেশ সম্পর্কে স্মরণ করতে গিয়ে উৎপল দত্ত বলেন—

> *১৯৭১ সালে, নির্বাচনের ঠিক আগে, অশীতিপর বামপন্থী নেতা হেমন্ত বসুকে হত্যা করে কিছু অজ্ঞাতপরিচয় লোক, এবং সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সংবাদপত্র— যারা নিরপেক্ষতার বড়াই করে— তারা ব্যাপক প্রচার শুরু ক'রে দেয়, এই হত্যাকাণ্ডের জন্য সি.পি.আই(এম) দায়ী। পুলিশ তদন্ত শুরু করার আগেই সব কংগ্রেসি নেতা চিৎকার শুরু ক'রে দেন— খুনি সি.পি.আই(এম)-এর হাত রক্তে লাল। এবং এই যৌথ প্রচারকার্যে গলা মেলান বুদ্ধিজীবীদের এক বৃহৎ অংশ।* [৭৯]

নাৎসি নেতা লিপার্ট যেমনভাবে য়োসেফ ৎসাউরিৎস হত্যাকাণ্ডকে সরাসরি কমিউনিস্টদের উপর চাপিয়েছেন, ঠিক একইরকমভাবে একই লক্ষ্যে ধাবিত হয় সংবাদপত্রের প্রচারও। পত্রিকা সম্পাদক লান্ট তার অফিসের সমস্ত কর্মচারীদের নির্দেশ দেন— পরের দিনের খবরের কাগজের প্রথম পাতায় য়োসেফ ৎসাউরিৎস হত্যার খবর বড়ো করে করে ছাপাতে হবে। অন্য সমস্ত খবরকে ভিতরের পাতায় রাখতে হবে এবং প্রথম পাতায় বড়ো বড়ো হেডলাইন করে কমিউনিস্টদের দোষী করে য়োসেফ ৎসাউরিৎস হত্যাকাণ্ডের খবর ছাপতে হবে। তিনি আরও নির্দেশ দেন যে এই হত্যাকাণ্ডের খবর একটানা সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় প্রকাশিত হবে। পত্রিকা সম্পাদক

লান্ট, যিনি সত্যের পূজারি হিসেবে দাবি করেন, তিনি হলেন শাসক শ্রেণির অনুগত। সত্যবাদিতার ভেক ধারণ করে মিডিয়া আসল খবরকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে, নিজের আখের গোছাবার জন্য। তারা সত্যকে মিথ্যায় পরিণত করে, মিথ্যাকে সত্যে। জনতাকে বিভ্রান্ত করে, মানুষকে রাজনৈতিকভাবে বিভ্রান্ত করে দেয় এইসব স্বার্থপর সংবাদপত্রগুলি। পত্রিকা সম্পাদক লান্টের কথার মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পারি যে তিনি এই লোভী স্বার্থপর শাসকের কতটা অনুগত ছিলেন, কতটা পদলেহন করতেন শাসক শ্রেণিকে—

> *রিপোর্টটি মিথ্যা সেকথা আমি বলছি না। বলছি তোমার বিচিত্র ভাষার কথা। তুমি লিখেছ "তখন পুলিশ গুলি চালায় এবং তাতে মিছিলের তিনজন শ্রমিক নিহত হয়।" এটা কি? তুমি কি মদ খেয়েছ নাকি? ... বুঝতে পারছ না? প্রথমত, "পুলিশ গুলি চালায়" এমন কথা আমার কাগজে বেরুতে পারে না। লিখবে, "পুলিশ গুলি চালাতে বাধ্য হয়।"... তর্ক আমি শুনতে চাই না। পুলিশ সবসময় বাধ্য হয়। বাধ্য না হলে তারা গুলি চালাতে পারে না— চালায় না। এটাই নিয়ম। দ্বিতীয়ত, বাধ্য যখন হতেই হবে, তখন বাধ্য হবার কারণটা কোথায়? ... আমি খুব ভাল করে জানি মাগ্‌ভেবুর্গের ধর্মঘটে শ্রমিকরা মিছিল করছিল, কিন্তু সেটা লেখা যায় না, শুধু সেটা লিখেই ছেড়ে দেওয়া যায় না। জার্নালিজম-এর কিছুই বোঝে না। শ্রমিকরা নিরীহ ভেড়ার পালের মত মিছিল করছে আর পুলিশ গিয়ে হামলে পড়ল, একথা ছাপা যায় না। ধর্মঘটিরা মিছিল করলেই পুলিশ বাধ্য হতে পারে না। সুতরাং আমি এইভাবে জিনিসটা লিখছি— "পুলিশ উগ্রপন্থী কমিউনিস্টদের ঘাঁটি খানাতল্লাসি করতে গেলে তারা পুলিশের ওপর গুলিবর্ষণ করে। ফলে পুলিশ পাল্টা গুলি ছুঁড়তে বাধ্য হয়" (অটো চলে যাচ্ছিল) তুমি যাচ্ছ কোথায়? বোসো। না তুমি যে বসেই আছ সেটা জানি। ওটা বললাম অটোকে। তৃতীয়ত, তুমি লিখেছ "তিনজন শ্রমিক নিহত হয়"। এটা কী? ... না না, ওসব চলবে না। পুলিশের গুলিতে যে-ই নিহত হোক, সে সর্বসময়ে সশস্ত্র উগ্রপন্থী। আর কাউকে পুলিশ মারে না, অন্তত সংবাদপত্রে মারে না। সুতরাং আমি ঘুরিয়ে লিখছি, "দুজন উগ্রপন্থী নিহত হয়, একজন নিজেদের গুলিতেই মারা যায়।" চতুর্থত, এরপর আমি জুড়ে দিচ্ছি, "আস্তানা থেকে চারটি রাশিয়ান রাইফেল, দশটি পিস্তল, প্রচুর কার্তুজ, লেনিনের বই এবং কিছু ইশ্‌তেহার পাওয়া যায়।" এইবার স্পষ্ট হ'ল কেন পুলিশ বাধ্য হয়েছে। আমার কাগজে ঐ রকমই হবে, ভাল না লাগলে ইস্তফা দাও।* [৮০]

উৎপল দত্ত ভালো করেই জানতেন যে শাসক শ্রেণির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল এই সংবাদপত্র। কিছু সংবাদপত্র নিজেদের স্বার্থে সর্বদা শাসক শ্রেণির হয়েই প্রচার করে যায়, তারা সত্য মিথ্যার ধার ধারে না। স্বার্থ চরিতার্থতার জন্য যেটা প্রয়োজন সেটা তারা করতে কোনোরকম দ্বিধা বোধ করে না। শাসকশ্রেণির সঙ্গে সঙ্গে এই সংবাদপত্রগুলোও বিরাট রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে শামিল হয়।

উৎপল দত্ত সংবাদপত্রের এই যে ষড়যন্ত্র, সে সম্পর্কে দর্শকদের বারে বারে সচেতন করে তুলেছেন একাধিক দৃশ্যে। মানুষকে রাজনৈতিকভাবে বিভ্রান্ত করে দেওয়া সংবাদপত্রের মুখোশ খোলার প্রচেষ্টা লক্ষ করা গেছে একাধিকবার। সত্তর বছরের বৃদ্ধ জননেতা য়োসেফ ৎসাউরিৎস-এর হত্যাকে কেন্দ্র করে দেখি, পত্রিকা সম্পাদক লান্ট কীভাবে তার সহকর্মী রিপোর্টার অটো বিরখোলৎসকে নির্লজ্জভাবে নির্দেশ দিচ্ছেন—

লান্ট।। ...কালকের হেডলাইন কি হবে শোনো— পাঁচ কলম ব্যাপী ব্যানার— "আশি বছরের বৃদ্ধ জননেতাকে কুপিয়ে হত্যা করে রাজপথে কমিউনিস্টদের নৃত্য।" লিখে নিয়েছ?...

অটো।। দেখুন কাহিনীর আগেই কাহিনীর নাম ঠিক করে ফেলাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।...

লান্ট।। এখানে সেরকম দুর্ঘটনার কোনো অবকাশ নেই।

অটো।। আছে বইকি। "রাজপথে কমিউনিস্টদের নৃত্য" বলছেন। কি করে জানলেন? আপনি কি ওখানে ছিলেন নাকি? দেখেছিলেন ওরা লাল ঝাণ্ডা নিয়ে নাচছে?

লান্ট।। নৃত্য না করে থাকলেও তুমি কলমের জোরে ওদের নৃত্য করাবে। আমার হেডলাইনের মান রাখবে।

অটো।। কমিউনিস্টরাই যে মেরেছে তার কি প্রমাণ?

লান্ট।। বা! শ্রীমতি ৎসাউরিৎস স্বচক্ষে দেখেছেন, পুলিশ এক কমিউনিস্ট নেতাকে হাতে-নাতে ধরেছে, আরো অনেক প্রমাণ। সেসব জোগাড় করতেই তোমার সান্ধ্য অভিসার। যাও বেরিয়ে পড়ো।

অটো।। আপনার হেডলাইনের আরো ভুল আছে। আপনি বলছেন, "আশি বছরের বৃদ্ধ জননেতা।" কিন্তু ৎসাউরিৎসের বয়স সত্তর।

লান্ট।। আশিতে ট্র্যাজেডিটা আরো পোক্ত হয়।... তাঁর গায়ে নাৎসিরা হাত দিতে পারে না। বাকি থাকে কে? ঐ কমিউনিস্টরা। স্টাইন? লিখে নাও, ওপরে ব্যানার, আশি বছরের বৃদ্ধ ইত্যাদি কমিউনিস্টদের নৃত্য ইত্যাদি— তারপর দ্বিতীয় হেডিং, ৩৬ পয়েন্টের কম যেন না হয়— "স্বামীর উষ্ণ রক্ত স্ত্রীর গায়ে লেপন।" লিখেছ? জেরগুট।

অটো।। এ আবার এক অসুবিধের সৃষ্টি হ'ল। বৃদ্ধার গায়ে আবার রক্ত দিতে গেল কেন? এসব কি করে যে রিপোর্টের মধ্যে গাদবো—

লান্ট।। বাঃ বৃদ্ধা প্রত্যক্ষদর্শী। রক্তের ছিটেও তো লাগতে পারে।

অটো।। বৃদ্ধা কোথায় ছিলেন? কোত্থেকে প্রত্যক্ষ দর্শন করলেন? ধরুন, তিনি যদি দোতলার জানলায় দাঁড়িয়ে খুনটা প্রত্যক্ষ করে থাকেন, তাহলে কি লিখবো? কমিউনিস্টরা আঁজলা করে রক্ত নিয়ে ওপর পানে ছুঁড়েছিল? না, একটা পাম্প আর নল এনে দমকলের মতন রক্ত ছুঁড়ে—

লান্ট।। তিনি যেখানে থেকেই দেখে থাকুন, তুমি তাঁকে সড়কের ওপর নিয়ে আসবে। তারপর স্বামীর রক্তচর্চিত শ্রীমতী ৎসাউরিৎসের ভয়ঙ্কর বর্ণনা লিখবে। কমিউনিস্টদের শেষ করতে হবে। [৮১]

জার্মানিতে ফ্যাসিবাদের উত্থানের সময় দুটি প্রবণতা লক্ষ করা গিয়েছিল। উৎপল দত্ত আলোচ্য নাটকে সেই প্রবণতাকে অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। এক হল সেই সময়কার সংবাদপত্র ও বেতারযন্ত্র রাষ্ট্রশক্তির সমস্ত অত্যাচার, দমন-পীড়ন ও ক্ষমতা দখলের নির্লজ্জ প্রচেষ্টাকে মেনে নিয়ে এবং সর্বোপরি সংবাদপত্রগুলোর আখের গুছিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টায় তারা রাষ্ট্রশক্তির সমস্ত অত্যাচার ও জবরদস্তিকে মেনে নিয়ে তার সপক্ষে নিরন্তর প্রচার চালিয়ে জনমত গঠন করে। আর এক হল যত্রতত্র নিরন্তর সন্ত্রাস চলাকালে দেশের নাগরিকরা শুধুই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে না, তারা এই ভীরুতা এবং অন্ধভাবে এই অত্যাচার ও অন্যায়কে মেনে নিতে বাধ্য হয়। সংবাদপত্র ও বেতারযন্ত্রগুলো মিথ্যা সংবাদ প্রচারের মধ্য দিয়েই নিজেদের যে যুক্তি দাঁড় করায় তা মেনে নিতে বাধ্য হয় আপামর জনতা। তাই বৃদ্ধ জননেতা য়োসেফ ৎসাউরিৎস হত্যাকে কেন্দ্র করে সংবাদ মাধ্যম ও পুলিশ প্রশাসনের মাধ্যমে প্রচার হতে থাকে যে, এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে কমিউনিস্টরাই। ওখানকার প্রথম সারির সংবাদপত্র 'ফ্রাইয়েৎসাইটুং' প্রথম পাতায় খবর বার করে—

আশি বছরের বৃদ্ধ জননেতাকে কুপিয়ে হত্যা করে রাজপথে কমিউনিস্টদের নৃত্য। [৮২]

বৃদ্ধ নেতা য়োসেফ ৎসাউরিৎস হত্যার দায়ে গ্রেফতার করা হয় কমিউনিস্ট পার্টির শার্লোটেনবুর্গ জেলা সম্পাদক রিখার্ড হুটিগকে। কারণ নির্বাচন জিততে গেলে কমিউনিস্টদের শেষ করে দিতে হবে এবং ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ৫ই মার্চ ষষ্ঠ বারের জন্য যে নির্বাচনের দিন ঘোষণা করা হয়েছে সেই নির্বাচনে সুপরিকল্পিতভাবে নাৎসিদলকে জিততেই হবে। তারই কৌশল হিসেবে বৃদ্ধ সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা য়োসেফ ৎসাউরিৎসকে হত্যা করা হয়।

য়োসেফ ৎসাউরিৎস হত্যার দায়ে গ্রেফতার করা হয় রিখার্ড হুটিগকে এবং তার বিচার শুরু হয় আদালতে। আমরা দেখি আদালতের কক্ষে বিচারপতি আলবের্ট ফস-এর সামনে য়োসেফ ৎসাউরিৎস হত্যা মামলার প্রাথমিক শুনানি চলে। পুলিশের বড়ো কর্তা ক্যাপ্টেন হেস একে একে জেরা করছেন ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ড: স্ট্রুবেল-কে, তারপর মূল আসামী ধৃত হুটিগকে এবং শেষে

জেরা করা হয় আর এক প্রত্যক্ষদর্শী য়োসেফ ৎসাউরিৎসের স্ত্রী শ্রীমতি ইংগেবর ৎসউরিৎসকে। শ্রীমতি ইংগেবর ৎসাউরিৎস-এর সঙ্গে হুটিগের কথোপকথন এবং শ্রীমতি ইংগেবর ৎসাউরিৎস-এর বয়ান এই মামলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।–

ইংগে।। সত্তর বছরের বৃদ্ধ য়োসেফ ৎসাউরিৎস তোমাদের মারতে গিয়েছিলেন?

হুটিগ।। তাঁকে আমরা মারিনি। শুনুন ফ্রাউ ৎসাউরিৎস—

ইংগে।। না আর শুনব না। এবার বলব। জবাব দাও— এ ছোরা কার? কার রক্ত এটা? শুকনো রক্তে কী ইতিহাস লেখা আছে এখানে? আরো অনেক মায়ের সর্বনাশ করবে তুমি, আরো অনেক ছেলের প্রাণ নেবে, আরো অনেককে ঠেলে দেবে ফাঁসিকাঠে। সে তো আমি হতে দেব না। পাউল গেছে যাক, অন্য পাউলদের বাঁচাতে হবে। মাননীয় বিচারপতি, যদিও আমার চোখ খারাপ তবু যতদূর মনে হয়, এই রিখার্ড হুটিগই সেই লম্বা লোকটি যে প্রথমে আমার স্বামীকে ছোরা মারে। (আদালতে চাঞ্চল্য) আমার স্বামীর স্নেহ ও প্রশ্রয়ে পুষ্ট হয়ে এই অকৃতজ্ঞ বেইমান হুটিগ তাঁকেই খুন করে ছোরা দিয়ে! [৮৩]

রিখার্ড হুটিগ-কে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো থেকে মুক্ত করতে এগিয়ে আসে সাংবাদিক অটো বিরখোলৎস। বিখ্যাত সংবাদপত্র 'ফ্রাইয়েৎসাইটুং' পত্রিকায় দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করতে করতে সে জানতে পারে এই পত্রিকার ভূমিকা কী। এবং নাৎসিরা কীভাবে গোপনে কমিউনিস্টদের উপরে অত্যাচারের পরিকল্পনা করে চলেছে সেটাও তার নখদর্পণে। সৎ সাংবাদিকতার দায়বদ্ধতা থেকে অটো বিরখোলৎস মূল হত্যাকাণ্ডের স্থানে হাজির থেকে সমস্ত সব সত্য জোগাড় করেন। এইসব তথ্য নিয়ে সে এক গোপন অধিবেশন ডাকেন। সেখানে লিপার্ট, মিসেস ইংগেবর ৎসাউরিৎস, স্ট্রুবেল, হেস এবং বিচারক ফসের উপস্থিতিতে প্রমাণ করে দেয় যে রিখার্ড হুটিগ নির্দোষ এবং এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে কমিউনিস্টদের কোনো যোগাযোগ নেই। রিখার্ড হুটিগকে নির্দোষ প্রমাণে তার সবচেয়ে বড়ো হাতিয়ার ছিল মিসেস ইংগেবর ৎসাউরিৎস-এর নেওয়া এক সাক্ষাৎকার। নাটকের তৃতীয় দৃশ্যে আমরা দেখি অটো বিরখোলৎস শ্রীমতি ইংগেবর ৎসাউরিৎস-এর বাড়িতে গিয়ে তার সাক্ষাৎকার নেন এবং য়োসেফ ৎসাডিরিৎস হত্যা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে অনেক তথ্য তিনি জানতে পারেন। সাংবাদিক অটো বিরখোলৎস ও মিসেস ইংগেবর ৎসাউরিৎস-এর সাক্ষাৎকারটি ছিল এইরকম—

অটো।। জিগ্যেস করতে ইচ্ছে হয় না, কারণ জবাব দিতে আপনার কষ্ট হবে, তবু জনতার দাবি, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, গণতন্ত্রের জয় ইত্যাদি সব ভয়ঙ্কর জিনিসের স্বার্থে বলতে বাধ্য হচ্ছি।

আপনি কি সত্যিই হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী?

ইংগে।। হ্যাঁ

অটো।। আপনি কোথায় ছিলেন?

ইংগে।। দরজায়। গাড়িটা ছিল রাস্তার ওধারে। আমার স্বামী বিদায় নিয়ে রাস্তার ওধারে গেলেন গাড়িতে উঠতে। দরজাটা মাত্র খুলছেন—

অটো।। তারপর কি হ'ল?

ইংগে।। একটা গাড়ি এসে ব্রেক কষল রাস্তার মাঝখানে। পাঁচজন লোক লাফিয়ে নামলো তা থেকে। তারা ঘিরে ফেললো আমার স্বামীকে!

অটো।। তাদের পরনে কি ছিল?

ইংগে।। অতি সাধারণ শ্রমজীবীর পোষাক, মাথায় টুপি। কিন্তু তাদের প্রত্যেকের বাঁ বাহুতে জ্বলজ্বল করছিল লাল ব্যাজ।

অটো।। ৎসাউরিৎসকে তারা ঘিরে ফেললো। তারপর?

ইংগে।। স্পষ্ট দেখতে পাইনি কারণ মনে রাখবেন এটা ঘটেছিল দু-দুটো গাড়ির ওধারে। মনে হচ্ছিল একটা ধস্তাধস্তি চলছে।

অটো।। খুনীরা নাকি চিৎকার করছিল?

ইংগে।। হ্যাঁ— চিৎকার করে বলেছিল, 'কমিউনিস্ট পার্টি জিন্দাবাদ', আর 'রেজফ্রন্ট'।

অটো।। আপনি রিখার্ড হুটিগকে এই দলে দেখেছিলেন?

ইংগে।। ঠাহর করে বলতে পারব না। আমার চোখ খারাপ। তার ওপর দুটো গাড়ির ওপাশে ঘটেছিল ব্যাপারটা।

অটো।। আপনি হুটিগকে চেনেন?

ইংগে।। নিশ্চয়ই। এ পাড়ার সব কমিউনিস্ট ছেলেদের চিনি। আমার স্বামীর খুবই স্নেহের পাত্র ছিল হুটিগ।...

অটো।। তারপর ওরা কি করলো?

ইংগে।। আবার ছুটে এসে ওদের গাড়িতে উঠলো।

অটো।। লাল ব্যাজ আর স্লোগান ছাড়া আর কোনো উপায়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে ওরা কমিউনিস্ট?

ইংগে।। হ্যাঁ। নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায় ওরা, ‘কমরেড’ কথাটা ব্যবহার করছিল।

অটো।। (ঈষৎ উত্তেজিত) সত্যি?

ইংগে।। হ্যাঁ।

অটো।। ঠিক কি বলছিল? দু-একটা কথা মনে আছে?...

ইংগে।। ইয়ে... হ্যাঁ ধরুন— গাড়িতে ওঠার পর ড্রাইভার জিজ্ঞেস করলো পাশের ছেলেটিকে— কোথায় সেই মোড়টা? কোনদিকে ঘুরব? তখন সে ‘কমরেড’ কথাটা ব্যবহার করছিল।

অটো।। ওর ভাষায় বলুন। কি বলেছিল ও?

ইংগে।। বলেছিল, ‘ভো মুস ইশ আইনবীগেন, কামরেড’। [৮৪]

সাংবাদিক অটো বিরখোলৎস শ্রীমতি ইংগেবর ৎসাইরিৎস-এর বক্তব্যের রেশ ধরেই প্রমাণ করে দেন যে, য়োসেফ ৎসাউরিৎস-এর হত্যা কমিউনিস্টরা করেননি। তার যুক্তি ছিল য়োসেফ ৎসাউরিৎস যেখানে খুন হন ভালস্ট্রাস, সেটা কমিউনিস্টদের এলাকা। তাহলে কমিউনিস্টরা যদি তাকে হত্যা করে তাহলে গাড়ি ব্যবহার করবে কেন। এবং আরো আশ্চর্যের কথা এটাই ছিল যে গাড়ি চালাচ্ছিল সে তার সহকর্মীদের ‘কমরেড’ বলে সম্বোধন করেছিল। এবং জিজ্ঞাসা করেছিল, মোড় কোথায়? এখানেই প্রশ্ন যে তারা যদি হুটিগের পাড়ার লোক হন, হুটিগের পরিচিত হন, তাহলে পাড়ার মোড় চিনবে না এমন হতে পারে না। আরও কিছু তথ্য প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছিলেন য়োসেফ ৎসাউরিৎসের খুনি অন্য কেউ— রিখার্ড হুটিগ নন বা তার সহকর্মীরা নন। নাৎসিদের একটা চক্রান্ত মাঝপথে ধরা পড়ে গেল, তাদের মুখোশ খুলে গেল দেশের জনগণের সামনে। বিচারপতি আলবের্ট ফস গোয়েন্দা পুলিশের অফিসার ক্যাপ্টেন হেস-কে মিথ্যা মামলা সাজানো ও রিখার্ড হুটিগকে মিথ্যা মামলায় জড়ানো, একটি খুন নিয়ে নাৎসি পার্টির ফায়দা তোলা প্রভৃতি বিষয়কে নিয়ে আদালত চত্বরে তীব্র ভর্ৎসনা করেন। নাৎসি দলের নেতা য়োহান লিপার্ট-কে বিচারপতি ফস তীব্র নিন্দা ভাষায় ভর্ৎসনা করেন—

ফস।। আপনি একটা জালিয়াৎ। ক্যাপ্টেন হেস মিথ্যাবাদী। এই পুরো মামলাটা সাজানো হয়েছিল নির্বাচনী চাল হিসেবে। আমার এও ধারণা জন্মাচ্ছে, ৎসাউরিৎসকে খুন করেছিল হয় শাদা-পোশাকে পুলিশ আর নয়তো আপনার নাৎসি গুণ্ডার দল। বিচারপতির উচিত নয় এসব রাজনৈতিক মন্তব্য করা। কোনোদিন করিনি কিন্তু এখন যখন বুঝতে পারছি আপনারা আইনের পবিত্রতা মানেন না,

আপনারা ন্যায়বিচারের টুঁটি টিপে ধরতে চান, তখন আমি মুখ খুলতে বাধ্য। আদালতে উপস্থিত থাকলে শুনবেন কি বলি। [৮৫]

এরপর সাংবাদিক অটো বিরখোলৎস যোসেফ ৎসাউরিৎস হত্যার প্রত্যক্ষদর্শী ডাক্তার হেরমান স্ট্রুবেল-এর বয়ানকে হাতিয়ার করে সে প্রমাণ করে আঁততায়ী হুটিগ নয়, আঁততায়ী অন্য কেউ। ডক্টর স্ট্রুবেল-এর সাক্ষ্য অনুযায়ী আক্রান্ত হওয়ার সময় য়োসেফ ৎসাউরিৎস বলেছিলেন— "এ কি! আপনি আমাকে মারছেন কেন?"[৮৬] অভিযুক্ত রিখার্ড হুটিগ মৃত ৎসাউরিৎ-এর প্রতিবেশী, তার ছেলের বন্ধু ও খুব স্নেহের পাত্র ছিল। কিন্তু সাংবাদিক অটো বিরখোলৎস প্রশ্ন করেন, স্নেহের পাত্রকে কেউ কখনো আপনি বলে ডাকে? আঁততায়ী নিশ্চয়ই অপরিচিত ছিল মৃত য়োসেফ ৎসাউরিৎস-এর। তাই তাকে আপনি বলে ডেকেছিলেন। এর থেকেই প্রমাণিত হয় রিখার্ড হুটিগ য়োসেফ ৎসাউরিৎস-এর হত্যাকারী ছিলেন না। অন্য কেউ হত্যা করেছেন যে য়োসেফ ৎসাউরিৎসের অপরিচিত ছিল। সাংবাদিক অটোর কোনো পালটা যুক্তি পুলিশ দিতে পারেন না। বিচারপতি ফস বাধ্য হয়ে রিখার্ড হুটিগকে বেকসুর খালাস দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। এবং তিনি পুলিশকর্তা ক্যাপ্টেন হেসকে বলেন পরের দিন দশটায় আদালতে রিখার্ড হুটিগকে হাজির করতে তখনই তাকে মুক্তি দেওয়ার কথাও তিনি ঘোষণা করবেন। কিন্তু বিচারের নামে প্রহসনের মাত্রাটা এখানে চরমে উঠে যায় বিচারপতির রায় দেওয়ার আগেই হুটিগকে জেলে বন্দি করা হয়। ক্যাপ্টেন হেস বলেন যে, প্রধানমন্ত্রী হিটলারের আদেশে হুটিগকে নিরাপত্তা আইন-এ বন্দি করে নিয়ে গেছে কেন্দ্রীয় পুলিশ। হুটিগ কারাবন্দি, তাকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব নয়। ক্যাপ্টেন হেসের কথা শুনে বিচারপতি আলবের্ট ফস ক্রোধে ফেটে পড়েন ও তিনি ক্রুদ্ধস্বরে বলেন, এটা বিচার বিভাগের অধিকারের উপর নির্লজ্জ হস্তক্ষেপ ও গণতন্ত্রের উপর নির্লজ্জ আক্রমণ। তিনি ক্যাপ্টেন হেসকে তিরস্কার করে আরও বলেন—

ফস।। হুটিগ বিপজ্জনক নয়, আদালতে তার উপস্থিতিটা বিপজ্জনক, বিচারপতি ফস বিপজ্জনক, আদালতটাই বিপজ্জনক, আপনাদের শুধু ভয় জালিয়াতি ধরা পড়ার। সেটা ধরা পড়বে হের লিপার্ট। বিচারপতি ফসকে আপনারা চেনেননি এখনো। হুটিগকে গুম করে এ মামলা চেপে দিতে পারবেন না। [৮৭]

শুধুমাত্র নির্বাচনের নামে প্রহসন নয়, নাৎসিদের প্রহসন চলতে থাকে সর্বত্রই। বিচারপতি আলবেট ফস রিখার্ড হুটিগকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন, নাৎসিদের উলটো পথে গিয়ে তাদের তিরস্কার করছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে পরের দিন ভোরবেলায় বিচারপতি ফস যখন হ্রদের ধারে প্রাতঃভ্রমণে বের হন তখন তিনি নৃশংসভাবে খুন হন। সরকারের পক্ষে, তাদের তালে তাল

ঠুকলে বোধহয় বিচারপতি ফসের এমন করুণ পরিণতি হত না। এরপর দেখা যায় নাৎসি পার্টির সরকার গণতন্ত্রের মুখোশ বজায় রাখার জন্য হুটিগ মামলা চালু রাখতে চেয়েছেন। এই মামলায় নতুন বিচারপতি হবেন গিওর্গ টাইখার্ট। এবং আইন অনুযায়ী মামলা আবার গোড়া থেকেই শুরু হবে আর মামলার ফলাফল সেটা ধরেই নেওয়া যায় কি হতে চলেছে। নাৎসি পুলিশ মামলার মূল সাক্ষী সাংবাদিক অটো যিনি হুটিগের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন তাকে হুমকি দেওয়া হয় যাতে তিনি মামলায় সাক্ষ্য না দেন। নাৎসি সরকার হুটিগ মামলা আবার নতুন করে শুরু করার একটাই উদ্দেশ্য যে মামলায় বিচারের নামে প্রহসন করে কমিউনিস্ট পার্টিকে দোষারোপ করা। আঁততায়ী হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য রিখার্ড হুটিগকে দেখানো। যাতে জনমানসে কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে একটা বিরূপ ধারণা রচিত হয়। কমিউনিস্ট পার্টিকে দোষারোপ করতে পারলেই নাৎসি পার্টি প্রভূত সুবিধা পাবে আসন্ন নির্বাচনে।

এরপরের দৃশ্যে ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে বার্লিন শহরের পরিবেশ পরিস্থিতি আর ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের কলকাতা শহরের পরিবেশ পরিস্থিতি প্রায় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে যায়। বার্লিনের রাইখ স্টাগ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। হিটলার তাঁর বক্তৃতায় সরাসরি তিনি এই অগ্নিকাণ্ডের জন্য কমিউনিস্টদের দায়ী করেছেন। তিনি আরও ঘটে যাওয়া যে নির্বাচনগুলির অশান্তি ও মারামারির ঘটনায় সরাসরি কমিউনিস্ট পার্টিকে দায়ী করেছেন। তাই কমিউনিস্ট পার্টিকে দমিয়ে রাখার জন্য হিটলার কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে কতকগুলো ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। ব্যবস্থাগুলো ছিল—

> *১) কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। ২) ঐ পার্টির সদস্যদের দেখামাত্র গ্রেফতার করার এবং প্রয়োজনবোধে দেখামাত্র গুলি করে মারার নির্দেশ জারি হল। ৩) আজ থেকে সর্বপ্রকার ট্রেড-ইউনিয়ন কার্যকলাপ নিষিদ্ধ হল। ৪) আজ থেকে সর্বপ্রকার কৃষক সমিতি নিষিদ্ধ হল। ৫) আজ থেকে সরকারি কর্মচারী ও ছাত্রদের সর্বপ্রকার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আন্দোলন নিষিদ্ধ হল।* [৮৮]

হিটলারের এই ঘোষণার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল কমিউনিস্ট পার্টিকে যে কোনো উপায়ে দমিয়ে রেখে আসন্ন নির্বাচনে নাৎসি পার্টির জয়লাভ করানো। কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা তো করা হলই সেই সঙ্গে এই পার্টি সদস্যদের গ্রেফতার ও প্রয়োজনবোধে দেখা মাত্র গুলি করার নির্দেশও দিলেন তিনি। যাতে তারা আসন্ন ভোটে লড়ার সাহস দেখাতে না পারে। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার পরিবেশ পরিস্থিতির দিকে তাকালেও আমরা ঠিক একইরকম চিত্র দেখতে পাই সেখানে হেমন্ত বসুর হত্যার দায় কমিউনিস্টদের উপরে চাপানো তো হলই সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টিকে দমিয়ে রাখার জন্য কংগ্রেস সরকার যতরকম ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব, তা নিল।

হিটলারের কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে এই ঘোষণার পরই শুরু হয় নাৎসিদের তীব্র ও ভয়ংকর অত্যাচার। তারা বেছে বেছে কমিউনিস্টদের ঘর থেকে টেনে বের করে প্রকাশ্য রাস্তায় গুলি করে হত্যা করতে থাকে। এমন নিষ্ঠুর অত্যাচার তারা করতে থাকে যাতে ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে কমিউনিস্টরা ভোট দিতে যাওয়ার সাহস না পায়। এইভাবে নির্বাচনের দিন এগিয়ে এল। নির্বাচনের দিন সাধারণ গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারল না। নির্বাচন কেন্দ্রের ধারেকাছে কমিউনিস্টদের আসতে দেওয়া হল না। পুলিশ প্রশাসন, নাৎসি ঝটিকা বাহিনী ও মিলিটারির প্রত্যক্ষ মদতে সেদিন নির্বাচন প্রহসনে পরিণত হয়েছিল। জার্মানির বিখ্যাত সংবাদপত্র 'ফ্রাইরেৎসাইটুং'-এর সম্পাদক হাইনরিশ লান্ট সারাজীবন ধরে তার পত্রিকায় এই নাৎসি পার্টির হয়ে সমস্ত মিথ্যে সংবাদ ছেপে গেছেন, সমস্ত জীবন ধরে পদলেহন করে গেছেন নাৎসি পার্টির। তিনি নাৎসিদের তাঁবেদারি করে কমিউনিস্টদের নামে সদাসর্বদা দোষারোপ ও নিন্দা করে গেছেন। সেই লান্ট ভোটের সময় নাৎসিদের অত্যাচারে তিনিও বীতশ্রদ্ধ। জার্মানির সাধারণ মানুষ নাৎসিদের অত্যাচারে কতটা বীতশ্রদ্ধ, তা পত্রিকা সম্পাদক লান্টের কথোপকথনে বোঝা যায়—

লান্ট।। এর নাম নির্বাচন? এর নাম গণতন্ত্র? প্রহসন হচ্ছে! বাইরে প্রহসন চলছে। বন্দুকের ডগায় দাঁড়িয়ে জনতা নাকি স্বাধীন মতামত দেবে!

ইংগে।। এত উত্তেজনা কিসের হের লান্ট? বসুন না!

লান্ট।। ফ্রাউ ৎসাউসিৎস, আজ বত্রিশ বছর আমি শার্লোটেনবুর্গ অঞ্চলে বাস করছি। প্রতি নির্বাচনে ভোট দিয়ে এসেছি। আজ দিতে পারলাম না।

ইংগে।। কেন?

লান্ট।। বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে গুণ্ডার দল। বলছে আপনার ভোট দেওয়া হয়ে গেছে। চলে যান। আমার পবিত্র ভোটাধিকার আমি প্রয়োগ করতে অক্ষম।

ইংগে।। পবিত্র ভোটাধিকার এভাবে হারাবার মূলে কিন্তু আপনিও আছেন।

লান্ট।। মানে?

ইংগে।। কমিউনিস্টদের খতম করো বলে— এমন শোরগোল তুললেন যে, নাৎসিরা... বন্দুক নিয়ে নেমে পড়লো রাস্তায়।

লান্ট।। কিন্তু আমি ভোট দিতাম নাৎসিদেরই! ওরা বুঝল না।

ইংগে।। তাহলে আর চেঁচামেচি কেন? আপনার ভোটটা ওদের বাক্সেই তো পড়ছে। কত সুবিধে দেখুন। মার্চের এই বাতাসে আপনাদের কষ্ট করে বেরুতে হচ্ছে না— ঘরে বসে আছেন, ওদিকে ভোট পড়ে যাচ্ছে।

লান্ট।। কিন্তু আমার পবিত্র অধিকারটা! [৮৯]

এই চিত্র আমাদের মনে করিয়ে দেয় ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের কথা। সেখানে আমরা দেখতে পাই কংগ্রেস সরকার ১৯৭১ সালে বামফ্রন্টের কাছে হারার পর সেই ক্ষমতা পুনর্দখলের জন্য তারা এই নাৎসিদের মতো একইরকমভাবে কমিউনিস্টদের উপরে অত্যাচার শুরু করেছিল। কমিউনিস্টদের ভোটকেন্দ্রে যেতে না দেওয়া, পুলিশ মিলিটারি দিয়ে কমিউনিস্টদের উপর অত্যাচার ও হত্যা করা কমিউনিস্ট সংগঠনগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা কোনো কিছুই বাদ ছিল না। ১৯৩৩-এর বার্লিন, ১৯৭২-এর কলকাতা রাজনৈতিক পরিবেশগত দিক দিয়ে একেবারে হুবহু মিলে গিয়েছিল।

জার্মানির মানুষ নাৎসিদের হাতে এইভাবে অত্যাচারিত হতে হতে ও কোণঠাসা হতে হতে বুঝে যায় ফ্যাসিস্ট নাৎসিদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না। তারা নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচাবার তাগিদ অনুভব করে, নতজানু হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে লড়াই করে মৃত্যু বরণ করাটাকে শ্রেয় বলে মনে করেন। শুধু কমিউনিস্টরা নয়, অরাজনৈতিক মানুষেরাও এই অত্যাচার থেকে বাঁচবার জন্য একত্রিত হওয়ার তাগিদ অনুভব করে। নাটকের শেষে তাই দেখা যায় রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক সব মানুষ এসে জড়ো হয় ভালস্ট্রাসের ব্যারিকেডে। জার্মানিতে হিটলারের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই গোপন কমিউনিস্ট প্রতিরোধের ঐতিহাসিক কাহিনি এখানে মূর্ত হয়ে ওঠে।

ভালস্ট্রাসের দৃশ্যে উৎপল দত্ত একটা জিনিস তুলে ধরতে চেয়েছেন সেটা হল কমিউনিস্টদের সংগ্রাম। রাজনৈতিক দৃঢ়তা ও শাসক শ্রেণির আক্রমণের সামনে তাদের গোপনে সংগঠন গড়ে তোলবার প্রচেষ্টা। যেটা ১৯৭২ সালে বা ৭০ দশকে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসি সরকারের বাঁধন ছাড়া অত্যাচারের সামনে দাঁড়িয়ে বামপন্থীরা যখন দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল তাদের মধ্যেও কিন্তু এইরকম সংগ্রাম, তাদের গোপনে সংগঠন গড়ে তোলার একটা প্রচেষ্টা সেখানেও পরিলক্ষিত হয়েছিল। ভালট্রাস জায়গাটি কমিউনিস্টদের এলাকা বলে পরিচিত, তা সত্ত্বেও এখানে শুরু হয়েছে নাৎসি আক্রমণ। নাৎসি পোস্টার পড়ছে এলাকার দেয়ালে দেয়ালে। এ পাড়ায় ও পাড়ায় ঢুকে নাৎসিরা কমিউনিস্টদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে, প্রহার করছে, গুলি করে হত্যা করছে সার সার দাঁড়

করিয়ে। তাই এখানে কমিউনিস্টদের চালাতে হচ্ছে আত্মরক্ষার লড়াই, তাদের সংগঠনকে টিঁকিয়ে রাখার জন্য চলছে গোপনে মিটিং। কমিউনিস্ট পার্টি যদিও এখন বে-আইনি নয় তারা আসন্ন নির্বাচনে লড়বে, তবুও নাৎসিদের হিংস্র আক্রমণের সামনে তাদের পার্টির কাজকর্ম চালাতে হচ্ছে অনেকটাই গোপনে। বার্লিনের এই ভয়ংকর বীভৎস ছবি ১৯৭০-৭২ খ্রিস্টাব্দের পশ্চিমবঙ্গকে মনে করিয়ে দেয়। বার্লিনের এই অত্যাচারের ছবি যেন ১৯৭০-৭২ খ্রিস্টাব্দের পশ্চিমবঙ্গের ছবির অনুরূপ। উৎপল দত্ত তাঁর 'ব্যারিকেড' নাটক সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন—

> *"১৯৭১ সালের নির্বাচনে সি.পি.আই(এম) পশ্চিমবঙ্গে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলো।" এবং পর পর ক্ষমতা দখলের জন্য "ব্যাপক রিগিং করা ছাড়া কংগ্রেসের সামনে আর কোনো রাস্তাই খোলা রইল না। ১৯৭২ সালের নির্বাচনে তারা গুলি চালিয়ে, বোমা মেরে ভোটারদের সন্ত্রস্ত করে বুথ থেকে তাড়িয়ে দিল, তারা বুথ দখল করলো, বন্দুক উঁচিয়ে ব্যালট বাক্স ভর্তি করলো ব্যালট পেপারে। এ সবকিছুই ঘটেছিল প্রকাশ্য দিবালোকে, গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এবং চরম লজ্জার কথা এই যে, বুদ্ধিজীবীদের তরফ থেকে কোনো প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়নি গণতন্ত্রের ওপর এই নগ্ন আক্রমণের সামনে। ... এহেন অবস্থায় প্রচণ্ড ক্রোধে আমি নাটক লিখলাম— 'ব্যারিকেড'।* [৯০]

নাট্যকার উৎপল দত্ত 'ব্যারিকেড' নাটকে জার্মানির বিশেষ সময়ের ঘূর্ণাবর্তের কাহিনি নিয়ে বিশেষ রাজনৈতিক চেহারা ফুটিয়ে তুলেছেন। আলোচ্য নাটকে কোথাও পশ্চিমবঙ্গের নাম নেই, এখানকার কোনো ঘটনার উল্লেখও নেই। তবুও এই নাটক পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে উথাল পাথাল করে দিয়েছিল। নাট্যকার সুকৌশলে জার্মানির পটভূমিকায় রাজনৈতিক সন্ত্রাস এবং তা থেকে মুক্তির যে ছবি এঁকেছেন তা মুহূর্তেই বাঙালি মানুষের কাছে তাদের সমকালীন যে রাজনৈতিক অত্যাচারের চিত্রটি ফুটিয়ে তোলে। উৎপল দত্ত 'ব্যারিকেড' নাটকটির মধ্য দিয়ে তিনি জার্মানির পটভূমিকায় পশ্চিমবাংলার মানুষকে উজ্জীবিত ও সচেতন করতে চেয়েছেন। ভিন দেশের এক রাজনৈতিক উত্তাল পরিস্থিতির অধ্যায়কে তুলে এনে তিনি তাঁর নিজের দেশের পাঠক, দর্শক ও জনসাধারণকে সচেতন করে তুলতে চেয়েছেন, এখানেই তাঁর নাটকের সার্থকতা।

দুঃস্বপ্নের নগরী

প্রথম অভিনয় : ১৬ মে ১৯৭৪, কলামন্দির।

প্রথম প্রকাশ : এপিক থিয়েটার, ১০-২ সংখ্যা, ১৯৭৯-৮০।

১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম অভিনীত হয় 'দুঃস্বপ্নের নগরী'। এটি উৎপল দত্তের একটি স্মরণীয় প্রযোজনা। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে যে সাধারণ নির্বাচন সেই নির্বাচনে জিতে কংগ্রেস দল সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের মুখ্যমন্ত্রীত্বে পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠন করল। ক্ষমতা কায়েম রাখতে সবরকম দমন পীড়নের সন্ত্রাস চালিয়ে যেতে থাকল কংগ্রেস সরকার এবং তার স্নেহধন্য নেতা, মন্ত্রী ও মদতপুষ্ট গুণ্ডা মস্তানের দল। পুলিশ প্রশাসন, রাজনৈতিক নেতা, গুণ্ডা-মস্তান এবং বিভিন্ন গণমাধ্যম ও সংবাদপত্রগুলির নির্লজ্জ আঁতাত মানুষকে শোষণ-শাসন করা— সবমিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গের পরিবেশ পরিস্থিতিতে এক ভয়াবহ অবস্থা। কলকাতা শহর ছিল কলকাতাবাসীর কাছে স্বপ্নের নগরী, কিন্তু শাসক দলের প্রত্যক্ষ সহায়তায় জনতার উপরে ও কমিউনিস্ট পার্টির উপরে পুলিশ ও গুণ্ডাদের দ্বারা যে দুর্বিষহ অত্যাচার শুরু হয়েছিল তাতে স্বপ্নের নগরী কলকাতা সাধারণ মানুষের কাছে দুঃস্বপ্নের নগরী হয়ে উঠেছিল। গুণ্ডা মস্তান ও পুলিশ রাজের সেই দুর্বিষহ দিনগুলি উৎপল দত্ত একেবারে খোলাখুলিভাবে সমসাময়িক রাজনৈতিক বিষয়কে নাটকে নিয়ে এলেন। একেবারে সোজাসুজি প্রত্যক্ষভাবে নাট্য প্রযোজনায় নিজের দেশের সমকালের জ্বলন্ত ছবি তুলে ধরলেন আলোচ্য নাটকে।

১৯৭০-এর দশকের প্রথম দিকে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের যে অধ্যায় চলছিল তার এক প্রামাণ্য দলিল উৎপল দত্তের এই 'দুঃস্বপ্নের নগরী' নাটকটি। সত্তরের দশকের সেই সময়কার দর্পণ হয়ে উঠেছে নাটকটি। নাটকটি থেকে সহজেই অনুমেয় তৎকালীন সময়ের শাসক শ্রেণির নির্মম ও বীভৎস অত্যাচার ও অনাচারের ইতিবৃত্ত। একটা শ্রেণির মানুষ নিজের আখের গোছাবার জন্য সদাসর্বদা তৎপর। মজুতদার, কালোবাজারি, ঠিকাদাররা পুলিশ প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে ও গুণ্ডা মস্তানের সহযোগে নিজেদের কারবার চালিয়ে যায় অনায়াসে। বিরোধী কমিউনিস্ট আন্দোলনকে দমন করা ও তাদের ভিটে ছাড়া করা বা হত্যা করার প্রয়াস সদাসর্বদা। পুলিশ গুণ্ডা-মস্তান ও কিছু স্বার্থপর রাজনৈতিক নেতার সহযোগে কলকাতার জনজীবনকে একেবারে বিপর্যস্ত করে তোলা হয়েছে। সাধারণ মানুষের অসহনীয় দুর্ভোগ সেদিনকার কলকাতার জনজীবনকে দুঃস্বপ্নের কারাগারে পরিণত করেছিল। 'দুঃস্বপ্নের নগরী' নাটকটি সম্পর্কে অনুনয় চট্টোপাধ্যায় উৎপল দত্তের 'নাটক সমগ্র'-এর ষষ্ঠ খণ্ডের ভূমিকাংশে তিনি বলেছেন—

রাজনৈতিক সন্ত্রাসের চূড়ান্ত পরিস্থিতিতে প্রশাসন, শাসকদল, বিত্তবান শ্রেণী, তথাকথিত জাতীয়তাবাদী পত্রপত্রিকা, লুম্পেন যুবক ও ভাড়াটে খুনী— একযোগে এই রাজ্যকে এক নৈরাজ্যের অবাধ ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছিল। কাশীপুর বারাসাত, বেলেঘাটায় গণহত্যা, জেলের মধ্যে থানার মধ্যে নির্বিচারে হত্যা, অনিমা পোদ্দারের মতো মহিলাদের উপর দৈহিক অত্যাচার, হেমন্ত বসু হত্যা, শত সহস্র কমিউনিস্টদের ঘর-বাড়ি, পাড়া এমনকি রাজ্য ছাড়া করা হয়েছে। অন্ধকারের সেই কালো দিনগুলো এখনও দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয়। জীবন জীবিকার আন্দোলন নিষিদ্ধ, গণতান্ত্রিক অধিকার অপহৃত, অলিতে গলিতে খুন, সন্ত্রাস, মৃতদেহের মিছিল— সত্তরের দশকের এই কলকাতায় প্রতিবাদী সংস্কৃতিও ছিল আক্রান্ত। নাটকে অসামান্য দক্ষতায় বিভিন্ন চরিত্রের মুখ ও মুখোশ উন্মোচন করে নাট্যকার ফ্যাসিবাদী শাসকগোষ্ঠীর স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছিলেন। [৯১]

নাটকের শুরুতেই দেখতে পাই বড়ো ব্যবসায়ী ও মজুতদার লক্ষ্মণ পালিতের বাড়িতে গোপন মিটিং চলছে। সেখানে উপস্থিত রয়েছেন পুলিশকর্তা মৃগাঙ্ক রায়, কংগ্রেসের যুব নেতা চিন্ময় গোস্বামী ও সংবাদপত্র 'রঙ্গবাণী'-র সম্পাদক গোবিন্দ চাটুজ্যে। এরা সকলেই লক্ষ্মণ পালিতের আজ্ঞাবাহী। কারণ এদের সকলকেই লক্ষ্মণ পালিত টাকা দিয়ে কিনে রেখেছেন। লক্ষ্মণ পালিতের সংলাপেই সেকথা প্রকাশ পায়—

লক্ষ্মণ।। এ-হেন সংকটে কাজ-টাজ পুরুন পকেটে— আমায় চেনেন তো? তুলি যদি কনিষ্ঠ আঙুল সব শেয়ালের কাটা যাবে লাঙ্গুল। প্রতি মাসের প্রথম হপ্তায় যে চেকগুলো কাটি সেগুলো কি মনে করেন দান-খয়রাতি? কোনো কম্মেওই যদি না আসেন, তবে আপনাদের মতন ভূষি কি কারণে পুষি? [৯২]

লক্ষ্মণ পালিতের বাড়িতে মিটিং ডাকার কারণ হল পুলিশ ও গুণ্ডারা মিলে লক্ষ্মণ পালিতের অঙ্গুলি হেলনে কমিউনিস্টদের এ পাড়া থেকে পিটিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এর পরেও জানা গেছে তাদের মধ্যে দু'জন, একজন হলেন স্বপন, অন্যজন হলেন মুস্তাফা গোপনে আবার এ পাড়ায় ঢুকেছে এবং মজুতদার লক্ষ্মণ পালিতের চালের গুদাম ভেঙে সমস্ত চাল লুঠ করে নিয়ে গেছে। এখন লক্ষ্মণ পালিতের অন্য গুদামগুলিতেও সঞ্চিত আটা, কেরোসিন ও বেবিফুড লুণ্ঠনের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সেই সঙ্গে কমিউনিস্ট নেতা স্বপন ও মুস্তাফা পাড়ায় পাড়ায় প্রচার করে বলছে—

মজুতদার ও ব্যবসায়ী লক্ষ্মণ পালিতের সহিত ছয় জন মন্ত্রী ও স্থানীয় কংগ্রেসি নেতারা এই চোরাকারবারে লিপ্ত। তাহারা বলিতেছে, মন্ত্রী নেতাগণ লক্ষ্মণ পালিতের নিকট হইতে মোট বাইশ লক্ষ টাকা ঘুষ খাইয়াছেন। [৯৩]

এই সমস্যা সমাধানের জন্য মন্ত্রী ও পুলিশ সহযোগে লক্ষ্মণ পালিতের বাড়িতে মিটিং-এর আয়োজন করা হয়েছে।

এই সময় পুলিশি সন্ত্রাসের ভয়ংকরতা ও বীভৎসতা এক ভিন্ন মাত্রা লাভ করে। পুলিশ আইনের রক্ষক হওয়া সত্ত্বেও লক্ষ্মণ পালিতের মতো জোতদারদের অঙ্গুলি হেলনে তাদেরকে চলতে বাধ্য করা হয়। সেই সঙ্গে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য পুলিশকে তারা নিজের মতো করে ব্যবহার করে। পুলিশ প্রশাসন তার নিজের সত্তা হারিয়ে শাসক শ্রেণির আজ্ঞাবাহী দলদাসে পরিণত হয়। পুলিশি অত্যাচার ও নির্যাতনের মাত্রা কত বীভৎস হতে পারে তা তাদের কথোপকথন থেকেই স্পষ্ট হয়—

চিন্ময়।। দু-দিন আগেও তো রাজপথের মাঝখানে—

যেখানে-সেখানে—

এক-একজন ছেলেকে বিশজন পুলিশ বেষ্টনে গুলি খেয়ে মরতে দেখেছি। বারাসাতে বারটি দেহ আপনাদেরই অসামান্য কীর্তি, ভুলবে না কেহ।...

মৃগাঙ্ক।। ... প্রেসিডেন্সি জেলের মধ্যে দশদশটা মারকুটে নকশাল ছোকরাকে ওরা সেদিন লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মেরেছে। একটুও ঘাবড়ায়নি। তারপর ধরুন বেলগাছিয়ায় পাঁচ-পাঁচটা খুনে ছোকরাকে ওরা মোটে তিনশ' জন গিয়ে গুলি করে মেরে এসেছে। তারপর টালিগঞ্জে দুটি সিপিএম-এর ছেলেকে ওরা মোটে দুশ' জন গিয়ে মেরে এসেছে।

লক্ষ্মণ।। তাছাড়া থানার মধ্যে অসীমা পোদ্দারকে মোটে চারজনে ধর্ষণ করেছে, একটুও ভয় পায়নি।। [৯৪]

এইসময় পুলিশি নির্যাতনের পাশাপাশি জোতদার, মজুতদারি, মুনাফাবাজি ও কালোবাজারির রমরমা এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে তাদের অত্যাচারে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম। একে তো পুলিশি অত্যাচার ও সন্ত্রাস সেই সঙ্গে জোতদারদের অতিরিক্ত মুনাফা লাভের লোভ। তাতে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য এতটাই আকাশছোঁয়া হয়ে যায় যে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহ করা একপ্রকার অসাধ্য হয়ে ওঠে। আর এদিকে এই মুনাফা লাভের জন্য জোতদার মুনাফাবাজরা নানারকম রাজনৈতিক ফন্দি ও ছক তৈরি করেন।–

চিন্ময়।। মিস্টার পালিত, কিছু মারোয়াড়ি ব্যবসায়ীর স্বার্থে আপনার এই যে দেশদ্রোহিতা, দেশের চাল-আটা লুকিয়ে বড়বাজারের হাতে তুলে দেয়া—

লক্ষ্মণ।। দেশদ্রোহিতা? পশ্চিমবঙ্গ থাকবে রিক্ত নিঃস্ব এটা কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত। পশ্চিমবঙ্গ জোগাবে ইস্পাত, কয়লা, লোহা, পাট, চা, এটা দিল্লীর পলিসি। আর আপনারা কলকাতায় সে-পলিসি কার্যকরী করবেন, তাই আপনাদের গদিতে বসানো হয়েছে। এখান থেকে সব কাঁচামাল নিয়ে যাব আমরা, শুষে নেব, লুঠে নেব— বাধা দিলে একটানে সরকারকে আবার ভুঁয়ে পাড়ব।

চিন্ময়।। না, মানে, শুনুন— যুক্তফ্রন্ট সরকারকে যখন ভাঙা হল—

লক্ষ্মণ।। যুক্তফ্রন্ট সরকারকে কেন ভাঙা হল সেটা বাইরের লোকে না জানলেও, আপনার জানার কথা। কাঁচামাল লুণ্ঠনে তারা বাধা দিয়েছিল। দেশের শিল্প দেশেতে রাখিব আমরা তাহারে ছাড়িব না— এই ধরনের কথাবার্তা ছিল তার। শুনুন, ১৯৭৪ সালে পশ্চিমবাংলার মাথাপিছু আয় ছিল ভারতের মধ্যে সর্বোচ্চ। আমরা তাকে সাত নম্বরে নামিয়েছিলাম। যুক্তফ্রন্ট সরকার দেশের সম্পদ দেশেই আটকে পশ্চিমবঙ্গকে আবার পাঁচ নম্বরে তুলেছিল, আরো হয়ত তুলতো। এ স্পর্ধা আমরা সহ্য করিনি। চাকর চাকরের মতন থাকবে। পরাধীন পশ্চিমবঙ্গ কাঁচামাল জুগিয়ে যাবে— ভারত যেমন জোগাত ব্রিটেনকে। তাই যুক্তফ্রন্ট সরকারকে উচ্ছেদ করেছি। কাঁচামাল আবার বাইরে পাঠাচ্ছি, এবং শুনে হয়তো খুশী হবেন পশ্চিমবঙ্গকে এখন মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে এগারো নম্বরে নামিয়েছি। আরো নামাবো। ভারতের সর্বনিম্ন স্থানে নামিয়ে তবে আমাদের ছুটি।। [৯৫]

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এলে কংগ্রেসের তরফ থেকে নানারকম চক্রান্ত করে সরকারকে ভেঙে দেওয়া হয়। লক্ষ্মণ পালিতের কথা থেকে বোঝা যায় যে কংগ্রেস সরকারের নেতৃত্ববৃন্দ তারা দেশটাকে শোষণ ও লুণ্ঠন করতে চেয়েছিল, কিন্তু যুক্তফ্রন্ট সরকার তাদের প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ালে তারা তা চক্রান্ত করে ভেঙে দেয়। লক্ষ্মণ পালিতের কথা থেকে আমরা জানতে পারি ১৯৭৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে মাথা পিছু আয় সর্বোচ্চ ছিল। কংগ্রেস নেতারা শোষণ করে তাকে সাতে নামিয়ে এনেছিল। শেষপর্যন্ত শোষণ করতে করতে তা এগারো নম্বরে নামিয়ে এনেছে লক্ষ্মণ পালিতের মতো কিছু স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক মানুষেরা। মাতৃসম পশ্চিমবঙ্গকে লক্ষ্মণ পালিতের মতো মজুতদাররা যখন নির্লজ্জভাবে শোষণ করে তখন 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার সম্পাদক গোবিন্দ চাটুজ্জের মতো মানুষেরা আকুল হয়ে লক্ষ্মণকে বলেন— যে মাতৃসম পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচানো দরকার। জবাবে লক্ষ্মণ ব্যঙ্গাত্মকভাবে বলেন—

পশ্চিমবঙ্গের সর্বনাশে আপনার এই বিষাদ কবে থেকে জাগল? লেক স্টেডিয়ামে নারী নির্যাতনের লোমহর্ষক উপন্যাসটা ছাপবার সময়ে কোথায় ছিল? কলকাতার রাজপথে মেয়েরা হাঁটতে গেলেই ধর্ষিতা হয়, এ খবর তো আপনিই ছেপেছিলেন? পুলিশ গিয়ে লোক খুন করে আর আপনি লেখেন—

নকশাল আর সি.পি.এম-এর ছেলেরা হত্যালীলায় মেতেছে! সারা ভারত সেসব গল্প পড়ে পশ্চিমবঙ্গকে ঘৃণা করতে শিখেছে, বলেছে, বাঙালি নরখাদক বনে গেছে। আপনারা ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন, তাই আমরা বাঙালির টুঁটি চেপে ধরতে পেরেছি।– এই তো চলছিল সেদিন পর্যন্ত। [৯৬]

বাঙালির স্বপ্নের নগরী কলকাতাকে দুঃস্বপ্নের নগরীতে পরিণত করতে লক্ষ্মণ পালিতের মতো স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক মানুষরা তো সর্বাগ্রেই ছিলেন, সেই সঙ্গে পত্রিকা সম্পাদক গোবিন্দ চাটুজ্জের মতো মানুষরাও শাসকের তাঁবেদারি করে সদা সর্বদা নির্লজ্জভাবে একপেশে সংবাদ পরিবেশন করে গেছেন। শাসক দলের অত্যাচারকে চাপা দিয়ে সর্বদা বিরোধী তথা কমিউনিস্ট পার্টির লোকজনকে নির্লজ্জভাবে দোষারোপ করে গেছেন। সবসময় খুন, জখম, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন প্রভৃতিকে নিয়ে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করে গেছেন।

উৎপল দত্ত একের পর এক ঘটনাক্রম সাজিয়ে দেখাতে চেয়েছেন লক্ষ্মণ পালিতের মতো মজুতদার, শাসকশ্রেণির নেতা, পুলিশের বড়ো বড়ো অফিসার এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন তাঁবেদার সংবাদপত্রগুলো কীভাবে স্বপ্নের নগরী কলকাতাকে 'দুঃস্বপ্নের নগরী' বানিয়েছিলেন। কীভাবে পশ্চিমবঙ্গকে শোষণ-লুন্ঠন করে ধ্বংসের পথে নিয়ে গিয়েছিল। এই আত্মকেন্দ্রিক মানুষগুলো নিজ নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য নিজেদের মাতৃভূমি পশ্চিমবঙ্গকে নিঃস্ব রিক্ত করে তুলেছেন। তাই যখন পত্রিকা সম্পাদক বলেন–

গোবিন্দ।। তবু দেশ মানে মা-পশ্চিমবঙ্গের সর্বনাশ ক'রে [৯৭]

লক্ষ্মণ পালিতকে যখন একথা পত্রিকা সম্পাদক গোবিন্দ চাটুজ্জে বলেন, তখন লক্ষ্মণ পালিত প্রবল শ্লেষে ও ব্যঙ্গাত্মকভাবে বলেন–

শাটআপ! হেমন্ত বাবুকে খুন করলো এঁদের নিয়োজিত গুণ্ডা আর সঙ্গে সঙ্গে আপনারা চেঁচালেন, সি. পি. এম মেরেছে! দেশ নাকি মা! এই মাকে নগ্ন করে দিল্লীর দ্যুতসভায় কৌরব বিবরে করেছে সমর্পণ।

আজ কেন বিলাপ হে দুঃশাসন?

মায়ের বুকে ছুরি মারার এই প্ল্যান মজাদার।

আপনার আর আমার তাতে সমান অংশীদার।

সবাই আমরা বাংলা মায়ের কু-সন্তান,

সুতরাং হে সম্পাদক, হে পুলিশ, আর হে হেড-মস্তান,

কেন আর মেখে থিয়েটারি রং

এইসব সতীত্বের ঢং?

উই আর ইন দা সেম বোট, ব্রাদার! [৯৮]

চিন্ময় গোস্বামীর মতো কংগ্রেস নেতারা অথবা লক্ষ্মণ পালিতের মতো জোতদার শ্রেণির মানুষরা নিজ স্বার্থ কায়েম করতে অথবা শাসক গোষ্ঠীর স্বার্থে, বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে বা জনতার বিরুদ্ধে গুণ্ডা, মস্তান, খুনিদেরকে ব্যবহার করে থাকে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বলে এইসব গুণ্ডা পোষা মস্তান খুনিদের আজ্ঞাবাহী দাসে পরিণত করে। এইরকম একটা চরিত্র হল মণিভূষণ মিত্র। উৎপল দত্ত মণিভূষণ চরিত্রটির মধ্য দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন ষাট-সত্তর দশকের কলকাতার শিক্ষিত বেকার যুবকরা শাসকশ্রেণির আজ্ঞাবাহী ভাড়াটে গুণ্ডায় পরিণত হওয়ার আর্থসামাজিক প্রক্রিয়া। দেখাতে চেয়েছেন কীভাবে শাসকশ্রেণির জাঁতাকলে পড়ে একজন শিক্ষিত বেকার ছেলে পেশাদার খুনিতে পরিণত হয়। শাসকশ্রেণির লোকেরা নিজেদের প্রয়োজনে এইসব খুনি মস্তানদের ব্যবহার করে, প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে তাদেরকে নিকেশ করে ডাস্টবিনে ফেলতে একবারের জন্যও পিছুপা হন না। নাটকের শুরুতেই দেখি গ্যারেজ ঘরে বসে আছে মণিভূষণ মিত্র। অলস হাতে সে বোমায় দড়ি জড়িয়ে চলেছে। সিরাজ একজন পেশাদার খুনি যার ভয়ে কলকাতার বুকে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়।

মণিভূষণ রাজনৈতিক গুণ্ডা। খুন খারাপির এই পথে এলই বা কেন। কেউ তো আর জন্মগত অপরাধী হয় না। মণিভূষণ একজন শিক্ষিত দরিদ্র বেকার যুবক। সে একজন অধ্যাপক হতে চেয়েছিল। কিন্তু অনাত্মীয় শৈশব, শ্রদ্ধাহীন, ভালোবাসাহীন মূল্যবোধহীন এক দারিদ্র্য জর্জরিত পারিবারিক পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে মণিভূষণ তার নিজের ইচ্ছেটাকে ধরে রাখতে পারে না। অধ্যাপক হওয়ার স্বপ্ন তার অধরাই থেকে যায়। চরম আর্থিক অনটনে অস্তিত্ব রক্ষার্থে দারিদ্র্য পীড়িত ক্ষুধার্ত বেকার যুবক ব্যাংক লুঠের সিদ্ধান্ত নেয়। সে অনাহারে মরতে চায়নি, তাই সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়—

> *আমি ব্যাঙ্ক লুঠ করি। বি-এ পাশ ক'রে বেকার হয়ে খিদেয় ধুঁকতে ধুঁকতে মরার চেয়ে বাহুবলে টাকা ছিনিয়ে নিয়ে বাঁচব ভাবলাম। মনে হল গায়ে শক্তি থাকতে যে শালা স্থানুবৎ বসে ভাইবোনের ক্ষিদের কান্না শোনে, তার চেয়ে ঘৃণ্যজীব আর কেউ নেই। লক্ষ্মী ব্যাঙ্কের টালিগঞ্জ ব্রাঞ্চ— অনাহারে মরব কেন? লুঠ করে খাব! – ব্যাঙ্কে ঢুকে পিস্তল উঁচিয়ে টাকা কুড়িয়ে নিলাম দুহাতে।* [৯৯]

ব্যাংক লুঠের দায়ে মণিভূষণ ধরা পড়ে। শুরু হয় বেদম প্রহার। প্রহারের দাপটে এখনও তার মাথায় যন্ত্রণা হয়। সেসময় খাদ্য আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গে তীব্র আকার ধারণ করে এবং তা কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে। পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্টদের এই খাদ্য আন্দোলন দুর্বার গতিতে এবং

অপ্রতিরোধ্য গতিতে অগ্রসর হচ্ছিল। এই আন্দোলনের তীব্রতায় তৎকালীন কংগ্রেস সরকার একপ্রকার দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। কিছুদিনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। ঠিক সেইসময় চিন্ময় গোস্বামীর মতো কংগ্রেসি নেতা অথবা লক্ষ্মণ পালিতের মতো স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক, মুনাফালোভী জোতদারদের পাল্লায় পড়ে মণিভূষণ মিত্র। তারা মণিভূষণ মিত্রকে ব্যবহার করে। তারা মণিভূষণের হাতে বন্দুক ধরিয়ে দেয়। প্রতিশ্রুতি দেয় কমিউনিস্টকে হত্যা করলে তারা ব্যাংক ডাকাতির কেস থেকে রেহাই দেবে। কিন্তু কেস থেকে রেহাই দেওয়া তো দূরস্থ তারা ক্রমাগত একটার পর একটা কেসে তাকে জড়িয়ে একটার পর একটা খুন করতে বাধ্য করে তাকে একজন পেশাদার গুণ্ডা ও বিশ্বস্ত খুনিতে পরিণত করে। মণি মিত্রর কথায়—

> *তারপর একদিন বন্দুক হাতে দিয়ে বলে কমিউনিস্ট মার, তবে ডাকাতির দায় থেকে রেহাই দেব। মাথার ভেতর তখন— কি বলব— দে ড্রোভ মি ম্যাড, পাগল হয়ে গেছি ততক্ষণে। চিন্তার শক্তি নেই। মারলাম একটি ছেলেকে। তখন বলে, আরেকটি ছেলেকে মারতে হবে, নইলে প্রথম ছেলেটিকে খুনের দায়ে আমায় ফাঁসি দেবে। এইভাবে চলল। তৃতীয়কে না মারলে দ্বিতীয়কে খুনের চার্জ— চতুর্থকে না মারলে, তৃতীয়কে খুনের চার্জ! মাথার ভেতরে মগজটা বোধহয় গলে গেছে।— শয়তানরা! মেরে, ওষুধ খাইয়ে পাগল ক'রে দিয়ে আমাকে একটা রাজনৈতিক অস্ত্র বানিয়েছে।* ১০০

মণিভূষণ মিত্র এখন শাসক গোষ্ঠীর বিশ্বস্ত খুনি। একটার পর একটা রাজনৈতিক খুন করে সে এখন জনতার কাছে আতঙ্ক। সে মানুষ খুন করতে যেমন পারদর্শী তেমনি বোমা ছুঁড়তেও সমভাবে পারদর্শী। সে লক্ষ্মণ পালিত, মৃগাঙ্ক রায় ও চিন্ময় গোস্বামীর মতো মানুষদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য তাদের আজ্ঞাবাহী দাসের মতো কাজ করে। বোমা মারতে বললে বোমা মারে, খুন করতে বললে খুন করে। তাদের আজ্ঞা পালন করতে তাকে একটার পর একটা কমিউনিস্টকে হত্যা করতে হয়েছে বা হত্যা করতে বাধ্য হয়েছে। বিভিন্ন রকম ভয়-ভীতি দেখিয়ে এই কাজ করাতে মণিভূষণকে বাধ্য করে—

> *মণি।। এসব— এসব কী?*
>
> *লক্ষ্মণ।। তোমার পারিশ্রমিক। কাল রাত্রে তুমি পাড়ায় ঢুকে চেঁচবে মাও-ৎসে-তুং যুগ যুগ জিও। বলেই এক কনস্টেব্‌ল্‌কে ছুরি মারবে। পরশু রাত্রে তুমি পাড়ায় ঢুকেই চেঁচাবে জোতি বসু জিন্দাবাদ, বলেই তুমি কংগ্রেস আপিসে বোমা মারবে। এতে ঢি ঢি পড়ে যাবে— নকশাল আর সি.পি.এম আবার খুনোখুনি করছে। তখন তুমি আবার পাড়ায় ঢুকে নকশাল বাড়ি লাল সেলাম চেঁচাতে চেঁচাতে*

স্বপনকে খুন করবে। [১০১]

একজন পুলিশ কনস্টেবলকে ছুরি মারতে হবে, সেটা একজন পুলিশ কর্তার মদতেই হচ্ছে। তাতে তার কোনো আপত্তি নেই, কারণ পুলিশের কনস্টেবল নিমাই মোদক যে একজন পুলিশ ইউনিয়নের সম্পাদক। মৃগাঙ্ক রায়ের মতো বা লক্ষ্মণ পালিতের মতো মানুষের কাছে সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই পুলিশ কনস্টেবল নিমাই মোদক। তাই তাকে চিরতরে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করে পুলিশেরই একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী মৃগাঙ্ক রায়। আবার কংগ্রেস অফিসেও বোমা মারার কথা বলা হয় কারণ ওখানে সেইসময় উপস্থিত থাকবেন দিব্যেন্দু চক্কোত্তি নামে একজন কংগ্রেস-এর কর্মী। কিন্তু এই চিন্ময় গোস্বামীর শত্রু সে। তাই নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করবার জন্য চিন্ময় গোস্বামী তারই পার্টির সহকর্মী দিব্যেন্দু চক্কোত্তিকে চিরতরে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করে। এবং তারা সেই কাজটা মণিভূষণকে দিয়েই সমাধা করতে চায়।

মণিভূষণের মতো শিক্ষিত বেকার ছেলেদের মধ্য দিয়ে উৎপল দত্ত পশ্চিমবঙ্গের আপামর বেকার শিক্ষিত যুবকদের জীবনের ছবিটাই ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। অনেক শিক্ষিত বেকাররা কাজ না পেয়ে, চাকরি না পেয়ে তারা তাদের আজ্ঞাবাহী দাসে পরিণত হয়েছে। ভুল পথে চালিত হয়েছে। তাদের বেকারত্বের সুযোগ নিয়ে শাসকদল তাদেরকে ব্যবহার করেছে, তাদেরকে পেশাদার গুণ্ডায় পরিণত করেছে। চাকরি দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে যাবতীয় অন্যায় কাজ করিয়ে নিয়েছে। কখনো কখনো চাকরি দেওয়ার নাম করে তারা কমিউনিস্টদের উপরে বেকার যুবকদের দ্বারা আক্রমণ করিয়েছে। অথচ চাকরিটা নানান অছিলায় তারা তাদের দেয়নি। শেষপর্যন্ত তাদেরকে আসামী বানিয়েছে। মণিভূষণের উক্তির থেকে এই অত্যাচার, তাদেরকে গুণ্ডা বানানোর যে বিভিন্ন পন্থা তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—

> *তারপর এসে বললেন, সি.পি.এম-কে মেরে পাড়া ছাড়া করতে হবে— তাহলে চাকরি দেবেন। পুলিশ পাহারায় দিনের পর দিন আক্রমণ চালিয়েছে। এ পাড়ায় সি.পি.এম-এর শান্তনু রায় মরেছে, জীবনকৃষ্ণ, সুরেন, জসীম, গণেশ— নকশাল ছেলে অনুপম সরকার, ভয় কাকে বলে জানে না—। কিন্তু চাকরি পাইনি। তখন বললেন, নির্বাচনটা পার করতে হবে। তাহলে গদিতে বসেই সক্কলকে চাকরি দেবেন। আমার ছেলেরা তাই মেনে নিয়ে গুণ্ডামি আর জোচ্চুরিতে নামল। বিপক্ষের ইলেকশন এজেন্টকে গুম করেছি, ব্যালট বাক্‌স পাল্টে দিয়েছি, ভোটকেন্দ্রে যেন সাধারণ মানুষ না আসতে পারে তারই বন্দুক নিয়ে পাহারা দিয়েছি, বোমা মেরে ভোট কেন্দ্র তছনছ করেছি, হাজারে হাজারে জাল ভোটপত্রে ছাপ মেরে বাক্‌সে ফেলেছি। (চিৎকার ক'র) কিন্তু চাকরি পাইনি— ক্ষুধার জ্বালায় তবু জ্বলছি!* [১০২]

এসব কৃতকর্মের জন্য মণিভূষণের আত্ম-অনুশোচনা হয়। সে শোষকদের স্বরূপ জেনে ফেলেছে। তারা নিজ স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যেই তাদেরকে এই অন্ধকার জগতে টেনে নিয়ে এসেছে। সে শোষকদের এই চক্রব্যূহ থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে, কিন্তু আসতে পারে না। সে আর মানুষ খুন করতে চাইছে না, একটার পর একটা হত্যা ও তার বীভৎসতায় সে একেবারে দিশেহারা মানসিক বিকারগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। সে আর পাঁচটা মানুষের মতো স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে চাইছে। কিন্তু সে শাসকের নাগপাশ থেকে মুক্তি পাচ্ছে না কোনোভাবেই। তবু তাকে খুন করে যেতে হবে কেননা লোভী, অত্যাচারী, শোষকদের ফাঁদে সে বন্দি। মণিভূষণকে একটার পর একটা খুন করে যেতে হয় তার নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে। নিজের বিবেক ও নিজের জীবন দৃষ্টির বিরুদ্ধে। সে যখন টাকার বিনিময়ে মানুষ খুন করতে অস্বীকার করে, একটা সুস্থ স্বাভাবিক সুন্দর জীবনযাপন করতে আগ্রহী হয় তখন বাধা হয়ে দাঁড়ায় সেই স্বার্থপর লোভী শাসকের একাংশ। তারা মণিভূষণকে নানারকমভাবে ভীতি প্রদর্শন করে। তারা মণিভূষণকে দিয়ে মার্ডার করায় আবার যখন মণিভূষণ এসব ছেড়ে সুন্দর জীবনের পথে অগ্রসর হতে চায় তখন তারাই সেই মার্ডারের কেসে তাকে অ্যারেস্ট করার হুমকি দেয় ও তাকে ফাঁসিতে ঝোলানোর ভীতি প্রদর্শন করে।—

মণি।। আমি এ-পাড়া ছেড়ে চলে যাব। আমি... আমি অন্যভাবে বাঁচতে চাই। এটাকে কি বেঁচে থাকা বলে?

লক্ষ্মণ।। ও, তুমি এ পথ ত্যাগ করবে ভাবছ? সেটা কি করে সম্ভব হবে? পাড়া বদলে স্বপনদের হাত এড়াতে পার, কিন্তু পুলিশের হাত এড়াবে কি ক'রে?

মণি।। পুলিশ? পুলিশ কী করবে?

মৃগাঙ্ক।। তোমার বিরুদ্ধে চারটে মার্ডার কেস রয়েছে মণিভূষণ। তোমাকে এরেস্ট করা হবে, মামলা চালু হবে।

চিন্ময়।। মামলাগুলো আমরা চাপা দিয়ে রেখেছি, মণিদা।

লক্ষ্মণ।। বদন, তুমি কি ফাঁসিতে ঝুলতে চাও?

মণি।। আমরা খুন করেছি আপনাদের হুকুমে।

লক্ষ্মণ।। সেটা আদালতে গ্রাহ্য কোনো যুক্তিই নয়, বদন। মামলা চালু করলে তুমি ফাঁসিতে ঝুলবেই।

মণি।। তার মানে— তার মানে অন্তহীন এই বৃত্ত?

চিন্ময়।। বটেই তো। অন্য যত মস্তান আছে আমাদের হাতের মুঠোয়, প্রত্যেকে এই ভয়েই তো আমাদের হুকুম তামিল করে যাচ্ছে মুখ বুজে। [১০৩]

এভাবে মণিভূষণ এক বিরাট রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রের শিকার হয়। এই ষড়যন্ত্র থেকে সে কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারে না। সত্তরের দশকে কংগ্রেস সরকার শিক্ষিত যুবকদের সঙ্গে প্রতারণা করে তাদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য এইরকম অন্ধকার জগতে টেনে আনে। তারই এক বাস্তব চিত্র উৎপল দত্ত তুলে ধরেছেন মণিভূষণ মিত্র চরিত্রটির মধ্য দিয়ে।

উৎপল দত্ত সত্তর দশকের প্রথমার্ধে কলকাতার শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক সংগঠিত রাজনৈতিক সন্ত্রাসের তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করেছেন। তার ব্যাখ্যা ও অন্তর্তদন্ত করেছেন। তৎকালীন কলকাতার রাজনৈতিক পরিস্থিতি নাটকে তিনি বিশদ ও বিস্তারিতভাবে ব্যাখা করেছেন। শাসকের সঙ্গে মণিভূষণের দ্বন্দ্ব সেখানে প্রধান হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে শাসকগোষ্ঠীর সৃষ্ট সন্ত্রাসের বহুবিধ ঘটনা তিনি উল্লেখ করেছেন। দেখিয়েছেন শাসক দলের গুণ্ডা ও মস্তানরা পুলিশদের সঙ্গে নিয়ে কমিউনিস্টদের খুঁজে বার করে তাদেরকে প্রহার করা, তাদেরকে পাড়া ছাড়া করে দিত যাতে তারা শাসকের বিরুদ্ধে কোনোরকমভাবে মুখ খুলতে না পারে, সংগঠনে নামতে না পারে। প্রয়োজনে তাকে হত্যা করা হত। পাড়ায় পাড়ায় নিরীহ নাগরিকদের উপরে হামলা ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করে একটা ভয়ার্ত পরিবেশ সদাসর্বদা জাগ্রত রাখার প্রচেষ্টা তারা করে যেত।

এর পরে আমরা দেখি, গোপন মিটিং-এ সিদ্ধান্ত হয় মণিভূষণ মিত্র কমিউনিস্ট নেতা স্বপনকে হত্যা করবেন। তার পরিবর্তে মণিভূষণের বিরুদ্ধে যত মার্ডার কেস আছে, যত ফাইল আছে সব পুড়িয়ে ফেলতে হবে। এই অন্ধকার জগৎ থেকে নিষ্ক্রমণের রাস্তা খুঁজতে থাকে মণিভূষণ। মণিভূষণ স্বপনকে হত্যা করার জন্য দশ হাজার টাকার চুক্তি হয় এবং আগাম সাত হাজার টাকা ক্যাশ। কিন্তু মণিভূষণ স্বপনকে খুন করতে গিয়ে খুন তো করেন না, উলটে স্বপনকে হাতের কাছে পেয়েও তাকে ছেড়ে দেয়, এমনকি তাকে পালাতে সাহায্য করে। শাসক দল চক্রান্ত করে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য অন্ধকার জগতের যে আস্তাকুঁড় ওরা বানিয়ে রেখেছে তা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা করছে মণিভূষণ মিত্র। এই পথ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া এতটা সহজ নয়, তবুও সে সৎ পথের, সুন্দর জীবনযাপন করার আশায় এপথ থেকে বেরোনোর জন্য লক্ষ্মণ পালিত, মৃগাঙ্ক রায় প্রভৃতি শঠ মানুষদের বিরুদ্ধে সে একরকম যুদ্ধ ঘোষণা করে।

ধূরন্ধর, শঠ, স্বার্থপর এই রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে মণিভূষণ মিত্রের বিদ্রোহ চরমে ওঠে যখন তার প্রেমিকা পূর্ণিমা, যিনি লক্ষ্মণ পালিতের টেলিফোন অপারেটর ছিল, তাকে পুলিশ যখন

গ্রেফতার করে, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এই যে, পূর্ণিমা টেলিফোনে আড়ি পেতে শাসক দলের সমস্ত চক্রান্তের গোপন খবর জানিয়ে দিতেন কমিউনিস্টদের। পূর্ণিমাকে গ্রেফতার করার পর তার উপর চলে অকথ্য নির্যাতন। এই খবরে মণিভূষণ আরো ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ে এবং শাসকশ্রেণির এই স্বার্থপর কূট শ্রেণির মানুষের বিরুদ্ধে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানায়। সে শাসকদের সমস্ত চক্রান্তের কথা ফাঁস করে দেওয়ার হুমকি দেয়—

> *মণি।। শাটআপ। আমি বলছি শুনুন— পূর্ণিমাকে আজকের মধ্যে ছেড়ে না দিলে আমি সব ফাঁস করে দেব।*
>
> *লক্ষ্মণ।। কী বদন? তুমি কী ফাঁস করে দেবে?*
>
> *মণি।। সব। কি ক'রে একটা মজুতদারের ঘুষ খেয়ে এই নেতা, এই পুলিশ— কনস্টেব্‌ল্‌কে কে খুন করেছে— দিব্যেন্দু চক্রবর্তীকে কে মেরেছে— অন্ধ পল্লবকে কি ক'রে পুলিশের সামনে খুন করা হয়েছে সব বলতে শুরু করব, মহাশয়গণ!*
>
> *চিন্ময়।। এ অত্যন্ত অন্যায় হচ্ছে।*
>
> *মণি।। শালা আজ বিকেলের মধ্যে যদি পূর্ণিমা বাড়ি না ফেরে তবে কেলেঙ্কারি ফাঁস হবে। এবং সে কেলেঙ্কারি আরো বহুদূর গড়াবে, বাবুরা! এটা ফাঁস হলেই লোকে হেমন্ত বসুর খুনের ব্যাপারটা বুঝবে, জজ আর উপাচার্য খুন হবার রহস্যটা ধরে ফেলবে। আরো ডজন ডজন হত্যাকাণ্ডের নায়করা ধরা পড়ে যাবেন! কলকাতাকে যে আপনারাই দুঃস্বপ্নের নগরী ক'রে তুলে নকশাল আর সি.পি.এম-কে নন্দ ঘোষ বানিয়ে শেষ করে দিতে চাইছিলেন, এসব লোকেরা বুঝে ফেলবে। প্রস্তাবটা ভেবে দেখবেন, স্যারেরা! হাঃ হাঃ!।* [১০৪]

মণিভূষণ বিদ্রোহ ঘোষণা করলে শাসকগোষ্ঠী কিছুটা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে গোপন মিটিং হয় এবং সেই গোপন মিটিং-এ সিদ্ধান্ত হয় যে কোনো উপায়ে মণিভূষণকে খতম করে দিতে হবে। কারণ, সে অনেকটা বেশি জেনে ফেলেছে।

এরপরে আমরা দেখতে পাই নাটকের সবচেয়ে বড়ো ক্লাইম্যাক্স। শাসকদল পুর্ণিমাকে মুক্তি দেয়নি, তাকে নানারকমভাবে অত্যাচার ও ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হয়েছে। ক্রুদ্ধ মণিভূষণ শাসকের বিরুদ্ধে তাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে একাই রুখে দাঁড়ায়। সে শাসকদের দলবলের সমস্ত কেলেঙ্কারি ও কুকীর্তি বিস্তারিতভাবে লিখে সেটা খামে ভরে অপেক্ষা করছে এক বামপন্থী পত্রিকার সাংবাদিকের জন্য। সংবাদপত্রের মধ্যে দিয়ে তিনি শাসকদলের এই নেতা, পুলিশ ও জোতদারদের সমস্ত কেলেঙ্কারি ফাঁস করে দিতে চায়। তার জন্য গভীর রাত্রে কলকাতার এক

নির্জন পথের ধারে অপেক্ষা করছে মণিভূষণ মিত্র ও তার সাকরেদ সাগর। এই সাগর মনিভূষণ মিত্রকে গুরু বলে মানে। অনেক অপেক্ষা করার পরও কোনও সাংবাদিক আসে না। পরিবর্তে আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী। গোটা এলাকাটাকে ঘিরে ফেলে সশস্ত্র পুলিশ। মণিভূষণের বুঝতে বাকি থাকে না তার এই আজ্ঞাবাহী সাকরেদ সাগরই তাকে ঠকিয়েছে। সেই পুলিশকে খবর দিয়েছে। সেকথা তার সাকরেদ সাগর স্বীকারও করে।—

মণি।। এমনিই ধরিয়ে দিলি?

সাগর।। নইলে আমায় ফাঁসি দেবে গুরু? তুমি তো স্বপনকে মারবে বলেছিলে? নিজের জান বাঁচাতে তুমি তো স্বপনকে মারবে বলেছিলে; আমিও নিজের জান বাঁচাতে— গুরু! [১০৫]

সশস্ত্র পুলিশের বূহ্যে আটকে পড়ে মণিভূষণ। একদিকে মণিভূষণ একা, আর একদিকে গোটা রাষ্ট্রের ষড়যন্ত্র ও বিশাল পুলিশবাহিনী। সে চেয়েছিল অন্ধকার জগৎ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ-স্বাভাবিক সুন্দর জীবনযাপন করতে। সে চেয়েছিল শাসকের চক্রান্ত, কর্দমময় আস্তাকুঁড়ে থেকে নিষ্কৃতি পেতে। কিন্তু তার মুক্তি আর মেলে না। তার মুক্তি মেলে চিরকালের জন্য। পুলিশের কর্তা মৃগাঙ্ক রায় বড়ো সার্ভিস পিস্তল থেকে তাকে গুলি করে হত্যা করে—

মৃগাঙ্ক।। দেখি বড় সার্ভিস পিস্তল একটা। মণিভূষণ বাড়ি যাও। তোমার ফাইল পুড়িয়ে দিয়েছি। তাই মামলা তো আর চালাতে পারব না। কাজেই তুমি রিলীজ্‌ড্‌।

[মণিভূষণ দৌড়ে পালাতেই মৃগাঙ্ক পিছন থেকে গুলি করে এবং মণিভূষণ ডাস্টবিনে পড়ে যায়]। [১০৬]

উৎপল দত্ত 'দুঃস্বপ্নের নগরী' নাটকটির মধ্যে দিয়ে সত্তর দশকের সমকালের রাজনৈতিক পরিস্থিতির বাস্তব ছবি অঙ্কন করেছেন। তিনি দেখাতে চেয়েছেন শাসকের জাঁতাকলে, তাদের ষড়যন্ত্রে মণিভূষণের মতো শত সহস্র ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেয়। মণিভূষণ একটি প্রতীকী চরিত্রমাত্র। মণিভূষণ চরিত্রের মধ্যে দিয়ে উৎপল দত্ত শত শত বাঙালি যুবকদের কথাই বলতে চেয়েছেন যারা সদা সর্বদা রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে অন্ধকার পথ বেছে নেয়। যে পথ থেকে ফেরার আর কোনো রাস্তা থাকে না শেষপর্যন্ত মণিভূষণের মতো মৃত্যু বরণই করতে হয়। ইতিহাসের একটা চক্রান্ত ও রক্তাক্ত অধ্যায়ের বলি হয় মণিভূষণের মতো মানুষেরা।

নাটকের শেষে দেখি জনতার সঙ্গে এগিয়ে আসছে কমিউনিস্ট পার্টির নেতা স্বপন ও মুস্তাফারা, সঙ্গে শ্রমিকের দল। উদ্যত জনতার মিছিল এগিয়ে আসে শেষ প্রতিরোধের জন্য। শাসকের অত্যাচার-অন্যায়, অবিচার প্রভৃতিকে রুখে দেওয়ার জন্য। চায়ের দোকানের প্রৌঢ় যে ভদ্রলোক কৃষ্ণচূড়া তাকে মারতে মারতে নিয়ে চলেছিল কংগ্রেসি খুনি মস্তান গিরিন ও তার

দলবল। স্বপন ও মুস্তাফারের নেতৃত্বে শ্রমিক জনতা যখন সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে সেই প্রতিরোধে তারা কিন্তু পালিয়ে গেছে। পাড়া ছেড়ে সব পালিয়ে গেছে, মিছিল দেখে সব হাওয়া হয়ে গেছে। শেষ অংশটির মধ্য দিয়ে উৎপল দত্ত কমিউনিস্টদের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, তাদের সংগঠিত হওয়ার বার্তা সুকৌশলে প্রয়োগ করেছেন।

সমকালীন এই নাটক যেমন সাড়া জাগিয়েছিল মানুষের মধ্যে তেমনি পরবর্তীকালেও এই নাটক একটা দেশ-কাল-জাতির জ্বলন্ত দলিলরূপে ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে থাকবে। এই নাটক সেই সময় শাসকদলের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল, তাদের আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শাসক দলের কাছে এই নাটক অবশ্যই নিন্দিত। কিন্তু অত্যাচারী এবং মুক্তিকামী মানুষের কাছে এই নাটক সদা সর্বদা স্মরণযোগ্য। কারণ এই নাটক দেখিয়ে দেয় মুক্তির জন্য মানুষ কীভাবে সংগ্রামী হয়ে ওঠে, শাসকদলের অন্যায় অত্যাচার কীভাবে মানুষকে জোটবদ্ধ করে তোলে। 'দুঃস্বপ্নের নগরী' নাটকটি জনমানসে এতটাই প্রভাব ফেলেছিল এবং সরকারের নির্যাতনের মুখোশটি উন্মোচিত করায় এ নাটক গোড়া থেকেই শাসক শ্রেণির ভাড়াটে গুণ্ডার দ্বারা বারে বারে আক্রান্ত হয়েছে, পুলিশের দ্বারা নিগৃহীত হয়েছে, এমনকি এই নাটক বন্ধ করার জন্য এই নাটকের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা করা হয়। উৎপল দত্তের ভাষায়—

> *আমাদের দুঃস্বপ্নের নগরী— তখন বে-আইনী হলো, শুধু বে-আইনী হলো না, প্রহৃতও হলো; যেখানেই অভিনয় করতে যাচ্ছি সেখানেই প্রহার।* [১০৭]

উৎপল দত্ত আলোচ্য নাটকের মধ্য দিয়ে সুকৌশলে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সন্ত্রাসের নগ্ন চিত্র জনসম্মুখে উন্মোচন করলেন। পুলিশ, গুণ্ডা, মস্তান প্রভৃতি সবার মুখোশের আড়ালে তাদের আসল রূপকে জনসম্মুখে প্রকাশ করে দিলেন। তাই শাসক, পুলিশ ও জোতদার শ্রেণি বিষয়টিকে যে ভালোভাবে মেনে নেবেন না তা উৎপল দত্ত আগে থেকেই জানতেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কলকাতায় এ নাটক আক্রান্ত হবেই। 'দুঃস্বপ্নের নগরী' প্রথম আক্রান্ত হয় উত্তর কলকাতার স্টার থিয়েটারে, ২৬ আগস্ট ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে। ঘটনাটির বিবরণ দিতে গিয়ে উৎপল দত্ত একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন—

> *স্টার থিয়েটারে সেদিন পাঠানো হয়েছিল উত্তর কলকাতার কুখ্যাত দুষ্কৃতিদের। সশস্ত্র এই দুষ্কৃতিরা দুপুরের দিকে ঢুকে পড়ে থিয়েটারের মধ্যে। সেখানে তখন নাটকের স্টেজ-কর্মীরা সেট তৈরি করছিল। ইন্দিরা-গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী ঐ কুখ্যাত গুণ্ডারা স্টেজ-কর্মীদের নির্দয়ভাবে প্রহার করলো, নাটকের সেট ভেঙে দিল এবং সেটের কিছু অংশে আগুন লাগিয়ে দিল। এরপর তারা হলের সব*

ক'টি দরজা অবরোধ ক'রে অপেক্ষা করতে লাগলো আমাদের জন্য। বিকাল সাড়ে তিনটে নাগাদ আমি যখন হলে পৌঁছলাম তখন একদল লোকের উন্মত্ত চিৎকার কানে এল— 'দূর হঠো! দূর হঠো! এই গুণ্ডাদের পাহারা দিচ্ছিল বিরাট সংখ্যক সশস্ত্র পুলিশ। আমি এই গুণ্ডাদের পাশ কাটিয়ে হলের মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করা মাত্র ওরা আমাকে ধাক্কা দিয়ে ঘুষি মেরে রাস্তায় ফেলে দিল। আমি দেখলাম আলোকশিল্পী তাপস সেনকেও ওরা ধাক্কা মেরে ফেলে দিল। আমাদের অভিনেত্রী সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ওরা চুলের মুঠি ধরে রাস্তায় ফেলে দিল। ঐ এলাকার কিছু মানুষজন এই ঘটনার প্রতিবাদ করায় সশস্ত্র পুলিশের দল, যারা এতক্ষণ উদাসীন ছিল, সহসা ঐ মানুষগুলোকে রাইফেলের বাট দিয়ে পেটাতে শুরু করল। [১০৮]

'দুঃস্বপ্নের নগরী' তৎকালীন জনমানসে এতটাই প্রভাব ফেলেছিল, কলকাতার মানুষ এতটাই উত্তাল হয়ে উঠেছিল যে এই নাটককে কোনোভাবেই থামানো যাচ্ছিল না। তখন কলকাতার পুলিশের ডেপুটি কমিশনার বিভূতি চক্রবর্তী উৎপল দত্তের নামে মামলা দায়ের করেছিলেন। মামলার ধারাটি ছিল ১২৪এ। এই ধারা অনুযায়ী শাস্তি ছিল সর্বাধিক পনেরো বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলাম তার কবিতার জন্য তিনিও এই ধারায় গ্রেফতার হয়েছিলেন। তারপরে উৎপল দত্তের বিরুদ্ধে এই ধারা অনুযায়ী মামলা দায়ের করা হয়। পুলিশ মামলা করে নাটকটিকে কার্যত নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। কোনোভাবেই যেন অভিনীত না হয় তার জন্য তারা সবপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু অভিনয় হত, অভিনয় থামেনি। অন্য নামে অভিনয় হত। সে কথা উৎপল দত্ত এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন—

কিন্তু নাটকটা কার্যত 'ব্যানড' হয়ে গেছিল। তা বলে থামেনি। অভিনয় হত। অন্য নামে। 'কলকাতার কড়চা', কত রকম নাম। পশ্চিমবঙ্গে বহু জায়গায় অভিনয় হয়ে গেল। শুধু নামটা পাল্টে দিত স্থানীয় কমরেডরা। [১০৯]

'দুঃস্বপ্নের নগরী' নাটকটি সমকালীন রাজনীতিতে বিশেষ ছাপ রাখতে সক্ষম হয়। তৎকালীন রাজনৈতিক পরিবেশ পরিস্থিতিকে উথাল-পাথাল করে দিতে সক্ষম হয়েছিল। নাটকের সমকালীন রাজনীতিকে তুলে ধরে 'দুঃস্বপ্নের নগরী' নাটকটি বাংলা থিয়েটারের অন্যতম সেরা দলিল হয়ে উঠেছে।

এবার রাজার পালা

প্রথম অভিনয় : ৬ জানুয়ারি ১৯৭৭, কলামন্দির

প্রথম প্রকাশ : গ্রন্থাকারে, জুন ১৯৭৭, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ

শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন ১৯৭৫ সালে ১৫ জুন ভারতব্যাপী জরুরি অবস্থা জারি হয়। উৎপল দত্ত এই জরুরি অবস্থার পটভূমিকায় রচনা করলেন 'এবার রাজার পালা' নাটকটি। কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন-শোষণে, গর্জনে ও তর্জনে দেশময় তখন সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত ও প্রাণ ওষ্ঠাগত। দেশব্যাপী বিভিন্ন বিরোধী পক্ষের মিটিং মিছিল বন্ধ করে দেওয়া, বিরোধী পক্ষের সমস্তরকম স্বাধীনতা ও অধিকার হরণ করে নেওয়া থেকে শুরু করে সংবাদপত্রের ওপরে সেন্সরশিপ বসানো কোনো কিছুই বাদ ছিল না। মানুষের গণতান্ত্রিক সকল রকমের অধিকার সেদিন এই জরুরি অবস্থা বা ইমারজেন্সির পটভূমিকায় পুলিশ ও গুণ্ডাদের সন্ত্রাসে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। ভারতীয় সংবিধানকে নির্লজ্জভাবে পদদলিত করে তার পরিবর্তন করা, অবাঞ্ছিত আইন প্রণয়ন করা কিছুই বাদ ছিল না। বিরোধী প্রতিবাদী কণ্ঠকে বিনা অপরাধে, বিনা কারণে কারাগারে বন্দি নইলে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা সব মিলিয়ে এক ভয়ংকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে। এই পরিস্থিতির মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধি, তারই স্নেহধন্য পুত্র সঞ্জয় গান্ধির রাজনীতিতে আবির্ভাব। এই এমারজেন্সির সুযোগে সঞ্জয় গান্ধি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা রাষ্ট্রীয় পুলিশকে ব্যবহার করে সর্বময় কর্তৃত্ব অর্জন করেছেন দেশের রাজনীতিতে। সব মিলিয়ে সে এক ভয়ংকর অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল ভারতবর্ষের ইতিহাসে। উৎপল দত্ত তাঁর 'এবার রাজার পালা' নাটকটিতে এই ভয়ংকর বিশৃঙ্খল ও অরাজক অবস্থাকে সুন্দরভাবে তাঁর নাটকটিতে তুলে ধরেছেন। সেই সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন স্বৈরাচারী শাসকের স্বেচ্ছাচারিতার নিদর্শন।

'এবার রাজার পালা' নাটকটি উত্তরবঙ্গের একটি কাল্পনিক সামন্ত রাজ্যের কল্পনায় স্থাপন করা হয়েছে। সামন্ত রাজ্যটির নাম 'মেচগীর'। এই কল্পিত সামন্ত রাজ্য মেচগীরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরাধীন ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে এই নাটকের বিষয় পরিকল্পনা করা হয়েছে। নাটকের ঘটনার সূত্রপাত ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের কল্পিত সামন্তরাজ্য 'মেচগীর' যেন ১৯৭৭-এর ভারতবর্ষের প্রতীক হয়ে উঠেছে। কল্পিত সামন্ত রাজ্য 'মেচগীর'-এর রাজা বঙ্গেশ্বর সিংহ ওরফে বঙ্কুর স্বৈরাচারী মানসিকতা, ক্ষমতা দখল করার নির্লজ্জ আপ্রাণ চেষ্টা, বিরোধী কণ্ঠকে সমূলে উৎপাটিত করার প্রাণপণ প্রচেষ্টা ও সংবিধানকে তছনছ করার চেষ্টা তা লক্ষ করা গিয়েছিল ১৯৭৭-এর রাজনৈতিক ইতিহাসে। ইন্দিরা গান্ধি ও তাঁর পুত্র সঞ্জয় গান্ধি একই রকমভাবে জরুরি অবস্থার সুযোগ নিয়ে ক্ষমতা দখলের নির্লজ্জ প্রচেষ্টা তারা চালিয়ে যায়। নির্বিচারে কমিউনিস্টদের

উৎখাত করার প্রচেষ্টা তাঁরা করতে থাকেন। বিরোধী প্রতিবাদী কণ্ঠ— তাদেরকে নির্বিচারে কারাগারে বন্দি করতে থাকেন। মিথ্যা গণতন্ত্রের নামে স্বৈরতন্ত্র শাসনকে তাঁরা কায়েম করেন। ইন্দিরা গান্ধি ও তাঁর চক্র ভারতের সংবিধানকে নির্লজ্জভাবে পদদলিত করলেন। ভারতবাসীর সব গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিলেন, সব বিরোধী রাজনীতিকদের নির্বিচারে জেলে পাঠালেন গণতন্ত্র রক্ষা করার নামে। সেই নির্লজ্জ ক্ষমতালোভের প্রচেষ্টাকে উৎপল দত্ত কাল্পনিক সামন্ত রাজ্য 'মেচগীর'-এর রাজা বঙ্গেশ্বর সিংহ ওরফে বঙ্কুর মধ্য দিয়ে অতীব সুন্দরভাবে হাস্যরসাত্মকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। স্বৈরাচারী এক নায়কের উত্থান-পতন এবং স্বৈরতন্ত্রের স্বরূপ উন্মোচন হল 'এবার রাজার পালা' নাটকের মুখ্য বিষয়। আমরা 'এবার রাজার পালা'ই নাটকে সম্যক আলোচনা ও বিচার বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হব এবং দেখার চেষ্টা করব উত্তরবঙ্গের একটি সামন্ত রাজ্য 'মেচগীর' ও তাঁর রাজা বঙ্কুর স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের আড়ালে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দের ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিবেশ পরিস্থিতির প্রকৃত অবস্থা।

নাটকে ঘটনার সূত্রপাত ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। ব্রিটিশ অধিকৃত উত্তরবাংলার 'মেচগীর' নামক এক স্বাধীন দেশীয় রাজ্যের এক গ্রামে রাজকুমার ত্রিদিব সিংহের আমন্ত্রণে সেখানে যাত্রাপালা নিয়ে পালা করতে এসেছে ননী অধিকারীর দল নামে পরিচিত একটি যাত্রার দল। মেচগীর হল একটি সামন্ত রাজ্য। সেখানকার রাজা টিকেন্দ্র জিৎ। টিকেন্দ্র জিৎ-এর ভাই হলেন রাজকুমার ত্রিদিব সিংহ। নাটকের শুরুতে দেখা যায় দুদিন ধরে অভুক্ত থাকা অবস্থায় ননী অধিকারীর এই দলটি 'কংসবধ'-এর মহলা দিচ্ছে পূর্ণ সাজসজ্জা নিয়ে। ননী অধিকারীর দলটি অত্যন্ত দরিদ্র। এই দলের প্রধান অভিনেতা বঙ্গেশ্বর সিংহ ওরফে বঙ্কু। বঙ্কু দলের বাঁধা রাজা। দলের প্রধান গায়ক চন্দ্রশেখর ডোম, আর এক অভিনেতা হলে ঝগড়ু নাপিত। ননী অধিকারী হলেন এই দলের মালিক ও পালা রচয়িতা। দলের প্রধান গায়ক চন্দ্রশেখর ডোমের মুখ থেকে আমরা শুনতে পাই এই দলটি ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে দশ বছর ধরে সারা বাংলা ঘুরে ঘুরে নানা রকম পালা গেয়ে ব্রিটিশ অপশাসন, নিপীড়ন ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রচার করে চলেছে। এই মেচগীর নামক সামন্ত রাজ্যে প্রবল খাদ্যাভাব, গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ দুবেলা দু-মুঠো অন্ন সংস্থান করতে পারে না। ক্ষুধার জ্বালায় মানুষ বটের পাতা সেদ্ধ করে খাচ্ছে। বঙ্কু, চন্দ্রশেখর ডোম অথবা বঙ্কুর রক্ষিতা যমুনার কথোপকথনে এই রাজ্যের প্রবল খাদ্যাভাবের চিত্র প্রস্ফুটিত হয়—

বঙ্কু।। আমার অসম্ভব খিদে পেয়েছে। সেই পরশুদিন খানিক খিচুরি খেতে দিয়েছে। তোমার ভাষা ওগরাতে হলে পালোয়ানের শক্তি লাগে ননীদা।

চন্দ্র।। হ্যাঁ বটে। জমিদার বাবু হাত উপুড় করছেন না কেন? আমরা কি খালি পেটে পালা গাইব?

ননী।। কাল বাদে পরশু পালাগান হবে, তখন খেতে দেবে।

যমুনা।। এ গাঁয়ে কেউই খেতে পাচ্ছে না, বটের পাতা সেদ্ধ করে খাচ্ছে। [১১০]

—ভারতবর্ষ তখন ব্রিটিশ পরাধীন। এই পরাধীন ভারতবর্ষের চিত্রের মধ্য দিয়ে নাট্যকার উৎপল দত্ত সমকালীন অর্থাৎ ১৯৭৭-এর ভারতবর্ষের চিত্রকেই তুলে ধরেছেন। ব্রিটিশ বিরোধিতার কাহিনির মধ্য দিয়ে নাট্যকার সমকালীন ভারতবর্ষের শাসকের বিরুদ্ধে একপ্রকার জেহাদ ঘোষণা করেছেন।

বঙ্কু হল সামন্ত রাজ্য মেচগীর-এর রাজা টিকেন্দ্রজিৎ-এর অবৈধ সন্তান। বঙ্কু সেকথা গর্বের সঙ্গে প্রচার করে—

আমি রাজা টিকেন্দ্রজিতের জারজ ছেলে... কলকাতার বাড়িতে আমার মাকে দাসী রেখে ছিল, রাজা। রাজা টিকেন্দ্রজিতের ঔরসে ঐ দাসীর গর্ভে আমার জন্ম। [১১১]

নাটকের মহলা চলাকালীন নানা ঘটনাও ঘটে। বঙ্কু খালি পেটে কংসের গুরুগম্ভীর সংলাপ বলতে বলতে মূর্ছিত হয়ে যায়। ঝগড়ু নাপিত উন্মত্ত হয়ে চিৎকার শুরু করে পূর্ণিমা পড়লেই তার মাথায় ভর হয়, সে নিজের সঙ্গে তর্ক শুরু করে। এর ফাঁকে বঙ্কু আর যমুনার প্রেমালাপ চলতে থাকে। এইরকম পরিবেশে রাজকুমার ত্রিদিব সিংহের পুলিশের তাড়া খেয়ে কমিউনিস্ট এবং কৃষকের নেতা ভীষ্মলোচন দাস এবং তার স্ত্রী আন্নাকালী পালিয়ে এসে হাজির হয় যাত্রাদলের মহড়া কক্ষে, আশ্রয়ের আশায়। ভীষ্মলোচন আলিপুর জেল থেকে ছাড়া পেয়ে গ্রামে ফিরেছে চারদিন আগে। জমিদার ত্রিদিব সিংহ তাকে বন্দুক নিয়ে তাড়া করেছে, কারণ সে জমিদারের বিরুদ্ধে চাষিদের সঙ্গে লড়াইয়ের নেতৃত্ব দিচ্ছে। এই যাত্রার দল ত্রিদিব সিংহ এনেছেন, তাই তারা ভীষ্মকে কেউই আশ্রয় দিতে রাজি হয় না। সবাই এক উটকো ঝামেলার মধ্যে পড়ে। শেষে দলের অভিনেতা বঙ্কু এগিয়ে আসে তাদের সাহায্যে, বঙ্কুর ইচ্ছায় ভীষ্মলোচন ও তার স্ত্রী আন্নাকালী আশ্রয় পায়। ভীষ্মের খোঁজে বন্দুক হাতে রাজার খুড়তুতো ভাই জমিদার ত্রিদিব সিংহ প্রবেশ করে, সঙ্গে তার সশস্ত্র সেবক মস্তান ট্যাংরাও প্রবেশ করে।

মহড়া কক্ষে ত্রিদিব সিংহ ভীষ্মলোচনকে না পেয়ে তার লোলুপ দৃষ্টি পড়ে যাত্রা দলের নায়িকা তথা বঙ্কুর প্রেমিকা যমুনার দিকে। যমুনার সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে তাকে এক থলি টাকা দিয়ে নিজের রক্ষিতা করে নেন। যমুনাও ভেবে-চিন্তে বঙ্কুকে ছেড়ে ত্রিদিব সিংহের সঙ্গিনী হয়ে যায়। বঙ্কু এর প্রতিবাদ জানালে ত্রিদিব সিংহের হুকুমে তার সাকরেদ ট্যাংরা বঙ্কুকে চাবুক পেটা করে। এরকম পরিস্থিতিতে রাজ্যের দেওয়ান হরকিশোর রায় স্বপারিষদ প্রবেশ করে জানায় যে রাজ্যের রাজা টিকেন্দ্রজিৎ পোলো খেলতে গিয়ে আহত হয়ে মারা গিয়েছেন। তখন ত্রিদিব সিংহ

নিজে রাজা হওয়ার বাসনা প্রকাশ করে, কিন্তু দেওয়ান হরকিশোর রায় জানায় ত্রিদিব সিংহ রাজা হতে পারবে না। কারণ সারা হিন্দুস্থানে রাজার আটত্রিশ জন জারজ ছেলে রয়েছেন, তাদের মধ্যে বয়ঃজ্যেষ্ঠ হলেন বঙ্গেশ্বর সিংহ ওরফে বঙ্কু। সমস্ত প্রমাণাদি দেখার পর এবং মেচগীরের নিয়ম অনুযায়ী বঙ্গেশ্বর সিংহ ওরফে বঙ্কুকে দেওয়ান হরকিশোর মেচগীরের স্বাধীন সার্বভৌম রাজা হিসেবে ঘোষণা করেন। যাত্রার রাজা থেকে বঙ্কু সত্যিকারের রাজায় পরিণত হয়।

যাত্রাপালার রাজা বঙ্কু এখন সত্যিকারের রাজা। দেওয়ান হরকিশোর ভেবেছিল, এই অশিক্ষিত, অমার্জিত, অজ্ঞ লোকটাকে রাজা বানিয়ে বকলমে নিজের মতো করে রাজত্ব চালাবেন। কিন্তু তার সেই আশা দুরাশায় পরিণত হয়। নতুন আইন জারি করে বঙ্গেশ্বর সিংহ জমিদারি প্রথা বিলোপ করে দেন। তার হুকুমে কুমার বাহাদুর ত্রিদিব সিংহকে বন্দি করে এনে ভুগর্ভস্থ কারাকক্ষে নিক্ষেপ করা হয়। কপুর থালার রাজকুমারীর সঙ্গে এ রাজ্যের রাজার ঐতিহ্যমাফিক যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার প্রথা সেটাকে বাতিল করে মহারাজ বঙ্কু তার পূর্বতন রক্ষিতা যমুনাকে ত্রিদিব সিংহের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনে মহারানী বানায়। রাজা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রিয়ভাজন ননী অধিকারী, ঝগড়ু নাপিত ও চন্দ্র ডোমকে তার পারিষদে নিয়োগ করে। অজ্ঞ, অশিক্ষিত বঙ্কু ননী অধিকারীর লেখা বক্তৃতা মুখস্থ করে রাজ্য জুড়ে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ায়। মহারাজা বঙ্কুর মধ্যে পরিবর্তন ঘটতে থাকে। সে ক্রমশ ক্ষমতালোভী হয়ে ওঠেন এবং সর্বক্ষমতা আপন কুক্ষিগত করতে উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়ে। সে ক্রমাগত স্বৈরাচারী, নির্মম এক শাসক-এ পরিণত হয়।

সংবাদপত্রের মালিক শ্রেণির সঙ্গে মহারাজা বঙ্কুর বিবাদ শুরু হয়। নতুন রাজা বঙ্কুর পূর্বজীবনের কথা সেখানকার সংবাদপত্রে প্রকাশ পায়। তার কলঙ্কময় জীবনের প্রতি ইঙ্গিত করে সংবাদ ছাপা হয়। কুমার বাহাদুর ত্রিদিব সিংহকে গ্রেপ্তারের জন্য বঙ্কুকে দোষারোপ করা হয় অথচ বঙ্কু ঘণ্টার পর ঘণ্টা গলায় রক্ত তুলে যে বক্তৃতা দেয়, তার কিছুই সংবাদপত্রে ছাপা হয় না। বরং তার কলঙ্কময় জীবনের ঘটনা বৃত্তান্ত প্রথম পাতায় ছাপা হয়। ফলত তার রাগ বর্ষিত হয় সংবাদপত্রের ওপরে। এবং দোল গোবিন্দকে আদেশ দেয় সংবাদপত্র সে আগে খুঁটিয়ে দেখবে ও পড়বে তারপরে ছাপার আদেশ দেবে। ননী অধিকারীকে তার জন্য একটা কড়া আইনও লিখতে আদেশ দেয়—

বঙ্কু।। গায়ে তো রয়েছে একখানা উত্তরবঙ্গ পত্রিকা! দেখ না হাতে নিয়ে কথার মালশাট মেরেছে বড় বড় অক্ষরে— "বেশ্যার জন্য ত্রিদিব সিংহ গ্রেপ্তার! নূতন রাজার লাম্পট্য কাহিনী"; আরো যা যা লিখেছে পড়তে পারলে ও সালার বাপের বিয়ে দেখিয়ে দিতাম।

ননী।। পড়ে শোনাব?

বঙ্কু।। না! এই দোল গোবিন্দ মুখুয্যে পড়তে শুরু করেছিল। কিন্তু সে এমন খলখল হেসে আর রসিয়ে যে বুঝলাম বকলমে নিজের গালগুলোই আমায় দিচ্ছে। চুপ করিয়ে দিয়েছি।

দোল।। মহারাজ ভুল করছেন, তেমন কোন অভিপ্রায়—

বঙ্কু।। আপনি তো প্রচার সচিব?

দোল।। এ্যাঁ

বঙ্কু।। তাহলে আপনি কী করছিলেন? কোন বেনাগাছে চুল জড়িয়ে পাকে পাকে বেড়াচ্ছিলেন? আমি দশ দিনে চোদ্দটা বক্তৃতা দিয়েছি।– সে সব এরা ছাপেনি কেন?

ননী।। ছেপেছে, চেপেছে বঙ্কু। পাঁচ পাতায় ছ'লাইনে সেরেছে। এর চেয়ে না ছাপলেই ভাল হত।

বঙ্কু।। আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা গলায় রক্ত তুলে বক্তৃতা দেব আর সেটা ছ'লাইনে ফক্কা? আর মাসুল চোর জন্মদাসী প্রথম পাতা জুড়ে আমার কলঙ্ক রটনা করবে? আর আপনি রূপের নাগর তখন শহরের পথে টো টো করে মেয়েছেলে খুঁজবেন?

দোল।। না, না, শুনুন— আমি ঐ কাগজের মালিক এবং সম্পাদককে বারবার অনুরোধ করেছি—

বঙ্কু।। অনুরোধ? চার পয়সা বকেয়া আদায়ের জন্য চাষীর ঘর জ্বালাতে পার, আর কাগজের বেলায় শান্তিপুরী অনুরোধ? আমার মনে হয় আপনার মগজটা চার বছরের শিশুর, এবং সেও তাকে জো দেখে ফেলে দিয়েছিল নিশ্চয়ই নইল আপনি পেলেন কোথায়? (হঠাৎ) কাগজের মালিক কে?

দোল।। কুমার ইন্দ্রজিৎ সিংহ।

বঙ্কু।। হুঁ বুঝেছি, জমিদার নন্দনদের ষড়যন্ত্র। আজ থেকে এ রাজ্যের সব সংবাদপত্রের প্রত্যেকটা খবর আপনি আগে পড়বেন, তারপর ছাপা হবে।

ননী।। সেনসর, সেনসর, যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ যা করেছিল।

বঙ্কু।। যদি দেখি সামান্যতম খবরের সামান্যতম অংশে সামান্যতম তিকড়মবাজির সামান্যতম আভাসের সামান্যতম লক্ষণ, তাহলে ঐ ইন্দ্রজিৎ সিংগি আর সম্পাদক তো বটেই, আপনাকে সুদ্ধ গ্রেপ্তার করা হবে।

দোল।। উঃ! দেখুন হুজুর এটা কি ঠিক হবে? সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা এক গণতান্ত্রিক অধিকার, তাকে—

বঙ্কু।। ওঃ! সংবাদপত্রের স্বাধীনতা! একতাল সালা সংবাদপত্ররা স্বাধীনতা নিয়ে বানানো হয়েছে

সিদ্ধির ঝুলি, কখনো শ্যামের মুরলী!

ননী।। হ্যাঁ গঙ্গা ফেলে এদ্দিন তো পুকুরে চান করেছে।

বঙ্কু।। লিখুন ননীদা, কড়া ক'রে একটা আইন লিখুন তো। দেখাচ্ছি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা।[১১২]

বঙ্কু ক্রমাগত স্বৈরাচারী শাসকে পরিণত হয়। ক্রমে ক্রমে সন্দেহ আশঙ্কা তার ভিতরে দানা বাঁধতে থাকে। সে যত সন্ত্রাসের পথে এগোয় তার মনও তেমনি ক্রমশ সন্দেহ জর্জর হয়ে ওঠে। একসময় সে তার প্রিয় বিশ্বস্ত পারিষদ ঝগড়ু নাপিতকে ছাড়া অন্য কারো কাছে চুল দাড়ি কাটায় না পাছে জমিদার পক্ষের লোক নাপিত সেজে তার গলায় ক্ষুর চালিয়ে দেয় সেই আশঙ্কায় দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বঙ্কু উঠেপড়ে লাগে। জমিদারি প্রথা বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে দেশে শ্রমিকদের পাঁচ বছরের জন্য বোনাস বন্ধ করে দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু সেই শ্রমিক বিরোধী প্রস্তাব প্রজা পারিষদে অনুমোদন পায় না। প্রজা পারিষদের ভোটে নাকচ হয়ে যায় সেই প্রস্তাব। বঙ্কুর পক্ষে ভোট পড়ে চল্লিশটি আর বিপক্ষে ভোট পড়ে একশো তিনটি। কিন্তু ক্রমাগত স্বৈরাচারী হয়ে ওঠা বঙ্কু পেছন ফিরতে রাজি নয়, সংখ্যা গরিষ্ঠতার গণতন্ত্রে সে আর বিশ্বাস করে না। ক্রুদ্ধ বঙ্কু দেওয়ান তথা মুখ্যমন্ত্রী হরকিশোরকে ডেকে পাঠায়। এবং তাকে আদেশ দেয় প্রজা পরিষদের যারা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে তাদের সবাইকে যেন গ্রেপ্তার করা হয় ও জেলে ভরা হয়। ফলে বাকি যে চল্লিশ জন থাকবে তারা সবাই প্রস্তাবের পক্ষে এবং তাদের সামনে প্রস্তাবটা আবার পেশ করে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব পাশ করা হবে। স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্রে বিশ্বাসী বঙ্কু এভাবে সংবিধানকে পদদলিত করতে পিছুপা হয় না—

চন্দ্র।। তোমার প্রস্তাব নাকচ ক'রে দিয়েছে প্রজা পরিষদ। পাঁচ বছরের জন্য বোনাস বন্ধ করার যে প্রস্তাব তুমি পাঠিয়েছিলে ঘণ্টা তিনেক খ্যাচোর খ্যাচোর করার পর ভোটের জোরে সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে আস্তাকুঁড়ে, তোমার প্রস্তাব হেরে গেছে।

বঙ্কু।। আমার পক্ষে কত ভোট?

চন্দ্র।। ৪০।

বঙ্কু।। বিপক্ষে?

চন্দ্র।। ১০৩।

বঙ্কু।। হুঁ।

ননী।। আমার মনে হয় নূতন একটা আইন পাশ করা উচিত— এরপর থেকে যে কম ভোট পাবে

সেই জিতবে।

চন্দ্র।। এই বুড়োহাবড়াই যত নষ্টের গোড়া। এই উস্কেছে ঐ অকম্মার ধাড়িগুলোকে।

হর।। বিশ্বাস করুন মহারাজ আমি এমন কিছু করতেই পারি না।

বঙ্কু।। এটা কোন দিশি গণতন্ত্র? আমি একটা কথা কইলাম, আর ভোটের জোরে সেটাকে চেপে দিল? গণতন্ত্র মানে কি এই, যে বেশি ভোট পড়লেই আমি হেরে গেলাম?

হর।। আগে তাই তো জানতাম, সংখ্যাগরিষ্ঠই তো গণতন্ত্র—

বঙ্কু।। ভুল। গণতন্ত্র মানে আমি যা বলব সবাই মিলে তাই করবে। সেটাই প্রকৃত গণতন্ত্র। বর্মণ পুলিশ নিয়ে যাও, ইউ গোজ উইথ পুলিশ। যে ১০৩ জন বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে তাদের গ্রেপ্তার ক'রে জেলে পুরে দাও। বাকি থাকবে যে ৪০ জন তারা সবাই প্রস্তাবের পক্ষে। তাদের সামনে প্রস্তাবটা আবার পেশ কর চন্দ্রশেখর ডোম। সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব পাশ হবে। এটাই হল প্রকৃত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। বর্মণ! [১১৩]

গণতন্ত্র রক্ষার নামে গণতন্ত্রকে হত্যার এক নগ্ন মানসিকতা প্রকাশ পায় বঙ্কুর মধ্যে। সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের অপপ্রয়োগ করে বঙ্কু। নানারকম অত্যাচার-অন্যায় নিপীড়ন করে নিজের স্বৈরতান্ত্রিক মানসিকতা বজায় রাখাই একমাত্র উদ্দেশ্য। আইন-সংবিধান সবই সরকারের স্বার্থসিদ্ধির জন্য, সংবিধানের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সেটাও অপশাসন প্রয়োগের জন্য। রাজা বঙ্কু তার মন্ত্রীকে সংবিধান কেটেকুটে সংশোধন করতে আদেশ দেন নিজের ইচ্ছে মতো, নিজের প্রয়োজন মতো, নিজের সুবিধার্থে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে। সংবিধানকে এই নির্লজ্জ পদলেহন ও অবমাননা দেখতে পাই বঙ্কু ও ননী অধিকারীদের উক্তির মধ্যে দিয়ে—

বঙ্কু।। ননীদা, আপনি কাল গোপন ব্যালট না কি একটা বলেছিলেন?

ননী।। হ্যাঁ। গোপন ব্যালট মানে হচ্ছে—

বঙ্কু।। (চন্দ্রকে) চল্লিশটা কাগজের টুকরোয় লেখা "হ্যাঁ"। সেগুলো খামে পুরে আঠা দিয়ে ভাল ক'রে সাঁটো, শীলমোহর কর। তারপর সেগুলো দাও ঐ চল্লিশটি সদস্যের হাতে। বল, এবার সংবিধান সংশোধনের ওপর ভোট দাও।

হর।। এ কি? এ আবার কি? ঐ বন্ধ খামগুলো ওঁদের ভোটপত্র?

বঙ্কু।। হ্যাঁ।

হর।। খুলে দেখতেও পাবে না কি ভোট দিচ্ছে?

বঙ্কু।। নিশ্চয়ই না। এটা গোপন ব্যালট, আপনি জানেন কি গোপন ব্যালট হল গণতন্ত্রের এক প্রধান স্তম্ভ? এতদিন আপনারা এসব করতে দেননি, আমি এসে চালু করলাম।

ননী।। সিক্রেট ব্যালট হল গে তোমার গণতন্ত্রের প্রাণস্বরূপ। [১১৪]

১৯৭৭ সালের এমারজেন্সি সময়ে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে শুরু হয় সংবাদপত্রের ওপরে সেন্সরশিপ। কোনো সংবাদ ছাপতে গেলে সেটি আগে শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হত, শাসকের বিপক্ষে গিয়ে অথবা শাসকের মনোগত না হলে কোনো সংবাদ প্রায় ছাপাই হত না। শাসকের কুকাণ্ডের কথা তো দূরস্ত বরং শাসকের অন্তঃসারশূন্য বক্তৃতাগুলোকে প্রথম পাতায় বড়ো বড়ো হরফে ছাপতে বাধ্য করা হত। এমারজেন্সির পটভূমিকায় সারা ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গে শাসকশ্রেণি নিজের মতো করে আইন রূপায়ণ ও বলবৎ করতে থাকে। যার এক এবং অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বিরোধী পক্ষের কণ্ঠরোধ ও বিরোধী পক্ষকে যেন তেন প্রকারে অবদমিত করা। আপন স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে যখন তখন সংবিধান পরিবর্তন ও আইন বলবৎ করা যার জোরে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা যেতে পারে। পুলিশ প্রশাসন মিলিটারি দিয়ে বিরোধী জোটকে দুর্বল করা ও সমূলে উৎপাটিত করাই ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য। উৎপল দত্ত পরাধীন মেচগীর রাজ্যের রাজা স্বৈরাচারী বঙ্গেশ্বর সিংহের মধ্য দিয়ে তিনি সমকালীন শাসক শ্রেণির মানসিকতা ও চরিত্রকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন। বঙ্গেশ্বর সিংহের স্বৈরাচারী মানসিকতা ও অন্তঃসারশূন্য বক্তৃতা, শাসন-শোষণের স্বৈরাচারী পদ্ধতি আলোচ্য নাটকে তুলে ধরে উৎপল দত্ত সমকালীন ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতি ও রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন।

রাজা বঙ্কু নিজের ইচ্ছে মতো রাজ্য শাসন করার উদ্দেশ্যে সংবিধানকে ইচ্ছা মতো পরিবর্তন করে নিজের সুবিধা মতো। এমতাবস্থায় দেওয়ান হরকিশোর উৎফুল্ল হয়ে মতামত প্রদান করে যে দেশে সংকট অবস্থা তৈরি না হলে দেশের সংবিধান সংশোধন করা যায় না। স্বৈরাচারী শাসক বঙ্কু সঙ্গে সঙ্গেই দেশে জরুরি অবস্থা বা সংকট অবস্থা তৈরি করতে উদ্যত হয়। সে তার দেওয়ান হরকিশোরকে আহত করার চেষ্টা করে। এবং তার দেওয়ানকে আহত করার মধ্য দিয়ে দেশে সংকট অবস্থা তৈরি করতে চায় যার বলে সংবিধানটাকে পরিবর্তন করা সম্ভব হয়। যাতে কেউ সংবিধান পরিবর্তন নিয়ে যেন কোনো রকম প্রশ্ন করতে না পারে—

বঙ্কু।। তা সংকট-অবস্থা একটা সৃষ্টি ক'রে নিলেই তো হয়।

হর।। কি?...

বঙ্কু।। আমি বলি এই দেওয়ানের প্রাণনাশের লোমহর্ষক চেষ্টা হোক।

চন্দ্র।। হ্যাঁ, হ্যাঁ, উত্তম প্রস্তাব। একটা বল্লম দিয়ে এর ডান উরুটা এফোঁড় ওফোঁড় ক'রে দিলেই—। [১১৫]

শ্রমিকদের বোনাস বন্ধ করে দেওয়ায় ভীষ্মলোচন দাস ও ওসমান শেখের নেতৃত্বে শ্রমিকরা অরণ্য শ্রমিক ইউনিয়ন একত্রিত হয়েছে ও ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। বঙ্কু বোনাসের দাবির মতো ধর্মঘটকেও বে-আইনি ঘোষণা করেছে। সে কঠোরতম উপায়ে সমস্তরকম প্রতিকূলতাকে স্তব্ধ করে দিতে চায় প্রথমেই বিদ্রোহ দমনে তৎপর হয়। ব্রিগ্রেডিয়ার বর্মণের নেতৃত্বে সৈনদল পাঠানো হয় বামপন্থী নেতা ভীষ্মলোচন দাস ও ওসমান শেখের নেতৃত্বে ধর্মঘট ডাকা শ্রমিকদের নিঃশেষ করতে। সমস্ত মিটিং মিছিল, ধর্মঘট, বিভিন্ন শ্রমিক ইউনিয়নের কাজকর্ম বে-আইনি ঘোষিত হয়। স্বৈরাচারী শাসক বঙ্কুর মধ্যে এক ভণ্ডামির মুখোশ পরিলক্ষিত হয়। তার ফাঁকা বুলির মধ্যে উঁকি মারে এক কুচক্রী মানসিকতা ও ক্ষমতা লোভের নির্মম প্রচেষ্টা। যখন ব্রিগেডিয়ার বর্মণের নেতৃত্বে সৈন্য পাঠাবার প্রস্তাব হয় তখন চন্দ্রশেখর ডোম তার প্রতিবাদ করে। তখন বঙ্কু সুকৌশলে শ্রমিক নেতা ভীষ্মলোচন দাস ও শেখ ওসমানকে আলোচনার জন্য প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানানো হয়, অপরদিকে ব্রিগেডিয়ার বর্মণের নেতৃত্বে সৈন্য সমাবেশও করা হয়। আলোচনা করতে এলে তারা যখনই প্রাসাদে পা দেবে তখনই তাদের গ্রেপ্তার করার পরিকল্পনা বঙ্কু করে—

ট্যাংরা।। মহারাজ! অরণ্য শ্রমিক ইউনিয়ন ধর্মঘট ডেকেছে!

ঝগড়ু।। ধর্মঘট তো বেআইনি।

ট্যাংরা।। তবু ডেকেছে। বলে বোনাস দিতে হবে।

ঝগড়ু।। বোনাস তো বেআইনি।

ট্যাংরা।। তবু চাইছে। ওদের নেতা হচ্ছে ভীষ্মলোচন দাস এবং শেখ ওসমান।..............

ঝগড়ু।। বর্মণকে পাঠাও সৈন্য দিয়ে।

চন্দ্র।। না, না, আমরা সব চাষীর ছেলে। চাষীদের নয়নের মণি ভীষ্ম আর ওসমানকে ধরতে সৈন্য পাঠাব?

বঙ্কু।। কখনো না, এ রাজদেহে প্রাণ থাকতে নয়।

ননীদা।। যান ওদের কাছে, বোঝান ওদের— মেচগীর রাজ্যের অভ্যুদয়ের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িও না, নেহহরুদের হাত জোরদার কোরো না, মোটে পাঁচটা বছর বোনাসের আশা ছেড়ে দিয়ে কাজ

কর দশের স্বার্থে। ওদের মিটিঙে ডাকুন। বলুন, মেচগীরের অধীশ্বর ওদের সঙ্গে কথা কইবে।... ঐ ভীষ্ম আর ওসমান আমার ভাই। কিন্তু রক্তের টানের চেয়ে আমার কাছে দেশের স্বার্থ বড়। যাও! ঠিক তিনটের সময়ে দেওয়ানের পশ্চাদ্দেশে গুলি করবে। তারপর এখানে ফিলে উদ্যানে সৈন্য-সমাবেশ কর। আমার অগ্রজপ্রতিম ভীষ্ম দাস ও অনুজপ্রতিম শেখ ওসমান সন্ধ্যাকালে এ প্রাসাদে পা দেয়ামাত্র তাদের গ্রেপ্তার করবে। উঃ, রাজকার্য কি নির্মম! বুক ভেঙে যায় তবু কর্তব্যের আহ্বানে সাড়া দিতেই হয়। [১১৬]

স্বৈরাচারী শাসক তার স্বৈরাচারের সমস্ত মুখোশ উন্মোচন করে। নিজেকে হিটলারের মতো করে ভাবতে থাকে ও হিটলারের আদলে চুল ও গোঁফ রেখেছে বঙ্কু। বঙ্কু ক্ষমতাবলে আদালতের সমস্ত ক্ষমতা বাতিল করে দিয়েছে। কারণ প্রজা পরিষদে বঙ্কুর বিপক্ষে ভোট দিয়েছিল যে একশো তিন জন তাদের মধ্যে আঠাশ জনকে আদালত ইতিমধ্যে ছেড়ে দিয়েছে। তাই বঙ্কু আদালতের সমস্ত ক্ষমতা হরণ করে ননী অধিকারীকে দিয়ে একটা আইন লিখিয়ে নেয়—

ননীদা লেখো তো একটা আইন— আজ থেকে আদালত থাকবে, কিন্তু তার কোন মান্যতা থাকবে না।... আমরা যা করব তার বিরুদ্ধে কড়ে আঙুলটি তুললে জজের জেল হবে। [১১৭]

ভীষ্ম ও ওসমান বঙ্কুর আহ্বানে মিটিং-এ আসার কারণও জানতে চায়, তার উত্তরে ট্যাংরা এসে জানায় যে তারা মিটিং-এ তো আসবেই না উপরন্তু দুশো লোক নিয়ে ওরা পুলিশের অস্ত্রাগার লুঠ কর প্রচুর বন্দুক আর গুলি হাতিয়ে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে পালিয়ে গেছে। একথা শুনে বঙ্কু আরও উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং ব্রিগেডিয়ার বর্মণকে কঠোরভাবে নির্দেশ দেয় প্রত্যেক আন্দোলনকারীকে যেন দেখা মাত্রই গুলি করা হয়, তাদের গ্রেপ্তার করার আর প্রয়োজন নেই এবং ননী অধিকারীকে অরণ্যযুদ্ধের আর একটা খসড়া তৈরি করতে নির্দেশ দেয়—

বর্মণ, আপনার হাতে যত সৈন্য আছে সবাইকে নিয়ে চক্রধামপুর চলে যান। জঙ্গল ঘিরে ভীষ্মের দলকে নিশ্চিহ্ন করে আসুন। না। বন্দী করারও আর প্রয়োজন নেই, ধরামাত্র গুলি ক'রে মারবেন— প্রত্যেককে। ননীদা আর বর্মণ বসে অরণ্যযুদ্ধের একটা খসড়া তৈরী করুন। আমাকে কপি দেবেন একটা, দেখব, কী করছেন। [১১৮]

১৯৭৫ সালের জুন মাসে সারা ভারতে জরুরি অবস্থা জারি হওয়ার পর শাসক দল ক্ষমতা কায়েম রাখতে সবরকমের দমন পীড়ন সন্ত্রাস চালিয়ে যেতে থাকল। এই সন্ত্রাস দমনপীড়নে সাহায্য করল তাদের স্নেহ ও মদতপুষ্ট গুণ্ডার দল। রাজনৈতিক নেতা থেকে পুলিশ প্রশাসন প্রভৃতির এক নির্লজ্জ অভিসন্ধি পরিলক্ষিত হতে থাকল সর্বত্র। বিরোধী জোট বিশেষত কমিউনিস্ট

পার্টি ও জনতার ওপরে শাসক শ্রেণির দুর্বিষহ অত্যাচার চলতে থাকল অনবরত। একের পর এক আইন প্রণয়ন করে বিরোধীদের ছত্রভঙ্গ করাই ছিল শাসকের একমাত্র উদ্দেশ্য, যাতে তারা শাসকের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হতে না পারে। আলোচ্য নাটকে স্বৈরাচারী রাজা বঙ্কু যেন এমারজেন্সির সময়ের সেই শাসকের প্রতিরূপ। বিরোধী অর্থাৎ কমিউনিস্ট শ্রমিক নেতা ভীষ্ম ও তার সহযোগী ওসমানকে দেখামাত্রই গুলি করার নির্দেশ দেন। শ্রমিক আন্দোলন ও সমস্ত ধর্মঘটকে তিনি নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু গোপনে গোপনে কমিউনিস্টদের প্রতিরোধ সংগ্রাম চলতে থাকে। তাদের একত্রে জোটবদ্ধভাবে সংগঠন বাড়িয়ে তোলা ও দলীয় কর্মীদের সংঘবদ্ধ করে তোলার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। যেমনটা দেখা গিয়েছিল এমারজেন্সির সময়ে শাসক শ্রেণির সমস্ত অত্যাচার-অন্যায় ও বীভৎসতাকে সহ্য করার পরেও তারা গোপনে গোপনে দলবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ প্রতিবাদ ও সংগ্রামের প্রস্তুতি নিতে। খোদ ননী অধিকারী এই কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত সেই সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতমা সদস্যা হলেন বঙ্কুর মহারানী যমুনা। ননী অধিকারী গোপনে যমুনা মারফত অরণ্য যুদ্ধের প্ল্যানের যে কপি তৈরি করা হয়েছিল সেই কপি একখানি শ্রীনিবাস ময়রা মারফত ভীষ্মের কাছে পাঠানো হয়। ফলে প্রস্তুত হয়ে থাকা ভীষ্মদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্রিগেডিয়ার বর্মণের বাহিনী পরাজিত হয় ও আহত হয়ে ফিরে আসে। এতে বঙ্কু আরও অপমানিত হয়, সে সান্ধ্যআইন জারি করে। টাউন হলের মাঠে কমিউনিস্ট পার্টির যে মিটিং সেই মিটিংকে তিনি গুলি চালিয়ে ছত্রভঙ্গ করতে নির্দেশ দেন—

> *ননীবাবু, আজ থেকে কার্ফু জারি হল সারা মেচগীর রাজ্যে, বিকেলে পাঁচটা থেকে সকাল ছ'টা। লিখে আনুন। হরবাবু, আজ চারটের সময়ে কমিউনিস্ট পার্টি মিটিং ডেকেছে টাউনহলের মাঠে। সে মিটিং গুলি চালিয়ে ছত্রভঙ্গ করা হবে। অন্তত দশটা মৃতদেহ যেন পড়ে থাকে মাঠে এখানে-ওখানে। তাহলে আর মিটিং ডাকবে না এ জন্মে।* [১১৬]

কমিউনিস্ট শ্রমিক নেতা ভীষ্মলোচন ও তার দলবল গোপনে যেভাবে সংঘবদ্ধ হয়েছে, সরকারের বিভিন্ন অন্যায় অত্যাচার ও জুলুম সহ্য করে তাদের আন্দোলনকে সঠিক পথে নিয়ে গেছে, শতরকম অত্যাচার জুলুমবাজি সহ্য করেও আন্দোলনের জন্য আত্মত্যাগ করেছে, তা এমারজেন্সির সময়কার কমিউনিস্ট নেতাদের আত্মত্যাগ আন্দোলন-মিটিং মিছিল ও গোপনে সংগঠনকে নেতৃত্ব দেওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

সাধারণ মানুষের ওপরে অত্যাচার নিপীড়ন ক্রমাগত বাড়তে থাকল। বঙ্কুর স্বৈরাচারী শাসন ক্রমবর্ধিত হতে থাকল। সেই শাসন থেকে মুক্তির লড়াই শুরু হয় সমস্ত রাজ্যব্যাপী। শ্রমিক-কৃষক সম্মিলিতভাবে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে রাজ্যব্যাপী আন্দোলন শুরু করে। মিটিং-মিছিল অবরোধ

ও ধর্মঘটে রাজ্যকে অচল করে দেওয়ার প্রচেষ্টা করে। কোণঠাসা বঙ্কু একা হয়ে পড়ে, তার পাশের বিশ্বস্ত পারিষদবর্গ ও মানুষজনেরা ক্রমে ক্রমে তার সঙ্গ ছেড়ে চলে যায়। এমতাবস্থায় ক্ষিপ্ত উন্মত্ত বঙ্কু নির্ভর করে দেশের গুণ্ডা ও মস্তানদের ওপর। দেশের পুলিশ-মিলেটারি প্রশাসনের ওপরে। বঙ্কু তবুও বিদ্রোহ দমন করতে পারে না। তার প্রিয় ননী অধিকারীও তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। সব বিশ্বাস হারিয়ে শেষপর্যন্ত বঙ্কু ব্রিটিশ রাজশক্তির দ্বারস্থ হয়। মেচগীর রাজ্যকে রক্ষার জন্য এবং তার সিংহাসন রক্ষার জন্য বঙ্কু ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীকে আমন্ত্রণ জানায়, কিন্তু ননী অধিকারী একজন কমিউনিস্ট গুপ্তচর হিসেবে আবার চক্রান্ত করে, সে কৌশলে রাজার সাজ পরে বঙ্কুর ভূমিকায় নেমে রাজার যে আদেশ ব্রিটিশ সৈন্যদের প্রতি, সেই আদেশকে পালটে দেয়। ব্রিটিশ শক্তি পড়ে চরম অস্বস্তির মুখে। এরাজ্যে তাদের পদার্পণ পিছিয়ে যায়। সেই সুযোগে ননী অধিকারী সারাদেশে কর্মচারীদের ছুটি ঘোষণা করে দিয়ে রাজ্যের প্রশাসনকে একপ্রকার স্তব্ধ করে দেয়। এমতাবস্থায় বঙ্কু পড়ে যায় চরম অসহায়তার মধ্যে। বঙ্কুকে দিয়ে আর রাজার পালা করানো যাবে না এটা বুঝতে পেরে চামারিয়া, হরকিশোর, দোল গোবিন্দ এবং ব্রিগেডিয়ার বর্মণ বঙ্কুকে হত্যা করে। নতুন রাজা হিসেবে তারা রাজকুমার ত্রিদিব সিংহের নাম ঘোষণা করে।

এমারজেন্সির ভয়াবহতা এই নাটকের মূল এবং অন্যতম দিক, সেই সঙ্গে এই নাটকের আরেকটি দিক অবশ্যই উল্লেখযোগ্য যে, রাজার পালায় যারা রাজা সাজে তারা পালাতেও যেমন কুশীলব, রাজ্য শাসনেও তেমনি। পিছন থেকে তাদের নিয়ন্ত্রণ করে চামারিয়া, দোল গোবিন্দ ও হরকিশোরের মতো বেনিয়ারা। তাদের ইচ্ছা মতো তারা রাজা নির্বাচন করে। আবার তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হলে তারা প্রয়োজন মতো রাজা পরিবর্তন করতেও পারে। রাজাকে নিয়ন্ত্রণ করার এক অদৃশ্য সুতো তাদের হাতেই থাকে। তারা ইচ্ছা মতো রাজাকে পুতুলের মতো নাচাতে পারে, কাঁদাতে পারে আবার হাসাতেও পারে। নাটকের শেষভাগে ননী অধিকারীর বক্তব্যটি তাই স্মরণযোগ্য—

> *আমরা ভাবি আমরাই বুঝি আসল ভাগ্যবিধাতা। আসলে আমরাও পুতুল।... তোমার সুতোও বাঁধা রয়েছে বানিয়া জমিদারদের হাতে।* [১২০]

ভারতবর্ষেও সেই সময় দেখা যায় এমারজেন্সির বাধ্যতামূলক অবসানে নির্বাচন সংগঠিত হল তাতে ইন্দিরা গান্ধির পরাজয় ঘটে। সিংহাসনে যারা আরোহণ করলেন, জোটধারী জনতা দল তাদের ওপর বিশ্বাস রাখা গেল না। আবার পুনরায় নির্বাচন সংগঠিত হল। সেই নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধি ফিরে এলেন। তিনি এবার অনেক সংযত ও পূর্বের অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ। পশ্চাতের অঙ্গুলি হেলনে অর্থাৎ বেনিয়াদের অঙ্গুলি হেলনে তিনি আর ততটা দুলছেন না। ফলে তার পরিণতি হল

চরম— মৃত্যু। ব্রিটিশরা এই দেশ থেকে চলে গেলেও অর্থনৈতিক পরাধীনতা, বেনিয়া শিল্পপতিদের নিয়ন্ত্রণ থেকে এদেশের তখনও মুক্তি ঘটেনি। এই পুঁজিপতি বা শিল্পপতিরা সদা সর্বদাই সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে। শাসন ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত থেকে শ্রমিক-কৃষক সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করে। গণতন্ত্রের মুখোশ পরে কৃষক শ্রমিক মেহনতি মানুষকে ক্রমাগত শোষণ করে চলে। অর্থাৎ শ্রেণিবিভক্ত এই সমাজে পুঁজিবাদ তার ইচ্ছা মতো রাজা বদল করে, পুতুল রাজাদের সামনে রেখে রাজ্য চালায় এই পুঁজিবাদ শ্রেণি। তাই আসল শত্রু হচ্ছে পুঁজিবাদ। মুক্তিকামী মানুষজনের এই পুঁজিবাদকেই উৎপাটন করতে হবে, তার জন্যই প্রয়োজন সংগ্রাম। শ্রমিক-কৃষক ও মেহনতি মানুষের সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়েই প্রতিরোধ গড়ে তুলে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে নির্মূল করা যেতে পারে, উৎপল দত্ত সেই বার্তাই দিয়েছেন।

‘এবার রাজার পালা’ নাটকটি রচিত ও প্রযোজিত হয়েছিল সত্তর দশকের মধ্যভাগের ভারতের জরুরি অবস্থার সময়ে। আলোচ্য নাটকে উৎপল দত্ত এক কাল্পনিক রাজ্যে কাল্পনিক রাজার স্বৈরতান্ত্রিক কার্যকলাপ-এর বর্ণনা দিয়েছেন। বঙ্কুর এই স্বৈরাচারী কার্যকলাপ যেন প্রকারান্তরে ঘটে চলেছিল ১৯৭০ দশকের এমারজেন্সির সময়কার ভারতবর্ষে। ১৯৭৫ খ্রি. ২৬ জুন ইন্দিরা গান্ধি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন সারা ভারতবর্ষ জুড়ে। গণতন্ত্রের মুখোশ পরে যেভাবে সমস্ত ভারতবর্ষে স্বৈরতন্ত্র শাসনের যে রূপ ভারতবাসী প্রত্যক্ষ করেছিল, মেগচীর কাল্পনিক রাজ্য যেন তারই দর্পণ। ক্ষমতালোভীর নির্লজ্জ প্রচেষ্টার জন্য দেশের সংবিধানকে পদদলিত করে তার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে নিজ সুবিধামতো গণতন্ত্রকে বুড়ো আঙুল দেখানো হয়েছে। ইন্দিরা গান্ধির পুত্র সঞ্জয় গান্ধি সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করে এমারজেন্সির সময়ে যে স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের অপপ্রয়োগ করেছিল তা যেন বঙ্কুর চরিত্রের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে। ‘এবার রাজার পালা’ নাটকটি সমকালীন রাজনৈতিক ও শৈল্পিক মানদণ্ডে নাটকের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন ও রাজনৈতিক নাট্যশালার একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংযোজন হয়ে উঠেছে।

লেনিন কোথায়

প্রথম অভিনয় : ১৯৭৬ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি, মিনার্ভা

প্রথম প্রকাশ : এপিক থিয়েটার, মে-জুন ১৯৭৯

১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুন পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশে ঘোষিত হল এমারজেন্সি। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এক কলঙ্কিত অধ্যায়ের সূচনা। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১২ জুন এলাহাবাদ

হাইকোর্ট তদানীন্তন কংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির বিরুদ্ধে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নেন। নির্বাচনে ভোট কারচুপির অভিযোগে বিচারপতি জগমোহন লাল সিনহা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধির বিরুদ্ধে রায় দেন, যে তিনি পরবর্তী ছয় বছর ভোট প্রক্রিয়ার অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। এলাহাবাদ হাইকোর্টের এই রায় হেরে গিয়ে শ্রীমতি গান্ধি ক্ষমতা দখল রাখার জন্য সারা দেশব্যাপী এমারজেন্সি বা জরুরি ব্যবস্থা জারি করলেন। হঠাৎ ভারতবর্ষের বুকে এক অন্ধকার রাত্রি নেমে এল। সমস্ত বিরোধী পার্টির কর্মীরা হতচকিত, ভীত সন্ত্রস্ত। তারা আত্মগোপন করলেন, কেউবা দেশান্তরী হলেন। বিরোধী নেতাকর্মীদের অবাঞ্ছিত ধরপাকড়, পার্টি অফিস জ্বালিয়ে দেওয়া, প্রকাশ্যে খুন, ধর্ষণ, হত্যা কোনো কিছুই বাদ ছিল না। বাইরে তখন আর কোনো কাজ করার পরিস্থিতি ছিল না। মিটিং-মিছিল বন্ধ, প্রকাশ্যে পার্টির সব কাজ করা বন্ধ। সংবাদপত্রে চালু হল সেন্সরশিপ। বামপন্থী থেকে শুরু করে সব ধরনের সংবাদপত্রেই সেন্সরশিপ চালু করা হল। খবরের বেশিরভাগ অংশই সাদা। সম্পাদকীয় কলম সেটিও সাদা, এমনকি গোটা পত্রিকাটি সাদা। এভাবে অনেক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকল সেন্সরশিপ-এর জেরে। শাসকের বিরুদ্ধে, অন্যায়-এর বিরুদ্ধে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোনো সংবাদ ছাপা হল না। যাবতীয় গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সংগঠন, পার্টিকর্মীদের ওপর চলতে থাকল সন্ত্রাসের দমন-পীড়ন। এই রকম এক দমবন্ধ করা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে রাজনৈতিক হানাহানি, রাজনৈতিক সন্ত্রাসের পটভূমিকায় উৎপল দত্ত প্রযোজনা করলেন 'লেনিন কোথায়'।

'লেনিন কোথায়' নাটকে উৎপল দত্ত দেখিয়েছেন ১৯১৭ সালে জুলাই থেকে অক্টোবর অর্থাৎ রুশ বিপ্লবের প্রাক্কালে লেনিন ও তাঁর সহযোদ্ধারা কীভাবে সমাজতন্ত্রের শত্রুদের মোকাবিলা করেছিল এবং বিপ্লব সম্পন্ন করেছিলেন ও সফল হয়েছিলেন। ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের এই সময়ে রাশিয়ার স্বৈরাচারী শাসনে সে দেশের অর্থনীতি থেকে শুরু করে রাজনৈতিক পরিস্থিতি সবই ভেঙে পড়েছিল। দেশের বৃহৎ অংশে দুর্ভিক্ষ ও প্রবল খাদ্যাভাব পরিলক্ষিত হয়, অথচ মজুতদাররা গুদামে খাদ্যসামগ্রী সঞ্চিত করতে থাকে। ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি হয় একের পর এক কারখানার মালিকদের লকাউট ঘোষণা ও হাজার হাজার শ্রমিকদের কর্মচ্যুত করে। শ্রমিকদের বৃহৎ একটি অংশ কর্মচ্যুত হওয়ার ফলে অনাহারগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ফলস্বরূপ জনতার মধ্যে তীব্র হতাশার জন্ম নেয়। সেই হতাশা থেকেই সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল ক্ষোভে জনতা ফেটে পড়ে। রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিক থেকে দেখা যায় বিরোধীদের কণ্ঠরোধ, দুর্বিষহ রাজনৈতিক পীড়ন ও শোষণের ফলে বিরোধী পক্ষ দিশেহারা হয়ে পড়ে। বিরোধী নেতা ও কর্মীদের দেখামাত্র গুলির নির্দেশ, নইলে কারাগারে নিক্ষেপ প্রভৃতি হয়ে উঠেছিল নিত্তনৈমিত্তিক ঘটনা। বিপ্লবের প্রাক্কালে

লেনিন ও তাঁর সহকর্মীরা সশস্ত্র বিপ্লব সংগঠিত করার জন্য আত্মগোপন করে থাকতেন। সেইসময় তাঁকে ধরার জন্য শাসক গোষ্ঠীর মরিয়া চেষ্টা, তাঁকে হত্যা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যেতে থাকে শাসকগোষ্ঠী। এইরকম দুর্বিষহ রাজনৈতিক সন্ত্রাস শোষণ ও শাসনের সামনে দাঁড়িয়ে পার্টিকর্মীদের কর্তব্য কী? শ্রমিক-কৃষকদের সংগঠিত করে লেনিন কীভাবে বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তা দেখানো হয়েছে এই নাটকে। রাশিয়ার প্রেক্ষাপটে লেনিনের নেতৃত্ব এবং প্রাক্‌বিপ্লব কালে পার্টিকর্মীদের ও সাধারণ মানুষের কর্তব্যসমূহ সুন্দরভাবে নাটকে তুলে ধরা হয়েছে। দেশ ও জনগণকে সমাজতন্ত্রের শত্রুদের হাত থেকে বাঁচানোর ও মোকাবিলা করার রাস্তা দেখানো হয়েছে।

আমাদের দেশে এমারজেন্সির পটভূমিকায় রাজনৈতিক সন্ত্রাসে যখন মানুষের জীবন বিপন্ন, পার্টিকর্মীরা বিশেষত বিরোধীরা যখন দিশেহারা, স্বচকিত-স্তম্ভিত। রাজনৈতিক সন্ত্রাসে বিরোধী দলকে অবদমিত করা, প্রকাশ্যে খুন, পার্টি অফিস জ্বালিয়ে দেওয়া প্রভৃতি চলতে থাকল নির্বিচারে। বিরোধী রাজনৈতিক দল একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ে ও ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। তাদের মনোবল একেবারে তলানিতে এসে ঠেকে। দেশের এমতপরিস্থিতিতে নাট্যকার লেনিনের মতো একজনকে সন্ধান করেছেন। যে এই পার্টিকর্মীদের হৃত মনোবল ফিরিয়ে তাদেরকে সংগঠিত করতে পারে, নতুনভাবে বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ করতে পারে, যেমনটা রাশিয়ায় লেনিন করেছিল। লেনিন-এর জীবন কথা ও তাঁর কার্যকলাপ, বিপ্লবের পন্থা উৎপল দত্তকে বারে বারে অনুপ্রাণিত করেছে। তাই নিজের দেশের এই দুর্দিনে, এইরকম রাজনৈতিক ভীতির মধ্য দিয়ে তিনি বারবার লেনিন ও তাঁর জীবন কথা এবং আদর্শকে স্মরণ করেছেন। এদেশের ইতিহাসের ধ্বংসাত্মক কালসীমায় উৎপল দত্ত সন্ধান করেছেন বিপ্লবী বীরকে, যে উদ্‌ভ্রান্ত মানুষকে সঠিক পথের দিশা দেখাতে পারে।

আমরা ‘লেনিন কোথায়’ নাটকটির বিস্তারিত বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখার চেষ্টা করব, ১৯১৭-এর প্রেক্ষাপটে রাশিয়ার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রকৃত অবস্থা। এক ভয়াবহ রাজনৈতিক সন্ত্রাস, ভেঙে পড়া অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে লেনিন কীভাবে পার্টি কর্মীদের সংগঠিত করেছেন, প্রবল খাদ্যাভাবের মধ্য দিয়ে নুইয়ে পড়া শ্রমিকদের বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ করেছেন। পরিকল্পনা মাফিক একের পর এক শ্রমিক-কৃষকদের সংগঠিত করে তিনি বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন এবং অত্যাচারী সরকারের পতন ঘটিয়েছেন। জোরদার, মুনাফাবাজ, কালোবাজারির পতন ঘটিয়ে শ্রমিক-কৃষকদের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে এনেছেন। সেই সঙ্গে আমরা এটাও দেখার চেষ্টা করব এমারজেন্সির সময়ে ভারতের প্রেক্ষাপটে, কমিউনিস্ট পার্টিকর্মীদের হৃত মনোবল পুনরুদ্ধারে, তাদের পুনরায় সংঘবদ্ধ হতে এই নাটকটি কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল।

এদেশের রাজনৈতিক বিভ্রান্তির কালে লেনিন-এর আদর্শ, কর্মপন্থা কতটা এদেশের পার্টিকর্মীদের সংগঠিত করেছিল ও বিপ্লবের হদিস দিয়েছিল তা দেখার চেষ্টা করব।

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের সমসময়কালে রাশিয়ার বৃহৎ অংশে দুর্ভিক্ষ ও খাদ্যাভাব দেখা যায়। ব্যাপকহারে দেশব্যাপী মুদ্রাস্ফীতি লক্ষ করা যায় কিন্তু মজুতদারদের গুদামে খাদ্যসামগ্রী সঞ্চিত থাকে। দিকে দিকে শ্রমিকদের কর্মহারা হয়ে পড়া, অনাহারগ্রস্ত হয়ে জনজীবনে তীব্র হতাশা নেমে আসে। এইসময় দেশের প্রধানমন্ত্রী হলেন কোরেন্স্কি। তিনি পুঁজিপতিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এবং একাধিক পার্টির সমন্বয়ে সরকার গঠন করেছেন। সরকারের সর্বস্তরে চলছে ঘুষের রাজত্ব, সমাজবিরোধীদের প্রশয় দেওয়া একপ্রকার চূড়ান্ত দুর্নীতি। সুশাসনের পরিবর্তে গুণ্ডা-খুনি-তোলাবাজরাই দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সমস্ত দেশব্যাপী। প্রধানমন্ত্রী কোরেন্স্কির নেতৃত্বে সরকার জমি নীতি এমনভাবে তৈরি করেছে যাতে কৃষকদের হাতে কোনো প্রকার জমি না থাকে, সব জমির অধিকার যেন জমিদারদের দখলে থাকে। মজুতদাররা এই দুর্ভিক্ষের সময়ে গুদামে প্রচুর পরিমাণ খাদ্য সঞ্চিত করে রাখতে শুরু করে, কিন্তু এই সঞ্চিত খাদ্যসামগ্রী উদ্ধার যাতে না করা যায় তার জন্যও আইন প্রণয়ন করে। সরকারের সর্বত্রব্যাপী চলছে চরম নৈরাজ্য। এক শরিকের সঙ্গে অন্য শরিকের দ্বন্দ্ব চলছে, বিরোধ চলছে, একে অপরকে খুন করার জন্য গুণ্ডা পর্যন্ত লাগিয়ে রেখেছে। গুণ্ডা-খুনি-বদমায়েশদের দিয়ে দেশ চালানোর একটা প্রচ্ছন্ন মানসিকতা পরিলক্ষিত হয়। গুণ্ডা-খুনি-বদমায়েশরা সারা দেশব্যাপী শুধু দাপিয়ে বেড়াচ্ছে তাই নয়, পুলিশ যদি তাদের গ্রেফতার করে সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রীদের নির্দেশে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। এইসব খুনি বদমায়েশরা সবাই মন্ত্রীদের পোষ্য। শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী নিকোলাই স্কোবেলেভ ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা মন্ত্রী জেনারেল নিকোলাই আলেকসেইচ আলেকসেইয়েভ-এর কথোপকথনে নাটকের প্রথম দৃশ্যে সেই চিত্র ফুটে ওঠে—

> *স্কোবেলেভ।। ... কাল পুলিশ আমার দলের তিনজন সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে, তাদের ছেড়ে দেয়া হোক।*
>
> *কেরে।। কেন ধরেছে?*
>
> *আলেকসেইয়েভ।। গুণ্ডামি করেছিল, ধরা হয়েছে। মদ খেয়ে রাস্তার ওপর ছেনতাই করছিল।*
>
> *স্কোবে।। মিথ্যা কথা। ওরা বিশিষ্ট রাজনৈতিক কর্মী। উপদলীয় চক্রান্ত করে ওদের ধরা হয়েছে।*
>
> *আলোক।। তিনটেই দাগী বদমায়েশ। ডাকাতি করে জেল খেটেছে—। এই মন্ত্রী স্কোবেলেভ ঐসব ঘৃণ্য জীবদেহ পোষেন।*

স্কোবে।। আপনারা পুলিশকে উপদলীয় কলহে ব্যবহার করছেন। কই কেরেন্‌স্কির গুণ্ডাদের তো ধরা হয় না! ওঁর ক্রুদোভিক পার্টি শত শত মাস্তান পোষে।

কোবে।। আর একটা কথা কইলে আমি পদত্যাগ করব। তখন দেখি অপোগুণ্ডরা কি করে রাজত্ব চালান।

আউয়ের।। আস্তে। কোনো গুণ্ডাকেই এখন ধরা হবে না, সব ছাড়া হবে। বলশেভিকদের শেষ করে দেবেন বলছেন। গুণ্ডা ছাড়া কি করে করবেন? [১২১]

দেশের সর্বত্র শুধুই দুর্নীতি, খাদ্যমন্ত্রী পিয়েতর পেশেথনোভ-এর কেলেঙ্কারির জন্য দেশে খাদ্যের এই দুরবস্থা তৈরি হয়। আবার ভূমি ও রাজস্ব মন্ত্রী ভিকতর চের্ণভ আজব রকমের জমি নীতি তৈরি করেন যাতে কৃষকদের কোনোরূপ অধিকার না থাকে। কেরেন্‌স্কি সরকার যখন দেশব্যাপী সর্বত্র অর্থনৈতিক সমস্যায় জর্জরিত সেই সঙ্গে তিনি অন্য শরিক পার্টিদের অন্তঃকলহ নিয়ে জেরবার হয়ে ওঠেন। সেই সুযোগে বৃহৎ পুঁজিপতি আউয়েরবাঘ তিনিও সুযোগ বুঝে সর্বস্ব লুন্ঠন করার প্রচেষ্টা করেন। কালোবাজারি, মজুতদারি করে সর্বস্ব লুন্ঠন করার প্রয়াসে সদা-সর্বদা সচেষ্ট থাকেন। পুঁজিপতি আউয়েরবাঘ অন্যান্য মন্ত্রীদের উদ্দেশ্যে খোলামেলাভাবেই প্রচ্ছন্ন হুমকি দেন সরকার ফেলে দেওয়ার। আর সরকার পড়ে গেলে পরোক্ষভাবে ক্ষমতায় আসবে শ্রমিকরা ও তাদের নেতা লেনিন—

> *“আপনারা আমাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতায় এসেছেন। এই ক্যাবিনেটে আমরা অর্ধেক আর আপনারা নানা প্রগতিশীলরা অর্ধেক। আমাদের সঙ্গে হাত মেলালে কিছু ধকল পোয়াতেই হয়। কালোবাজার হবে, মজুতদারি হবে, ঘুষ চলবে। এটা তো আপনারা জানতেন। তবু কেন হাত মিলিয়েছেন আমাদের সঙ্গে? কারণ অন্যথায় ক্ষমতায় আসবে শ্রমিকশ্রেণী, আসবে বলশেভিকরা, আসবে লেনিন।* [১২২]

কেরেন্‌স্কি-র মন্ত্রীসভা আপদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। মন্ত্রীসভার প্রতিটি ব্যক্তি ঘুষ ব্যতীত কোনো কাজই সম্পন্ন করেন না। কয়লা থেকে শুরু করে চিনি, চাল এমনকি প্রতিরক্ষা বিষয়ক প্রত্যেকটি কাজের বরাতের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা মন্ত্রী কোনো না কোনো বিষয়ে ঘুষ খেয়ে থাকেন। কেরেন্‌স্কির ক্যাবিনেট সদস্যদের মিটিং-এ দেখা যায় প্রত্যেকটা মন্ত্রী ঘুষ নিয়ে একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকে ও দেখা যায় প্রত্যেক মন্ত্রী ঘুষের বিনিময়ে একের পর এক দুর্নীতিতে জড়িয়েছেন। ক্যাবিনেট মিটিং-এ মন্ত্রীদের নিজেদের মধ্যে যে ঘুষ খাওয়া নিয়ে অন্তঃকলহের বিষয়টি হাস্যরসাত্মক ভঙ্গিতে অতীব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন—

"স্কোবে।। চোরে চোরে এ সরকার ছেয়ে গেছে। কেউ এই আউয়েরবাখের ঘুষ খায়, কেউ বিয়াবশিন্স্কির। সব পুঁজিপতির দালাল।

কেরে।। আর বাজে কাঠ দিয়ে বন্দুকের কুঁদো তৈরি করে যুদ্ধে পাঠিয়ে রোড্‌জিয়াংকো সাহেব যে কোটিপতি হয়ে গেলেন, তাঁকে কে লাইসেন্স পাইয়ে দিল? আর লাইসেন্স্ কি সে বিনা পয়সায় পেয়েছে?

স্কোবে।। এসব ভিত্তিহীন অভিযোগও আসলে উপদলীয় চক্রান্ত। ক্ষমতা থাকে কমিশন বসান, তদন্ত করুন।

কেরে।। প্রত্যেকটা লাইসেন্স-এর পেছনে কোনো না কোনো মন্ত্রী ঘুষ খায়— ইহা ধ্রুব সত্য।

স্কোবে।। বাইরে এসে কথাটা বলুন, আমি মামলা করব। কয়লা-কেলেঙ্কারিও ফাঁস হবে। শুধু কুঁদো কেলেঙ্কারি নয়, কয়লা কেলেঙ্কারির শেষ দেখা হোক।

সেরে।। সেই সঙ্গে চিনি কেলেঙ্কারি। চিনি কল মালিকরা কাকে ঘুষ দিয়েছে বলা হোক। [১২৩]

কেরেন্স্কি সরকারের মন্ত্রীসভা বিভিন্ন কেলেঙ্কারির সঙ্গে যেমন যুক্ত তেমনি দেশটাকে লুটেপুটে খাওয়ার প্রচেষ্টা সকলের মধ্যে প্রকটভাবে পরিলক্ষিত হয়। তারা নিজেদের মধ্যে যতই অন্তঃকলহে জড়িয়ে পড়ুক না কেন তাদের প্রধানতম রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বলশেভিকদের দমন করা, তাদের কার্যকলাপ স্তব্ধ করা। বলশেভিক পার্টিকে চূর্ণ করে তাদের সর্বোচ্চ নেতা লেনিনকে খতম করা। তার জন্য তারা বলশেভিকদের পার্টি অফিসগুলো ধীরে ধীরে দখল করতে শুরু করে ও আগুন লাগিয়ে দেয়। বলশেভিক পার্টিকর্মীদের গ্রেফতার ও হত্যা শুরু হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বলশেভিক পার্টি সম্পর্কে ও তাদের সর্বময় কর্তা লেনিন সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার চালানো হয়, যাতে জনতার মনে তাদের সম্পর্কে একটা ঘৃণা জাগ্রত হয়। সেই সময়ে রাশিয়ার সঙ্গে জার্মানির যুদ্ধ চলছিল। লেনিন তাঁর নির্বাসনকালের মেয়াদ শেষ হলে তিনি জার্মানির মধ্য দিয়ে রাশিয়ায় ফিরছিলেন। সুকৌশলে সেই ঘটনাটিকে কাজে লাগায় মেনশেভিক পার্টি ও কেরেন্স্কি সরকার। রুশ শাসক গোষ্ঠী রটিয়ে দেয় লেনিন জার্মানির গুপ্তচর। তিনি জার্মান সরকারের টাকা খেয়ে রাশিয়ায় এসেছেন রাশিয়ার ভিতরে অস্থিরতা তৈরি করতে, গণ্ডগোল বাঁধাতে, রাশিয়াকে ধ্বংস করতে। যাতে রাশিয়া ও জার্মানির যুদ্ধে জার্মানি জিতে যায়। মেনশেভিকরা এই অপপ্রচার ক্রমাগত করতে থাকে যাতে জনতা এই কথাকে বিশ্বাস করে। এই অপপ্রচার করে জনতাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে এমনকি কৃষক শ্রমিকের একাংশ বিশ্বাস করতেও শুরু করে যে লেনিন ভিনদেশে টাকা খেয়ে রাশিয়ার প্রভূত ক্ষতিসাধন করছে। সপ্তম দৃশ্যের শুরুতে আমরা কৃষক-শ্রমিকদের মুখে সেই কথারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই—

গ্রামে গঞ্জে শহরের বস্তিতে লোকে গান গাইছে :

“ভিনদেশে প্রভুর টাকা খেয়ে

মায়ের বুকে ছুরি মারল কে?

লেনিন, লেনিন।

দেশমাতা বেশ্যা হলেন কার ব্যভিচারে?

গরীব দুখীর অশ্রু বেচে কার টাকা বাড়ে?

লেনিন, লেনিন। [১২৪]

ভণ্ড-মেকি দেশপ্রেমের ধুলো তুলে শাসকগোষ্ঠী জনতাকে লেনিন বিরোধী করে তোলার চেষ্টা করে। বলশেভিকদের প্রতি কৃষক-শ্রমিক মনে ঘৃণা জাগ্রত করার প্রচেষ্টা করে। দেশে যখন মুদ্রাস্ফীতি, খাদ্যাভাব, বেকারত্বের জ্বালায় যখন মানুষ দিশেহারা জীবনধারণ করতে এবং মানুষের যখন দিশেহারা অবস্থায় সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে তখন তাদের কাছে মিথ্যা প্রচার করে মানসিকভাবে বিভ্রান্ত করার প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায় তাদেরকে বলশেভিক বিরোধী, লেনিন বিরোধী করে তোলাই শাসকদলের একমাত্র উদ্দেশ্য।

শ্রমিক-কৃষককে বিভ্রান্ত করার নতুন নতুন কৌশল আবিষ্কার করে কেরেন্স্কি-র সরকার। তাদের অপদার্থতা, দুষ্কর্ম ও দুর্নীতি ঢাকতে ক্রমাগত জনসভায় মানুষের সামনে মিথ্যা প্রচার করে। কেরেন্স্কি-ক্যাবিনেটের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীরা শহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত মিছিল ও সভা করে জনতাকে বিভ্রান্ত করতে থাকেন। পুঁজিপতি আউয়েরবাখ-এর সুচতুর নির্দেশে কেরেন্স্কির মন্ত্রীরা সবাই বামপন্থী স্লোগান ব্যবহার করে জনতাকে বিভ্রান্ত করে। তৃতীয় দৃশ্যের শুরুতেই ভূমিসংস্কার মন্ত্রী মিখাইলোভিচ চের্ণভ-এর বক্তৃতার মধ্য দিয়ে জনতাকে বিভ্রান্ত করার নমুনা পাই—

আপনারা দেখছেন আজ মন্ত্রীরা পথে নেমে এসেছেন। কেন এসেছেন? মজুতদারদের গুদাম ভেঙে খাদ্য উদ্ধার ক’রে জনতার মধ্যে বিলিয়ে দেয়ার জন্য। আমাদের সরকার জনতার সরকার। জনতার স্বার্থে আমরা সংগ্রামে নেমেছি; আপনারা দলে দলে আমাদের পেছনে সমাবিষ্ট হন। চলুন যাই কালোবাজারিদের কালো হাত চেপে ধরি, গুঁড়িয়ে দিই। জনগণের সরকার জনগণের কাছে ডাক দিচ্ছে— আমাদের পাশে দাঁড়ান। [১২৫]

দেশে প্রবল খাদ্যাভাব দুর্ভিক্ষের মধ্যে কেরেন্স্কি-র মন্ত্রীপরিষদ সবাই উঠে পড়ে লাগে

দেশটাকে লুণ্ঠন করার প্রচেষ্টায় সেই সঙ্গে পুঁজিপতি আউয়েরবাখও। নিরন্ন মানুষের হাহাকার, বেকার যুবকদের হাহাকার তাদের কর্ণগোচর কোনোভাবেই হয় না। ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার মরিয়া প্রচেষ্টা তাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। তার জন্য তারা একাধিক পার্টি মিলে সরকার গঠন করে। দেশের সর্বস্ব লুণ্ঠনের পাশাপাশি কেরেন্‌স্কির মন্ত্রীসভা এক এবং অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বলশেভিক দল ও তাদের সর্বময় কর্তা লেনিনকে হত্যা করা। তার জন্য কেরেন্‌স্কির সরকার গোপনে লেনিনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে। কারণ লেনিন ছিল তাদের শোষণের পথের প্রধান বাধা। লেনিনকে ধরার জন্য সশস্ত্র পুলিশ সদাসর্বদা তাড়া করে বেড়াচ্ছে। শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী স্কোবেলেভ ও নিরাপত্তা মন্ত্রী আলেকসেভ দুজনে মিলে নানা রকম পরিকল্পনা করে লেনিনকে ধরার জন্য—

> *প্রাভ্‌দা অফিসে আমি ঢুকব আড়াইটেয়, আপনি পুলিশ নিয়ে অতর্কিতে ঢুকবেন পঁয়তাল্লিশে। ঐ পনের মিনিট আমি কথাবার্তায় লেনিনকে আটকে রাখব। দোতলার ডানদিকে প্রথম ঘর— এক ছুটে গিয়ে জাপটে ধরবেন লেনিনকে।* [১২৬]

স্কোবেলেভ ও আলেকসেভ-এর লেনিনকে ধরার সমস্ত রকম পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায় লেনিন-এর সুচারু ক্ষুরধার বুদ্ধিমত্তার কাছে। পুলিশ যখন তাদেরকে ধরার জন্য অভিযান করে তখন লেনিন ও তার ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধারা দ্রুত এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরে যান। পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে প্রতিবার লেনিনের আস্তানায় হাজির হচ্ছে এবং দেখা যায় প্রত্যেক বারেই পুলিশ আসার কিছু আগেই পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে সে আস্তানা পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে গেছেন। কখনো শহরে শ্রমিকদের বস্তিতে আবার কখনো বা গ্রামে তার বিশ্বস্ত সহকর্মীর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। কখনো এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে, কখনো এক কৃষকের ঘর থেকে অন্য শ্রমিকের বাড়িতে। এই নিরন্তর তার আস্তানা বদলানোর সময় তাঁকে বিভিন্ন রকম ছদ্মবেশ ধারণ করতে হয়। কখনো ফিলল্যান্ডের দুর্ভিক্ষ পীড়িত চাষির বেশে, কখনো লেনিনের জগৎবিখ্যাত দাড়ি কামিয়ে মুখমণ্ডলের পরিবর্তন ঘটিয়ে চেহারার আমূল পরিবর্তন ঘটাতে হয়, কখনোবা পরচুল লাগিয়ে বিভিন্ন সাজসজ্জায়, বিভিন্ন কায়দায় তাকে ঘুরে বেড়াতে হয় এক স্থান থেকে অন্য স্থানে।

অজ্ঞাতবাসের মধ্যেই লেনিন নিরলস পরিশ্রম করেই বিপ্লবী রণকৌশল সম্পর্কে নানা প্রবন্ধ লিখে চলেছেন। গোপন আস্তনা থেকে সেই রণকৌশলগুলি কমরেডদের মাধ্যমে পাঠিয়ে দিচ্ছেন তার পার্টির নেতৃত্বের কাছে। অজ্ঞাতবাসের মধ্যেই পার্টিকর্মীদের ক্রমাগত উৎসাহ দিয়ে মনোবল বাড়িয়ে যাচ্ছেন। আত্মগোপনের মধ্যেই লিখে চলেছেন 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' নামক গ্রন্থ। মেনশেভিক দল ও পুলিশের ভয়ে এক মুহূর্ত কোথাও স্থির থাকতে পারছেন না, সর্বদা একস্থান

থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করছেন, এক বিশ্বস্ত কমরেডের বাড়ি থেকে অন্য বিশ্বস্ত কমরেডের বাড়িতে। কোথাও এক বিন্দু স্থির থাকতে পারছেন না, যখনই যেখানে সময় পাচ্ছেন রাত্রি জাগরণের মধ্য দিয়ে তার গ্রন্থ লেখা সম্পন্ন করার প্রচেষ্টা করে যাচ্ছেন। প্রতিটা মুহূর্তে দলীয় সংগ্রামকে পরিচালনা করছেন। কমরেডদের কাছ থেকে বলশেভিকদের আসন্ন সংগ্রামের খবরা-খবর নিচ্ছেন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিচ্ছেন। কোনো সময়ে লড়তে হবে, কখন লড়তে হবে, কীভাবে লড়তে হবে তার প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন ক্রমাগত। সুকৌশলে দেশব্যাপী আসন্ন গণঅভ্যুত্থানের ওপরে নজর রাখছেন এবং সঠিক সময়ের অপেক্ষা করছেন যে কখন গণঅভ্যুত্থান ঘটালে সেটাকে সাফল্যমণ্ডিত করা যায়। দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ, অন্নাভাবের পটভূমিকায় কিছু মানুষ যখন যন্ত্রণায় ক্ষেপে উঠেছে শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে, তখন বলশেভিক পার্টির বিশ্বস্ত কমরেড সের্গে আলিলুইয়েভ লেনিনকে সংগ্রাম শুরু করার প্রস্তাব দেন, কিন্তু লেনিন তার কথায় বিচলিত না হয়ে তাকে সংগ্রাম শুরু করার সময়, সংগ্রামের গুরুত্ব সম্পর্কে অসাধারণভাবে মতামত ব্যক্ত করেন—

> *সের্গে।। প্রস্তুতি শেষ হবে কবে? আর কতকাল কাপুরুষের মতন আমরা গর্তে সেঁধিয়ে থাকব? ... সমস্ত লোক ক্ষেপে উঠেছে। এই তো মার শুরু করার সময়।*
>
> *লেনিন।। লোক ক্ষেপে উঠলেই লড়াই জেতা যায়? কে বলেছে আপনাকে?*
>
> *সের্গে।। বেশিরভাগ লোক চাইছে লড়াই।*
>
> *লেনিন।। বেশিরভাগ চাইলেই লড়াই জেতা যায় না। কত লোক এল দেখতে হবে, তারপর দেখতে হবে শত্রুর চেয়ে আমাদের শক্তি বেশি কিনা। শক্তিই বড় কথা। যত বিপ্লব পৃথিবীতে হয়েছে প্রত্যেক ক্ষেত্রে বিপুল জনতাকে পরাজিত করেছে মুষ্টিমেয় শোষক। সঠিক?*
>
> *সের্গে।। হ্যাঁ।*
>
> *লেনিন।। কিসের জোরে? সংগঠন, প্রচার, অস্ত্র। অস্ত্র সংগ্রহ, অস্ত্র শিক্ষা, সশস্ত্র বাহিনী গঠন সেটাই এখন কাজ। আমরা এখনো জনতাকেই পুরো পাইনি। শক্তি তো পরের কথা।*
>
> *সের্গে।। জনতাকে পাইনি? খাদ্যের জন্য তারা মরীয়া হয়ে উঠেছে—*
>
> *লেনিন।। খাদ্য পেলেই তারা কি মাথা নিচু করবে না? ক্ষুধার চোটে রেগে উঠেছে বলেই কি বিপ্লব সমাধা করার মতন প্রতিজ্ঞা তাদরে এসেছে? খাদ্যের নয়, বিপ্লবের ডাকে ক'জন আসবে? সেনাবাহিনীর মধ্যে আমাদের শক্তি কী? নাকি ক'জন বলশেভিক আছেন? কৃষকদের মধ্যে কতটুকু শক্তি আমাদের? বলশেভিক শ্রমিক ফৌজের হাতে অস্ত্র কত? সোভিয়েতেই এখনো আমরা*

সংখ্যাগরিষ্ঠ হইনি। [১২৭]

গণঅভ্যুত্থানের প্রস্তুতি লেনিন খুবই ধীর ও সন্তর্পণে দীর্ঘ সময় ধরে নেন। তিনি মনে করেন জনতার বৃহত্তম অংশকে প্রথমে কাছে টেনে তাদেরকে বিপ্লব সম্পর্কে সচেতন ও উদ্দীপ্ত করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করান। শ্রমিক মজুর কৃষকের বৃহত্তম অংশ দলের অন্তর্ভুক্তি না ঘটানো পর্যন্ত সঠিক বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের পরিস্থিতি তৈরি হয় না বলে তিনি মনে করেন। বিপ্লবের জন্য তিনি পাঁচজন সদস্যের নাম ঘোষণা করেন। এঁরা হলেন স্তালিন, বুবনোভ, জেরজিনস্কি, সোয়ের্দলোভ এবং উরিতস্কি এই পাঁচজনকে অভ্যুত্থানের নেতা ঘোষণা করেন। এরাই সুকৌশলে গণঅভ্যুত্থানকে পরিচালনা করবেন এমন নির্দেশও তিনি দেন। লেনিন মনে করেন সশস্ত্র অভ্যুত্থান ছাড়া বিপ্লব সম্ভব নয়। বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সঠিক সময় কোনটা, কীভাবে, কখন, কী উপায়ে বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে তা নিয়ে লেনিন দলের উদ্দেশ্যে আটটি শর্ত মানার নির্দেশ দেন। তিনি মনে করেন এই শর্তগুলি কমরেডরা সঠিকভাবে যদি মেনে চলেন তাহলে এই অভ্যুত্থান সঠিক পথেই এগোবে, নইলে শুধুমাত্র ব্যর্থ খুনোখুনিতে পর্যবসিত হবে। এই আটটি শর্ত হল—

> *প্রথম, অভ্যুত্থানের নেতৃত্বে থাকবে শ্রমিকশ্রেণি, বাস্তবে কথার নয়। অর্থাৎ পার্টি হবে সম্পূর্ণত শ্রমিকের পার্টি। দ্বিতীয়, অভ্যুত্থান ঘটবে এমন সময়ে যখন জনতার আন্দোলনে একটা জোয়ার ডেকেছে। তৃতীয়, যখন জনতার সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন আমরা পেয়ে গেছি। চতুর্থ, সর্বপ্রকার আপসপন্থী পার্টির যখন নৈতিক পরাজয় ঘটে গেছে। পঞ্চম, শত্রুর সেনা ও পুলিশ বাহিনীর মধ্যে যখন আমাদের প্রভাব ছড়িয়েছে। ষষ্ঠ, আমাদের স্লোগানগুলি যখন লোকের মুখে মুখে ফিরছে। সপ্তম, কৃষকদের একটা বৃহৎ অংশের সমর্থন যখন আমরা পেয়ে গেছি। অষ্টম, যখন অর্থনৈতিক অবস্থা এমন তীব্র আকার ধারণ করেছে যে, জনতার মধ্যে শান্তিপূর্ণ উত্তরণের মোহটা আর নেই।* [১২৮]

বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান শুরু করার আটটি শর্ত, যা লেনিন নির্ধারিত, সেই আটটি শর্ত যথাযথভাবে পালিত হলে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান শুরু করা যেতে পারে। তার মধ্য দিয়েই কাঙ্ক্ষিত সফলতায় পৌঁছানো সম্ভবপর হয়ে উঠবে। শর্তগুলি মেনে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান শুরু হলে আর থামা নেই, বিরতি নেই। লেনিনের মতে আত্মরক্ষা হচ্ছে অভ্যুত্থানের মৃত্যু। অভ্যুত্থান মানে ক্রমাগত আক্রমণ, আবার আক্রমণ, পরপর আক্রমণ। বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান শুরু হওয়ার পর আন্দোলন কোন পথে যাবে, কীভাবে এগোবে, কার নেতৃত্বে কীভাবে, কখন, কোন সময়ে কী কৌশলে আক্রমণ এগোবে তার একটা নকশা লেনিন অঙ্কন করেন দলীয় কর্মী ও বিপ্লবীদের উদ্দেশ্যে—

> *শত্রুকে দাঁড়াতে দেয়া চলবে না। প্রতিদিন প্রতি ঘণ্টায় ছোট ছোট সাফল্য অর্জন করতে হবে।*

বিপ্লবী বাহিনীর সদর দপ্তর গড়তে হবে, সঠিক জায়গাগুলিতে বাহিনীকে মোতায়েন করতে হবে, প্রথমেই টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন এক্‌স্‌চেঞ্জগুলি যুগপৎ আক্রমণে দখল করতে হবে, প্রত্যেকটি রেলস্টেশন দখল করতে হবে, পুলিশের সদর দপ্তর, থানা, সরকারি ভবন সব আক্রমণ ও দখল করতে হবে। সর্বোপরি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আসল উদ্দেশ্য গোপন রাখতে হবে, যাতে আমাদের আক্রমণ হয় অতর্কিত এবং অপ্রত্যাশিত। [১২৯]

রাশিয়ার বৈপ্লবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হল, শোষিত, নিপীড়িত, নির্যাতিত শ্রমিক কৃষক মজদুর শ্রেণি একত্রে বলশেভিক দলের নেতৃত্বে অত্যাচারী কেরেন্‌স্কি সরকারের বিরুদ্ধে বিপ্লবে শামিল হল। বলশেভিকরা জনতার বৃহৎ অংশকে নিজেদের দিকে নিয়ে এল, অত্যাচারী জনবিরোধী কেরেন্‌স্কি সরকারকে পুরোপুরি জনবিচ্ছিন্ন করে ফেলল। লেনিনের সুতীক্ষ্ণ ধারালো বুদ্ধির দ্বারা সেনা পুলিশ বাহিনীর মধ্যেও বলশেভিকরা ক্রমাগত প্রভাব বিস্তার করে তাদের বেশিরভাগ অংশকে নিজেদের দলে টানতে সক্ষম হল। খাদ্যাভাব অত্যাচার থেকে জনতার রোষ, সেই রোষ ধীরে ধীরে আন্দোলনে পরিণত হল এবং গণঅভ্যুত্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুত হতে থাকত ধীরে ধীরে। শেষে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরা অত্যাচারিত-শোষিত জনতাকে সঙ্গে নিয়ে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করল। পুঁজিপতিদের নিঃশেষ করে বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠিত হল।–

কমরেড্‌স, যে শ্রমিক কৃষক বিপ্লবের কথা আমরা বলছিলাম তা সম্পন্ন হয়েছে, এই বিপ্লবের তাৎপর্য কী? তাৎপর্য এই– আজ থেকে সোভিয়েতেই হল সরকার যে সরকারে পুঁজিপতিদের বিন্দুমাত্র স্থান নেই। নিযার্তিত জনতা নিজেদের রাজনৈতিক শক্তি গড়ে তুলবে। পুরাতন রাষ্ট্রযন্ত্রকে ভিৎশুদ্ধ উপড়ে ফেলা হবে এবং সোভিয়েতগুলির মাধ্যমে নূতন রাষ্ট্রযন্ত্র গড়ে তোলা হবে। এবার আমরা... রাশিয়ায় সর্বহারার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনের কাজ আরম্ভ করব। বিশ্বসমাজতান্ত্রিক বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক! [১৩০]

উৎপল দত্ত এদেশের রাজনৈতিক বিভ্রান্তির কালে লেনিন কোথায় নাটকটি প্রযোজনা করেন। নাটকটি রাজনৈতিক সন্ত্রাস, রাষ্ট্রীয় অত্যাচারের সময়কালে জনগণের বিপ্লবের সঠিক দিশা দেখিয়েছে। তার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবকালে মানুষের ভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং মধ্যবিত্তের দোলাচল মানসিকতার গণ্ডি অতিক্রম করার পথ প্রদর্শক হয়ে উঠেছে। নাট্যকার উৎপল দত্ত বিপ্লবী কর্মে যে বিপদ আসতে পারে এবং তা থেকে উত্তরণের পথও নির্দেশ তিনি করেছেন। বিপ্লবের হুজুক নয় সঠিক পথে সঠিক সময়ে বিপ্লবের অভ্রান্ত পথ নির্দেশ রচিত হয় নাটকটিতে। বিপ্লবীদের গণঅভ্যুত্থানের যে আটটি কার্যক্রম উপস্থিত করেন, তা নাটক ছাড়িয়ে সব দেশের সব বিপ্লবী কর্মীর অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হয়ে ওঠে।

একলা চলো রে

প্রথম অভিনয় : ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৮৯

প্রথম প্রকাশ : আজকাল পত্রিকা [শারদীয়], ১৩৯৭

মহাত্মা গান্ধির জীবনের শেষ আট মাস সময়কালকে অবলম্বন করে আলোচ্য নাটকটি রচিত। গান্ধি ও গান্ধিবাদের দ্বন্দ্ব, দেশভাগ, স্বাধীনতাপ্রাপ্তি, গান্ধিহত্যা প্রভৃতি ঘটনা বৃত্তান্ত ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এইসব রাজনৈতিক ঘটনা বৃত্তান্তকে নিয়ে উৎপল দত্ত লিখলেন 'একলা চলো রে' নাটকটি। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়। এই স্বাধীনতা এলো বাংলা এবং পাঞ্জাবকে দ্বিখণ্ডিত করে। দেশ বিভাগের মূল কারণ হিসেবে যে সিদ্ধান্তগুলি ছিল, সেই সিদ্ধান্তগুলিকে তিনি অসাধারণ কৌশলের মধ্য দিয়ে তুলে ধরলেন নাটকের মধ্য দিয়ে। পাশাপাশি সেগুলোর অন্তর্তদন্ত করতে প্রবৃত্ত হলেন উৎপল দত্ত। দেশ বিভাগ কেন হয়েছিল, কারা কীভাবে চক্রান্ত করে দেশটাকে ভাগ করেছিল, এতে কাদের স্বার্থ সিদ্ধ হয়েছিল বা কাদের স্বার্থ লঙ্ঘিত হয়েছিল, কারা বা দেশভাগের বিরোধিতা করেছিল এইসব রাজনৈতিক প্রশ্নের সন্ধানে উৎপল দত্ত ব্রতী হলেন। বাংলা তথা দেশভাগের নেপথ্যে যে রাজনৈতিক কারণগুলি নিহিত ছিল সেগুলিকে উৎপল দত্ত থিয়েটারের মধ্য দিয়ে জনগণকে জানানো ও প্রকাশ্যে আনা কর্তব্য বলে মনে করলেন। অর্থাৎ দেশ বিভাগের রাজনৈতিক সত্য উদ্‌ঘাটন করার প্রয়াস করলেন উৎপল দত্ত। এই প্রক্রিয়ারই ফসল তাঁর 'একলা চলো রে' নাটকটি।

'একলা চলো রে' নাটকে একের পর এক দৃশ্যে তৎকালীন রাজনৈতিক ইতিহাসের এক একটি খণ্ড হাজির হয়েছে এবং সেগুলি বিভিন্ন দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে। পিপলস লিটল থিয়েটার 'একলা চলো রে' নাটকটি প্রযোজনার সময় যে পুস্তিকা প্রকাশ করেছিল তাতে উৎপল দত্ত স্পষ্ট ভাষায় লিখেছিলেন—

> *নাটকটি দেশ বিভাগ ও গান্ধি হত্যার অনুদ্‌ঘাটিত ইতিহাস এবং এই নাটকে বর্ণিত অধিকাংশ ঘটনা ও সংলাপ ঐতিহাসিক।* [১৩১]

নাটকটিতে ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক ক্রান্তিকালের সময়কে তুলে ধরা হয়েছে, সেই ক্রান্তিকাল স্বাধীনতার পরবর্তী সময় ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রাণপুরুষ গান্ধিজিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছিল। ভারতীয় ইতিহাসে গান্ধিজির জীবনদর্শন ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ব্যাপক গুরুত্ব বহন করে। গান্ধিজির জীবনের শেষ লগ্নে এসে তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র ও রাজনৈতিক ইতিহাসে

তার গুরুত্ব প্রভৃতি 'একলা চলো রে' নাটকে উৎপল দত্ত ইতিহাসের সেই অধ্যায়কে উন্মোচিত করেছেন। এখানে গান্ধিজির সমগ্র জীবন ও কর্মের বিস্তৃত পরিচয় বর্ণিত হয়নি, শুধুমাত্র দেশভাগ ও ক্ষমতা লাভের জন্য যে গভীর ষড়যন্ত্র, তৎকালীন কংগ্রেসি নেতাদের ভূমিকা এবং গান্ধি হত্যার নেপথ্যে প্রকৃত কাহিনিটি উৎপল দত্ত এই নাটকে প্রকাশ করেছেন।

নাটকের ঘটনা ঘটেছে তিনটি জায়গায়— বাংলার নন্দীগ্রাম, দিল্লি এবং মুম্বাই-এ। নাটকের প্রথম দৃশ্যে দেখা যায় দেশ বিভাগের পূর্ববর্তী বাংলার নন্দীগ্রাম। প্রবীণ গান্ধিবাদী কংগ্রেসি নেতা অনাথবন্ধু চক্রবর্তী ও তার দুই ছেলে সন্তোষ ও প্রিয়তোষ। সন্তোষ ও প্রিয়তোষ ব্রিটিশ বিরোধী লড়াই-এ শামিল হয়ে ম্যাজিস্ট্রেট ডানকান সাহেবকে গুলি করে হত্যা করেছিল নন্দীগ্রাম স্টেশনে। বিচারে সন্তোষের ফাঁসি হয়, প্রিয়তোষকে আন্দামান জেলে পাঠানো হয়। অনাথবন্ধু তার ছেলের ফাঁসি রোধ করবার জন্য মহাত্মা গান্ধিকে অনুরোধ করেন, ব্রিটিশ সরকারের কাছে আবেদন জানাতে। কিন্তু গান্ধিজি সেই আবেদন করতে অস্বীকার করেন কারণ—

> *গুলি চালিয়ে যে মানুষ মেরেছে তার জন্য আবেদন জানালে গান্ধীজির সারা জীবনের অহিংসা নীতির অবমাননা হত। ... গান্ধীজি ওঁদের দেশপ্রেমকে স্বীকার করেন, পথটাকে নয়।* [১৩২]

এদিকে প্রিয়তোষ ষোলো বছর আন্দামান জেলে থেকে বাড়ি ফিরে এসেছে। আন্দামান জেলে থাকাকালীন সে বাংলার বিপ্লবীদের সংস্পর্শে কমিউনিস্ট ভাবধারায় দীক্ষিত হয়েছে। ইতিমধ্যে বাংলায় শুরু হয়েছে তেভাগা আন্দোলন। জমিদার শ্রেণির স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়ায় অঘোর রায়ের মতো জমিদাররা স্বভাবতই ক্ষিপ্ত হয়ে আন্দোলনকে পিষে মারার প্রচেষ্টা করতে থাকে।

দ্বিতীয় দৃশ্যের পটভূমিতে দেখতে পাই ১৯৪৭ সালের ২ রা জুন দিল্লির ভাইস রিগাল প্রাসাদের দরবার কক্ষ, সেখানে বসে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ও তার স্ত্রী এডুইনা ভারতের সামগ্রিক রাজনীতি নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত আছেন। এখানে বসেই মাউন্টব্যাটেন ভারতকে দ্বি-খণ্ডিত করার নীল নকশা তৈরি করেন। এতদিন ভারতবর্ষকে তারা বাহুবলে শাসন করে এসেছিল। কিন্তু এখন তারা বুঝতে পারে আর বাহুবলে তাদেরকে নিজেদের অধীনে রাখা সম্ভবপর নয়। লর্ড মাউন্টব্যাটেন নতুন পরিকল্পনা করেন। সেই পরিকল্পনা হল অখণ্ড ভারতবর্ষকে ভেঙে টুকরো করে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান-এ পরিণত করা। দেশটাকে দুটো অংশে বিভক্ত করে দেশের সামগ্রিক কাঠামোকে দুর্বল করাই যার প্রধান উদ্দেশ্য।–

> *লেডি।। ...তা তোমার প্ল্যানটা কী? কী যাদুমন্ত্রে ওরা সব সুবোধ বালকের মতন তোমার প্ল্যানটা মেনে নেবে।*
>
> *মাউন্ট।। পার্টিশান। হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান। দুই অংশে দেশটাকে ভাগ করতে হবে।* [১৩৩]

ব্রিটিশ বড়োলাট মাউন্টব্যাটেন এদেশ থেকে চলে যাওয়ার আগে সুকৌশলে ধর্মের ভিত্তিতে দেশটাকে দুভাগ করার প্রচেষ্টা করতে থাকে। জহরলাল নেহেরু, বল্লভভাই প্যাটেল প্রভৃতি কংগ্রেসি নেতারা এবং মহম্মদ আলি জিন্না প্রমুখ মুসলিম লিগের নেতৃবৃন্দ নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি করার উদ্দেশ্যে, ক্ষমতা লোভের ঐকান্তিক আগ্রহ ও লোভে দেশ বিভাগকে মেনে নিয়েছিলেন।

ভাইস রিগাল প্রাসাদের দরবার কক্ষে একে একে উপস্থিত হন বল্লভভাই প্যাটেল, জহরলাল নেহেরু, আলি জিন্না। কংগ্রেসের সম্মুখ সারির দুই নেতা এবং মুসলিম লিগের প্রধানের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়। সাম্প্রদায়িকতা, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয় নিয়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ ও দ্বন্দ্ব প্রকট হতে থাকে। আলি জিন্না কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, ইংরেজরা ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার পর কংগ্রেসরা মুসলিম লিগকে কোণঠাসা করবে, মুসলিমদের নির্বিচারে খুন করবে। জিন্না একের পর এক অভিযোগ করতে থাকেন লর্ড মাউন্টব্যাটেনের কাছে। কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও প্যাটেল ও নেহেরু অভিযোগ করতে থাকেন মুসলিম লিগের বিরুদ্ধে, তাদের অভিযোগ স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে সমস্ত অশান্তি ও গণ্ডগোলের মূলে মুসলিম লিগ, অর্থনীতির বিষয়েও মুসলিম লিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন যে, অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থমন্ত্রী মুসলিম লিগের লিয়াকৎ আলি খাঁ— যে বাজেট তৈরি করেছেন যেটা একেবারেই অসম্ভব ও অবাস্তব বাজেট বলে দাবি করেন।–

জিন্না।। আমার প্রশ্ন সোজা মিস্টার নেহেরুর কাছে। আপনি জেনারেল ওয়েভেলের সামনে কথা দিয়েছিলেন— কেন্দ্রে ঐক্যবদ্ধ সরকার মেনে নেবেন, মুসলিম-প্রধান প্রদেশে আমাদের মন্ত্রীসভা হবে, হিন্দুপ্রধান প্রদেশে কংগ্রেসের। আপনারা মেনে নিলেন এই প্রস্তাব। আপনার সই আছে সেই প্রস্তাবের ওপর। লর্ড মাউন্টব্যাটেন দেখতে পারেন সেই কাগজ। তার পরের দিন এই সইয়ের কালি শুকোবার আগে ২৪ শে জুলাই ১৯৪৬, বোম্বাইতে গিয়ে কেন বললেন, কংগ্রেস কোন শর্তই মানে না? আমি পাকিস্তানের দাবি ছেড়ে দিয়েছিলাম এর কথায়। তারপর ইনি বেইমানি করলেন।

মাউন্ট।। মিস্টার জিন্না, আজকে আমরা যা আলোচনা করার জন্য—

জিন্না।। এইরকম নীতিহীন মিথ্যাশ্রয়ী লোকের সঙ্গে মুসলিম লীগ কোন কিছুই আলোচনা করতে চায় না। আপনারা ইংরেজরা এখনো এদেশে উপস্থিত আছেন, এখনই এরা আপনাদের সামনেই এমনভাবে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করছে। আপনারা চলে যাবার পর এরা মুসলিম লীগকে কিভাবে ঘায়েল করবে বুঝতে পারছেন না? মুসলিমরা নির্বিচারে খুন হবেন!

নেহেরু ।। খুনের ব্যাপারে মুসলিম লীগের কাছে কংগ্রেস শিশু।

প্যাটেল।। কংগ্রেসের কাছে হিন্দু-মুসলিমে কোনো ভেদাভেদ নেই। কংগ্রেস যেখানে সরকার চালায় সেখানে দাঙ্গা হয় না।

জিন্না। বিহারে কি বর্তমানে মুসলিম লীগের মন্ত্রীসভা রয়েছে? কংগ্রেসের যিনি ডিরেক্টর সেই মিস্টার গান্ধী বলেছেন : বিহারে মুসলিম মহিলাদের গণধর্ষণ করা হচ্ছে! এবং বিহার কংগ্রেসের নেতারা প্রত্যক্ষভাবে এই অত্যাচার পরিচালনা করেছেন।

নেহেরু।। ইওর এক্সেলেসি, মিস্টার জিন্না প্রতি মিটিঙে একই কথা বলে যান, কোনো উত্তরে তিনি কর্ণপাত করেন না।

জিন্না।। আজ পর্যন্ত আমার কোনো প্রশ্নের উত্তর আপনি দিতে পেরেছেন?

প্যাটেল।। অন্তর্বর্তী সরকারের কাজ অচল করে দিয়েছে মুসলিম লীগ। আপনার সহযোগী নবাবজাদা লিয়াকৎ আলি খাঁ অর্থমন্ত্রীর পদটি দখল ক'রে বসে আছেন, এবং টাকা বন্ধ করে সরকারকে পঙ্গু করে দিচ্ছেন প্রত্যেক ক্ষেত্রে। [১৩৪]

এভাবেই তর্ক বিতর্ক চলতে থাকে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের মধ্যে। মুসলিম লিগ কংগ্রেসকে যেমন দোষারোপ করেন বা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান তেমনি, কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও মুসলিম লিগের বিরুদ্ধে পালটা অভিযোগ জানানো হয়। তর্ক-বিতর্ক-অভিযোগ-পালটা অভিযোগ এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছায় যে সেখান থেকে আর কোনো সমাধানসূত্র বেরিয়ে আসার সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে যায়। এমতাবস্থায় অন্য উপায়ান্তর না থাকায় পাকিস্তানের দাবি ওঠে ও ভারতকে ভেঙে দুইভাগে বিভক্ত করা হয়—

জিন্না।। পাকিস্তান আমার সর্বনিম্ন দাবী। সেটা যদি আমরা না পাই, তবে আবার ডাইরেক্ট অ্যাকশন শুরু করব। সেটা ঠেকাতে পারবেন?...

মাউন্ট।। ব্রিটিশ সরকারও সিদ্ধান্তে এসেছেন— ভারতবিভাগ ছাড়া কোনো পথ নেই। [১৩৫]

এই পরিস্থিতিতে যখন দুই পক্ষ ভারত বিভাগে আগ্রহী তখন দুই তরফেরই পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছেন এক বিচিত্র রহস্যময় ফকির মহাত্মা গান্ধি। দুই পক্ষই বুঝেছিল দেশ বিভাগ হবে কি হবে না, তা নির্ভর করছে ঐ রহস্যময় ফকিরের ওপরে। ঐ একটা লোকই পারে যা মুসলিম লিগ ও কংগ্রেসের ষড়যন্ত্র ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে দেশব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধের সংগ্রাম সই করে দিতে। দেশবিভাগ সম্পর্কে গান্ধিজির মতামত জানতে চাওয়া হল, কিন্তু গান্ধিজি তাঁর কোনো মতামত জানালেন না। কারণ সেদিন ছিল সোমবার—

আজ সোমবার, আমার মৌন দিবস, এই দিনে আমি কথা বলি না। [১৩৬]

এই কথাগুলি একটি কাগজের টুকরোতে লিখে দেশের এক গুরুত্বপূর্ণ সংকটের পরিস্থিতি এড়িয়ে গেলেন। ফলে দেশভাগ অনিবার্য হয়ে পড়ল। স্বাধীন ভারত দ্বি-খণ্ডিত হল। একটি পাকিস্তান, একটি হিন্দুস্থান। হিন্দুস্থানের প্রধানমন্ত্রী হলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হলেন মহম্মদ আলি জিন্না। হিন্দুস্থানের স্বরাষ্টমন্ত্রী হলেন সরদার বল্লভভাই প্যাটেল।

সদ্য বিভক্ত সমগ্র ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান জুড়ে দাঙ্গা শুরু হয় এবং তা ক্রমে ক্রমে ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। হিন্দুরা মুসলিমদের হত্যা করছে নির্বিচারে আবার অপরপক্ষে মুসলিমরাও হিন্দুদের হত্যা করছে। হিন্দু মুসলিমদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে তাদের সমূলে উচ্ছেদ করছে অপরপক্ষ যেখানে মুসলিম অধ্যুষিত সেখান থেকে হিন্দুদেরও একই রকমভাবে সমূলে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। রক্তের বন্যা বইছে পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান জুড়ে। চারিদিকে লেলিহান অগ্নিশিখা, চিৎকার, আর্তনাদ, ছোটাছুটি, মৃত্যুর যন্ত্রণায় আকাশ-বাতাস কম্পিত। হিন্দু-মুসলিম পরস্পরকে হত্যার উন্মাদনায় অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত। এমতবস্থায় ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে গান্ধিবাদী যেসব কংগ্রেসকর্মী এই ভয়ংকর সর্বগ্রাসী দাঙ্গার বিরোধিতা করছেন তাদেরকে কংগ্রেস থেকে পদচ্যুত অথবা বহিষ্কৃত করা হচ্ছে। এই ভয়ংকর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে মাউন্টব্যাটেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ বাক্য পাঠ করালেন।

মৌন থেকে গান্ধিজি চোখের সামনে দেশভাগ হতে দেখলেন, তিনি হয়তো সেদিন মুখ খুললে দেশভাগটা আটকানো যেত, তা তিনি করলেন না। এই আত্মসমালোচনা তাঁকে অনবরত দগ্ধ করেছে, যখন তিনি দেখলেন হিন্দুস্থান এবং পাকিস্তান জুড়ে রক্তের বন্যা বইছে। দেশের এইরূপ ভয়ানক পরিস্থিতি দেখে তিনি স্থির থাকতে পারলেন না। ভারতবর্ষের অত্যাচারিত নিপীড়ত মুসলিমদের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি ভারতবর্ষের স্বরাষ্টমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে চিঠি লিখে তাঁর নিজস্ব মতামত ও আগামী সিদ্ধান্তের কথা সরাসরি জানালে—

> *আমি স্থির করেছি দিল্লিতে মুসলিমদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার দাবীতে এবং পাকিস্তানের ন্যায্য প্রাপ্য টাকা ফেরৎ দেয়ার দাবীতে আমি আজ ১৩ই জানুয়ারী ১৯৪৮, সকাল দশটা থেকে অনশন শুরু করছি। এ-খবর তোমাকে কাল দিয়েছি, আজ লিখিতভাবে জানালাম।* [১৩৭]

গান্ধিজি যখন শুনলেন পাকিস্তান থেকে মহম্মদ আলি জিন্না চিঠি মারফত জানিয়েছেন—

> *গান্ধী সারা ভারতের মুসলিমদের একমাত্র সহায় ও সম্বল। তিনি যদি করাচি আসেন তবে আমি কৃতার্থচিত্তে তাঁর সঙ্গে আলোচনায় বসব।* [১৩৮]

জিন্নার প্রস্তাবে গান্ধিজি অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ও আলোচনায় বসতে উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠেন। জিন্নার সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ও কংগ্রেসিরা দেশবিভাগের যে চক্রান্ত করেছিল সেই চক্রান্তকে তিনি ব্যর্থ করে দিতে চান—

আমি যাব হেঁটে। বিদ্ধস্ত পাঞ্জাবের মধ্য দিয়ে পদযাত্রা ক'রে যাব জিন্নাভাই-এর কাছে। তাঁর হাত চেপে ধরব। দুনিয়া দেখবে কি করে দুই বৃদ্ধ পশুশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। সব আবার গড়ব, গোড়া থেকে গড়ব।... মাউন্টব্যাটেনের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ ক'রে দেব আমি আর জিন্না। [১৩৯]

দেশবিভাগ হতে দিয়ে গান্ধি তার জাতকর্মের জন্য নিজেকে আত্মধিক্কারে অনবরত জর্জরিত করছেন, সেই সঙ্গে নিজের ভুল সংশোধনের জন্য ও রাজনৈতিক প্রায়শ্চিত্তের জন্য তিনি কঠোর সংগ্রামে ব্রতী হতে চাইছেন। তাঁর এই আপসহীন কঠোর সংগ্রামের পরিকল্পনায় লর্ড মাউন্টব্যাটেনসহ বল্লভভাই প্যাটেলরা শঙ্কিত হয়ে পড়েন। মাউন্টব্যাটেন গান্ধিকে তাঁর অনশনের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে বলেন, কিন্তু গান্ধি তাতে কর্ণপাত না করে আরও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠেন—

আর আপোস নেই। প্রাণপণ শক্তি নিয়ে আমি আপনাদের বিরুদ্ধে লড়ব। চেষ্টা ক'রে দেখব ভুল শোধরানো যায় কিনা। [১৪০]

বাংলার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহ পরিস্থিতিতে গান্ধিজি একক পদযাত্রায় বিচ্ছিন্ন বিভেদকামী মানুষের মনে সাহস ও বিশ্বাস এনে দিতে চেয়েছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের ক্ষমতা লাভ ও ক্ষমতার অপব্যবহার তাদের নীতি-নৈতিকতা কোনোভাবেই গান্ধিজি মানতে পারেননি। তিনি মনেপ্রাণে সর্বদা চাইতেন ভারতের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, মৈত্রীর বন্ধন। তিনি যখন দেখলেন সেই সম্প্রীতি বিঘ্নিত হচ্ছে তিনি পদযাত্রা করবেন বলে স্থির করলেন। কংগ্রেস নেতৃত্ববৃন্দের আশঙ্কিত হওয়ার কারণ গান্ধিজি যদি আবার পথে নামেন এবং তার নিজস্ব মতামত জানান তাহলে সমগ্র বিশ্বের কাছে এই নতুন কংগ্রেসি সরকারের অপকীর্তি প্রকাশিত হবে। কংগ্রেসের কিছু ব্যক্তি ব্রিটিশের সঙ্গে চক্রান্ত করে শুধুমাত্র ক্ষমতা প্রাপ্তির জন্যই দেশভাগ মেনে নিয়েছিল এই বার্তা পৌঁছে যাবে পৃথিবীর কোণে কোণে। গান্ধিজির এই পদক্ষেপ কংগ্রেসের কাছে যে কতটা ভয়ংকর ও বিপজ্জনক হয়ে উঠতে চলেছে তা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। তাই ফলস্বরূপ গান্ধি হত্যার পরিকল্পনা।

সদ্য বিভক্ত ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল গান্ধির কুটিরে এসে সাক্ষাৎ করেন ও তাঁর অনশনের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার আবেদন জানান। গান্ধিজি পাঞ্জাব প্রদেশের

ওপর দিয়ে সুদীর্ঘ পদযাত্রায় মহম্মদ আলি জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাওয়ার পরিকল্পনা করলে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল তাঁর চরম বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন— সদ্যোজাত ভারতবর্ষ নানা রকম সমস্যায় জর্জরিত, আবার ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে অনবরত যুদ্ধ চলছে, এমতাবস্থায় গান্ধিজি যদি জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান, সেটা হবে দেশদ্রোহিতার শামিল—

প্যাটেল।। আপনি আবার অনশন করছেন?

গান্ধী।। হ্যাঁ।

প্যাটেল।। আমাদের সদ্যোজাত রাষ্ট্র নানা সমস্যায় জর্জরিত। তার মধ্যে আপনার এই আচরণ পেছন থেকে আমাদেরকে ছুরিকাঘাতের সামিল। [১৪১]

এমনকি গান্ধিজি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলে ভারতের স্বরাষ্টমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল তাঁকে ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করার কথাও বলেন। কোনো হুমকি, কোনা বাধা, কোনো নিষেধে গান্ধিজি দমবার পাত্র নন। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের গ্রেপ্তারের কথায় তিনি আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠেন নিজের কর্তব্যে আরও অবিচল থাকার সংকল্প গ্রহণ করেন। প্যাটেল এবং গান্ধিজির মধ্যে বাদানুবাদ চরমে পৌঁছে যায়, গান্ধিজি একের পর এক ক্ষমতা লোলুপ কংগ্রেসের মুখোশ খুলে ফেলতে থাকেন ও তাদের আসল স্বরূপ উন্মোচন করেন ও কংগ্রেসকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করতে থাকেন। যে পার্টিটাকে তিনি এতদিন ধরে লালিত-পালিত করেছেন সেই পার্টির সদস্যদের নির্লজ্জতা, ক্ষমতার অপব্যবহার, স্বেচ্ছাচারিতা কোনোভাবেই তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না। তিনি কংগ্রেসকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করতে থাকেন—

কংগ্রেস পার্টি যে ক্ষমতার স্বাদ পাওয়ামাত্র এরকম হিংস্র, স্বৈরাচারী, বিশ্বাসঘাতক এবং চোর হয়ে উঠবে, তা আমি ভাবতে পারিনি কখনো। জীবনে গান্ধীর যতগুলি পরাজয় ঘটেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে লজ্জাকর হচ্ছে কংগ্রেস নামক সংগঠনটা। চোরের আড্ডা বা মস্তানদের ভাঁটিখানা হয়ে উঠলো স্বাধীনতা-সংগ্রামের একমাত্র সংগঠনটি? [১৪২]

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গান্ধিজি একরকম যুদ্ধ ঘোষণা করেন। পার্টিটাকে আবার গোড়া থেকে গড়ে তোলার সংকল্প গ্রহণ করেন। কংগ্রেসের অত্যাচার ও মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি দাঁড়ালেন ও উদৃপ্ত কণ্ঠে তাঁর অবস্থানের কথা জানিয়ে দিলেন।–

গান্ধী।। হ্যাঁ যুদ্ধ ঘোষণা করছি। আপনাদের অত্যাচার ও মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে আমি এই দাঁড়ালাম। দেখা যাক কে জেতে। [১৪৩]

গান্ধিজির দেওয়া চ্যালেঞ্জ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল গ্রহণ করলেন। গান্ধিজির অনমনীয় মনোভাব ও কংগ্রেস কর্মীদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ফলে গান্ধিজিকে হত্যা করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল এবং সেই পরিকল্পনা সফলও করেছিল।

নাটকের ষষ্ঠ ও সপ্তম দৃশ্যে দেখা যায় ধীরে ধীরে গান্ধি হত্যার পরিকল্পনা চলছে। ভারতের স্বরাষ্টমন্ত্রী, পুলিশ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ অফিসারেরা, হিন্দু সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক ব্যক্তিরা একযোগে গান্ধি হত্যার পরিকল্পনায় অংশ নেন। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল নানারকমভাবে চক্রান্ত করতে থাকেন গান্ধি হত্যার জন্য এবং নাথুরাম গোড্‌সে, মদনলাল পাহোয়া এবং নারায়ণ আপ্টের মতো বিশিষ্ট মানুষরা সেই চক্রান্তে শামিল হন। সেই সঙ্গে যোগদান করেন দিল্লির পুলিশ কমিশনার সাঞ্জেভি ও মুম্বাই-এর পুলিশ কমিশনার নাগরওয়ালা। ষড়যন্ত্র করে স্থির করা হয় দিল্লির প্রার্থনা সভাতেই মহাত্মা গান্ধিকে গুলি করে হত্যা করা হবে। সমস্ত চক্রান্তের মূল চক্রী ছিলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। হিন্দু মহাসভা ও আর.এস.এস গান্ধি হত্যার জন্য সরাসরি উস্কানি দিলেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আগ্রহী হয় না, বরং তাদের ওপর থেকে পুলিশি নজরদারি বন্ধ করার নির্দেশ দেয়। পুলিশের কাছে ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে বিভিন্ন সূত্র থেকে খবর আসতে থাকে গান্ধিজিকে হত্যা করা হবে। তার পরিকল্পনা চলছে—

আমাদের পার্টি স্থির করেছে গান্ধিকে হত্যা করা হবে। [১৪৪]

গান্ধিকে হত্যা করার জন্য সরকারের সর্বোচ্চ অফিসাররা এই ষড়যন্ত্রে সাহায্য করছেন। শুধু তাই নয় পুণে থেকে মুম্বাই, মুম্বাই থেকে দিল্লি পর্যন্ত এই ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এই সমস্ত ষড়যন্ত্রের কথা সবই জানেন, তিনি এটাকে প্রতিহত না করে বিনা বাধায় এগোতে দিতে চান। কিছু কিছু কর্তব্যপরায়ণ অফিসার গান্ধিকে বাঁচানোর জন্য, তাঁর জীবন রক্ষার জন্য একনিষ্ঠভাবে যখন উদ্যোগ নেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সমস্তরকম শক্তি দিয়ে তাদেরকে নিষ্ক্রিয় ও প্রতিহত করেন। ক্রমশ দেখা যায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে গান্ধিজির সমস্তরকম নিরাপত্তা ব্যবস্থা শিথিল করা হয় ও নিরাপত্তা কমিয়ে দেওয়া হয়, যাতে সহজে গান্ধিজিকে হত্যা করা সম্ভব হয়।

সপ্তম দৃশ্যে আমরা দেখতে পাই, ১৯ জানুয়ারি, দিল্লির মারিনা হোটেলের পঞ্চাশ নম্বর কক্ষে মদনলাল পাথেয়া, নাথুরাম গোড্‌সে এবং নারায়ণ আপ্টে গান্ধিকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে। এবং সেখানে স্থির হয় পরের দিন গান্ধিকে হত্যা করা হবে প্রার্থনা সভাতে—

কাল ২০শে জানুয়ারী বিকেলে গান্ধীর প্রার্থনা সভায় তাকে শেষ ক'রে দিতে হবে— এই আদেশ এসেছে। সেইজন্য আমরা বোম্বাই থেকে দিল্লি এসে পৌঁছেছি। মদনলাল, তুমি নেবে গানবাটন। এই

দেখ বিড়লাভবনের ম্যাপ, এইখানে গান্ধী বসবে বেদীর ওপর। তুমি বেদীর পেছনে এইখানটায় থাকবে। আমি থাকব বেদীর পাশে এইখানে। আমি এইভাবে হাত তুললেই তুমি বোমাটা ফাটাবে। [১৪৫]

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু অনুভব করেন গান্ধিজিকে হত্যা করার জন্য এক বিরাট ষড়যন্ত্রের জাল পাতা হয়েছে সর্বত্র জুড়ে, এবং সেই ষড়যন্ত্রে যুক্ত আছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে শুরু করে বিভিন্ন উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাও। এই ষড়যন্ত্রে কে আছেন আর কে নেই তা তিনি বুঝে উঠতে পারেন না। তিনি আসন্ন বিপদের আশঙ্কা করে গান্ধিজির নিরাপত্তা ব্যবস্থা শিথিল করার বিরোধিতা করেন এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিরাপত্তা শিথিল না করার নির্দেশও দেন। কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর চক্রান্তে ও হস্তক্ষেপে সে নির্দেশ কার্যকরী হয় না। নেহেরু এই বিরাট ষড়যন্ত্রের আঁচ পেয়ে গান্ধিজিকে প্রার্থনা সভায় যেতে নিষেধ করেন এবং গান্ধিজির নিরাপত্তা হ্রাসের বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে তলব করেন ও কৈফিয়ৎ দাবি করেন। কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক তার কৈফিয়েতের কোনো রূপ জবাবদিহি করে না বরং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেল তাঁকে প্রচ্ছন্ন জীবন হানির হুমকিও দেন—

আপনি ভুলে যাচ্ছেন শুধু গান্ধী-হত্যার ষড়যন্ত্র হয়নি, নেহেরু-হত্যারও গভীর এবং ব্যাপক ষড়যন্ত্র হয়েছে। [১৪৬]

স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা মিলে ঠিক করেন দিল্লির প্রার্থনা সভাতেই মহাত্মা গান্ধিকে গুলি করে হত্যা করা হবে। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারির ২০ তারিখে প্রথম গান্ধিজিকে হত্যা করার প্রাথমিক প্রচেষ্টা করা হয়, কিন্তু সেই প্রচেষ্টা পাঞ্জাবি যুবক মদনলাল পাহোয়ার ভুলে ব্যর্থ হয়ে যায়। মদনলাল পুলিশের কাছে ধরা পড়ে ও পুলিশি জেরায় মদনলাল পুলিশের কাছে ফাঁস করে দেয় গান্ধি হত্যার সমস্ত ষড়যন্ত্রের কথা। বালকৃষ্ণন ও জসবন্ত সিংহের মতো সৎসাহসী নির্ভীক পুলিশ অফিসার এই ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরে তা ব্যর্থ করার জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা করে। পুলিশের উচ্চপদস্থ অফিসারেরা সৎ নির্ভীক নিষ্ঠাবান পুলিশদের কখনো স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেয়নি। কারণ পুলিশের উপর দিককার কর্তারা রাজনৈতিক নেতাদের হাতের পুতুল মাত্র ছিলেন। মদনলাল পাহোয়ার মুখ থেকে জসবন্ত সিং ও বালকৃষ্ণানের মতো সৎ পুলিশ অফিসার গান্ধি হত্যার ষড়যন্ত্রকারী নাথুরাম গোড্‌সে ও নারায়ণ আপ্টের নাম এবং অন্যান্য ষড়যন্ত্রীদের নাম ও ঠিকানা জানতে পারার পর তাদেরকে গ্রেপ্তার করতে চান। কিন্তু পুলিশের উচ্চপদস্থকর্তা ও রাজনৈতিক নেতারা ষড়যন্ত্র করে সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেন। উৎপল দত্ত দশম দৃশ্যে পুলিশ ও রাজনৈতিক নেতাদের নির্লজ্জ ষড়যন্ত্রের কথা অসাধারণভাবে তুলে ধরেছেন—

জস।। স্যার, বসারও সময় নেই। আমাদের হাতে গান্ধীহত্যার পুরো ষড়যন্ত্রের নক্‌শা এসে গেছে। অনেকগুলো অ্যারেস্ট করতে হবে।

নাগর।। ওয়ারেন্ট সই করাতে হবে তো। ম্যাজিস্ট্রেটকে দিয়ে! সময় তো একটু লাগবেই।

জস।। স্যার, নিরাপত্তা আইনে ধরুন আগে। সময় নেই। আর মোটে পাঁচ দিন। হাত ফস্কে যদি ওরা পালায় তবে গান্ধীজীর প্রাণরক্ষার আর উপায় থাকবে না। পরে ওয়ারেন্ট বার করা যাবে।

নাগর।। এটা দিল্লি নয়, বম্বে। বিনা প্রমাণে এখানে কাউকে গ্রেপ্তার করা হয় না।...

নাগর।। দেখুন, মদনলাল একটা তৃতীয় শ্রেণীর ভবঘুরে বেকার। তার কথায় সাভারকারের মতন দেশনেতাকে গ্রেপ্তার করা যায় না।

জস।। (সজোরে) করতেই হবে। নইলে পাঁচদিনের মধ্যে গান্ধী খুন হবেন।

নাগর।। তাহলে দিল্লি-পুলিশ অপদার্থ। গান্ধীর প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা করতে না পেরে বম্বেতে এসে যাকে তাকে ধরতে চাইছে।

বাল।। স্যার, দিল্লি পুলিশ শুধু অপদার্থ নয়, তার সর্বোচ্চ অফিসারদের কাজকর্ম ক্রমশ অপরাধমূলক হয়ে উঠছে। সেইজন্য আপনার কাছে বিনীত আবেদন রাখছি স্যার— দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানকে খুন হতে দেবেন না।...

জস।। স্যার, আমরা পুলিশ অফিসার, কর্তব্য আমাদের করতেই হবে! নইলে এদেশের মানুষকে মুখ দেখাব কি ক'রে? নিজেদের কাছে ছোট হয়ে বাঁচব কি ক'রে?

নাগর।। এসব বক্তৃতা এককালে আমিও খুব ঝাড়তাম। ইনস্‌পেক্টার! ওরা আমার ছেলেমেয়েকে কিড্‌ন্যাপ ক'রে খুন করবে বলছে। আপনার ছেলেমেয়ে নেই?

জস।। আছে স্যার। সেই ছেলেকে মুখ দেখাতে পারব না কর্তব্য না করলে।

নাগর।। তাকে মেরে ফেলবে। আপনার উন্মাদসুলভ প্ল্যান পরিত্যাগ করুন।

জস।। না-মুনকিন স্যার, অন্তত আপ্টে আর গোড়্‌সেকে ধরে নিয়ে যাবই।

নাগর।। আপনি কি আমার ছেলেমেয়ের প্রাণ নিয়ে খেলতে এসেছেন?

জস।। মানে?

নাগর।। আপনাকে যা খুশি করতে দিলে আমার কী হবে বোঝেন না?

বাল।। স্যার, এ-শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ভারতবাসীর প্রাণ আপনার হাতে।

নাগর।। I am Sorry, I can't help you, I am not so brave. আপনারা এই ঘরেই থাকবেন। ৩০শে জানুয়ারী পর্যন্ত আপনারা হাজতে থাকবেন।

জস।। ভয়ের চোটে স্বাভাবিক মানবতাবোধ পর্যন্ত হারিয়ে ফেলছেন আপনি। গান্ধীজী খুন হতে যাচ্ছেন! শুনেছেন?

নাগর।। শুনেছি, শুনেছি। সেটা অতি দুঃখের কথা। কিন্তু আমার ক্ষুদ্র জগতে আমার ছেলেমেয়েরাই রাজ্য, গান্ধী নন। এ-ঘর থেকে বেরুবার চেষ্টা করবেন না!

জস।। On the contrary, আমরা বেরুবই। বোম্বাইয়ে দেশপ্রেমিক মানুষ আছেন লক্ষ লক্ষ। এটা নৌবিদ্রোহের শহর। আমরা বেরিয়ে তাদের কাছে আবেদন করব—

নাগর।। হল্ট্! You are both under arrest!

জস।। নাগরওয়ালা সাব! কী করছেন জানেন?

নাগর।। হ্যাঁ জানি! আমি নিরুপায়। আপনারা আমায় ক্ষমা করবেন! গার্ড!

[রাইফেলধারী প্রহরীর প্রবেশ]

এদের হাজতে পোরো! পাঁচ দিনের জন্য আপনারা ডিটেইন্ড!

বাল।। কী অভিযোগ? কী অভিযোগে গ্রেপ্তার করছেন?

নাগর।। অভিযোগ দিল্লি-পুলিশের, আমার নয়। আপনারা দুজনেই চোরাকারবারীদের সঙ্গে গোপন ব্যবসায়ে লিপ্ত। দিল্লি থেকে পালিয়ে এসেছেন। আমি ধরে ফেলছি। নিয়ে যাও এদের। [১৪৭]

পুলিশ কমিশনার নাগরওয়ালা বালকৃষ্ণ ও জসবন্ত সিংকে চোরাকারবারিদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার মিথ্যা অপরাধে গ্রেপ্তার করে আটকে রাখে, যাতে গান্ধী হত্যার পরিকল্পনা সফল হয়। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ৩০ জানুয়ারি বিকালে দিল্লির বিড়লা ভবনে প্রার্থনা সভাতেই গান্ধিজিকে হত্যা করা হল। গান্ধিজিকে পরপর তিনটি গুলি করে হত্যা করলেন নাথুরাম গোড্সে। গান্ধি হত্যা একেবারে পরিকল্পনামাফিক একটি রাজনৈতিক হত্যা তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। নাথুরাম গোড্সে-কে গ্রেপ্তারের পর বিচারের সময় গোড্সের স্বীকারোক্তি সেই পরিকল্পনামাফিক রাজনৈতিক হত্যার সপক্ষে প্রমাণ দেয়—

দেখছি আপনারা পরমপূজনীয় বীর সাভারকারকেও আসামী করেছেন। ঠিকই করেছেন। আমি ছিলাম সাভারকারের আজ্ঞাবহ, আর সাভারকর ছিলেন আবার অন্য কারুর আজ্ঞাবহ। আমি সেই

শক্তিমান পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম বোম্বাইয়ে, সাভারকর উপস্থিত ছিলেন শিখের ছদ্মবেশে। [১৪৮]

ভারতবর্ষকে নিয়ে ব্রিটিশ শাসকের চক্রান্ত ও সেই চক্রান্তের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কিছু ক্ষমতালোভী ও স্বার্থপর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ভারতবর্ষ জুড়ে সাম্প্রদায়িক হানাহানি দাঙ্গা প্রভৃতি এক অস্থির পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল, যার ফলে গান্ধিজিকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। ইংরেজরা ভারতবর্ষকে দু-টুকরো করে ক্ষমতা ভাগ করে দিয়েছিল কিছু লোভী আত্মসর্বস্ব মানুষের হাতে। স্বাধীনতা সংগ্রামে কংগ্রেসের গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক, কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর কংগ্রেসের কার্যকারিতা যেন উবে গিয়েছিল। যে দলে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় কোটি কোটি মানুষ জড়ো হয়ে প্রাণ উৎসর্গ করেছিল সেই দল রাষ্ট্র পরিচালনা করতে গিয়ে কিছু দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষের কবজায় চলে গিয়েছিল। কিছু স্বার্থপর কংগ্রেসি নেতারা ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। গান্ধিজির পক্ষে তা মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তিনি কংগ্রেস দলটাকেই তুলে দিতে চেয়েছিলেন ও পথে নামতে চেয়েছিলেন, অনশন করতে চেয়েছিলেন। যার পরিণাম স্বরূপ তাকে আত্মবলিদান দিতে হয়। কংগ্রেসি নেতাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতেই গান্ধিজিকে হত্যা করা হয়েছিল। উৎপল দত্ত আলোচ্য নাটক সম্পর্কে বলেছিলেন—

> *কংগ্রেসের বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস আজকের নয়, তা বহু দিনের। একটা নাটক আমি লিখেছি— 'একলা চলো রে'— গান্ধী-হত্যা এবং দেশবিভাগ নিয়ে। কংগ্রেসের দালালির অন্য ইতিহাস। গান্ধী-হত্যাতে ওরা যে সবাই লিপ্ত ছিল, এইসব হচ্ছে এই নাটকের বিষয়বস্তু।* [১৪৯]

'একলা চলো রে' নাটকে উৎপল দত্ত গান্ধিজিকে হত্যা, ব্রিটিশ রাজশক্তির চক্রান্ত ও কংগ্রেসি কিছু স্বার্থপর নেতাদের ক্ষমতালোভ নিয়ে যে ভারতের স্বাধীন দেশের ইতিহাস গড়ে উঠেছে তার স্বরূপটি তিনি উন্মোচন করেছেন আলোচ্য নাটকে। ইতিহাসের সেই উত্তাল পরিস্থিতিতে কিছু স্বার্থপর সুবিধাবাদী মানুষের লোভ-লালসার উল্লাসের দিনে সমস্ত ভারতবর্ষব্যাপী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং দেশবিভাগের সুগভীর চক্রান্তের বিরুদ্ধে গান্ধিজিই একা নিষ্কম্প দীপশিখার মতো অবস্থান করে আছেন মানুষের মননে-চিন্তনে ও বিবেকের কাছে।

উৎস নির্দেশ :

১. উৎপল দত্ত, উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র (প্রথম খণ্ড), শোভা সেন ও শৌভিক রায়চোধুরী (সম্পা), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, মাঘ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ, পৃ ১৪৮

২. তদেব, পৃ ১৬৪

৩. তদেব, পৃ ১৫৬

৪. তদেব, পৃ ১৬৪, ১৬৫

৫. তদেব, পৃ ১৬৫

৬. তদেব, পৃ ১৬৫

৭. তদেব, পৃ ১৬৯

৮. তদেব, পৃ ২০৮

৯. তদেব, পৃ ১৬৪

১০. তদেব, পৃ ১৬৮

১১. তদেব, পৃ ২২৪, ২২৫

১২. তদেব, পৃ ২০০

১৩. তদেব, পৃ ২০২

১৪. তদেব, পৃ ১৬৬

১৫. তদেব, পৃ ১৬৯

১৬. উৎপল দত্ত, 'লিটল থিয়েটার ও আমি', 'উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন', নৃপেন্দ্র সাহা (সম্পা), উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব ২০০৫ কমিটি, কলকাতা, ৭ নভেম্বর ২০০৫, পৃ ৪৫৬, ৪৫৭

১৭. উৎপল দত্ত, উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড), শোভা সেন ও শৌভিক রায়চৌধুরী (সম্পা), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, পৃ ২৩৭, ২৩৮

১৮. তদেব, পৃ ২৩৪

১৯. তদেব, পৃ ২৩৯

২০. তদেব, পৃ ২৫৩

২১. তদেব, পৃ ২৫২

২২. তদেব, পৃ ২৫৭-২৫৯

২৩. তদেব, পৃ ২৫৫, ২৫৬

২৪. তদেব, পৃ ২৬০

২৫. তদেব, পৃ ২৬০

২৬. তদেব, পৃ ২৫৫

২৭. তদেব, পৃ ২৬৩, ২৬৪

২৮. তদেব, পৃ ২৬৬

২৯. তদেব, পৃ ২৬৬

৩০. তদেব, পৃ ২৬৭

৩১. তদেব, পৃ ২৮২, ২৮৩

৩২. তদেব, পৃ ২৯৯, ৩০০

৩৩. তদেব, পৃ ৩৫০

৩৪. শঙ্কর শীল, 'মিনার্ভা থিয়েটারের দিনগুলি', উৎপল দত্ত : মনন ও সৃজন, প্রতিভাস, সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ ৫৪

৩৫. উৎপল দত্ত, উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র (তৃতীয় খণ্ড), শোভা সেন ও শৌভিক রায়চৌধুরী (সম্পা), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, চৈত্র ১৪২০ বঙ্গাব্দ, পৃ ১৬৩, ১৬৪

৩৬. শঙ্কর শীল, 'উৎপল দত্তের নাটক : প্রথম পর্ব', উৎপল দত্ত : মনন ও সৃজন, প্রতিভাস, সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ ২১৯

৩৭. সূত্র-৩৫, পৃ ১৬৫

৩৮. তদেব, পৃ ১৬৭

৩৯. তদেব, পৃ ১৭০

৪০. তদেব, পৃ ১৯৫, ১৯৬

৪১. তদেব, পৃ ১৯৭

৪২. তদেব, পৃ ২১০

৪৩. দর্শন চৌধুরী, 'থিয়েটারওয়ালা উৎপল দত্ত', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১০ অক্টোবর [মহালয়া], ২০০৭, পৃ ৯৮

৪৪. সূত্র-১৬, পৃ ৪৫৯

৪৫. তদেব, পৃ ৪৫৯

৪৬. সূত্র-৩৫, পৃ ২১৯

৪৭. তদেব, পৃ ২২৫, ২২৬

৪৮. তদেব, পৃ ২৩৩, ২৩৪

৪৯. তদেব, পৃ ২৪১

৫০. তদেব, পৃ ২৪১

৫১. তদেব, পৃ ২৫৯

৫২. তদেব, পৃ ২৬০

৫৩. তদেব, পৃ ২৬১

৫৪. তদেব, পৃ ২৭৭

৫৫. তদেব, পৃ ৩০৩, ৩০৪

৫৬. তদেব, পৃ ৩১৪

৫৭. সূত্র-৩৪, পৃ ৫৭

৫৮. সূত্র-১৬, পৃ ৪৫৯

৫৯. সূত্র-১৭, পৃ ৬৯

৬০. তদেব, পৃ ৬৯, ৭০

৬১. তদেব, পৃ ৭৫, ৭৬

৬২. তদেব, পৃ ৮৪

৬৩. তদেব, পৃ ৮৪

৬৪. তদেব, পৃ ৮৪

৬৫. তদেব, পৃ ৯৭

৬৬. তদেব, পৃ ১০৫, ১০৬

৬৭. তদেব, পৃ ১০৭, ১০৮

৬৮. তদেব, পৃ ১০৮

৬৯. তদেব, পৃ ১১২

৭০. তদেব, পৃ ১৩২

৭১. তদেব, পৃ ১৩৩

৭২. তদেব, পৃ ১৩৬

৭৩. সূত্র-১৬, পৃ ৪৬০

৭৪. শঙ্কর শীল, 'পিপলস লিটল থিয়েটার', উৎপল দত্ত : মনন ও সৃজন, প্রতিভাস, সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ ৮৮

৭৫. উৎপল দত্ত, উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র (পঞ্চম খণ্ড), শোভা সেন ও শৌভিক রায়চৌধুরী (সম্পা), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, আশ্বিন ১৪২২ বঙ্গাব্দ, পৃ ২১৯

৭৬. তদেব, পৃ ২২০

৭৭. তদেব, পৃ ২২০-২২৪

৭৮. তদেব, পৃ ২২৩

৭৯. সূত্র-৭৪, পৃ ৮৮

৮০. সূত্র-৭৫, পৃ ২৪৯

৮১. তদেব, পৃ ২২৬

৮২. তদেব, পৃ ২২৬

৮৩. তদেব, পৃ ২৪৮

৮৪. তদেব, পৃ ২৩৫, ২৩৬

৮৫. তদেব, পৃ ২৬৭

৮৬. তদেব, পৃ ২৩৮

৮৭. তদেব, পৃ ২৬৭

৮৮. তদেব, পৃ ২৬৮

৮৯. তদেব, পৃ ২৬৮, ২৬৯

৯০. সূত্র-৭৪, পৃ ৮৪

৯১. উৎপল দত্ত, উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র (ষষ্ঠ খণ্ড), শোভা সেন ও শৌভিক রায়চৌধুরী (সম্পা), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ, পৃ ১৮

৯২. তদেব, পৃ ৮১

৯৩. তদেব, পৃ ৮২

৯৪. তদেব, পৃ ৮২, ৮৩

৯৫. তদেব, পৃ ৮৭

৯৬. তদেব, পৃ ৮৭

৯৭. তদেব, পৃ ৮৭

৯৮. তদেব, পৃ ৮৭, ৮৮

৯৯. তদেব, পৃ ১১৫

১০০. তদেব, পৃ ১১৫

১০১. তদেব, পৃ ১০০

১০২. তদেব, পৃ ১০১, ১০২

১০৩. তদেব, পৃ ১০২, ১০৩

১০৪. তদেব, পৃ ১৩১, ১৩২

১০৫. তদেব, পৃ ১৪১

১০৬. তদেব, পৃ ১৪৩

১০৭. সূত্র-৭৪, পৃ ৯২

১০৮. তদেব, পৃ ৯৩

১০৯. তদেব, পৃ ৯৪

১১০. সূত্র-৯১, পৃ ২৩০, ২৩১

১১১. তদেব, পৃ ২৩১

১১২. তদেব, পৃ ২৬২, ২৬৩

১১৩. তদেব, পৃ ২৬৪, ২৬৫

১১৪. তদেব, পৃ ২৬৬

১১৫. তদেব, পৃ ২৬৭

১১৬. তদেব, পৃ ২৬৮, ২৬৯

১১৭. তদেব, পৃ ২৭৪

১১৮. তদেব, পৃ ২৭৫

১১৯. তদেব, পৃ ২৮০

১২০. তদেব, পৃ ২৯৩

১২১. তদেব, পৃ ১৫৫

১২২. তদেব, পৃ ১৫৮

১২৩. তদেব, পৃ ১৫৭

১২৪. তদেব, পৃ ১৯৩

১২৫. তদেব, পৃ ১৬৭

১২৬. তদেব, পৃ ১৬১

১২৭. তদেব, পৃ ১৮৫, ১৮৬

১২৮. তদেব, পৃ ২১৫

১২৯. তদেব, পৃ ২১৫

১৩০. তদেব, পৃ ২২৬

১৩১. সূত্র-৪৩, পৃ ২৮৪

১৩২. উৎপল দত্ত, উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র (সপ্তম খণ্ড), শোভা সেন, বিষ্ণুপ্রিয়া দত্ত ও শৌভিক রায়চৌধুরী (সম্পা), মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, পৌষ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, পৃ ৩৮৩

১৩৩. তদেব, পৃ ৩৮৭

১৩৪. তদেব, পৃ ৩৮৯

১৩৫. তদেব, পৃ ৩৯১

১৩৬. তদেব, পৃ ৩৯৫

১৩৭. তদেব, পৃ ৪০১

১৩৮. তদেব, পৃ ৪০২

১৩৯. তদেব, পৃ ৪০২

১৪০. তদেব, পৃ ৪০৩

১৪১. তদেব, পৃ ৪০৩, ৪০৪

১৪২. তদেব, পৃ ৪০৭

১৪৩. তদেব, পৃ ৪০৭

১৪৪. তদেব, পৃ ৪১৫

১৪৫. তদেব, পৃ ৪১৭

১৪৬. তদেব, পৃ ৪৩১

১৪৭. তদেব, পৃ ৪২৭, ৪২৮

১৪৮. তদেব, পৃ ৪৩৩

১৪৯. সূত্র-৭৪, পৃ ১১০

চতুর্থ অধ্যায়

উৎপল দত্তের নাটক বঞ্চিত মানুষ ও রাজনৈতিক দর্শন

উৎপল দত্ত একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন "আমি মনে করি আমি প্রকৃত স্তালিনবাদী।"[১] উৎপল দত্তের থিয়েটার ছিল শ্রমিক-শ্রেণির তথা নিপীড়িত, শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সৃষ্ট বিপ্লবী থিয়েটার। তাঁর নাটক সদাসর্বদা গর্জে উঠেছে যখনই তিনি দেখেছেন বঞ্চিত মানুষদের স্বার্থ বিঘ্নিত হয়েছে, বুর্জোয়া শ্রেণি দ্বারা শ্রমিক-কৃষকশ্রেণি যখন অত্যাচারিত হয়েছে। তিনি আদ্যন্ত মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী একজন নাট্যকার ছিলেন "মার্ক্সবাদ হচ্ছে শ্রমিক-শ্রেণির মতবাদ।"[২] মার্ক্সবাদী রাজনীতি শ্রমিক-শ্রেণির রাজনীতি। প্রকৃতপক্ষে মার্ক্সবাদকে বুঝতে গেলে শ্রমিক-শ্রেণি তথা শোষিত-নিপীড়িত মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বুঝতে হয়। 'ব্রেখ্ট্ ও মার্ক্সবাদ' প্রবন্ধে উৎপল দত্ত বলেছেন—

> *দার্শনিকদের তথাকথিত নিরপেক্ষ ও শীতল মস্তিস্কবিশ্লেষণে জগতের আসল সত্য ধরা পড়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। শ্রমিকের একপেশে ও জঙ্গি উপলব্ধিতেই বরং জগৎকে বোঝা সম্ভব। এবং বুঝে তাকে পরিবর্তিত করাও সম্ভব। মার্কসবাদ হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে নাট্যশালার সাযুজ্য ঘটাবার ব্রেখ্টীয় দাবি তাহলে শুধু একটা রণধ্বনি নয়, সেটা হচ্ছে জগৎ, মানুষ, সমাজ, উৎপাদন-সম্পর্ক সব বুঝবার একমাত্র পথ। সেটা হচ্ছে সত্যে পৌঁছুবার একমাত্র উপায়।* [৩]

উৎপল দত্ত শোষিত-বঞ্চিত শ্রমিক শ্রেণিকে তথা শ্রমিক আন্দোলনের বিভিন্ন ধারাকে নাট্যাঙ্গনে নিয়ে এলেন। শ্রমিক-শ্রেণির দুর্দশা, তাদের প্রতি শোষণ ও অত্যাচারের কাহিনি নিয়ে তিনি তৈরি করলেন কালজয়ী বিভিন্ন নাটক। স্কুলে ও কলেজে পড়ার সময় বামপন্থা সম্পর্কে তথা কমিউনিজম সম্পর্কে পুথিগত শিক্ষা অর্জন করেছিলেন তা সরাসরি নাটকের মধ্যে প্রয়োগ করে তার বাস্তবায়ন ঘটিয়েছিলেন, শ্রমিক শ্রেণিকে নাট্যাঙ্গনে আনয়নের মধ্য দিয়ে। 'লিট্ল থিয়েটার ও আমি' প্রবন্ধে তিনি স্পষ্টতই বলেছেন,

> *বাংলার পেশাদার নাট্যশালায় তখনও পর্যন্ত শ্রমিক শ্রেণি আসেনি, শ্রমিককে অচ্ছুত করে রাখা হয়েছিল পেশাদার থিয়েটারে, এমনকি গণনাট্য সংঘের নাটকগুলিও তখন আবর্তিত হচ্ছিল কিছু চাষীর কান্না বা মধ্যবিত্ত পরিবারের বিলাপের মধ্যে।* [৪]

উৎপল দত্ত মার্ক্সবাদী শিল্পীর শিল্পসৃষ্টির প্রক্রিয়াকে শ্রমিক শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে অন্বীত করলেন। কমিউনিস্ট পার্টি যেহেতু শ্রমিক শ্রেণির পার্টি, তাই শ্রমিকের চেতনার জগৎ ও মানসিক

জগৎকে বুঝতে গেলে ও জানতে গেলে পার্টিরই সঙ্গে গভীর যোগাযোগ রক্ষা করে চলা অতি আবশ্যকীয় কর্তব্য। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে মার্কসবাদী শিল্পীর চেতনা কখনো আবীলতায় আচ্ছন্ন তো হয়ই না, বরং শ্রমিকদের চেতনার জগৎকে ভালোভাবে বোঝা সম্ভব হয়। 'জপেনদা জপেন যা' প্রবন্ধে তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন—

> *কোন দলের নেতৃত্ব স্বীকার করলেই যে শিল্পী স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে তার স্বাধীন থাকবার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।* [৫]

লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ যখন মিনার্ভায় নিয়মিত নাটক করতে শুরু করল তখন উৎপল দত্ত ও তাঁর নাট্যদল নতুন কিছু ভাবনাচিন্তা শুরু করল। তারা ভাবল মানুষের কথা মানুষের কাছে বলতে গেলে মানুষের জীবন ও সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে। তাদের কথা তাদের কাছ থেকে জানতে হবে। তা না হলে জীবন সমস্যায় জর্জরিত-শোষিত-নিষ্পেষিত-নিপীড়িত-বঞ্চিত মানুষের প্রাণের কাছে পৌঁছানো যাবে না। এইসময় উৎপল দত্তের প্রধান লক্ষ্য ছিল নাটকে শ্রমিক আন্দোলনকে তুলে ধরা। বাংলা নাটকের আঙিনায় তখনও পর্যন্ত শ্রমিক শ্রেণির কোনো স্থান হয়নি। একজন একনিষ্ঠ মার্কসবাদী হিসেবে উৎপল দত্ত চেয়েছিলেন বঙ্গীয় নাট্যশালায় শ্রমিক শ্রেণিকে প্রাধান্য দিতে ও কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে নিয়ে আসতে। শোষিত-বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত শ্রমিকের জীবন ও সংগ্রামকে রূপায়িত করে বাংলার থিয়েটারে বঞ্চিত মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তিনি। বাংলা নাট্যশালায় উৎপল দত্তের আগে কেউই হাঁটেননি। সাহসিকতার সঙ্গে তিনি হন পথিকৃত, নতুন চিন্তার দিশারী, নতুন যুগের স্রষ্টা। উৎপল দত্ত তাঁর 'জপেন দা জপেন যা' প্রবন্ধে লিখেছেন—

> *নাটক কোন তারে বাঁধব তা নির্ভর করে আমার দর্শকের ওপর। বাংলা রাজনৈতিক নাটক কার সামনে অভিনীত হবে? রাজনৈতিক নাটক তৈরি করে তারপর আকাদেমি নামক ক্ষুদ্র প্রেক্ষাগৃহে কয়েক কুড়ি সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন ভদ্রলোকের সামনে অভিনয় করতে থাকলে, সেটা আর রাজনৈতিক নাটক থাকে না। সেটা কাঁঠালের আমসত্ত্ব হয়। যেখানে এ নাটক প্রধানত অভিনয় হবে, সেখানে থাকবে দশ থেকে বিশ হাজার শ্রমক্লান্ত মানুষ, থাকবে অত্যন্ত নির্জীব মাইক এবং থাকবে আশেপাশে হাটুরে কোলাহল। সেখানে রবীন্দ্রনাথের কোনো পরিশীলিত বুদ্ধিদীপ্ত কাব্যসুষমামণ্ডিত সামাজিক নাটক অভিনয় করতে যাওয়ার বিপর্যস্ত অভিজ্ঞতা যার হয়েছে, সে-ই বোঝে কেন রাজনৈতিক নাটক আমাদের দেশে চড়া সুরে বাঁধতে হয় ।* [৬]

সমাজের শোষিত বঞ্চিত মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে তিনি শ্রমিক শ্রেণিকে

মঞ্চে উপস্থাপনা করলেন। বিহারের ধানবাদ অঞ্চলের বরাধেমো কয়লাখনির দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে লিখলেন ‘অঙ্গার’ নাটকটি। সেখানকার কয়লাখনিতে আগুন লাগা ও জল ঢুকে যাওয়ার ফলে খনি শ্রমিকদের মর্মান্তিক অবস্থার বর্ণনা করলেন আলোচ্য নাটকে। উৎপল দত্ত ও তাঁর কয়েকজন সহকর্মীরা গিয়ে বরাধেমো অঞ্চলে গিয়ে বাস্তব অবস্থা দেখলেন, যেসব শ্রমিকেরা বেঁচে ফিরেছিল তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করলেন। শ্রমিকদের বাস্তব জীবন ও তাদের শোষিত অবস্থার নির্মম অভিজ্ঞতাগুলি উপলব্ধি করে নাটকে তুলে ধরলেন। কয়লা খনির গহ্বরে জল ঢুকে যাওয়া, স্রোতের সঙ্গে মানুষের প্রাণ বাঁচানোর যে আপ্রাণ চেষ্টা ও মর্মান্তিক লড়াই বাংলার থিয়েটারে কিংবদন্তি হয়ে আছে, অমর হয়ে আছে শ্রমিক আন্দোলন ও তাদের বাঁচার লড়াই।

কয়লা খনির শ্রমিকদের জীবন অবলম্বনে ও বাস্তব ঘটনাভিত্তিক এই ‘অঙ্গার’ নাটকে প্রথম থেকেই শ্রমিকদের ওপরে যে শোষণ-অত্যাচার ও বঞ্চনার যে জীবনধারা তার মুখোমুখি হই। আমরা জানতে পারি কয়লা খনির খাদের নীচে প্রায়শই গ্যাস জমে যা শ্রমিকদের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। যে-কোনো মুহূর্তে প্রাণহানির সম্ভাবনা কিন্তু এ-নিয়ে মালিক পক্ষের কোনোরূপ ভ্রূক্ষেপ নেই। মালিক পক্ষ শুধুই জানে তাদের মুনাফা। খরচ নয়, আয় করাই তাদের উদ্দেশ্য শ্রমিকদের প্রাণ যাক আর থাক। নাটকের প্রথম দৃশ্যে দীননাথের কথায় সে ত্রুটি ফুটে ওঠে—

> *দীনু।। গ্যাস জমছে। মেথেন গ্যাস। শালার ব্যাটা শালা কোম্পানি ফ্যানগুলো মেরামত করবে না। গ্যাস জমছে আর জমছে।* [৭]

আবার দীননাথকে বলতে শুনি—

> *দীন।। ...বাতি দেখে বুঝতে হয় গ্যাস আছে কিনা। কোনো মিটার কিনবে না শালা ফিরিঙ্গি কঞ্জুষের বাচ্চারা।* [৮]

মালিক শ্রেণির শোষণ ও শ্রমিকদের বঞ্চনার রূপটি নাটকের প্রথম থেকেই পরিলক্ষিত হয়।

খনিতে দুর্ঘটনার ফলে শ্রমিকের মৃত্যু হয় কিন্তু কোম্পানি শ্রমিকদের মৃত্যুর কোনো দায় স্বীকার করে না, তারা কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে চায় না। দায় এড়ানোর জন্য দীননাথ ও কালু সিং-এর মৃতদেহ সরিয়ে ফেলে যাতে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে না হয়। তারা তাদের তদন্ত রিপোর্টে বলে, খাদের নীচে গ্যাস জমার ফলে শ্রমিকদের মৃত্যু ঘটেছে এমন কোনো প্রমাণ নেই। এমনকি শ্রমিকদের মৃত্যু ঘটেছে এ সংবাদটিও সম্পূর্ণ মিথ্যা। তাদের মতে—

> *ভারতীয় শ্রমিকদের এটা চিরাচরিত প্রথা। দুর্ঘটনার সুযোগ নিয়ে তারা গা ঢাকা দেয়, যাতে তাদের*

পরিবার কিছু পয়সা হাতাতে পারে ক্ষতিপূরণ হিসাবে। [৯]

মৃত্যুর খবর কোম্পানির পক্ষ থেকে কোনোভাবেই স্বীকার করা হয় না যাতে ক্ষতিপূরণ দিতে না হয় তার জন্য সমস্ত রকম কু-প্রচেষ্টা তারা করতে থাকে। তাদের মতে শ্রমিক দীননাথ আদতে মরেনি সে বেঁচে আছে ও লুকিয়ে আছে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার আশায়। দীননাথ ও কালু সিং-এর মৃতদেহকে এমনভাবে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল দুর্ঘটনাস্থল থেকে পঁচিশ মাইল দূরে। তাদের সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করে দেওয়া হয় যাতে কেউ শনাক্ত করতে না পারে—

ক্ষতিপূরণ দেয়া এড়াবার জন্য এবং সরকার তথা দেশবাসীর কাছে তাঁদের কলঙ্ক ঢাকবার জন্য তাঁরা মৃতদেহ সরিয়ে ফেলেন ও কেউ যাতে সনাক্ত করতে না পারে সেজন্য নিষ্ঠুরভাবে তাঁরা মৃতদেহের মুখ বিকৃত করে দিয়েছেন। [১০]

উৎপল দত্ত 'অঙ্গার' নাটকের মধ্য দিয়ে ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণির শোষিত-নির্যাতিত ও বঞ্চিত অবস্থার মর্মান্তিক চেহারা তুলে ধরেছেন। আর্থিক শোষণ তো ছিল-ই সেই সঙ্গে শোষণের জাঁতাকলে শ্রমিকরা নিজেদের আত্মপরিচয় হারিয়ে ফেলে, কীভাবে তারা নিজেদের মানবসত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সেই ভয়াবহ পরিস্থিতি দর্শকের সামনে তিনি উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। তৃতীয় দৃশ্যে আমরা শ্রমিকদের জীবনের সঙ্গে অনেকটা পরিচিত হই এবং জানতে পারি এরা শুধু আর্থিকভাবে চূড়ান্ত শোষিত তা নয়, এদের কাজ পেতে গেলে কিংবা কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নিতে গেলে কোম্পানির মুন্সিদের ঘুষ দিতে হয়। এই বঞ্চিত শ্রমিকরা কেউ কেউ হয়তো কাবুলিওয়ালাদের কাছে দেনাগ্রস্ত, কাজ করে সেই দেনা শোধ করার পরিকল্পনা করে। এদের মধ্যে আবার অনেক শ্রমিকের যক্ষ্মা হয়েছে, কয়লার গুঁড়ো গিয়ে ফুসফুসটা প্রায় নষ্ট করে দিয়েছে, নারী শ্রমিকদের মধ্যে অনেকের কয়লা বয়ে বয়ে পেট জখম হয়ে গিয়েছে। হয়তো কখনো ছেলেপুলেও হবে না। এইসব অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হই নাটকের তৃতীয় দৃশ্যে—

আরিফ।। এই কাশি— ডাক্তার বলেছে আমার যক্ষ্মা হয়েছে, কয়লার গুঁড়ো গিয়ে গিয়ে ফুসফুট ফুটো হয়ে গেছে।

মোস্তাক।। সে তো সকলেরই হয় দাদা।

বিনু।। তা তোমার অমন অসুখ, রুক্মিকে বিয়ে করা কি উচিত হোত?

আরিফ।। ওরও তো অসুখ। কয়লা বয়ে বয়ে ওর পেট জখম হয়ে গেছে। ছেলেপুলে হবে না। [১১]

কোম্পানির কাজের জন্য শ্রমিক শ্রেণির নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শরীর থাক আর যাক সেদিকে লক্ষ করার ফুরসত পর্যন্ত পায় না, অথচ এই কোম্পানি অতিরিক্ত লোভে কয়লা কাটতে কাটতে শ্রমিকদের জীবন বিপন্ন করে তোলে। নাটকের তৃতীয় দৃশ্যে কুদরৎ-এর কথায় তা প্রকাশ পায়—

> *কুদরৎ।।... আইন আছে সুরঙ্গ ষোল ফুটের বেশি চওড়া হবে না, নইলে গ্যাস জমে। এখানে তো বাইশ ফুট পর্যন্ত চওড়া হয়। দেখুন আপনারা, টাকার লোভে কয়লা কাটতে কাটতে কিভাবে আমাদের জীবন বিপন্ন করে কোম্পানি।* [১২]

শ্রমিকরা যদি কখনো এই বিপদের মাঝখানে কয়লা তুলতে নিমরাজি হয় তাহলে কোম্পানির লোক শ্রমিকদের হুমকি দেয়, ভীতি প্রদর্শন করে এমনকি শ্রমিকদের প্রহার করতেও পিছুপা হয় না। অতিরিক্ত লোভ ও লালসা, অতিরিক্ত মুনাফার জন্য তারা এই শোষিত বঞ্চিত মানুষগুলিকে আশু বিপদের মাঝে ঠেলে দেয়। পরিকাঠামোগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার থেকে কোম্পানির কোনোরকম ভ্রুক্ষেপ থাকে না। তাদের একমাত্র ও প্রধান উদ্দেশ্য যত বেশি সম্ভব লাভ করা বা কয়লা উত্তোলন করা। কোম্পানির এই নিষ্ঠুর মানসিকতা শ্রমিকদের কথাতেই প্রকাশ পায়—

> *এ তল্লাটে এমন কেউ নেই যে দীনুদাকে চিনতো না। তিনি ছিলেন সবার দাদা। তাঁকে যখন খাদে পাঠিয়ে মারলো, তখন থেকেই কোম্পানি জানে গ্যাস জমেছে। আজ পর্যন্ত তার কোনো ব্যবস্থা করেনি। ফ্যান কমজোর হয়ে গেছে, বাতাস প্রায় নেই, বালি ছড়ানো বন্ধ করেছে। কয়লার গুঁড়োয় খাদ অন্ধকার, বাতিগুলো হলদে নিবু নিবু দেখায়। কারণ খরচা ওরা করবে না। ওরা চায় মাসে পঞ্চাশ হাজার টন প্রডাকশন। সেটাকে বাড়িয়ে ষাট সত্তর করতে পারলে ভালো হয়। আর সেই মুনাফা যারা গড়ে তুলছে, তাদের জীবন রক্ষার কি ব্যবস্থা ওরা করছে বলুন?* [১৩]

চতুর্থ দৃশ্যে কোম্পানি ও মালিক শ্রেণির ছলনা ও চাটুকারিতার এক নির্লজ্জ রূপ উৎপল দত্ত দর্শকের সামনে উপস্থাপনা করেন। সমাজের শোষিত-বঞ্চিত শ্রমিকদের ঠকাবার নতুন নতুন পন্থা আবিষ্কার করে কোম্পানির লোকেরা। এ দৃশ্যে দেখা যায়, শ্রমিকরা যখন প্রচণ্ড আর্থিক অনটনে নাজেহাল দুবেলা-দুমুঠো অন্নসংস্থানে অপারগ, ঠিক তখনই কোম্পানি ক্ষুধার্ত শ্রমিকদের সামনে টাকার টোপ দেয়। কোম্পানির তরফ থেকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ও সুবাদার এসে শ্রমিকদের বলে যে খাদের নীচে গ্যাস পরিষ্কার হয়ে গেছে, এবং তারা অফিসারদের রিপোর্ট দেখায়। শ্রমিকরা তাদের কথায় সংশয় প্রকাশ করলে সুবাদার তাদেরকে স্পেশাল বোনাস দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং হরতালের সময়কার পুরো পাওনা মিটিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেয়। সুবাদার চালাকি করে এটাও বলে যে, খাদের নীচে গ্যাস নেই এটা প্রমাণ করার জন্য সে

নিজে শ্রমিকদের সঙ্গে খাদের নীচে যাবে। আসলে নিঃস্ব-রিক্ত-শোষিত মানুষগুলিকে ঠকানোর নিত্যনতুন পন্থা অবলম্বন করে কোম্পানি ও তার সহকর্মীরা।—

মহা।। কোম্পানি ব্যাপারটা ভেবে দেখেছে, বুঝলে?

দত্ত।। মানে আমরা Consider করলাম ব্যাপারটা। গ্যাসের রিডিং নেওয়া হয়েছে আজ। এই দেখ রিপোর্ট— এক পার্সেন্টেরও কম। [কাগজ বাড়িয়ে ধরেন।]

বিনু।। ওসব রিপোর্ট ভুল হয় অনেক সময়ে।

দত্ত।। বড় বড় অফিসারদের রিপোর্ট—

মহা।। থামুন স্যার— হ্যাঁ স্বীকার করছি, ভুল হয়। এ-ও স্বীকার করছি, খাদে নামায় বিপদ আছে। প্রচুর বিপদ আছে। আবার বিপদ না-ও ঘটতে পারে— অভিজ্ঞ মাইনার হিসেবে এটা মানো তো?

হাফিজ।। হ্যাঁ, এটা মানি।

মহা।। এসব জেনে শুনেও খাদে যাবে কেউ?

দত্ত।। আহাহা, অমন বেয়াড়াভাবে প্রশ্নগুলো তুলছেন কেন? কোম্পানী একজন শট্‌ফায়ারার ও এক গ্যাং মালাকাটা চায়। এদের Special Bonus দেওয়া হবে— প্রত্যেককে ৫০০ টাকা করে এবং সেই সঙ্গে Strike Period-এর পুরো পাওনা time rate হিসেবে ধরে দেয়া হবে।

হাফিজ।। উদ্দেশ্য?

দত্ত।। উদ্দেশ্য হোলো, খাদে যে গ্যাস নেই এটা অকাট্যভাবে প্রমাণ করা।...

মহা।। জান যাওয়ার বিপদ নেই বলব না, তবে খুব কম। সেটা প্রমাণ করব এক্ষুনি।

বিনু।। প্রমাণ! প্রমাণ করবেন কি করে?

মহা।। ম্যানেজার সাহেবের হুকুম, আমি নিজে যাব আপনাদের সঙ্গে। [১৪]

আলোচ্য নাটকে উৎপল দত্ত শ্রমিক চেতনার নানা জটিল স্তরকে প্রকাশ করেছেন। নানা শ্রমিকদের ভিড়ে তিনি এক অত্যাশ্চর্য শ্রমিক চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন যার নাম সনাতন। সনাতন এক সাইকিক চরিত্র। সে অন্ধকার সহ্য করতে পারে না। খাদের মধ্যে সাতদিন আটকে থাকার

ফলে তার মনে জন্ম নিয়েছে এক ভীষণ অন্ধকার ভীতি। সে এক বিচিত্র মানুষ। তার পরিচয় জানতে চাইলে সে অদ্ভুত রকমের কথা শোনায়। সে বলে—

আমি একজন ভূতপূর্ব লোক। [১৫]

বিনু যখন তার নাম জিজ্ঞাসা করে তখনও সে আশ্চর্য রকমের কথা বলতে থাকে। নাম জানতে চাইলে তার উত্তর—

কোন্ নামটা জানতে চাও? যখন জ্যান্ত ছিলাম, তখন আমার নাম ছিল বৈদ্যনাথ। এখন সনাতন। [১৬]

সনাতন চরিত্রটির মধ্য দিয়ে এই অসংলগ্ন কথাবার্তার অর্থ ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও গভীর। অসংলগ্ন কথাবার্তার মধ্য দিয়ে শোষিত, নিপীড়িত শ্রমিকের প্রতি কোম্পানির যে অকথ্য অত্যাচার ও অন্যায়-অবিচার সেটা সনাতন ও বিনুর সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়।—

বিনু।। কি কাজ করেন?

সনা।। যখন জ্যান্ত ছিলাম তখন ছিলাম ইলেক্‌ট্রিশিয়ান। এখন মালকাটা।

বিনু।। বারবার ও-কথা বলছেন কেন? আপনি মরলেন কবে কি করে?

সনা।। তিনবছর আগে মরেছি। রাধানগর কোলিয়ারি যে ফেটে গেছল, তখন আমারও কর্ম সাফ। খাদের মধ্যে ফ্যান সারাচ্ছিলাম। হঠাৎ চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। বুঝলাম মরেছি। সাতদিন পরে বেরিয়ে এলাম বাইরে। ভূত দেখে সবাই পালাতে লাগল। বুঝলাম, আমি ভূতপূর্ব, আমি গত, আমি হত।

বিনু।। তারপর?

সনা।। তারপর বিষম খিদে পেল। কেমন সন্দেহ হলো— হয়তো বা আমি মরিনি, নইলে খিদে পায় কেন? একটু পরে আমার বন্ধুবান্ধবরা এসে জুটল, আমার গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল, আমি ভাবলাম— গলা যখন আছে, তখন শরীরও আছে, তাহলে বোধহয় আমি ভূত নই, আমি বর্তমান। কিন্তু ভুল ভেঙে দিল কোম্পানি। ওরা বললে আমি নেই।

বিনু।। তার মানে?

সনাতন।। কোর্টে ওরা প্রমাণ করে দিয়েছে আমি নেই। মানে বদ্যিনাথ বলে কোনো লোক কস্মিনকালেও ছিল না। ওদের খাতায় বদ্যিনাথ বলে কোনো নামই নেই। তাই রাধানগরে কেউ

মরেনি। এমন সময়ে আমি গিয়ে কোম্পানির সামনে উপস্থিত। কোম্পানি বললে, তুমি কে? আমি বললাম— আরে আমি যে! বদ্যিনাথ! চিনতে পারছ না? ওরা বললে— বদ্যিনাথ বলে কেউ নেই প্রমাণ হয়ে গেছে : তারপর এমনভাবে হাজির হওয়ার মানে? আমি বললাম— আরে আমি যে! ওরা বললে— ওসব বুঝি না, দলিল-পত্রাদি থেকে প্রমাণ হয়ে গেছে তুমি নেই, ছিলেই না, আর এখন এসে হেঁড়ে গলায় 'আমি যে' বললেই হলো। লোকে কি বলবে? এই বলে গলাধাক্কা! তারপর হাসপাতাল! মাস তিনেক সেখানে ভুলটুল বকে তারপর এখানে এসে কাজ নিলাম, সনাতন নাম নিয়ে। এমনি করে বদ্যিনাথ মরল। [১৭]

কোম্পানির লোকেরা শ্রমিক শ্রেণিকে সর্বশান্ত করার সমস্তরকম প্রচেষ্টা করে। তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করার জন্য সমস্তরকম চক্রান্ত করতে তারা পিছুপা হয় না। বদ্যিনাথকে যাতে কোনো ক্ষতিপূরণ না দিতে হয়, তার জন্য তারা ক্ষমতার জোরে সমস্তরকম দলিল-পত্রাদি তৈরি করে রেখেছে এবং তা থেকে মিথ্যা প্রমাণ করেছে যে বদ্যিনাথ বলে কেউ ছিল না। প্রয়োজনে তাকে পাগল সাজাতেও দ্বিধা বোধ করে না। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে লেখা 'ময়নাতদন্ত' পথনাটকেও একইরকম মালিক শ্রেণির সন্ত্রাস ও শোষণের নগ্নরূপ পরিস্ফুটিত করেছেন। যেনতেনপ্রকারেণ নিঃস্ব-রিক্ত-বঞ্চিত শ্রমিক শ্রেণিকে ফাঁকি দেওয়ার কৌশল রপ্ত করে থাকে এই মালিক শ্রেণিরা। এখানে দেখা যায় কারখানার এক বঞ্চিত শ্রমিক তিনবার তার নাম পালটে এখন তার নাম হয়েছে জীবন হালদার। কারণ কারখানায় মাইনে বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নামও পরিবর্তন করতে হয় যাতে সেদিন থেকে সে নতুন লোক হিসেবে কাজ করতে পারে। নইলে যে অনেক বছর চাকরির সুযোগ সুবিধা দিতে হয় ফলে তাদের কাজ হারাতে হয়। নতুন লোক হয়ে কাজ করলে কাজ হারানোর ভয় থাকে না। কারণ নতুন লোকের মাইনে কম আর পুরানো লোকের মাইনে বেশি। কারখানার শ্রমিকদের নাম পালটে পালটে শেষে এমন পরিস্থিতি হয় যাতে তাদের আসল যে নাম সেটাই ভুলে যেতে হয়। একারণেই 'অঙ্গার' নাটকের প্রথম দৃশ্যে খনিশ্রমিক সনাতনের মুখ দিয়ে আমরা শুনতে পাই—

বড় গোলমেলে! আমার নিজেরই ঠিক থাকে না, আমি কে। [১৮]

আসলে উৎপল দত্ত এসবের মধ্য দিয়ে ভারতীয় তথা পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকদের যে নিঃস্ব-রিক্ত-শোষিত রূপ তার বাস্তব ও মর্মান্তিক চেহারা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। শোষক শ্রেণির জাঁতাকলে পড়ে শ্রমিকরা কীভাবে নিষ্পেষিত হয় তার জীবন্ত দলিল আলোচ্য 'অঙ্গার' নাটকটি।

মালিক শ্রেণির মুনাফালোভ ও শ্রমিক শ্রেণির প্রতি তাদের নৃশংসতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত আমরা

দেখতে পাই নাটকের শেষের দিকে অর্থের লোভ-লালসা মানুষকে কতটা হিংস্র, নৃশংস ও অমানবিক করে তোলে তারই প্রতিফলন ঘটে নাটকের শেষ অংশে। কোম্পানির কয়লা উৎপাদন কমে যাওয়ায় তারা ক্ষুধার্ত-নিঃস্ব-রিক্ত শ্রমিকদের নানারকম প্রলোভন দেখিয়ে খনিতে নামতে বাধ্য করে। নাটকের শেষভাগে আমরা দেখতে পাই কয়লা খনির খাদের নীচে ৩৯, ৪০ ও ৪১ নম্বর ডিপ-এ আগুন লেগেছে, সেখানে বহু শ্রমিক মারা গেছে, তাদের দগ্ধ মৃতদেহগুলি তুলে নিয়ে আসা হচ্ছে উপরে। ৪২ নম্বর ডিপ-এ আগুন লাগেনি কিন্তু সেখানে আটকে আছে ছয় জন শ্রমিক এবং একজন সুবাদার। খনির নীচে গভীর অন্ধকারে অন্যান্য ডিপ-এ যখন আগুন লাগে তখন ৪২ নম্বর ডিপের এই সাতটি প্রাণী বাঁচার তাগিদে প্রাণপনে রাস্তা খুঁজতে থাকে। শ্রমিকরা সুড়ঙ্গ থেকে বেরোবার মরিয়া চেষ্টা চালায়। শ্রমিকরা ভাবতে থাকে যে তাদের বাঁচানোর জন্য রেসকিউ টিম নিশ্চয়ই আসবে। কিন্তু সময় গড়িয়ে যায়, ভয়, আতঙ্ক তাদের ক্রমাগত চেপে ধরে। সবাই এতটাই আতঙ্কিত হয় যে তারা আসন্ন মৃত্যুকে যেন দেখতে পায় ও মৃত্যু ভয়ে প্রলাপ বকতে থাকে।

খাদের মধ্যে শ্রমিকরা যখন বেঁচে ফেরার জন্য আকুল চেষ্টা চালাচ্ছে, অবসন্ন শরীরে সমস্ত শক্তি একত্রিত করে যখন সুড়ঙ্গ কেটে বাইরে বেরোনোর প্রাণপন চেষ্টা চালাচ্ছে, তখন স্বার্থপর লোভী কোম্পানি মানুষের প্রাণকে তুচ্ছ করে লক্ষ লক্ষ টাকার কয়লাকে বাঁচানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করে—

ক্যাপ্টেন।। রিপোর্টের সময় এখনও হয়নি। ঢুকতেই পারছি না বিয়াল্লিশ ডিপে। লোক বেঁচে আছে কিনা কি করে বলবো!

দত্ত।। আগুন লেগে গিয়ে থাকতে পারে।

ক্যাপ্টেন।। আগুন তো লেগেছেই। ধোঁয়ার রং দেখছেন না?

দত্ত।। অত লক্ষ টাকার সম্পত্তি— তাই সেটাকে সেভ করার জন্য—

ক্যাপ্টেন।। আর মানুষের প্রাণ? তাকে সেভ করার দরকার নেই?। [১৯]

কোম্পানির লোকেদের কাছে মানুষের প্রাণের থেকে বড়ো হয়ে দাঁড়ায় অর্থ, তাই সেই অর্থকে বাঁচানোর জন্য তারা সাত সাতটি মানুষের প্রাণকে তুচ্ছ করে খাদের মধ্যে জল ছেড়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করে। কোম্পানির অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার মিস্টার দত্তের নেতৃত্বে ৪২ নম্বর ডিপ-এ জল ছেড়ে দেওয়া হয়—

গফুর।। বেরিয়ে আয় শিগগির। রমজান জল ছেড়ে দিচ্ছেরে, বেরিয়ে আয় রমজান। রমজান রে (চিৎকার করে) তোরা বেরিয়ে আয়, জল ছেড়ে দিচ্ছে। তোরা বেরিয়ে আয়, বেরিয়ে আয়।

[স্যাপার চাবি ঘোরায়— মুহূর্তে প্রচণ্ড ঝিলিক মেরে ধরিত্রীগর্ভে বাঁধ ভাঙে। কালো ধোঁয়া আর ধুলোর আস্তরণ সরে যেতে দেখা যায় মা ভয়ে রূপাকে জড়িয়ে ধরেছেন। আতঙ্কে সবাই দাঁড়িয়ে উঠেছে। বিস্ফোরণের শব্দ মেলাতে না মেলাতে শোনা যায় জলের সোঁ সোঁ গর্জন। ধরিত্রীর জঠরে বান ডেকেছে।] [২০]

শেষ দৃশ্যে কয়লা খনির গহ্বরে জল ঢুকে যাওয়া এবং ক্রমাগত বেড়ে যাওয়া জলস্রোতের মধ্যে ডুবন্ত শ্রমিকদের প্রাণ বাঁচানোর যে আকুল আর্তি ও মর্মান্তিক লড়াই বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে কিংবদন্তি হয়ে আছে। খনি শ্রমিকদের জীবনের কথা, তাদের মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কথা, শোষণ ও বঞ্চনার কথা, তাদের সংগ্রামের কথা অর্থাৎ কয়লা খনির শ্রমিক জীবনের এত বাস্তব ও অনুপুঙ্খ ছবি এর আগে বাংলা নাটকে ঘটেনি। উৎপল দত্ত সেটাই করে দেখালেন। তিনি বরাধেমো এলাকাতে বিভিন্ন কয়লা খনিতে ঘুরে তথ্য যেমন সংগ্রহ করেছিলেন তেমনি, খনি শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে তাদের বঞ্চিত ও শোষিত অবস্থার পুঙ্খানুপুঙ্খ অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করেছিলেন। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন—

কয়লা খনির শ্রমিকরা তখন নিজেদের দাবি নিয়ে আন্দোলন করছিল। আর অন্য পক্ষে কয়লাখনির তলার জলে তাদেরই ডুবিয়ে দেওয়া। আগুন লাগা কয়লাখনিতে। এইসব অনেক চমকপ্রদ দৃশ্য দেখবার সুযোগ পাওয়া যাবে। তাই আমরা বরাধেমো এরিয়াতে কয়লাখনি ঘুরে ঘুরে তথ্য-টথ্য সংগ্রহ ক'রে এলাম। নাটক লিখলাম। [২১]

কোম্পানির মালিকদের অর্থলোভ ও স্বার্থপরতা কোন পর্যায়ে যেতে পারে এবং তারই চক্রান্তে ও শোষণ অত্যাচারে অসহায় দরিদ্র-বঞ্চিত খনি শ্রমিকেরা নিজেদের শেষ করে ফেলে। তার নির্মম নিষ্ঠুর ছবি উৎপল দত্ত তুলে ধরেছেন আলোচ্য নাটকে। তিনি শোষিত-বঞ্চিত শ্রমিক পক্ষ নিয়ে পুঁজিবাদী মালিক শ্রেণির শোষণের স্বরূপ ও মুখোশ খুলে দিতে চেয়েছেন। এই শোষণ নিপীড়ন ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে নিজের বক্তব্য উচ্চগ্রামে তুলে ধরেছেন। তার জন্য তাঁকে অনেক আক্রমণও সহ্য করতে হয়েছে। শুধু শারীরিকভাবে নয়, মানসিকভাবেও তিনি আক্রান্ত হয়েছেন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকার পক্ষ থেকেও তাঁর নাটকের তথ্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছে—

'অঙ্গার'কে হিংস্র আক্রমণ করল বড়লোকদের পত্রপত্রিকা। শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার হয় এ কথা নাকি মিথ্যা। লিট্‌ল্ থিয়েটার নাকি অশ্লীলতার অনুশীলন করছে। এ-দল বাংলা নাট্যশালার পবিত্র ঐতিহ্য নষ্ট করছে। [২২]

শোষিত-বঞ্চিত ও নিপীড়িত মানুষের করুণ কাহিনি 'তীর' নাটকে উৎপল দত্ত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অতি নিপুণতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে নকশালবাড়ি অঞ্চলে সাঁওতাল, ওরাওঁ, নেপালি, রাজবংশী জনজাতি মানুষের শোষিত ও বঞ্চিত অবস্থার করুণ কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। জমিদার জোরদার শ্রেণি কীভাবে কৃষকদের ধান কেড়ে নিচ্ছে, কীভাবে তারা দিনের পর দিন মুনাফা লাভের জন্য চাল মজুত করছে ও দরিদ্র কৃষকদের অভুক্ত ও শোষিত করে রেখেছে তা উৎপল দত্ত সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন। তথ্য সংগ্রার্থে তিনি নকশালবাড়ি অঞ্চলে দীর্ঘদিন অবস্থান করেছিলেন ও এইসব জনজাতি অর্থাৎ সাঁওতাল, রাজবংশী, ওরাওঁ, নেপালি প্রভৃতি মানুষদের সঙ্গে মিশে তাদের দুঃখ-দুর্দশার কাহিনি শুনে তিনি তা বর্ণনা করেছেন। নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে দেখা যায় ধনী জোরদার সত্যবান সিং-এর গৃহের প্রাঙ্গন। সেখানে সে তার সহযোগী বৃক্ষ রায়-এর সঙ্গে জমির চাষিদের উপস্থিতিতে হিসাবে বসেছেন। তারা মিথ্যা হিসাব দেখিয়ে মজুরির বড়ো অংশ মেরে দিচ্ছে, তাদের যথাযোগ্য প্রাপ্য ধানও আত্মসাৎ করছে। দরিদ্র কৃষকদের সামান্য মজুরি ও শুকনো চিঁড়ের বদলে তাদের দ্বারা অমানুষিক পরিশ্রম করিয়ে নেন, অথচ তারা যখন তাদের প্রাপ্য চাইতে যায় তখন মিথ্যা হিসাবের জালে, মিথ্যা ঋণের ফাঁদে ফেলে তাদের প্রাপ্য তো জোটেই না সঙ্গে উপরি পাওনা হিসাবে ঘাড়ের ওপরে চাপে নানারকম ঋণের ভার সঙ্গে জোটে অত্যাচার। হতদরিদ্র কৃষক রণবাহাদুরকে দেখি তাকে মিথ্যা হিসাব দেখিয়ে পনেরো দিনের মাইনে সত্যবান সিং-এর যোগ্য সহযোগী বৃক্ষ রায় আত্মসাৎ করে ফেলে ধার নেওয়ার অজুহাতে। বরং তার কাছে আরও একশো টাকা পাওয়ার হিসাব দেখিয়ে দেন। জমিদার জোরদার শ্রেণির শোষণের এই বাস্তব ও নির্মম চিত্র উৎপল দত্ত তুলে ধরেছেন অসাধারণ শিল্প নৈপুণ্যতায়।—

বৃক্ষ।। ... এস -বির্সা ওরাওঁ, সানঝো ওরাইন— গত তিন দিনের বাকি আছে, বির্সার দুটাকা করে ছ'টাকা, সানঝোর দেড় টাকা করে সাড়ে চার। নাও— তারপর ওখানে চিঁড়ে আছে, খেয়ে মাঠে যাও—। চটপট, চটপট—

বির্সা।। চাহা দেয়ার কথা ছিল যে? চা, চা—

সত্যবান।। লবণের একান্ত অভাবের দরুণ চাহা পাবে না।...

বৃক্ষ।। শনিচারোয়া ওরাওঁ, বাকি নেই— মাঠে যাও।

শনিচারোয়া।। না, না, বাকি আছে বইকি, দুদিনের চার টাকা।

বৃক্ষ।। খাতায় নেই। রণবাহাদুর থাপা— ...

বৃক্ষ।। রণবাহাদুর থাপা, বাকি নেই!

রণবাহাদুর।। সে কি? পনেরো দিনের মাইনে বাকি। ৩০ টাকা।

বৃক্ষ।। বাঃ, ধান ধার নিয়েছিলে না?

রণবাহাদুর।। ধার নিয়েছিলাম নাকি?

বৃক্ষ।। এই তো— চার বারে আট মণ ধান। আমরাই বরং তোমার কাছে পাবো একশ—। [২৩]

রাজবংশী কৃষক উপাসু সিং যখন জোরদার সত্যবান সিং-এর সহযোগী বৃক্ষ রায়ের কাছে ধানের হিসাব করতে যায় তখন দেখি তার পঁচিশ মণ ধান হাওলাত নেওয়া, খোরাকি নেওয়া, জমিতে গোরুর মজুরি হিসাব বাবদ সবকিছু কেটে নিয়ে তার উপর আবার এগারো মণ ধানের ঋণ চাপিয়ে দেওয়া হয় ভুল হিসাব দেখিয়ে। সহজ-সরল-সাদাসিধে এই কৃষকরা হিসাবের এই ঘোরপ্যাঁচ বুঝতে পারলেও তারা প্রতিবাদ করতে পারেন না। তাদের মুখ বুজে সব কিছুই সহ্য করতে হয় পেটের দায়ে। এর মধ্যে সাঁওতাল কৃষক গেব্রিয়েল-এর মতো যদি কেউ প্রতিবাদ করে তাহলে তাকে বিভিন্নরকম হুমকি দেওয়া এবং জোরদার-এর খেত থেকে কাজও ছাড়িয়ে দেয় কিংবা কাজ ছাড়িয়ে দেওয়ার ভয়ও দেখায়। এই শোষিত দরিদ্র কৃষকরা পেটের অন্ন সংস্থানের অন্য উপায়ন্তর না পেয়ে শেষ পর্যন্ত সত্যবান সিং-এর সমস্ত অন্যায় অত্যাচার মেনে নিয়ে আবার তার কাছেই পেটের দায়ে কাজে যোগ দেয়।—

বৃক্ষ।। উপাসু সিং, ধান পাওনা নেই।

উপাসু।। আমি-আমি পুরো পঁচিশ মণই তো জমা দিয়ে গেছি। পঁচিশ মণ লেখা আছে তো?

বৃক্ষ।। হ্যাঁ। তা থেকে বারো মণ গেল গিরির—

উপাসু।। তাহলে আমি পাই তেরো মণ—

বৃক্ষ।। গরুর পানো বাবদ ছ'মণ কাটা গেল—

উপাসু।। তবু থাকে সাত—

বৃক্ষ।। আর ভুতা? তোমার খোরাকি? তাতে গেল ছ'মণ—

উপাসু।। [ক্রমশ হতাশ] তবু থাকে— এক—

বৃক্ষ।। আর হাওলাৎ নিয়েছিল বারো মণ ধান; তাহলে—

উপাসু।। তাহলে আমি পাচ্ছি না, আপনারা পাবেন এগারো মণ এই তো?

বৃক্ষ।। হ্যাঁ।

উপাসু।। জানতাম! ... সারা বছর খেটে ধান তুললাম, এখন ভেদেংগা চাষীর হিসেবে সে তো নেই ই। আরো ১১ মণের ঋণ শূন্য থেকে এসে চাপলো স্কন্ধে।...

বৃক্ষ।। গেব্রিয়েল, চারদিনের বাকি আট টাকা।

গেব্রিয়েল।। না, পাঁচ দিনের দশ টাকা।

বৃক্ষ।। খাতায় লেখা আছে।

গেব্রিয়েল।। খাতায় ভুল লেখা আছে।

বৃক্ষ।। না ভুল নেই।

গেব্রিয়েল।। তাহলে জোচ্চুরি করা আছে।

বৃক্ষ।। কী বললে?

গেব্রিয়েল।। ইচ্ছে করে মিথ্যে লিখে ঠকাবার চেষ্টা করছেন। সোমবার থেকে টাকা দেয়নি। আজ শনিবার। পাঁচ দিন হয়।

বৃক্ষ।। সাবধান গেব্রিয়েল!

গেব্রিয়েল।। আপনি আরো সাবধান, বৃক্ষবাবু!

বৃক্ষ।। এই রবিরাম! ধর তো ব্যাটাকে—

গেব্রিয়েল।। তীর মেরে বুকে ছ্যাঁদা ক'রে দেব, বৃক্ষবাবু, বেশি যদি খচরামি করেন। টাকা দিন।

সত্যবান।। দিয়ে দিন। ওকে আর দরকার নেই। আজ থেকেই ও যেন অন্যত্র কাজ দেখে। [২৪]

আর এক হতদরিদ্র কৃষক শুক্রা টুডু। তার যখন হিসাবের ডাক পড়ে এবং তার প্রাপ্য একদিনের মজুরি দু'টাকা নেওয়ার জন্য সত্যবান সিং-এর সাক্রেত বৃক্ষ রায় বলে তখন সে তাদের হিসাব-নিকাশকে ব্যঙ্গ করে এবং একদিনের প্রাপ্য মজুরি দু'টাকা নিতে অস্বীকার করে।—

বৃক্ষ।। শুক্রা টুডু একদিনের বাকি— দুটাকা।

শুক্রা।। হতে পারে না— এ হতে পারে না— কিছুতেই হতে পারে না—

বৃক্ষ।। লেখা আছে— এই দেখ, দু টাকা তার বেশি কি করে হবে, কারণ—

শুক্রা।। বেশি নয়! বলছি, দু টাকা আমি পেতে পারি না।

বৃক্ষ।। [থতমত খেয়ে, খাতা দেখে] না... দু টাকা পাবি এই যে—

শুক্রা।। নিশ্চয়ই ধার আছে। কেটে নিন। কেটে নিন।

বৃক্ষ।। ধার নেই তোর-এই তো-

শুক্রা।। তাহলে আমার বাপের ধার ছিল!। [২৫]

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট এল কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসানে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হল। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জন করল। দেশের আপামর কোটি কোটি জনগণ স্বপ্ন দেখল নতুন সরকার তাদের সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য আত্মনিয়োগ করবে। কিন্তু নেহেরুর নেতৃত্বে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকার দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা সমূলে নির্মূল করে দেয়। অচিরেই দেশের সাধারণ জনগণ বুঝতে পারে যে ভারতবর্ষের সরকার আসলে বিদেশি পুঁজির সরকার, তারা বিদেশি পুঁজির সংরক্ষণ ও প্রতিপালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সরকারের নতুন নতুন নীতি নির্ধারণ, নতুন নিয়ম প্রণয়ন সবই মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। সাধারণ জনগণের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে জমিদার-জোতদার শ্রেণিরা ও এক শ্রেণির মুনাফাবাজ মানুষ নিজেদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ক্রমাগত বর্ধিত করে তুলেছে। মুনাফাবাজ জমিদার-জোতদারদের জাঁতাকলে পড়ে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত। প্রতিবাদী কণ্ঠগুলোকে পুলিশি অত্যাচার-জুলুমের দ্বারা স্তব্ধ করে রাখা হয়েছে। কৃষকদের ন্যায্য দাবিগুলিকে সুপরিকল্পিতভাবে পদদলিত করা হয়, কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণির সুদ ও করের হ্রাসের দাবি, জমির দাবি প্রভৃতির জন্য যে সংগ্রাম, সেই সংগ্রামগুলোকেও নির্বিচারে রক্তের বন্যায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

ভারবর্ষের প্রেক্ষাপটে এহেন অপ্রীতিকর ঘটনার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দেশের সমস্ত গণতান্ত্রিক, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, সামন্ততন্ত্র বিরোধী শক্তির বিকল্প হিসেবে জনমানসে শোষিত, অত্যাচারিত মানুষের সহায়সম্বল হয়ে ওঠে। কৃষকদের বিনামূল্যে জমি বন্টন, কর মকুব, বিদেশি পণ্যের পরিবর্তে জাতীয় শিল্পের সংরক্ষণ ও শিল্পায়ণের উপযুক্ত ব্যবস্থা করার কথা বলে শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতি আস্থা অর্জন করতে থাকে। এক সুস্থ-সুন্দর গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের স্বপ্ন দেখাতে থাকে। কমিউনিস্ট পার্টি সারা ভারতবর্ষ জুড়ে শ্রমিক শ্রেণির উন্নত জীবনযাত্রা, দেশ থেকে বেকার দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে। জমিদার-জোতদার, মজুতদারদের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থ রক্ষার জন্য তাদেরকে সমবেত করার প্রচেষ্টা

করতে থাকে, পুঁজিবাদ বিরোধী নানা কার্যকলাপে তারা অংশগ্রহণ করে। বলাবাহুল্য এইসব বিভিন্নরকম কর্মসূচি আপামর মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

স্বাধীনতা আসার পরেই কমিউনিস্ট পার্টির কার্যকলাপের মধ্যে কিছুটা অতি বাম হটকারী বৈশিষ্ট্য ও আচার-আচরণ লক্ষ করা গেল। তেলেঙ্গানা আন্দোলন ও তেভাগা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশিত। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীন দেশে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করল ফলে পার্টির রাজনৈতিক কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেল। কার্যকলাপ-সংগঠন প্রভৃতিও ব্যাহত হল। সরকার মদতপুষ্ট প্রশাসনের পাশাপাশি গুণ্ডাবাহিনীর আক্রমণে কমিউনিস্ট কর্মীদের প্রাণহানি, হেনস্থা সবই ঘটতে থাকল। কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক শাখা গণনাট্য সংঘ তারও তখন খুবই দুরাবস্থা। আবার কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনের ভিতরেও কর্মীদের মধ্যে নানারকম মতভেদ তৈরি হচ্ছিল। এইসব নিয়ে গণনাট্য সংঘের মধ্যেও নানা মতানৈক্য দেখা দিল। গণনাট্য সংঘ ছেড়ে অনেকেই বেরিয়ে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ নাট্যদল তৈরি করে নাটক অভিনয় শুরু করলেন। গণনাট্য সংঘ থেকে শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র প্রভৃতি বিশেষ নাট্যব্যক্তিত্ব বেরিয়ে এসে তৈরি করলেন 'বহুরূপী নাট্যগোষ্ঠী'। 'বহুরূপী নাট্যগোষ্ঠী' প্রথমদিকে তারা গণনাট্য প্রযোজিত নাটকগুলোই করতে লাগলেন, বা সেইরকম ভাবনার নাটকই শুরু করলেন 'ছেঁড়া তার', 'পথিক', 'নবান্ন' প্রভৃতি। কিছুদিন পরেই দুটি শিবির আলাদা হয়ে গেল। গণনাট্য সংঘে যারা থাকলেন তারা নিজেদের ভাবনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শ অনুযায়ী নাটক করতে থাকলেন। গণনাট্য থেকে যারা বেরিয়ে এসে নিজেদের মতো নাটক করার চেষ্টা করলেন, কংগ্রেস সরকার তাদেরকে স্বাগত জানাল। কেউ কেউ এদের নাট্য প্রয়োজনার প্রচেষ্টাকে আরেকটা নবতর আন্দোলনের পর্যায়ভুক্ত করে দিলেন— যার নাম দেওয়া হল 'নবনাট্য আন্দোলন'। শম্ভু মিত্রকে ওই শিবিরের প্রধান হিসেবে বরণ করে নিলেন। রাজনৈতিক নাগপাশ (কমিউনিস্ট পার্টির) থেকে বেরিয়ে এসে শিল্পের প্রতি গুরুত্ব তাদের কাছে প্রধান হয়ে দাঁড়াল। গণনাট্য সংঘ থেকে বেরিয়ে এসে রাজনীতি মুক্ত নাট্যচর্চা করতে থাকায় সরকার তাদের বিপুল অর্থ ও সম্মান প্রদান করলেন। নতুন নাট্যদল বৃহৎ শাসন ও শোষণের সপক্ষে কথা বললেন। অর্থাৎ শাসকের হয়ে কথা বলা তদানীন্তন সরকার রাজনীতি মনে করতেন না। শাসকের ঘুমভাঙার এই প্রচেষ্টাকে রাজনীতি হিসেবে ধরে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন।

অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় এক পুলিশি ফতোয়া জারি করে গণনাট্য সংঘের ঊনষাটটি নাটকের অভিনয় নিষিদ্ধ করলেন। প্রচার শুরু করলেন গণনাট্য সংঘের কমিউনিস্ট কর্মীরা শিল্পে রাজনীতির প্রবেশ করিয়ে রাজনীতি করছে। তাই সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করা,

সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলা নাটকের অভিনয়গুলো বন্ধ করলেন। স্বাধীন দেশে এমন কিছু কিছু নাটক প্রযোজিত হচ্ছিল যে, স্বাধীন সরকারের পক্ষে নিশ্চিন্তে থাকা যাচ্ছিল না। তদানীন্তন কংগ্রেসি সরকার কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি মানুষদের স্বার্থহরণকারী যে কার্যকলাপ গ্রহণ করেছিল তা গণনাট্য সংঘের নাট্যকাররা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিলেন না। তারা সরকারের মুখোশ খুলে জনতার দরবারে উন্মোচন করতে শুরু করেছিলেন। ফলস্বরূপ বিধানচন্দ্র রায়ের সরকারের রোষানলে পড়তে হয়েছিল গণনাট্য সংঘের নাট্যকারদের এবং নাটকগুলিকেও।

১৯৫০-এর দশকে ভারতীয় তথা পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ডামাডোল অবস্থা, সেই সঙ্গে পশ্চিমবাংলার নাট্যজগতের নানা উত্থান-পতনের অবস্থায় উৎপল দত্তের নাট্য জগতে প্রবেশ। চল্লিশের দশকের শেষের দিকে কলেজে তখন তিনি ছাত্র, সেই সময় কিছু নাটকে অভিনয় করেছেন। শেকসপিয়রের নাটকে অভিনয় দিয়ে তাঁর শুরু। ক্রমশ শেকসপিয়র থেকে বার্নাড শ’, বার্নাড শ’ থেকে ক্লিফোর্ড অডেটস-এর লেখা বিখ্যাত বিখ্যাত নাটকে তিনি অভিনয় করেছেন। শেকসপিয়েরর নাটকে অভিনয়ের সময় (জুলিয়াস সিজারও) উৎপল দত্ত সিজার ও তার অনুচরদের যে ফ্যাসিস্ট আচার-আচরণ ও পোশাক সেগুলো অনুকরণ করার চেষ্টা করতেন—

> *পরের নাটক আধুনিক পোশাকে ‘জুলিয়াস সিজার’। আধুনিক বলতে ফ্যাসিস্ত ইটালিয় উর্দিতে। ইংরেজি নাটক কলকাতা শহরে যতটা আলোড়ন তুলতে পারে এ-নাটক তুলেছিল। শেক্‌স্‌পিয়ারের একটি অক্ষর পরিবর্তন না করেও একটি অত্যাধুনিক রাজনৈতিক নাটক হয়ে উঠেছিল সিজার।* [২৬]

জর্জ বানার্ড শ’-এর রাজনীতি ভাবনার নাটকগুলিতে যে রাজনীতি ধরা পড়েছে সেগুলোকে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতেন। আবার ক্লিফোর্ড অডেট্‌স-এর নাটক ইউরোপের নতুন রাজনৈতিক আন্দোলনের নাটক; সেই রাজনৈতিক আন্দোলনগুলিকে উৎপল দত্ত সুন্দরভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করতেন। কাকদ্বীপে নারী হত্যা, কারাগারে নির্বিচারে গুলি চালানো, নয়ানপুরে লাল মাটি, ডিব্রুগড়ে গণনাট্যের অনুষ্ঠানে গুলিবর্ষণ, ময়দানে হাজরাপার্কে জনসমাবেশে বেপরোয়া গুলি চালানো, বউবাজারে নারী মিছিলে গুলি প্রভৃতি নৃশংস ঘটনা যখন একের পর এক ঘটতে থাকে তখন গণনাট্য সংঘ ক্লিফোর্ড অডেটস-এর বিপ্লবী নাটক “Till the Day I Die” অভিনয় করেন। ইউরোপীয় রাজনৈতিক আন্দোলনকে কলকাতার ভারতীয় কমিউনিস্টদের আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম করে তুলেছিলেন—

> *নিষিদ্ধ এক কমিউনিস্ট পার্টির আমৃত্যু সংগ্রামের কাহিনী ওডেট্‌স-এর ‘টিল দা ডে আই ডাই’ হল আমাদের পরের নাটক। জর্মন পার্টি বীরত্ব গাথা ৪৯-এর কলকাতায় ভারতীয় কমিউনিস্টদের আত্মবলির কাহিনী হয়ে উঠেছিল।* [২৭]

এইভাবে রাজনৈতিক ভাবনায় ভাবিত হয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক ভাবনার প্রস্তুতি নিয়ে, উৎপল দত্ত **১৯৫১** খ্রিস্টাব্দে গণনাট্য সংঘে যোগ দেন। গণনাট্য সংঘ তাঁকে জনতার মুখরিত সখ্যে নিয়ে গেল। একটা আলোকিত জাগরণে মেতে উঠলেন তিনি। গণনাট্যের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন নাটক ও পথনাটক করতে শুরু করলেন, কোনটা অভিনেতা হিসেবে, কোনটা আবার পরিচালনা করলেন। গণনাট্যের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে রাজনীতির সঙ্গে ক্রমশ অভিজ্ঞ হতে থাকলেন—

> *রাজনীতি কত যে শিখেছি, তাঁদের কাছে হ্যারিকেন-জ্বালা রাত্রের অস্পষ্ট মায়ায়, তা বোধহয় তাঁরা নিজেরাও জানেন না। পরদিন ভোর থেকে আবার টহল— হেঁটে, লরিতে, জগদ্দলের মতন এক বিস্ফোরক মোটরগাড়িতে। বাটা কারখানার গেটে, নুংগিতে, বজবজে, দশ বারো মাইল দূরের গাঁয়ে, মহেশতলার প্রতি পথের মোড়ে।* [২৮]

সেইসময় অনেক নাট্যশিল্পী রাজনীতির ছ্যুৎমার্গে গণনাট্য সংঘকে পরিত্যাগ করেছেন কিন্তু উৎপল দত্ত গণনাট্য সংঘের সঙ্গে যুক্ত থেকে নানারকম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। এইভাবে প্রায় দশমাস গণনাট্যের সঙ্গে যুক্ত থেকে উৎপল দত্ত নিজের রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা ও ভাবনাকে ভালোভাবে গড়ে নিয়েছিলেন। উৎপল দত্তের কথায়—

> *মোট দশ মাস গণনাট্যে। কিন্তু এই দশ মাসে যা সঞ্চয় করেছি তার তুলনা কোথায়?* [২৯]

রাজনৈতিক টালমাটাল, বাংলা নাট্যজগতের দিশাহীন পটভূমিতে দাঁড়িয়ে উৎপল দত্ত থিয়েটারের কাজ করতে গিয়ে উপলব্ধি করলেন, থিয়েটারের কাজটা হবে আপাদমস্তক মতাদর্শগত। তিনি লক্ষ করেছিলেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠা তার বিকাশ ও ব্যাপ্তি এই মতাদর্শগত চিন্তারই প্রতিফলন। একটা সময় থিয়েটার মানেই ছিল বাবুবিলাসের পরিপন্থী, উৎপল দত্ত গণনাট্য আন্দোলনেই প্রথম থিয়েটারকে বাবুবিলাসের কক্ষ থেকে সরিয়ে এনে দাঁড় করিয়েছিলেন একেবারে আমজনতার মাঝখানে তিনি তাঁর লেখায়, কথায় শোষিত-নিপীড়িত শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে নায়ক হিসেবে মঞ্চে হাজির করেছেন। শিল্প-সংস্কৃতিকে সমাজ বিজ্ঞানের বৈপ্লবিক চিন্তা, প্রচার ও প্রসারের কাজে ব্যবহার করেছেন তরবারির মতো। উৎপল দত্তই বাংলার প্রথম নাট্যকার, যিনি সরাসরি বিষয়বস্তু হিসেবে রাজনীতিকে তাঁর সমগ্র রচনায় স্থান দিয়েছিলেন। অন্যান্য নাট্যকারদের মতো বিভিন্ন নাটক রচনার ফাঁকে রাজনীতি বিষয়ে নাট্য রচনা করেননি। বলা যেতে পারে রাজনীতি ও রাজনৈতিক বিষয়বস্তু উৎপল দত্তের সমগ্র নাট্যকার সত্তার প্রাণ ভোমরাস্বরূপ।

উৎপল দত্ত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সর্বদাই ছিলেন মার্কসবাদী। সেই মার্কসবাদী

চিন্তাধারাকে থিয়েটারে সফলভাবে প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। সেই চিন্তায় কখনো বিচ্যুতি ঘটলেও তা দ্রুততার সঙ্গে সংশোধন করেছেন এবং মার্কসবাদের প্রতি আদ্যন্ত বিশ্বাসে কখনোই বিচলিত হননি। তাঁর সময়সাময়িক বা নিকট বা দূর অতীতের রাজনৈতিক বিষয়কে কেন্দ্র করে নাট্য রচনা করেছেন এবং তা সর্বদা মার্কসবাদী চিন্তাধারার আলোকে। তাঁর নাট্যদলের উপরে কখনো শাসকবর্গের অকথ্য অত্যাচার ও আক্রমণ, ব্যক্তিগত জীবনে নানারকম হেনস্থা ও হাজতবাসকে সঙ্গী করতেও পিছুপা হননি। রাজনৈতিক ভাবনার জগৎ থেকে তিনি কখনোই সরে আসেননি নানারকম প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েও। সমসাময়িক বিষয়কে রাজনীতিতে নিয়ে আসায় শাসক শ্রেণির দ্বারা ও বিরোধী শ্রেণিশত্রুর আক্রমণ, হামলা, অত্যাচারে কখনোও ভীত হননি। শ্রেণিশত্রুর মুখোশ উদ্‌ঘাটন করতে ও তাদের স্বরূপ উন্মোচন করতে সদা সর্বদা নাট্যরচনায় ব্রতী ছিলেন।

উৎপল দত্ত দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়েছেন, প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে শামিলও হয়েছেন এবং সে আন্দোলনের দাবিতে বিভিন্ন প্রয়োজনে পথনাটক রচনা করেছেন, অভিনয় করেছেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক বক্তৃতাও দিয়েছেন। সেই রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও কখনো মার্কসবাদ থেকে তিনি দূরে সরে যাননি। রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের বিশাল প্রেক্ষাপটকে জড়িত করেই তিনি তাঁর বিভিন্ন রাজনৈতিক নাটক রচনা করেছেন। তাই তাঁর দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা শুনতে পাই—

> *যেদিন থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনে আমি যুক্ত থাকতে পারব না সেদিন থেকে আমার শিল্প সত্তারও মৃত্যু ঘটবে।* [৩০]

অতীতের ইতিহাস থেকে উপাদান নিয়ে এদেশের ঘটনার ব্যাখ্যা করে, বর্তমানের সমাজ দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণ করে কিংবা বিভিন্ন দেশের মানুষের বিভিন্ন মুক্তি সংগ্রামের কাহিনি এনে তিনি তাঁর নাটকে রাজনৈতিক ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। বুর্জোয়া মানবতাবাদ নয়, সর্বহারার দৃষ্টিতে সর্বহারার মানবতাবাদই উৎপল দত্তের নাটকের প্রধান ঘটনাবলি। তাই তিনি সমাজকে ও শ্রেণি বিভক্ত সমাজকে বিশ্লেষণ করেছেন মার্কসবাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ও মার্কসবাদের বিচার ধারায়। মার্কসবাদী ভাবধারা আদর্শ বহন করতে গিয়ে সমকালীন সময়ের শাসক শ্রেণির কাছ থেকে নানা আঘাত, নিন্দাবাদ, প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। সেই সঙ্গে গুণ্ডা-বদমায়েশেরা নানারকমভাবে তাঁর শারীরিক নির্যাতন ও আঘাত করেছে।

উৎপল দত্ত বিষয় ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে নাটকের আঙ্গিকের প্রতিও সদা সর্বদা সজাগ দৃষ্টিভঙ্গি রেখেছিলেন ও নাটকের আঙ্গিকও মার্কসবাদী চিন্তায় আবদ্ধ রেখেছিলেন। তিনি সবসময় মনে করতেন নাটকের বিষয়বস্তু হবে আন্তর্জাতিক মানের এবং অবশ্যই সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। সেই

সঙ্গে নাটকের আঙ্গিক হবে সম্পূর্ণ দেশীয় ও জাতীয় আঙ্গিকে নির্মিত। মার্কসবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে সদাসর্বদা সামঞ্জস্য রেখে নাটকের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক নির্বাচন করেছিলেন।

উৎপল দত্ত তাঁর সমস্ত জীবনব্যাপী মার্কসবাদী চিন্তাধারাকে তাঁর নাট্যকর্মে ও বাস্তব জীবনে ধারণ ও বহন করে গেছেন। মার্কসবাদী চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসী হয়ে বিভিন্ন আন্দোলনে শামিল হয়েছেন। উৎপল দত্তের নাটকীয় দর্শন আলোচনার ক্ষেত্রে মার্কসবাদ সম্পর্কে আলোচনা প্রাসঙ্গিক।

১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে জার্মানিতে কার্ল মার্কসের জন্ম হয়। কার্ল মার্কসের চিন্তাভাবনা, ন্যায়-নীতি, জ্ঞান-দর্শন প্রভৃতিকে মার্কসবাদ বলে। কাল মার্কস প্রথম জীবনে আইন নিয়ে পড়াশোনা করেন, তারপর ইতিহাস আর দর্শন পড়বার দিকে ঝোঁক তৈরি হয়। শেষপর্যন্ত দার্শনিক গবেষণার দরুন তিনি ডক্টরেট উপাধি অর্জন করলেন এবং স্থির করলেন দর্শনের অধ্যাপনাই গ্রহণ করবেন। কিন্তু অধ্যাপনা তাঁর করা হয়ে উঠল না কারণ সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে দার্শনিক মতাবর্ত্তা কোনোভাবেই নিরাপদ ছিল না। ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে মার্কস অধ্যাপনার আশা ছেড়ে দিয়ে সরাসরি রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়াই মনস্থির করলেন, কারণ সেই সময় সমগ্র জার্মানিতে রাজনৈতিক আন্দোলন বেশ জোরদার হয়ে উঠেছিল। রাজনীতিতে তাঁর আবির্ভাব সরকারি এক পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে। ক্রমে সরকারের চাপে মার্কসের সম্পাদিত পত্রিকার বিরুদ্ধে নিষেধ জারি হয় এবং পত্রিকাটিকে জোর করে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে কাল মার্কস জার্মানি ছেড়ে প্যারিসে চলে যান। সেখানে পরের বছর ঘটনাক্রমে ফ্রেডরিক এঙ্গেল্স্-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় ও বন্ধুত্ব হয় যা কাল মার্কসের জীবনের অন্তিম লগ্ন পর্যন্ত অটুট ছিল।

এঙ্গেল্স্ একান্তভাবেই কাল মার্কসের সহকর্মী হয়ে উঠলেন, দুজনে মিলে একসঙ্গে বিভিন্ন আলাপ আলোচনা ও চিন্তাভাবনা করা, একসঙ্গে আন্দোলন করা, এমনকি একসঙ্গে বই লেখাও চলতে থাকল তাঁদের। মার্কসবাদের অনেকগুলি মূল গ্রন্থ কার্ল মার্কস ও এঙ্গেল্স্—এই দুজনে মিলে লেখা। অবশ্য অনেকগুলি শুধুমাত্র এঙ্গেল্স্-এর লেখা। মার্কসবাদে কার্ল মার্কস-এর পাশাপাশি ফ্রেডেরিক এঙ্গেল্স্-এর অবদান ও অনস্বীকার্য, তাই এঙ্গেল্স্-এর অবদান সম্বন্ধে খেয়াল রাখবার জন্যই পরবর্তীকালে লেনিন মার্কসবাদের নাম দিয়েছেন— 'মার্কস-এঙ্গেল্স্ মার্কসবাদ'।[৩১] ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে মার্কস আর এঙ্গেল্স্ দুজনে একসঙ্গে 'কমিউনিস্ট লীগ' বা সাম্যবাদী সংঘ নামক এক গোপন সমিতির সদস্য হন। এই সমিতির কাজকর্মের সঙ্গেও দুজনে ক্রমাগত জড়িয়ে পড়েন এবং ক্রমশ সমিতি পরিচালনার প্রধান ভূমিকা অবলম্বন করেন। এই সমিতির তাগিদে দুজনে মিলে একসঙ্গে রচনা করেন 'কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো' বা সাম্যবাদীর

ফতোয়া। এই ফতোয়াই সাম্যবাদের বৈজ্ঞানিক রূপ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হল। দীর্ঘ বছর ধরে একটানা অমানুষিক মেহনত করে পৃথিবীর সেরা সেরা পাঠাগার উজাড় করে পুথি সংগ্রহ করে লিখলেন 'ডাস ক্যাপিটাল' বাংলা করলে দাঁড়ায় 'পুঁজি' বা 'মূলধন'। 'ডাস ক্যাপিটাল'-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে। দ্বিতীয়, তৃতীয় খণ্ড লেখার জন্য অগাধ মালমশলা জোগাড় করেছিলেন কার্ল মার্কস। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড লিখে শেষ করা তাঁর নিজের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাঁর আকস্মিক মৃত্যু ঘটার কারণে। তাই দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড লিখে শেষ করার কাজ এঙ্গেল্স্-এর উপর বর্তায় এবং 'ডাস ক্যাপিটাল'-এর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খণ্ড এঙ্গেল্স্ই শেষ করেন।

মার্কসবাদ হল বিজ্ঞান, কোনো মহাগুরুর অমৃতবাণী নয়। বিজ্ঞানের মতো মার্কসবাদেও দিনের পর দিন উন্নতি, অগ্রগতি ও নতুন নতুন আবিষ্কার। তাই মার্কস যা লিখেছেন, যা ভেবেছেন, যা বলেছেন শুধু সেইটুকুকে স্মৃতি মতো আঁকড়ে ধরতে যাওয়া মার্কসবাদ অনুমোদন করে না; কেন-না, মার্কসবাদে কোনোরকম সনাতন চিরন্তন সত্যের স্থান নেই। আসলে মার্কস কতগুলো মূল সূত্র দিয়ে গিয়েছেন, মার্কসবাদীদের দায়িত্ব কর্তব্য হল সেই মূল সূত্রগুলিকে পরিস্থিতির সঙ্গে, পরিবেশের সঙ্গে প্রয়োগ করা। লেনিন তাঁর সময়কার পৃথিবীকে মার্কসবাদের মূল সূত্রগুলো অনুসারে ভালো করে বুঝতে চেষ্টা করলেন এবং তার সময়কার রাশিয়ার অবস্থার উপরে মার্কসবাদের মূলসূত্রগুলো যথাযথভাবে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছিলেন। মার্কসবাদের সূত্রগুলি লেনিন সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে পেরেছিলেন বলেই মার্কসবাদে লেনিন-এর অবদান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল, এবং মার্কসবাদেও দেখা গেল অগ্রগতি ও রাশিয়ার অভূতপূর্ব উন্নতি। লেলিনের পরে স্তালিন। স্তালিনের সময় পৃথিবীর অবস্থা ও পরিবেশ পরিস্থিতি আরও বদল ঘটে। স্তালিন নতুন নতুন সমস্যা, নতুন নতুন পরিস্থিতির মুখোমুখি হলেন এবং মার্কসবাদের মূল সূত্রগুলিকে লেনিনের অবদানকে স্পষ্টভাবে মাথায় রেখে সেই নতুন পরিবেশ পরিস্থিতির উপরে মার্কসবাদের সূত্রগুলোকে সার্থকভাবে প্রয়োগ করলেন ও মার্কসবাদকে গড়ে তুললেন আরও সমৃদ্ধভাবে। তারপর মাও-সে-তুঙ, ইনি মার্কসবাদের প্রয়োগ ঘটান চীনের ওপর। ইউরোপের দেশগুলোর তুলনায় চীন দেশের পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অন্যরকম, মাও-সে-তুঙ সেই পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পূর্ণ অবগত হয়েও পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মার্কসবাদের সূত্রগুলির প্রয়োগ করলেন। মার্কসবাদের সার্থক প্রয়োগ করে মাও-সে-তুঙ চীনের ইতিহাসে এক আমূল পরিবর্তন ঘটালেন। সঙ্গে সঙ্গে মার্কসবাদের ইতিহাসেও নতুন অবদানের স্বাক্ষর রাখলেন।

মার্কসবাদের মূল কথা হল জ্ঞানের সঙ্গে কর্মের, মাথা খাটানোর সঙ্গে গতর খাটানোর

একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা চাই। এই সম্পর্ক ভেঙে গেলে জ্ঞান হবে বৃথা জ্ঞান। মানুষ যদি চোখ বাঁধা বলদের মতো শুধু গতর খাটায়, যদি তার কর্মের সঙ্গে জ্ঞান ও চেতনার যোগাযোগ না থাকে তাহলে তার শ্রমটুকু হবে অনর্থক, নিষ্ফল। তাই একপিঠে জ্ঞান আরেকপিঠে কর্ম, কর্মকে বাদ দিলে জ্ঞান হবে পঙ্গু, বন্ধ্যা। একইরকমভাবে জ্ঞানকে বাদ দিলে কর্ম হবে অন্ধ-অর্থহীন। সব জিনিসের ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য, তা সমাজতত্ত্বের বেলাতেও, আবার রাজনীতির ক্ষেত্রেও।

মার্কসবাদ হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণির মতবাদ। পুঁজিবাদী দুনিয়ায় কৃষক-শ্রমিক শ্রেণিরা সদাসর্বদা অবহেলিত, বঞ্চিত ও শোষিত হয়ে থাকে। শ্রমিক শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি ও তাদের কার্যকলাপের মধ্য দিয়েই জগতকে বোঝা সম্ভব এবং তা বুঝে তাকে পরিবর্তন করাও সম্ভব। শ্রমিক শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো আবিলতা থাকে না, কারণ তার শোষিত বিপর্যস্ত নিপীড়িত অবস্থা। শ্রমিক শ্রেণি মানসিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বুর্জোয়া শ্রেণি শ্রমিক শ্রেণিকে কখনোই তাদের অতীতের কুসংস্কার থেকে মুক্তি দিতে চায় না, বহির্বিশ্বের দিকে তাদেরকে তাকাতেই দেওয়া হয় না। শ্রমিক শ্রেণি নিজেরাই বোঝে যে সে নিজেই একটা পণ্য। সে বোঝে তার শ্রমশক্তিও একটা বাণিজ্যের বস্তু। তাই বুর্জোয়া দার্শনিক পরিবর্তনশীল জগতকে দেখতে পান না, কিন্তু শ্রমিক নিজেকে চেনার মাধ্যমেই জগতের স্বরূপ বুঝে ফেলে—

> *তার চেতনা হচ্ছে বাণিজ্যপণ্যের আত্মচেতনা, অর্থাৎ তাঁর চেতনার পুঁজিবাদী সমাজের স্বরূপ তার পণ্য-উৎপাদন ও বিনিময় সমেত উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়ে।* [৩২]

শ্রমিক শ্রেণি নিজেরাই বিশাল উৎপাদনী প্রক্রিয়ার অংশ এবং তারা উৎপাদনের একটি মুহূর্ত মাত্র। সুতরাং শ্রমিক শ্রেণি বিশ্বকে অচল-স্থির হিসেবে দেখতে পারে না, তারা সর্বদা বিশ্বকে প্রক্রিয়া হিসেবেই দেখে অভ্যস্ত। চলমান জগৎ এইভাবেই তার চেতনায় প্রবেশ করে, কারণ প্রক্রিয়া মানেই পরিবর্তন, যেমন লৌহ আকর থেকে ইস্পাতের বিমে পরিবর্তন হয়, বৃক্ষের কাষ্ঠ থেকে আসবাবপত্রে পরিবর্তন হয়, সম্ভাবনাপূর্ণ মানুষ থেকে নিঃস্ব শ্রমিকে পরিবর্তন হয়। উৎপল দত্তের স্পষ্ট মতামত—

> *শ্রমিকের মতাদর্শই তাই সত্যে পৌঁছায়। দার্শনিকদের তথাকথিত নিরপেক্ষ ও শীতল মস্তিষ্ক বিশ্লেষণে জগতের আসল সত্য ধরা পড়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। শ্রমিকের একপেশে ও জঙ্গি উপলব্ধিতেই বরং জগৎকে বোঝা সম্ভব। এবং বুঝে তাকে পরিবর্তন করাও সম্ভব। ... সেটা হচ্ছে সত্যে পৌঁছুবার একমাত্র উপায়।* [৩৩]

মার্কসবাদের সবকথাই হল মেহনতকারী মানুষের তরফের কথা। মেহনতকারী মানুষই

আগামী দিনে নতুন সমাজ সৃষ্টি করবে, নতুন ইতিহাস লিখবে। কার্ল মার্কসের চিন্তা-চেতনায় ও বিচার ধারায় একটা জিনিস স্পষ্টভাবে ধরা পড়ল যে পুঁজিবাদী সমাজের পরমায়ু অন্তিম লগ্নে পৌঁছে গেছে, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করেছে ও এমন অশুভ শক্তির জন্ম দিচ্ছে যার ফলে নিজেরাই একদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে। কিন্তু তাই বলে শ্রমজীবী মানুষ, মেহনতকারী মানুষদের হাত গুটিয়ে বসে থাকলে সব সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে না, কারণ ইতিহাসে আপনা আপনি কিছুই হয় না, মানুষই ইতিহাস বদলায়, মানুষই তার জ্ঞান-বুদ্ধি ও শ্রম দিয়ে একটা নতুন যুগ গড়ে তোলে। সেই নতুন যুগ গড়ে তোলার পিছনে সর্বাগ্রে অবদান অনস্বীকার্য এই মেহনতি মানুষ ও শ্রমজীবী মানুষদের। আগামী দিনের সমাজ কীভাবে গড়ে উঠবে, আগামী দিনের ইতিহাস কীরূপে লেখা হবে, তা সবই নির্ভর করে এই মেহনতি মানুষের শ্রমের উপর। কার্ল মার্কস মনে করেন তাই সুস্থ সুন্দর সমাজ গড়তে হলে, মেহনতকারী মানুষদেরই এগিয়ে আসতে হবে, দায়িত্ব নিতে হবে, জনতার দায়িত্বকে সংঘবদ্ধ করতে হবে। কার্ল মার্কস নিজের জীবদ্দশায়ও একইরকম কাজের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অগ্রণী ছিলেন।

দার্শনিক মতবাদ নিয়ে বিভিন্ন আলাপ-আলোচনা তা শুধুমাত্র পণ্ডিতদের মহলে সীমাবদ্ধ নেই। মানুষের জীবনধারণের প্রয়োজনে একটা না একটা দার্শনিক মতবাদ মানুষকে বেছে নিতেই হয়। মানুষ পৃথিবীকে যেমনভাবে দেখে বা পৃথিবীকে যেমনভাবে বুঝে নিয়েছে, মানুষের জীবন সম্পর্কে মোটামুটি একটা দার্শনিক মতবাদ মেনে নেয়। প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যেই একটা না একটা এই দার্শনিক মতবাদ থাকে। তাই কোনো মানুষের পক্ষে দার্শনিক মতবাদ ছাড়া চলা একপ্রকার অসম্ভব। যেমন জগতকে স্বীকার করলে একপ্রকার মতবাদ, আবার জগতকে যদি নাও স্বীকার করা হয় সেটাও একপ্রকার দার্শনিক মতবাদ। একটা না একটা দার্শনিক মতবাদকে আধার করে মানুষ এগিয়ে চলে। এই দার্শনিক মতবাদ বাছাই করবার ব্যাপারে মানুষকে যথেষ্ট সচেতন থাকতে হয়, নইলে এমন কোনো দার্শনিক মতবাদ মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে বিফলে চালিত করে। মার্কসবাদ সদাসর্বদা মেহনতকারী মানুষের উন্নতির কথা, সার্বিক মঙ্গলের কথা বলে থাকে, তাই মার্কসবাদ বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে কখনোই উদাসীন থাকতে পারে না। মার্কসবাদ প্রশ্ন তোলে, প্রচলিত বিভিন্ন যে দার্শনিক মতবাদগুলোর মধ্যে কোন মতবাদটি সঠিক? যে মতটাকে মানা হবে সেটা কেন ঠিক? মার্কসবাদ বলে, দার্শনিক মতবাদগুলির মধ্যে যেটা ঠিক অর্থাৎ যে দার্শনিক মতবাদ মেহনতকারী জনতাকে সমৃদ্ধির পথে, উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায় সেটাকে গ্রহণ করতে হবে আর যে দর্শন ভাবনা বা দার্শনিক মতবাদ মেহনতকারী মানুষের মনকে পঙ্গু করে রাখে সেগুলিকে বর্জন করতে হবে। সেই সঙ্গে মার্কসবাদ অকপটে প্রশ্ন রাখে, শ্রমজীবী

মেহনতকারী মানুষের মন পঙ্গুকারী যে দার্শনিক মতবাদ এগুলো দ্বারা কাদের সুবিধা হয়? এই মতবাদগুলি প্রচার করে সমাজ থেকে কোন শ্রেণির মানুষরা কীভাবে সুবিধা গ্রহণ করে? মার্কসবাদের একটা বিশেষ অঙ্গ হল এই দার্শনিক আলোচনা। মার্কসবাদ সেই দার্শনিক মতবাদটাকেই গ্রহণ করে, যা শ্রমজীবী মেহনতকারী মানুষকে শত অত্যাচার ও অন্যায়ের মোকাবিলা করে বাঁচবার খোরাক জোগায়। মার্কসবাদ সেই দার্শনিক মতবাদটাকেই গ্রহণ করে, যা শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের প্রেরণা সঞ্চার করে; তাই—

> *মার্কসবাদের একদিকে তাই দার্শনিক আলোচনা। যে-দার্শনিক মতবাদ মার্কসবাদীর কাছে শুধু অভ্রান্ত নয়, মেহনতকারী মানুষকে বাঁচাবার খোরাক জোগায়, সংগ্রামের প্রেরণা সঞ্চার করে, সেই দর্শনের আলোচনা। তারই নাম মার্কসীয় দর্শন।* [৩৪]

মার্কসবাদের নানান দিকের মধ্যে রাজনীতির দিকটিও গুরুত্বপূর্ণ। কোনো দেশ, কোনো জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গেলে রাজনীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যারা দেশ শাসন করেন তাদের নীতি নৈতিকতা সদা সর্বদা মেহনতকারী মানুষের স্বার্থ রক্ষার পরিপন্থী হওয়া প্রয়োজন। রাষ্ট্রনেতাদের নীতি হতে হবে সদা সর্বদা শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে। সেই সঙ্গে ভালো করে জানতে হবে ও বুঝতে হবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলির কথাও। সেইসব দেশে রাষ্ট্রনেতাদের নীতি নৈতিকতা কেমন? সেই রাষ্ট্রনেতারা কাদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য নীতি নৈতিকতা প্রণয়ন করেছে? তাদের দেশ শাসনের সঙ্গে আমাদের দেশ শাসনের, তাদের রাজনীতির সঙ্গে আমাদের রাজনীতির সম্পর্ক কেমন, সেটাও জানতে হবে। সেইসব দেশের সম্পর্কের সঙ্গে আমাদের দেশের সম্পর্ক, তাতে মেহনতকারী মানুষের স্বার্থরক্ষা হয় কিনা তা জানতে নির্দেশ দেয় মার্কসবাদ। অন্য দেশের নীতি-নৈতিকতার সঙ্গে আমাদের দেশের নীতি-নৈতিকতার যে সম্পর্ক তাতে যদি শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ রক্ষা না হয় তাহলে কেমন সম্পর্ক হলে মেহনতকারী মানুষের স্বার্থচরিতার্থ হবে, তা জানা ও বোঝা দরকার। সেই রাজনৈতিক কথাগুলি জানার সঙ্গে যদি মেহনতকারী মানুষের স্বার্থ চরিতার্থ না হয় সেই সঙ্গে উক্ত রাজনৈতিক সম্পর্ককে বা রাজনীতিটাকে বদল করার কথাও বলে মার্কসবাদ। বর্তমান দিনে আমাদের ঘরে বাইরে দেশ শাসনের যে ব্যবস্থা রয়েছে, সেই ব্যবস্থা যদি শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ রক্ষার সঙ্গে খাপ না খায় তাহলে তাকে বদল করতে হবে, তাকে ভেঙে নতুনভাবে গড়তে হবে, গ্রহণ করতে হবে অন্যরকমের ব্যবস্থা। মার্কসবাদ অনুযায়ী কোনো দেশের রাজনৈতিক অবস্থা শ্রমজীবী মানুষকে সামনে রেখে প্রণয়ন করলে সে দেশ সদা সর্বদা ও সর্বাগ্রে উন্নতির শিখরে আরোহণ করবে। মার্কসবাদ মেহনতি মানুষদের দেশ, বাসস্থান ও রাজনীতি নিয়ে মন্তব্য করে—

মেহনতীদের দেশ নেই। তাদের যা নেই তা আমরা কেড়ে নিতে পারি না। প্রলেতারিয়েতকে যেহেতু সর্বাগ্রে রাজনীতিক আধিপত্য অর্জন করতে হবে, জাতির পরিচালক শ্রেণী হয়ে উঠতে হবে, নিজেকেই হয়ে উঠতে হবে জাতি, তাই সেদিক থেকে প্রলেতারিয়েত নিজেই জাতীয়। [৩৫]

নিজের দেশের রাজনীতিকে যেমন আলাদাভাবে জানতে হবে, যেমন চিনতে হবে সেই সঙ্গে অন্য সব দেশের রাজনীতির সঙ্গে, আন্তর্জাতিক রাজনীতির সঙ্গে স্পষ্ট এক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। আর সেই দেশ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে বোঝার ভিত্তিতেই এগিয়ে চলতে হবে।

মার্কসবাদের নানান দিকের মধ্যে অন্যতম হল, অর্থনীতি নিয়ে গভীর ও তাত্ত্বিক আলোচনা। অন্যসব দিকের তুলনায় অর্থনীতির উপরে সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়, কারণ কোনো দেশ বা রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি হল এই অর্থনীতি। মার্কসবাদী বিচার অনুসারে অর্থনীতি হল ধন উৎপাদনের কায়দাকানুন চাল-ডাল-গম-গামছা-শাড়ি থেকে শুরু করে বিভিন্ন যান্ত্রিক গাড়ি থেকে হাওয়াই জাহাজ পর্যন্ত সবই মানুষ তৈরি করে অর্থাৎ উৎপাদন করে কিন্তু উৎপাদনের কায়দা কানুনটা সবসময় একরকম হয় না। যেমন— কাপড় উৎপাদন করার সময় তাঁত বুনে করা যায় আবার কলকারখানায় যন্ত্র দ্বারাও উৎপদান করা যায়। এই দুই পদ্ধতির মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য থাকে। এইসব ব্যাপার নিয়েই অর্থনীতির আলোচনা আর মার্কসবাদ এই আলোচনার মাধ্যমে বিচার করে দেখায় অর্থনীতির রকমফের নির্ভর করে এইসব ব্যাপারগুলোর উপরে। মানব সভ্যতার যা কিছু কীর্তি, তা সবই শেষ পর্যন্ত এই অর্থনীতির উপরে নির্ভর করে। অর্থনীতিই হল শেষপর্যন্ত সব কিছুর চরম ভিত্তি, সেটা শিল্প হোক, সাহিত্য হোক, আইন, ধর্ম, দর্শন সবকিছুর পিছনেই অর্থনীতির গভীর প্রভাব পরিলক্ষিত। আর এই অর্থনীতি সর্বদেশে সদাসর্বদা পরিচালিত হয় কতিপয় কিছু মানুষের দ্বারা। কার্ল মার্কস বলেছেন—

যে অর্থনৈতিক কাঠামোয় অল্প কিছু মানুষ বহু লোকের উপর আধিপত্য চালায়, ধনতন্ত্র কখনই তার বাইরে যায়নি। ধনতন্ত্র কেবল দাস/দাস-মালিক এবং বাঁধা-শ্রমিক/সামন্ত-প্রভু বিভাজনের জায়গায় একটা নতুন বিভাজন নিয়ে এসেছে। এই ব্যবস্থাতেও সংখ্যায় অল্প কিছু লোক আধিপত্য বজায় রাখলেন, বজায় থাকল তাঁদের শোষণও, কেবল তাঁদের একটা নতুন নাম হল : নিয়োগকর্তা।

অন্য দিকে, অধিকাংশ মানুষ আধিপত্যের শিকার, শোষণের শিকার থেকে গেলেন, তাঁদেরও একটা নতুন নাম হল : নিযুক্ত কর্মী। দাসব্যবস্থা ও সামন্ততন্ত্রের মতোই ধনতন্ত্রেও সংখ্যায় অল্প ক্ষমতাবানরাই সমাজে আধিপত্য বজায় রাখলেন, এবং রেখে চলেছেন। নিয়োগকর্তারা রাজনীতিকদের নিয়ন্ত্রণ করেন, সামাজিক উন্নয়নের লাগামও তাঁদের হাতে। কাজের জায়গায় সমস্ত

গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম তাঁরাই ঠিক করেন। তাঁরাই সবকিছু চালান। জনসাধারণ তাঁদের আধিপত্যেই থাকেন।[৩৬]

অর্থনীতি এবং রাজনীতি পরস্পর গভীর সম্পর্কে আবদ্ধ। অনেক ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে রাজনীতির জন্ম অর্থনীতি থেকে। মার্কসবাদ বিচার করে দেখায়—

অর্থনীতি থেকেই রাজনীতির জন্ম, অর্থনীতির শক্তিই রাজনীতি নিয়ে ভাঙাগড়া করে। কিংবা মাও-সে-তুঙ যেরকম বলেছেন, রাজনীতি আসলে অর্থনীতিরই ঘনীভূত বিকাশ।[৩৭]

অর্থনীতির থেকে রাজনীতির জন্ম হলেও অর্থনীতিকে অদলবদল করার ক্ষেত্রে রাজনীতির গভীর প্রভাব অনস্বীকার্য। আমাদের দেশের স্বদেশি আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় লক্ষ করলে বা বিচার করলে খুব পরিষ্কারভাবেই বুঝতে পারা যায় কীরকমভাবে রাজনৈতিক চাপে অর্থনীতির বিভিন্ন পরিবর্তন হয়েছে। শুধু আমাদের দেশ ভারতবর্ষে নয়, বিদেশের ক্ষেত্রেও দেখা যায় অর্থনীতিকে অদলবদল করার ক্ষেত্রে রাজনীতির গভীর প্রভাব বর্তমান। আবার একই রকমভাবে দেখা যায় অর্থনীতির চাপে দেশের রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে যায়। সেটা আমাদের দেশে যেমন প্রযোজ্য, অন্যসব দেশের ক্ষেত্রেও একইরকমভাবে প্রযোজ্য। অর্থাৎ অর্থনীতির সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে অর্থনীতির কথা বাদ দিয়ে রাজনীতির আলোচনা করা যায় না, উভয় উভয়ের সঙ্গে গভীরভাবে অন্বীত।

কোনো রাষ্ট্রের অর্থনীতি নির্ভর করে শ্রমজীবী মানুষের কর্মক্ষমতার উপরে। রাষ্ট্র, সমাজের অগ্রগতি শ্রমজীবী মানুষের শ্রমের বিনিময়ে ত্বরান্বিত হয়। সমাজে বুর্জোয়া শ্রেণি শ্রমিকের মজুরি নির্ধারণ করে শ্রমের দাম রূপে, একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রমের বিনিময়ে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থপ্রদান করা হয়। এভাবেই মানুষ শ্রমের মূল্য নির্ধারণ করে। মার্কসবাদে শ্রমজীবী মানুষের উৎপাদন ও মজুরি, মুনাফা, জোগান ও চাহিদা, মজুরি ও দাম, মূল্য ও শ্রম, বিভিন্ন অংশে উদ্বৃত্ত মূল্যের বাটোয়ারা, মুনাফা, মজুরি ও দামের সাধারণ সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় নিয়ে মতামত ব্যক্ত হয়েছে। শ্রমজীবী মানুষের মজুরি সম্পর্কে ইংরেজ শ্রমিক জন ওয়েস্টান শ্রমজীবী মানুষের আন্তর্জাতিক সমিতির সাধারণ পরিষদের সামনে মতামত প্রকাশ করেন যে—

উচ্চতর মজুরি মজুরদের অবস্থার উন্নতি করতে পারে না এবং ট্রেড ইউনিয়নের ক্রিয়াকলাপ ক্ষতিকর বলে বিবেচনা করতে হবে।[৩৮]

ইংরেজ নাগরিক ওয়েস্টান-এর যুক্তি আসলে নির্ভর করে দুটি বিষয়ের উপরে : প্রথমত, জাতীয় উৎপন্ন পণ্যের পরিমাপ হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট বস্তু, গণিতবিদরা যাকে বলেন স্থির রাশি বা পরিমাপ।

দ্বিতীয়ত, আসল মজুরির পরিমাপ অর্থাৎ তা দিয়ে যে পরিমাণ পণ্য কেনা যায় তার হিসেব মাপা মজুরির পরিমাণ হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট রাশি, একটা স্থির পরিমাণ। এই দুটি বিষয়ই ছিল নাগরিক ওয়েস্টানের মূল যুক্তি ও যুক্তির ভিত্তি। কার্ল মার্কস, মজুরি, দাম, মুনাফা, প্রবন্ধে ব্রিটিশ নাগরিক ওয়েস্টানের এই যুক্তিকে খণ্ডন করে শ্রমজীবী মানুষের মজুরি সম্পর্কে সুন্দর মতামত ব্যক্ত করেছেন—

> *বছরের পর বছর উৎপন্নের মূল্য ও পরিমাণ বেড়ে চলেছে, জাতীয় শ্রমের উৎপাদন শক্তি বাড়ছে এবং এই ক্রমবর্ধমান উৎপন্ন সঞ্চালনের জন্য যে পরিমাণ টাকার প্রয়োজন, ক্রমাগতই তার পরিবর্তন ঘটছে। বছর শেষের হিসাবে যা সত্য, বিভিন্ন বছরের তুলনামূলক হিসাবে যা সত্য— বছরের প্রতিটা গড়পড়তা দিনের পক্ষেও তা-ই সত্য। জাতীয় উৎপন্নের পরিমাণ বা আয়তন নিরন্তর বদলাচ্ছে। এটি স্থির নয়, বরং এটি একটা পরিবর্তনশীল পরিমাণ, আর জনসংখ্যার পরিবর্তনের কথা না ধরলেও পুঁজি সঞ্চয় ও শ্রমের উৎপাদন শক্তিতে ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটনার দরুন তা না হয়ে পারে না। একথা খুবই ঠিক যে, আজ যদি মজুরির সাধারণ হার বৃদ্ধি পায় তবে তার পরিমাণ ফল যাই হোক না কেন ঐ বৃদ্ধি আপনা থেকেই, অবিলম্বে উৎপন্নের পরিমাণে পরিবর্তন ঘটাবে না। সর্বাগ্রে বর্তমান অবস্থা থেকেই তার যাত্রা শুরু হবে। কিন্তু মজুরি বৃদ্ধির আগে জাতীয় উৎপন্ন যদি স্থির না হয়ে পরিবর্তনশীল থেকে থাকে, তবে মজুরি বৃদ্ধির পরেও তা স্থির না থেকে পরিবর্তনশীল হয়েই থাকবে।* [৩৯]

মার্কসবাদে সর্বদা শ্রমিক স্বার্থ সুরক্ষিত। শ্রমিকের কর্মদিবস, শ্রমিকদের কর্মদিবসের দৈর্ঘ্য ও শ্রমের নিবিড়তা, কর্মদিবস স্থির প্রয়োজনে কর্মদিবসের দৈর্ঘ্য হ্রাস, সময় হিসাবে মজুরি, ফুরন-মজুরি প্রভৃতি বিষয়ের উপরে সদাসর্বদা আলোকপাত করা হয়েছে। বুর্জোয়া শ্রেণি 'শ্রমের মূল্য'- এই কথাটির মধ্যে মূল্যের ধারণাকে মুছে দেওয়া হয়েছে তাই নয় বরং বাস্তবে তার ধারণাটাও উলটে দেওয়া হয়েছে— এই কথাটি এখন মাটির মূল্য কথাটির মতোই কাল্পনিক। যদিও এই কাল্পনিক কথাগুলো উৎপাদনের সম্পর্কগুলি থেকেই উদ্ভূত হয়। এগুলি হচ্ছে অবশ্য প্রয়োজনীয় সম্পর্কগুলির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপসমূহের বিভিন্ন ধারণা। চাহিদা ও সরবরাহের সম্বন্ধ পরিবর্তনশীল। চাহিদা ও সরবরাহ যদি পরস্পরের সমানও হয় তা হলে মূল্যের এই দোদুল্যমানতার অবসান ঘটে। যদি অন্যান্য সমস্ত অবস্থা অপরিবর্তনীয় থাকে। সেক্ষেত্রে চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সেক্ষেত্রে শ্রমের দাম হচ্ছে স্বাভাবিক দাম আর চাহিদা সরবরাহ সম্পর্ক থাকে স্বতন্ত্রভাবে। শ্রমের মূল্য ও দাম বা মজুরি সম্পর্কে কার্ল মার্কস তাঁর 'ডাস ক্যাপিটাল' (পুঁজি) প্রবন্ধে স্বতন্ত্র মতবাদ প্রদান করেছেন—

'শ্রমের মূল্য ও দাম' বা 'মজুরি'— এসব বাস্তব রূপ সম্পর্কে অবশেষে এটুকুই বলা যায় যে, তাদের মধ্যে মূর্ত মৌলিক সম্পর্ক, অর্থাৎ শ্রমশক্তির মূল্য ও দামের সঙ্গে এগুলিকে তুলনা করলে সেই পার্থক্যই দেখা যায়, যে পার্থক্য দেখা যায়, সমস্ত বিশ্বব্যাপারে ও তার গুপ্ত অন্তঃস্তরের মধ্যে তুলনায়। প্রথমটি প্রচলিত চিন্তারীতি রূপে প্রত্যক্ষ ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেখা দেয়, দ্বিতীয়টিকে আগে বিজ্ঞান দ্বারা আবিষ্কৃত হতে হয়। চিরায়ত অর্থশাস্ত্র বিষয়গুলির মধ্যেকার প্রকৃত সম্পর্কের খুব কাছাকাছি আসে, যদিও সচেতনভাবে সে সম্পর্কে কোনো সূত্র রচনা না করেই। সেটা তা করতে অক্ষম, যতক্ষণ পর্যন্ত তা তার বুর্জোয়া গাত্রচর্মের আবরণে ঢাকা থাকে। [৪০]

শিল্পী হোক, সাহিত্যিক হোক আর দার্শনিকই হোক সকলেই শেষপর্যন্ত সামাজিক জীব। তাই শিল্পীর শিল্পচিন্তায়, সাহিত্যিকের সাহিত্যচিন্তায়, দার্শনিকের দর্শনচিন্তায়, বা বিজ্ঞানীর বৈজ্ঞানিক ভাবনায় সবকিছুর উপরেই প্রত্যেক সমাজের প্রভাব এসে পড়ে। মেহনতকারী মানুষের মানসিকতা, চরিত্রগঠনেও সমাজের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই সমাজ গড়নকে নিয়েও মার্কসবাদে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। সমাজের ক্রমাগত পদ পরিবর্তন, উত্থান-পতন সবকিছুই আলোচিত হয়েছে। সভ্যতা শুরুর আগে সমাজ কেমন ছিল? কীভাবে সৃষ্ট হল মানুষের সমাজ, কেমনভাবে গড়ে উঠল সভ্যতা? ক্রমাগত সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে কীভাবে পরিবর্তন শুরু হল, পরিবর্তনের ফলে সমাজের নতুন রূপ কেমনভাবে ধরা ছিল? সভ্যতা শুরু হওয়ার সময় থেকে আজ পর্যন্ত সমাজের বিভিন্ন ভাঙাগড়া কেমনভাবে বদলেছে, সেই বদলের কারণগুলি কী কী, আগামী দিনে তার রূপটা কেমন হবে? এইসব বিষয় নিয়ে মার্কসবাদের নানান দিকের মধ্যে এই দিকটাও আলোচিত। অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের আলোচনা। ইতিহাসের পরিবর্তন, ইতিহাসের নানা ধারা নিয়েও আলোচনা। ইতিহাস সম্পর্কে মার্কসবাদের ধারণা হল—

বর্তমান সময় অবধি ইতিহাস সম্বন্ধে সমগ্র ধারণাটায় ইতিহাসের এই বাস্তব ভিত্তিটাকে হয় একেবারেই তাচ্ছিল্য করা হয়েছে, নইলে সেটাকে বিবেচনা করা হয়েছে ইতিহাসের ধারার পক্ষে সম্পূর্ণভাবেই অবান্তর একটা গৌণ বিষয় হিসেবে। কাজেই ইতিহাস সবসময় লিখিত হওয়া চাই একটা বহিস্থ মানদণ্ড অনুসারে, যথার্থ জীবন উৎপাদন মনে হয় যেন আদিযুগীয় ইতিহাস, আর যা যথার্থ ঐতিহাসিক সেটা সাধারণ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন, অধিপার্থিব-বহির্ভূত একটা কিছু বলে প্রতীয়মান হয়। এই মনে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের বিষয়টাকে ইতিহাস থেকে বাদ দেওয়া হয়, আর তার থেকে সৃষ্টি করা হয় প্রকৃতি আর ইতিহাসের বিরুদ্ধতা (antithesis)। ইতিহাস সম্বন্ধে এই ধারণার প্রবক্তারা কাজে কাজেই ইতিহাসে দেখতে পেরে উঠেছেন শুধু রাজ-রাজড়া আর বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজনীতিক কৃতিগুলো, ধর্মীয় এবং সবরকমের তত্ত্বগত সংগ্রামগুলো, আর

বিশেষত প্রত্যেকটা ইতিহাসক্রমিক যুগে তাঁদের সেই যুগের বিভ্রান্তিতে শরিক হতে হয়েছে। [৪১]

কার্ল মার্কস ধনতন্ত্রের একজন বড়ো সমালোচক ছিলেন। সেই সঙ্গে দাস ব্যবস্থা বা সামন্ততন্ত্রের মতো ব্যবস্থাগুলিকে তিনি নিন্দার চোখে দেখতেন। তিনি চাইতেন বিপ্লবের স্বাধিকার, সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের আদর্শ এবং সমকালীন সমাজে গণতন্ত্রের মতো আদর্শগুলি রূপায়িত হোক। তিনি মনে করতেন মানুষের ইতিহাসে দাস ব্যবস্থা বা সামন্ত্রতন্ত্রের মতো যে ব্যবস্থাগুলি দেখা গেছে তার থেকে ফরাসি এবং আমেরিকান বিপ্লবের সময় প্রচারিত ধনতন্ত্র তার চেয়ে শ্রেয়। মার্কস এটাও বিশ্বাস করতেন—

ফরাসি এবং আমেরিকান বিপ্লবীরা যে স্বাধিকার, সাম্য, সৌভ্রাত্র ও গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ধনতন্ত্র সেগুলিকেও নিয়ে আসবে। [৪২]

আমেরিকান ও ফরাসি বিপ্লবের ফলে ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। সমস্ত ইউরোপ জুড়ে ধনতন্ত্র দ্রুত এবং ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল। তাতেও দেখা যায় এক বিপুল বৈষম্য, একদিকে অল্প কিছু সংখ্যক মানুষ যারা আর্থিকভাবে ক্রমাগত সচ্ছল হতে থাকে ও আনন্দ ফুর্তিতে দিন কাটাতে থাকে। অন্যদিকে কৃষি শিল্প ও নানান পরিষেবার সঙ্গে নিযুক্ত বিরাট সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষেরা জীবন যন্ত্রণাময়তা ও দারিদ্র্যতার মধ্যে দিন কাটতে থাকে। এই শ্রমজীবী, দরিদ্র, নিরক্ষর মানুষগুলি ধনতন্ত্রের দেওয়া প্রতিশ্রুতিতে ভরসা রেখেছিল। ধনতন্ত্র প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে সামন্ততন্ত্র দাসব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে সাম্য, সৌভ্রাতৃত্বের ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করবে। তাই শ্রমজীবী মানুষরা সামন্ততন্ত্র ও দাসব্যবস্থার অবসান ঘটানোর প্রয়োজনে রক্তাক্ত বিপ্লবকে সমর্থন করেছিল। কিন্তু ধনতন্ত্র সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি। মার্কসের মতে—

ধনতন্ত্র তার সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি, সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। স্বাধিকার, সাম্য, সৌভ্রাত্র এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছে। [৪৩]

ধনতন্ত্র যখন প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থ মার্কস তাকে নিয়ে গভীর বিচার ও বিশ্লেষণ করলেন। ব্যর্থতার প্রকৃত কারণও অনুসন্ধানে ব্রতী হলেন। মার্কস বিশ্লেষণ করে দেখালেন সাম্য, স্বাধিকার, সৌভ্রাতৃত্ব গণতন্ত্রের লক্ষ্য পূরণে ধনতন্ত্র ব্যর্থ হওয়ার কারণ তার নিজের কাঠামো ও সামাজিক প্রক্রিয়া। মার্কস শেষপর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন— স্বাধিকার, সাম্য, সৌভ্রাতৃত্ব ও গণতন্ত্রের পথে যথার্থ অগ্রগতি হতে চাইলে ধনতন্ত্র থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে নতুন এক অন্য ব্যবস্থায় পৌঁছানো দরকার। সেই নতুন ব্যবস্থায় পৌঁছানোর পথে তিনি ধনতন্ত্রের ব্যর্থতার দিকগুলি স্মরণে রাখলেন এবং নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন যা সমাজতন্ত্র নামে অভিহিত করেন। ধনতন্ত্র প্রতিশ্রুতি না রক্ষা

করতে পারার কারণ হিসেবে মার্কস দেখিয়েছিলেন সেখানে খুব অল্প সংখ্যক মানুষের হাতে সমস্ত মালিকানা, সমস্ত সম্পত্তি, সমস্ত কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত। শ্রমিকদের শ্রমের মূল্য হিসেবে উৎপাদন মূল্যের কতটা অংশ দেওয়া হবে, তাদের উদ্‌বৃত্ত শ্রমের উৎপাদন নিয়ে কী করা হবে, কী উৎপাদন করা হবে, কীভাবে উৎপাদন করা হবে, তা ওই উপরতলার অল্প সংখ্যক লোকই ঠিক করতেন। এইসব বিষয়ে সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের মতামতের কোনো গুরুত্ব, মূল্য সচরাচর দেখা যেত না। সমাজের অল্প কিছু সংখ্যক মানুষের সিদ্ধান্ত বৃহদাংশের শ্রমজীবী মানুষকে তা মেনে চলতে হত। এটা গণতন্ত্র নয়, এটা গণতন্ত্রের বিপরীত অবস্থা। এরফলে দরিদ্র দরিদ্রই থাকে। ধনী ক্রমাগত আরও ধনী হয়ে ওঠে। মেহনতকারী মানুষের স্বার্থ হরণকারী এই ধনতন্ত্র প্রথার সমাপ্তি হওয়া আবশ্যক। মার্কসের মতে—

দারিদ্র নির্মূল করার জন্য ধনতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে অন্য ব্যবস্থায় যাওয়া আবশ্যক। [৪৪]

মার্কসবাদের নানান দিক— দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি। কিন্তু তাই বলে মার্কসবাদকে ভীতিপ্রদ পণ্ডিতি ব্যাপার বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। মার্কসবাদ হল মেহনতকারী মানুষের তরফের কথা, তাই মেহনতকারী মানুষের জীবনের সঙ্গে মার্কসবাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বলেই মার্কসবাদের মূল সূত্রগুলি মেহনতকারী, শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে বোঝা অনেক সহজ ও সরল। শ্রমজীবী মানুষ মার্কসবাদের মূল সূত্রগুলিকে অন্তর দিয়ে অনুভব করতে পারে ও হৃদয়ঙ্গম করতে কোনো অসুবিধা হয় না। বরং যারা শুধু মহা পণ্ডিত তাদের পক্ষেই এইসব কথা অমন প্রত্যক্ষভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে বাধা হয়ে ওঠে। কেন-না পাণ্ডিত্যের কুয়াশায় তারা নিজেদেরকে আচ্ছন্ন রাখেন, পুথির ধুলোয় তাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন। জীবনকে বাস্তবের সঙ্গে মিশিয়ে, ঘনিষ্ঠভাবে, প্রত্যক্ষভাবে তাদের চেনবার সুযোগ কম। কিন্তু মেহনতকারী মানুষের পক্ষে সে কথা খাটে না। জীবনের সঙ্গে তাদের সম্মক পরিচয়। আর মার্কসবাদ যেহেতু জীবনের কথাই, তাই মার্কসবাদকে, মার্কসবাদের মূল সূত্রগুলিকে এই শ্রমজীবী মানুষেরা সবচেয়ে স্পষ্টভাবে, সবচেয়ে প্রত্যক্ষভাবে বুঝতে পারে। এই বুঝতে পারাটা তর্কবিতর্ক দিয়ে বোঝা নয়, পুথির দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বোঝা নয় এই বোঝাটা হল অনেক বাস্তব, অনেক প্রত্যক্ষভাবে বোঝা। তা সেটা দর্শনের ক্ষেত্রে হোক বা অর্থনীতির ক্ষেত্রে হোক বা রাজনীতির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

উৎপল দত্ত সমস্ত জীবন ধরে তাঁর শিল্পকর্মে এই মার্কসবাদী ভাব-ভাবনা, চিন্তা-চেতনা ও আদর্শকে লালন-পালন ও বহন করে গেছেন। উৎপল দত্তের থিয়েটার ছিল শ্রমিক শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সৃষ্ট বিপ্লবীর থিয়েটার। তার সৃষ্টির মধ্যে বুর্জোয়া শ্রেণির চিন্তাধারা, তার রাজনৈতিক

কার্যকলাপ, বুর্জোয়া শ্রেণির দর্শন প্রভৃতি সক্রিয় বিরোধিতা করেছিলেন, সেই সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারার প্রবল বিরোধী ছিলেন। মূলত মার্কসবাদী আদর্শ, মার্কসবাদী ভাবনাকেই তাঁর থিয়েটার ও সৃষ্টিকর্মের মধ্যে দিয়ে তিনি ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। মার্কসবাদী আদর্শকে প্রচার করতে চেয়েছেন। উৎপল দত্ত তাঁর সৃষ্টি কর্মে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির তিনটি প্রধান সূত্রকে সফল ও সুন্দরভাবে প্রয়োগ করে গিয়েছিলেন—

> *এক, 'শ্রমিক শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করো'। দুই, 'অতীত শিল্পসাহিত্যের যা কিছু মূল্যবান সেই সব জনতার কাছে পৌঁছে দাও।' তিন, 'তোমরা বুদ্ধিজীবীরা শিক্ষার সুযোগ পেয়েছ, তোমরা শ্রমিককে বিপ্লবী চেতনা পৌঁছে দাও।'— এই তিনটি সূত্রই ছিল উৎপল দত্তের সমগ্র শিল্পচেতনার ভিত্তিস্বরূপ।* [৪৫]

উৎপল দত্ত মননে, চিন্তনে ও থিয়েটার ভাবনায় সর্বদা ছিলেন প্রকৃত স্তালিনবাদী। উৎপল দত্তের থিয়েটার সৃষ্টি হয়েছিল নিপীড়িত, শোষিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত শ্রমিক শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। তাঁর নাটক সদা সর্বদা গর্জে উঠেছে যখন তিনি দেখেছেন শ্রমজীবী মানুষদের স্বার্থ বিঘ্নিত হয়েছে, বুর্জোয়া শ্রেণির দ্বারা সমাজের মেহনতকারী মানুষের স্বার্থ বিঘ্নিত হয়েছে। উৎপল দত্ত আদ্যন্ত মার্কসবাদে বিশ্বাসী একজন নাট্যকার ছিলেন। তিনি মনে করতেন—

> *মার্কসবাদ হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণীর মতবাদ।* [৪৬]

মার্কসবাদী রাজনীতি হল শ্রমিক শ্রেণির রাজনীতি। প্রকৃতপক্ষে মার্কসবাদকে জানতে ও বুঝতে গেলে শোষিত, নিপীড়িত, অত্যাচারিত মেহনতকারী মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বুঝতে হয়। জঙ্গি পরিচালক বের্টোল্ট ব্রেখ্ট মনে করতেন অভিনেতাদের প্রকৃতপক্ষে অভিনয় শিখতে গেলে ও অভিনয় শিল্পকে যথাযথভাবে উন্নত করতে হলে অভিনেতাকে প্রত্যক্ষ শ্রেণিসংগ্রামে অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন। শ্রমিক শ্রেণির সঙ্গে নাট্যশালা ও নাট্যকলার সুগভীর যোগাযোগের কথা বলেছেন ব্রেখ্ট। উৎপল দত্ত ব্রেখ্ট-এর এই মতাদর্শের পরিপন্থী ছিলেন। 'ব্রেখ্ট ও মার্কসবাদ' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—

> *শ্রমিক শ্রেণির সঙ্গে নাট্যশালার সাযুজ্য ঘটাবার ব্রেখ্টীয় দাবি তাহলে শুধু একটা রণধ্বনি নয়, সেটা হচ্ছে জগৎ, মানুষ, সমাজ, উৎপাদন সম্পর্ক সব বুঝবার একমাত্র পথ। সেটা হচ্ছে সত্যে পৌঁছুবার একমাত্র উপায়।* [৪৭]

উৎপল দত্ত শোষিত, অত্যাচারিত, নিপীড়িত শ্রমিক শ্রেণিকে ও শোষিত-নিপীড়িত শ্রমিক আন্দোলনের বিভিন্ন ধারাকে নাট্যাঙ্গনে নিয়ে এলেন। উৎপল দত্ত শ্রমিক শ্রেণির ওপরে শাসক ও

জমিদারবর্গের অত্যাচার শোষণ-নিপীড়নের কাহিনি নিয়ে তিনি তৈরি করলেন বিভিন্ন কালজয়ী নাটক। স্কুলে পড়বার সময় বামপন্থী তথা কমিউনিস্ট সম্পর্কে যে পুথিগত বিদ্যা অর্জন করেছিলেন তা তিনি নাটকে প্রয়োগ করে সেই বামপন্থী নীতি আদর্শের বাস্তবায়ন ঘটিয়েছিলেন, শ্রমিক শ্রেণিকে নাট্যাঙ্গনে আনয়নের মধ্য দিয়ে। 'লিট্‌ল থিয়েটার ও আমি' প্রবন্ধে তিনি স্পষ্টত বলেছেন—

> *বাংলার পেশাদার নাট্যশালায় তখনও পর্যন্ত শ্রমিক শ্রেণী আসেনি, শ্রমিককে অচ্ছুত করে রাখা হয়েছিল পেশাদার থিয়েটারে, এমনকি গণনাট্য সংঘের নাটকগুলিও তখন আবর্তিত হচ্ছিল কিছু চাষির কান্না বা মধ্যবিত্ত পরিবারের বিলাপের মধ্যে।* [৪৮]

উৎপল দত্ত শিল্প সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে শ্রমিকশ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে উন্নীত করলেন। কমিউনিস্ট পার্টি যেহেতু শ্রমিকশ্রেণির পার্টি, তাই শ্রমিকের চেতনার জগৎ ও মানসিক জগৎকে বুঝতে গেলে ও জানতে গেলে পার্টির সঙ্গে গভীর যোগাযোগ রক্ষা করে চলা অতি আবশ্যকীয় কর্তব্য। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে মার্কসবাদী শিল্পীর চেতনা বা কোনো আবিলতায় আচ্ছন্ন হয়ই না, বরং শ্রমিকদের চেতনার জগৎকে ভালোভাবে বোঝা সম্ভব হয়। 'জপেন দা জপেন যা' প্রবন্ধে তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন—

> *কোনো দলের নেতৃত্ব স্বীকার করলেই যে শিল্পী স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে তার স্বাধীন থাকারই কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। নির্দেশ কোনো পার্টিই দেয় না, দেয় রাজনৈতিক লাইন। সে-লাইন সাংস্কৃতিক জগতে প্রয়োগ করার ভার নাট্যদলগুলির। সে-লাইন অনুসরণ না করলে শ্রেণি সংগ্রামে নাটককে শামিল করা যাবে না।* [৪৯]

শ্রমিক শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সৃষ্ট বৈপ্লবিক থিয়েটারই ছিল উৎপল দত্তের থিয়েটার দর্শন। তাঁর থিয়েটার বুর্জোয়া শ্রেণির রাজনীতি, চিন্তাধারা, দর্শন প্রভৃতির সক্রিয় বিরোধিতা করতে পিছুপা হয়নি সেই সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক কার্যকলাপ ও ভাবধারার বিরোধিতা করা তাঁর থিয়েটারের ছিল মৌলিক কর্তব্য। বৈপ্লবিক থিয়েটারের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য বিপ্লব প্রচার করা, শোষক, শাসকদের বিরুদ্ধে শ্রেণিঘৃণা জাগ্রত করা। থিয়েটারের মাধ্যমে তিনি সাধারণ মানুষ, মেহনতি মানুষ ও বৃহত্তর মানুষের কাছে পৌঁছাতে চেয়েছেন। তাদের মধ্যে শ্রেণি ঘৃণা জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন থিয়েটারের মধ্য দিয়ে। দার্শনিক স্তরে বৈপ্লবিক থিয়েটারের অন্যতম প্রধান কাজ হল বৈপ্লবিক সত্যে উপনীত হওয়া। উৎপল দত্তের সুস্পষ্ট অভিমত, বাস্তবে যা ঘটছে তাই শুধু নাটকে তুলে ধরার বিষয় নয়, বরং যা ঘটবে বা যা ঘটার কথা বা যা ঘটা উচিত তা সত্যিকারের

নাটককারের দায়িত্ব ও কর্তব্য। তিনি মনে করেন, বৈপ্লবিক সত্যে পৌঁছতে গেলে বহু মিথ্যাকে ক্রমাগত ভাঙতে ভাঙতে এগোতে হয়। 'রাজনৈতিক নাটক : একটি কলহ' প্রবন্ধে তিনি এই সত্য সম্পর্কে বলেছেন—

> *সত্য ইতিহাসের অংশ। এবং যেহেতু মেহনতী মানুষ হচ্ছে ইতিহাসের উদীয়মান শক্তি, তাই তার সত্যটাই সত্য। ... গোর্কি ও ব্রেখ্‌ট দুজনেই বলে গেছেন— যা ঘটছে সেটাই দেখাব না। যা ভবিষ্যতে ঘটবে, যা ঘটা উচিত তাও আমরা দেখাব।* [৫০]

বিপ্লববাদ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিচার্য না হলে চরম বিভ্রান্তি সংগঠিত হয়। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের ঐতিহ্য দেখে দেশবাসীকে বঞ্চিত করার প্রচেষ্টা চলছে নিরন্তর। প্রতিপক্ষের এইরকম ঘৃণ্য চক্রান্তের প্রতি লক্ষ রেখে স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান অধ্যায়গুলো নাটকের মধ্য দিয়ে তিনি তুলে ধরার প্রয়াস করলেন। সমস্ত সংগ্রাম বিপ্লবকে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিচার করার প্রবণতা তাঁর নাট্য জীবনের শুরু থেকেই। 'Towards Revolutionary Theatre' প্রবন্ধে তিনি এ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—

> *From the very begining of my theatre-work, we have tried to put revolution in a historical perpective।* [৫১]

শোষিত মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে উৎপল দত্ত লক্ষ করেছিলেন ভারতের শাসক শ্রেণি আপন স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে সম্পূর্ণ মিথ্যা ধারণা জনতার মধ্যে প্রচার করার প্রবণতা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রচার করা হচ্ছিল যে— ভারতবর্ষ শান্তির দেশ, সহিষ্ণুতার দেশ, অহিংসার দেশ। ভারতবর্ষ চিরকাল অহিংসা ও সহনশীলতার আদর্শ বিশ্বকে শিখিয়েছে। এ তথ্যের সম্পূর্ণ বিরোধিতা করেন উৎপল দত্ত এবং বলেন— এগুলো হচ্ছে বিশুদ্ধ 'বুর্জোয়াতত্ত্ব'; ভারতবর্ষের ইতিহাস গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়— ভারতবর্ষের মাটিতেই সংগঠিত হয়েছিল বিশ্বের বৃহত্তম গণহত্যার ঘটনাগুলি। এদেশের রক্তাক্ত ইতিহাসের সমকক্ষ ইতিহাস অন্যত্র খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। উৎপল দত্ত মনে করেন, ইতিহাসের এই মিথ্যা আস্ফালনকে প্রতিহত করে নাট্যকারের কাজ হওয়া উচিত নাটকের মাধ্যমে জনতার কাছে এটাই পৌঁছে দেওয়া যে, ভারতবর্ষ আবহমান কাল ধরেই যুদ্ধের উপাসক ও সংগ্রামের পরিপন্থী। তিনি মনে করেন নাটকের কাজ হচ্ছে এই সত্য উন্মোচন করা যে, শান্তি সম্পর্কে যে মিথ্যা তথ্যগুলো জনতাকে গলাধঃকরণ করা হচ্ছে সেটা আসলে শাসক শ্রেণির এক ঘৃণ্য প্রতারণার কৌশল মাত্র। ভারতবর্ষের ইতিহাসে পরিলক্ষিত হয়েছে শ্রমজীবী মানুষ অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে বারবার অস্ত্র

তুলে নিয়েছে নিজ হস্তে। সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ, শিখদের যুদ্ধ, মহীশূরের সংগ্রাম, ওয়াহবি বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ, বীরসা মুণ্ডার যুদ্ধ, বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবীদের প্রতিরোধ ও প্রতিবাদ প্রভৃতি— বিশ্বের খুবই কম দেশেরই এরকম সংগ্রামের কাহিনি পরিলক্ষিত হয়। অত্যাচারীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে এরকম সশস্ত্র দীর্ঘ ধারাবাহিক সংগ্রামের ইতিহাস বিশ্ব সংগ্রামের ইতিহাসে অপ্রতুল। ভারতীয় শাসক শ্রেণির পক্ষ থেকে এদেশের সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাসটাকে মুছে ফেলার প্রচেষ্টা নিরন্তর। কারণ তারা জানে এই সংগ্রামের ধারাবাহিকতা তাদের বিরুদ্ধে চালিত হওয়া অসম্ভব নয়। তাই তারা ভাড়াটে ইতিহাসবিদ্ তথা লেখকদের দিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের কাহিনিটাকে মুছে ফেলে নতুন ইতিহাস লেখাতে তৎপর। উৎপল দত্ত নাটক বা থিয়েটারে সেই সশস্ত্র সংগ্রামের ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে চেয়েছেন—

> *সশস্ত্র বিদ্রোহের দীর্ঘ ঐতিহ্যটাকে রক্ষা করতে হবে। কারণ আগামী বিপ্লবটা তারই পরিণতি, ফলশ্রুতি, উত্তরাধিকারী। ... বড় ভীষণ খেলা খেলছে শাসকশ্রেণির ভাড়াটে লেখকরা। ... একবার যদি দেশের মানুষের দেশপ্রেমিক অতীতটাকে মসিলিপ্ত ক'রে দেয়া যায়, ... তাহলে দু'শো বছরের অবিচ্ছিন্ন স্বাধীনতা সংগ্রামটা হয়ে পড়ে অসভ্য আরণ্যক মানুষের ব্যর্থ উল্লম্ফন। এরা মানুষকে তার গর্বিত অতীত থেকে বিয়োজিত করতে চায়, যাতে সে হয়ে পড়ে নিরুদ্যম, হতাশ, সংগ্রামবিমুখ।* [৫২]

শাসকশ্রেণি দ্বারা ঐতিহ্যকে মুছে ফেলার প্রচেষ্টা, নাটক ও থিয়েটারে সেই সংগ্রামের কাহিনি ও ঐতিহ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গে উৎপল দত্ত তাঁর 'Towards A Revolutionary Theatre' প্রবন্ধে বলেন—

> *It is, therefore, our task to re-affirm the violent history of India, to re-affirm the martial traditions of its people, to recount again and again the heroic tales of armed rebels and martyrs।* [৫৩]

উৎপল দত্ত মনে করেন সমাজ বিশ্লেষণ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বলতে শুধুমাত্র একটি জিনিস বোঝায়, তা হল মার্কসবাদ ও লেনিনবাদ। মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের বৈজ্ঞানিক ধারা ও সমাজমূল্য প্রচার করা হল নাট্যকার ও থিয়েটারওয়ালার অন্যতম প্রধান কাজ। মার্কসবাদ ও লেনিনবাদ সর্বহারার হাতে অস্ত্রের সম্ভার স্বরূপ। সর্বহারা শ্রেণি মার্কসবাদ ও লেনিনবাদকে আশ্রয় করে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে ও আগামীর পাথেয় খুঁজে পান। ব্রেটোল্ড ব্রেখট্ সারাজীবন এই মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের বৈজ্ঞানিক ধারার প্রচারক ছিলেন। যেটা আমাদের নাট্যকারেরা কখনও করে উঠতে পারেননি, তার কারণ হল আমাদের শ্রেণিগত অবস্থান। আমরা যে সমাজ থেকে এসেছি

সেই পাতি বুর্জোয়া শ্রেণির মধ্যে আবদ্ধ থাকার ফলেই আমরা মার্কসবাদ ও লেনিনবাদকে সঠিকভাবে প্রচারে অক্ষম। তিনি মনে করেন শ্রেণিসংগ্রাম ছাড়া নিজ পাঠাগারে বসে গ্রন্থকীটের মতো অনবরত মার্কসবাদ অধ্যয়ন করলেও সর্বহারা দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করা যায় না। সর্বহারা দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে হলে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সেটি হল শ্রেণিসংগ্রামে সরাসরি যুক্ত থাকা। সর্বহারার বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করা, এর সঙ্গে মার্কসবাদের বিভিন্ন মতাদর্শের গভীর অধ্যয়ন উপলব্ধি ও বিশ্লেষণ। এসবের সমন্বয়ে সর্বহারার দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করা সম্ভব। উৎপল দত্ত 'বিষয় থিয়েটার' গ্রন্থে মন্তব্য করেন—

> *অনেকে আছেন যাঁরা নিয়মিত রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং তারপর এসে নাটক করেন অথবা লেখেন। কিন্তু তাঁদেরও দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টেছে ব'লে আমি মনে করছি না, তাঁরা কিন্তু লেখেন পাতি বুর্জোয়ার দৃষ্টিকোণ থেকেই। তাঁদের এই শ্রেণিসংগ্রামের ফলে যে জিনিসটা হওয়া দরকার ছিল তা হল, তাঁদের দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন। তাঁরা সর্বহারা দৃষ্টিকোণটা নিজের ক'রে নেবেন। কিন্তু অনেক সময় তা হয় না। তাঁরা অনেক শ্রেণীসংগ্রাম, অনেক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সত্ত্বেও পাতি বুর্জোয়ার দৃষ্টিকোণটাই আশ্রয় ক'রে বসে থাকেন এবং তাঁদের লেখায়, তাঁদের সাংস্কৃতিক কাজকর্মে সেটাই প্রকাশ পায়।* [৫৪]

উৎপল দত্ত মনে করতেন রাজনৈতিক নাটক করতে গেলে মধ্যবিত্ত শিল্পীর সর্বপ্রথম ও প্রধান প্রয়োজন মেন্টাল ডিক্লাসমেন্ট। মানসিক দিক থেকে নিজ নিজ মধ্যবিত্ত শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করে শ্রমিক শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করা অবশ্যকীয় কর্তব্য; কারণ মার্কসীয় বিপ্লব পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বিপ্লবের অগ্রণী বাহিনী হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণি, সেখানে মধ্যবিত্তের কোনো স্থান নেই। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অনেকসময় দেখা যায় শ্রেণিচ্যুত হওয়ার ব্যাপারে মধ্যবিত্ত মানুষের চরমভাবে ব্যর্থতা। মধ্যবিত্ত শিল্পীরা সহজে শ্রেণিচ্যুত হতে পারতেন না, তার কারণ হল মার্কসবাদের ওপর তাদের সম্পূর্ণ দখল নেই। মার্কসবাদ সম্পর্কে তাদের পড়াশোনা যেমন খুবই কম, সেই সঙ্গে মার্কসীয় জ্ঞান অত্যন্ত ভাসা ভাসা। তাদের রাজনীতি চেতনার প্রধান ভিত্তি মার্কসবাদের বৈজ্ঞানিক ও তথ্যনিষ্ঠ বিশ্লেষণ নয়, বরং বিপরীত দিকে মধ্যবিত্তের ভাবালুতাসর্বস্ব একধরনের গরিবী দরদ। উৎপল দত্তের মতে এটি পাতি বুর্জোয়া মানসিকতার নগ্ন রূপ। মেন্টাল ডিক্লাসমেন্ট বা মানসিকভাবে শ্রেণিচ্যুত হওয়া বিষয়টা উৎপল দত্ত 'অনুষ্টুপ' পত্রিকায় সাক্ষাৎকারে সুন্দর ও সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন। তাঁর মতে—

> *ডিক্লাস্‌ড দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে সেই দৃষ্টিভঙ্গী যে কোন্ শ্রেণীর জন্য নাটক করা হচ্ছে,... কার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নাটক হচ্ছে, কার প্রয়োজনে নাটক, কোন্ শ্রেণীর প্রয়োজনে? ... আমাদের নাট্য-আন্দোলনের*

এক বিশাল অংশ শুধু মধ্যবিত্ত শ্রেণী, বুদ্ধিজীবী বা বুদ্ধিবাজদের জন্য নাটক ক'রে থাকেন, আর শ্রমিক-কৃষক অঞ্চলে তাঁরা প্রবেশ করতে পারছেন না— নাটক লেখা বা প্রযোজনা করার সময়ে প্রথম যেটা মনে রাখতে হবে যে আমাদের নাটক শ্রমিক দেখবে, কৃষক দেখবে ... তাদের যদি ভালোলাগে তাহলে আমাদের নাটক ভালো হয়েছে আর তারা যদি প্রত্যাখ্যান করে তবে বুঝতে হবে আমাদের নাটক ব্যর্থ হয়ে গেছে। ... যা-ই করি না কেন সেটা শেক্‌স্‌পিয়ার, গিরিশ ঘোষ বা পথনাটিকাই হোক, দেখতে হবে সেটা শ্রমিক-কৃষক বুঝতে পারলো কি না। [৫৫]

উৎপল দত্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণির মেন্টাল ডিক্লাসমেন্ট অর্থাৎ শ্রেণিচ্যুতির বিষয়টি গভীরভাবে ও একনিষ্ঠভাবে আলোচনা করেছিলেন তাঁর একাধিক গ্রন্থে। তাঁর 'জপেন দা জপেন যা' গ্রন্থটি এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থটি পাঠ করলে দেখা যায় যে অসামান্য দক্ষতায় এই বিষয়টির স্বরূপ উন্মোচন করেছিলেন উৎপল দত্ত। জপেন দা আসলে উৎপল দত্তরই কণ্ঠস্বর। জপেন দা চরিত্রর মধ্য দিয়ে উৎপল দত্ত নাটক, রাজনীতি, সমাজ, ইতিহাস প্রসঙ্গে গভীর চিন্তা ও উপলব্ধিগুলি অতি সহজ ও উপভোগ্যভাবে প্রকাশ করেছিলেন। কিছু নবীন মার্কসবাদী নাটককার, যারা মার্কসবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে শ্রমিক-কৃষকের সংগ্রাম নিয়ে নাটক লেখেন, যারা গণনাট্য সংঘের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নাটক লিখতে উদ্যোগী হন উৎপলের কণ্ঠস্বরের আড়ালে জপেনদা তাদের নানা বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন ও মার্কসবাদ সম্পর্কে সচেতন করতে দ্বিধাবোধ করেন না।

উৎপল দত্ত মধ্যবিত্তের পাতি-বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গিকে তীক্ষ্ণভাবে সমালোচনা করেছেন। তিনি দেখান পাতি বুর্জোয়া বামপন্থীদের রাজনৈতিক নাটকে যেসব নিষ্কলুষ নিষ্পাপ কমিউনিস্টদের তুলে ধরা হয় সেটা মূলত একটা বুর্জোয়া তত্ত্বের রূপায়ণ। সমাজ বিচ্ছিন্ন, মানুষ বিচ্ছিন্ন মধ্যবিত্তরা কৃষক-শ্রমিককে সঠিকভাবে চেনে না বলেই তাদের নাটকে শ্রমজীবী মানুষ কখনো রক্ত মাংসের মানুষ হয়ে ওঠে না, শ্রমজীবী মানুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণির কাছে বিমূর্ত ধারণা হিসেবে এসে ওঠে। সেইজন্য পাতি-বুর্জোয়ার নাটকে কমিনিউস্টের চরিত্রগুলিও হয়ে ওঠে অবাস্তব, সর্বগুণসম্পন্ন, একটি সর্বাঙ্গসুন্দর মহাপুরুষ রূপে। এই মহৎ পুরুষ মার্কা মার্কসবাদী কমিউনিস্ট চরিত্রগুলি আসলে প্রকৃত বিপ্লবের সমূহ ক্ষতি করে। এ প্রসঙ্গে উৎপল দত্ত তাঁর 'জপেন দা জপেন যা' প্রবন্ধে অতীব সুন্দর ব্যাখ্যা দান করেছেন—

ঐ দেবতাদের দেখে চাষী-মজুর কী ভাবে? ... ভাবে, আমি এ জন্মে অমন হইতে পারবো নি বাপু! ই কি রে ভাই? ই তো দেখি পরমপুরুষ, অবতার! এ বউরে ঠেঙায় নে, বাপের সোংগে ঝগড়া করে নে, খেতে দিতে না পেরে পিটিয়ে বালবাচ্চাগুলোনরে চুপ কইরে রাখে নে! এই যদি বিপ্লবী হয়, তার আমি বিপ্লবী হইতে পারবো নি। বিপ্লবী হওয়া মোর পক্ষে সম্ভবই নয়। [৫৬]

পাতি-বুর্জোয়া নাট্যকারের বিপ্লবী নাটক তাদের শ্রেণিগত অবস্থানের জন্য বিপ্লবী শ্রেণিকেই রাজনৈতিক সংগ্রাম থেকে অনেকটা দূরে সরিয়ে রাখে। বাবু গোছের বা দেবতা স্বরূপ বিপ্লবীদের দেখে শ্রমিক-কৃষকরা তার সঙ্গে নিজের আত্মিক মিল গড়ার বদলে সেই বাবু গোছের বিপ্লবীর থেকে মানসিকভাবে অনেকটা দূরত্ব তৈরি করে। ফলে মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক আন্দোলনের ও রাজনৈতিক সংগ্রামের নাটক তখন হয়ে ওঠে ভুল রাজনীতির প্রচারক এবং তা হয়ে ওঠে অপরিপক্ক রাজনীতির হাস্যকর উপকরণ। রাজনৈতিক থিয়েটারে মধ্যবিত্ত শ্রেণি অবস্থানের জন্য তা সঠিক রাজনৈতিক নাটক হয়ে উঠতে পারে না। মধ্যবিত্তশ্রেণির পাতি-বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গির পরিপন্থী— যা মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ বিপরীত। পাতি-বুর্জোয়া বামপন্থীদের রাজনৈতিক নাটকে যেসব সহজ সরল, সাদাসিধে নিষ্পাপ কমিউনিস্টদের তুলে ধরা হয়, সেটা আসলে একটা পাতি-বুর্জোয়া তত্ত্বের রূপায়ণ। পাতি-বুর্জোয়া শ্রেণি যে সর্বগুণের আধার নির্লোভ বীর কমিউনিস্টদের নায়ক হিসেবে নাটকে দেখায় তা এই সমাজ ব্যবস্থার একটি ভুল চিত্র। উৎপল দত্ত মনে করেন বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই যদি সুন্দর-নিখুঁত সর্বগুণসম্পন্ন মানুষ উপস্থিত থাকে, তাহলেই সমাজ ব্যবস্থা বদলানোর কোনো প্রয়োজন পড়ে না। বিপ্লবের কোনো প্রয়োজনই হয় না। আসলে এইভাবে পাতি-বুর্জোয়া দৃষ্টিকোণ থেকে সৃষ্ট রাজনৈতিক নাটক, তথা বিপ্লবী নাটক আসলে বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার পক্ষে ওকালতি মাত্র। মার্কসবাদ সম্পর্কে অজ্ঞ ও ভুল রাজনীতির প্রচারক সর্বস্ব ছাড়া আর কিছুই নয়। উৎপল দত্ত বারেবারে এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে মার্কসবাদ সম্পর্কে গভীর ও সম্যক জ্ঞান না থাকলে রাজনৈতিক থিয়েটার সঠিকভাবে রূপায়ণ করা সম্ভব নয়। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন মার্কসবাদ গভীরভাবে অধ্যয়ন না করলে রাজনৈতিক থিয়েটার পথভ্রষ্ট হবেই। তিনি তাঁর 'জপেন দা জপেন যা' প্রবন্ধে পাতি-বুর্জোয়া বামপন্থী নাট্যকারদের উদ্দেশ্যে জপেন দা নামক চরিত্রের জবানিতে বলেছেন—

> *তোরা শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস পড়িস না, বুর্জোয়া ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের ইতিহাসও পড়িস না। তাই বুঝিস না এ ব্যবস্থায় বঞ্চনা ও শোষণ কতদূর গেছে। তোরা জানিস না, অর্থনৈতিক রাহাজানির দাপটে শ্রমিক-কৃষককে কোন পশুর স্তরে নামিয়ে দিয়েছে শয়তানরা, কীভাবে তারা কেড়ে নিয়েছে শ্রমিকের শিক্ষাদীক্ষার অধিকার, ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য; মানবতা। তোরা পাতি-বুর্জোয়ারা 'শ্রমিক' বলতেই কেমন গদগদ ভাববিহ্বল গাধা হয়ে উঠিস। মাঝে আবার তোদের কৃষকে পেয়েছিল, ছাপার অক্ষরে লিখতে শুরু করেছিলি 'কৃষক রাজ কায়েম' করার কথা, 'কৃষকের পায়ের কাছে বসে, শিক্ষা লাভ করার কথা। পাতি-বুর্জোয়ার স্বপ্নালু চোখে শ্রমিক-কৃষককে দেখিস, শ্রমিকের চোখে দেখিস না। মাও বলেছিলেন, শ্রমিকের দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করো। তোরা সেদিকে মাড়াসনি*

কখনো। তোরা শ্রমিক বলতে বুঝিস শুধু সংঘবদ্ধ বিপ্লবী শক্তি। তোরা আড়াল ক'রে রাখছিস শ্রমিকের বিধ্বস্ত ব্যক্তিসত্তা এবং এভাবে তোরা গোপন ক'রে রাখছিস এই সমাজব্যবস্থার সর্বগ্রাসী শোষণের চেহারা। [৫৭]

উৎপল দত্ত স্পষ্ট ভাষায় বলেন, রাজনৈতিক নাটকে শ্রমিকের প্রকৃত বাস্তব অবস্থা তুলে ধরতে হবে। পাতি বুর্জোয়া শ্রেণির শ্রমিক বলতেই যে ন্যাকা ন্যাকা ভাবাবেগ জাগ্রত হয় সেটি বর্জন করা অবশ্যকীয় কর্তব্য। শ্রমিক যা আছে তার প্রকৃত অবস্থায় তুলে ধরতে হবে। শ্রমিকের অধঃপতন, সংকীর্ণতা, হিংসা, দ্বেষ, মদ্যপান, নারী নির্যাতন সবকিছুই দেখাতে হবে, কোনোকিছুই বাদ দেওয়া চলবে না। শ্রমিকের প্রচণ্ড ধূর্ততা, শ্রেণি ঘৃণা, বীরত্ব ও সততা মহত্বের পাশাপাশি নিকৃষ্টতম গুণের সমাবেশও করতে হবে, তাহলেই শ্রমিকের প্রকৃত অবস্থার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যাবে। নইলে সে রাজনৈতিক নাটক হবে পাতি-বুর্জোয়ার কাল্পনিক মাত্র। শ্রমিক শ্রেণির নাম কর্ণগোচর হতেই যারা আবেগে ভাববিহ্বল গদগদ স্বপ্নালু হয়ে পড়ে তাদের পক্ষে শোষিত-নিপীড়িত শ্রমিক শ্রেণির বিধ্বস্ত বিপন্ন অবস্থা বুঝতে পারা অসম্ভব। শ্রমিকদের তোষামুদি নয়, তার বাস্তব অবস্থা অনুসন্ধানই রাজনৈতিক থিয়েটারের প্রধান উদ্দেশ্য। উৎপল দত্ত তাঁর 'জপেন দা জপেন যা' প্রবন্ধে বলেন—

তোরা নাটকে শ্রমিক-কৃষকের খোসামুদি করিস, চাটুকারিতা করিস। লেনিন তোদের বলে গিয়েছিলেন, তোমরা বুদ্ধিজীবীরা শিক্ষার সুযোগ পেয়েছ, তোমরা শ্রমিককে বিপ্লবী চেতনা পৌঁছে দাও। অর্থাৎ তোরা শ্রমিকের রাজনৈতিক শিক্ষক, কিন্তু চাটুকার কি কখনো শিক্ষক হয়? তোষণ ক'রে কি কখনো সশস্ত্র সংগ্রামের কথা শেখানো যায়?... এঙ্গেল্‌স বহুদিন আগে বলে গেছেন : সমাজ বিবর্তনের নিয়মগুলি একবার সম্যক বুঝতে পারলেই মানুষ আর সে নিয়মের অন্ধ বলি হতে রাজি হবে না, সে লড়াই করবে। কিন্তু সমাজ বিবর্তনের নিয়মগুলি তো তোরা গোপন ক'রে রাখিস। তোরা তো শ্রমিকের ধর্ষিত ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে মুখ খুলতেই রাজি ন'স। ... কাল্পনিক বস্তির কাল্পনিক শ্রমিক তৈরি ক'রে তোরা তাকে ফুল-বেলপাতা দিয়ে পুজো করিস। বাস্তবের ভয়ংকর বস্তির বাস্তব রক্তমাংসের শ্রমিকের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। [৫৮]

মার্কসবাদীরা যদি শ্রমিকের দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে না পারে তাহলে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তার ভয়ংকর ফল নেমে আসে। তিনি লক্ষ করেছিলেন সংস্কৃতির জগতে যে বিভিন্ন ধ্বংসকার্য সংগঠিত হয়েছিল তার কারণ ছিল মার্কসবাদীদের প্রকৃতপক্ষে শ্রমিক শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে না পারার অক্ষমতা। শ্রমিক শ্রেণির প্রতি অচেতন দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া সংস্কৃতির জগতে এক অন্ধকার অধ্যায় ঘনিয়ে আসে, এর প্রধান কারণ মার্কসবাদী মহলে পাতি-বুর্জোয়া

দৃষ্টিভঙ্গির দৌরাত্ম্যের ফসল। অতীত ঐতিহ্যকে বাতিল করলে শ্রমিক শ্রেণি কখনোই তার নিজের কৃষ্টি সংস্কৃতি সৃষ্টি করতে পারে না। অতীত ঐতিহ্য, সাহিত্য থেকে শ্রমিক শ্রেণিকে বিচ্ছিন্ন করা হলে, শ্রমিক শ্রেণিরা সংস্কৃতির জগতে অত্যন্ত হীনবল হয়ে পড়ে। শ্রমিক শ্রেণির সংস্কৃতি, শ্রমিক শ্রেণিরা নিজেরাই গড়ে নেবে, একথা উৎপল দত্ত বিশ্বাস করতেন।

মার্কসের সমাজ বিশ্লেষণ ও ইতিহাস বিশ্লেষণের পথ ধরে উৎপল দত্ত দেখালেন ফিউদাল সমাজে বুর্জোয়া শ্রেণিরা সমাজের সবচেয়ে উচ্চতর পদগুলিতে অধিষ্ঠিত। তারা নিজেরা সমস্ত সুযোগ সুবিধা ও ক্ষমতার অলিন্দে থেকে নিজেদেরকে উচ্চশিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান করে তোলার সুযোগ পেয়েছিল। নিজের মতো করে অগ্রসর চেতনার শিল্প সাহিত্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু বুর্জোয়া সমাজে শ্রমিকরা এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত। তারা বুর্জোয়া শোষণের দ্বারা অর্থনৈতিকভাবে যেমন নিঃস্ব হয়ে পড়ে তেমনি মানসিকভাবেও তারা হয়ে পড়ে রিক্ত ও দেউলিয়া। এই দেউলিয়া মানসিকতা নিয়ে কখনও সংস্কৃতিবাণ হওয়া সম্ভব নয়। একারণে অতীতের শিল্প সাহিত্য, শ্রমিক শ্রেণির পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। শ্রমিক শ্রেণিরা বুর্জোয়া সমাজে না পায় কোনো শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ। ফলে সংস্কৃতি সম্পর্কে কোনো ধারণাই সঞ্চারিত হতে পারে না তাদের মানসপটে। উৎপল দত্ত শ্রমিকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জপেনদার জবানিতে দেখিয়েছিলেন পাতি-বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি ও শ্রমিক শ্রেণির দৃষ্টির মূল পার্থক্য। ‘জপেন দা জপেন যা’ প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—

> *শ্রমিক শ্রেণীর সংস্কৃতি গড়বে কে? শ্রমিকশ্রেণী। সেই শ্রমিক শ্রেণীর মানসিক স্তর কোন্ পর্যায়ে? বুর্জোয়া যখন বিপ্লব করেছিল তার অনেক আগে থেকেই বুর্জোয়া মহাজনী সমাজের উচ্চতর পদগুলির অধিকার, উচ্চশিক্ষিত, কালচার্ড। তাই ইংলন্ডে, জার্মানিতে, ফ্রান্সে সেই বিপ্লবের পরে অবলীলাক্রমে বুর্জোয়া শিল্পসাহিত্য সৃষ্টির কাজে মেতে পড়তে পেরেছিল। কিন্তু শ্রমিক কি বুর্জোয়া সমাজে সেই সুবিধা পেয়েছে যা বুর্জোয়া পেয়েছিল ফিউদাল সমাজে? একেবারেই না। বুর্জোয়া তো শ্রমিককে ক'রে রেখেছে নিঃস্ব। শ্রমিকের ট্যাঁক খালি, তার বাসস্থানের পরিবর্তে রয়েছে বস্তী, শিক্ষাদীক্ষার পরিবর্তে অমানুষিক পরিশ্রম। এমনকি তার সুকুমার বৃত্তিগুলি পর্যন্ত দলিত মথিত। বুর্জোয়া সমাজে শ্রমিক একটি জ্ঞানই লাভ করে : সেটা হচ্ছে বুর্জোয়া সমাজকে ধ্বংস করার প্রয়োজনীয়তা। শুধুমাত্র সেই চেতনার ওপর নির্ভর ক'রে আস্ত একটা শ্রেণীর নূতন শিল্পসাহিত্য গড়ে ওঠে না। তাই সাংস্কৃতিক বিপ্লব; তাই অতীতের যা কিছু মূল্যবান সব গোগ্রাসে গেলার পালা।* [৫৭]

শ্রমিকের দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করলেই একমাত্র মার্কসবাদী শিল্পচিন্তার মর্মবস্তুকে হৃদয়াঙ্গম

করা সম্ভব। কিন্তু পাতি-বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গির বামপন্থীরা সেই দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে অপারগ। তারা শ্রমিক সম্পর্কে বড়োই অজ্ঞ, শ্রমিককে সঠিকভাবে জানে না ও চেনে না বলেই শ্রমিকের খণ্ডিত মনোজগতের সঠিক মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ। তারা নিজেদের মধ্যবিত্ত দৃষ্টিভঙ্গিটাকে শ্রমিক শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি বলে চালাতে উদ্যোগী হন, ফলে শিল্প সংস্কৃতির জগতে বারবার অমার্কসীয় তাণ্ডব উপস্থিত হয়। বিষয়টি উৎপল দত্ত তাঁর 'জপেন দা জপেন যা' প্রবন্ধে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন—

> *কীসের ঐতিহ্যের কথা বলছিস? সাহিত্যের ঐতিহ্যের বন্ধনে শ্রমিক শ্রেণী বাঁধা পড়েছে নাকি? ঐতিহ্যের ছিটেফোঁটাও সে পেয়েছে নাকি কখনো?... তোর কি ধারণা কলকাতার বস্তীতে সন্ধ্যার পর সবাই সুর করে রবীন্দ্রনাথ পড়ে? তোর কী ধারণা বাঙালি শ্রমিক অবসর সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র পড়ে? ... আসলে এটাও তোদের পাতি-বুর্জোয়া বজ্জাতি। নিজেরা ঐসব পুরাতন সাহিত্য খুব কষে পড়ে নিয়েছিস ব'লে মনে করছিস শ্রমিক-কৃষকেরও পড়া হয়ে গেল। নিজেরা শাসকগোষ্ঠীর কাছে হাত পেতে ভিক্ষা ক'রে নিয়েছিস শিক্ষা-দীক্ষা, চাকরি-বাকরি; তারপর নিজের মতামতটাকে শ্রমিক-কৃষকের মতামত বলে চালাচ্ছিস। মাও বলেন, শ্রমিক শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করো। আর তোরা পাতি-বুর্জোয়া চামারের দল নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গিটাকে শ্রমিকের বলে চালাতে চাস। তুই ঐতিহ্য ভোগ করছিস বলে আর ঐতিহ্যের দরকার নেই, শ্রমিক-কৃষক যে তিমিরে আছে সে তিমিরেই থাকুক, এই তো তোর বিধান।* [৬০]

উৎপল দত্ত মার্কসবাদী হিসেবে সদাসর্বদা মনে করতেন, মধ্যবিত্ত শ্রেণি কখনো বিপ্লবী হতে পারে না, একমাত্র বিপ্লবী হল শ্রমিক শ্রেণি। মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনে রয়েছে শুধু আপস ও ক্লীবত্ব। এদের মনে রয়েছে নারী বিদ্বেষের জঘন্য আস্তাকুঁড়, মধ্যযুগীয় কু-সংস্কারের ভ্রান্ত ধারণা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে ধনী শ্রেণিদের নকল করে আত্মতৃপ্তি লাভ করার হাস্যকর প্রবণতা। দেশের সামন্ততান্ত্রিক গোষ্ঠী অক্টোপাসের মতো আঁকড়ে রেখেছে শ্রমিক ও কৃষককে অথচ পাতি-বুর্জোয়া মার্কসবাদীরা তাদের মুক্তির জন্য সংগ্রাম বা বিদ্রোহে অবতীর্ণ হন না। উৎপল দত্ত বিশ্লেষণ করে দেখান মধ্যবিত্ত শ্রেণিরা কখনও বিপ্লবী শ্রেণি নয়, হতেও পারে না। তিনি পাতি-বুর্জোয়া শ্রেণির মনের অন্দরমহলটাকে টেনে নগ্ন করে দেন, যেখানে রয়েছে মেকি বিপ্লবের বুলি আর হাজারো কু-সংস্কারে আচ্ছন্ন কলুষিত মন। বিপ্লবের দৃষ্টিকোণ থেকে মধ্যবিত্তরা একটি ক্ষয়িষ্ণু শ্রেণি মাত্র। মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতি উৎপল দত্তের ক্ষোভ, ঘৃণা যেন ফেটে পড়েছে—

> *পাতি-বুর্জোয়ার অন্তরের গভীরে চিরদিন হঠাৎ-নবাব (up star) হবার বাসনা, সে বিলাস-ব্যসনের মাঝে পড়লে আত্মহারা হয়। সুযোগ পেলেই সে বুর্জোয়াকে নকল ক'রে পরম সন্তোষ লাভ করে।* [৬১]

মানুষ অপরিবর্তনীয়, সমাজ অপরিবর্তনীয়, রাষ্ট্র অপরিবর্তনীয়— পাতি-বুর্জোয়াদের এই ধারণার ফলেই বুর্জোয়া যুগের শিল্প সাহিত্যে এক দৃষ্টিভঙ্গির আবির্ভাব হল, যাকে বলা হয়— ‘বুর্জোয়া বাস্তবতাবাদ’। এই বুর্জোয়া বাস্তবতাবাদের মূল কথা হল যা দেখছ, যেভাবে দেখছ হুবহু তাই শিল্প সাহিত্যে দেখাও। অর্থাৎ একজন নিঃস্ব, রিক্ত, উচ্ছিন্ন যাওয়া কৃষককে উচ্ছিন্ন হিসেবেই দেখাও, কেন-না এই উচ্ছিন্নে যাওয়াটাই তাদের পরিচয়। একজন শ্রমিককে যদি নেশাগ্রস্ত, রোগগ্রস্ত ও হতাশাগ্রস্ত হিসেবে দেখলে তাকে সেভাবেই হতাশাগ্রস্ত ও রোগগ্রস্ত হিসেবেই শিল্প-সাহিত্যে দেখাতে হবে, কারণ সেটাই তার বাস্তব পরিচয়। কোনো তদন্ত নয়, কোনো অন্বেষণ নয়, মানুষ সমাজ সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করা নয়। যা দেখা, যেভাবে দেখা সেভাবেই তাকে শিল্প-সাহিত্যে স্থান দিতে হবে— সেটাই শিল্পের বাস্তবতা। কারণ মানুষ, সমাজ, রাষ্ট্র সবই তো অপরিবর্তনীয়। চারিপাশের পরিবেশ পরিস্থিতিকে যেভাবেই দেখছ সেটাকে সেভাবেই অবিকল শিল্প সাহিত্যে তুলে ধর। সেটাই বুর্জোয়া বাস্তবতা, সেটাই শাশ্বত বাস্তব। নিঃস্ব-রিক্ত সর্বহারা মানুষের মধ্যেও যে দার্শনিকতা লুকিয়ে থাকে বা তার মধ্যে একজন ভবিষ্যৎ যোদ্ধা হওয়ার প্রবণতা লুকায়িত থাকে সেটা অন্বেষণ করা বুর্জোয়া শিল্পে নিষিদ্ধ। বুর্জোয়ার কাছে পুঁজিবাদই জগৎ অনড়, স্থানু ও শাশ্বত। জগৎ যে প্রতি মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে সেকথা তা তারা স্বীকার করেন না, সে সত্য তাদের কাছে অসহ্য। কারণ তারা জানেন পুঁজিবাদও একদিন অপসৃত হবে এই চিন্তা জনমানুষে জেগে উঠতে পারে। তাই বুর্জোয়া বাস্তবতাবাদ সমাজ ও মানুষ সম্পর্কে ভ্রান্ত অসত্য, খণ্ডিত চিত্র তুলে ধরতে প্রয়াসী হন। উৎপল দত্তের ভাষায়—

> *বাস্তবের হুবহু অনুকরণ হচ্ছে বুর্জোয়া শ্রেণীর শৈল্পিক প্রকাশ, তাদের বামন জগতের আস্ফালন। তারা সমাজ-পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটা নিজেদের চোখ থেকে আড়াল করতে চায়। ... তারা একজন উচ্ছিন্ন কৃষককে ভিক্ষুকে পরিণত হতে দেখলে বাস্তবতার নামে তাকে অসহায় ভিক্ষুক হিসেবেই দেখবে ও দেখাবে। সেই ভিক্ষুকের মধ্যেই যে লুকিয়ে আছে একজন ভবিষ্যৎ যোদ্ধা বা দার্শনিক অথবা ক্রোধোন্মত্ত কোনো অপ্রত্যাশিত বীর, এটা বুর্জোয়ার সমাজশৃঙ্খলার পরিপন্থী, সুতরাং তাদের শিল্পে নিষিদ্ধ।* [৬২]

শ্রেণিসত্যের ধারণাটাকে উৎপল দত্ত তাঁর থিয়েটারে দার্শনিক ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি তাঁর সমস্ত শিল্পকর্মই সৃষ্টি করেছিলেন শ্রেণিসত্যের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। তিনি তাঁর সৃষ্টিকর্মে বুর্জোয়া, দর্শন, তাঁর সমাজচিন্তা, তাঁর শিল্পচিন্তা, বুর্জোয়া রাজনীতি, তাঁর ইতিহাস চিন্তা সবকিছুর বিরুদ্ধে দাঁড়ান। শিল্পকর্মে তিনি সর্বহারা শ্রেণিসত্যকে তুলে ধরেন যা বুর্জোয়া সত্যের বিপরীত। তিনি শ্রেণিসত্যের ঊর্ধ্বে এক মুহূর্তের জন্যও কোনো বিমূর্ত সত্যে বিশ্বাসী ছিলেন না।

তাঁর কাছে সত্য সবসময়ই 'শ্রেণিসত্য'— 'ক্লাসট্রুথ'। 'শ্রেণিসত্যের' বিষয়ে তাঁর 'Towards A Revolutionary Theatre' গ্রন্থে তিনি বলেছেন—

> *I do not for a moment believe in the fiction of absolute truth, above classes, metaphysical and eternal. The revoluationary theatre has no time for impartial study of 'both sides' of the questions.* [৬৩]

তিনি তাঁর নাটক ও থিয়েটারে মাঝামাঝির দালালি দেখতে পাননি। নাট্যজীবনের শুরু থেকে শেষপর্যন্ত তিনি শ্রমিক শ্রেণির পক্ষে থেকেছেন শ্রমিকসত্যকে সদাসর্বদা তুলে ধরার প্রয়াস করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন জনতার কাছে রাজনীতি পৌঁছে দিতে হবে, মানুষের মধ্যে বিপ্লবের চেতনা ছড়িয়ে দিতে হবে। সেইজন্য নাটক ও থিয়েটারের প্রয়োজন বৈপ্লবিক বিষয় বস্তু। ব্রেটোল্ড ব্রেখট্ এর মতো উৎপল দত্ত বিশ্বাস করেন মার্কসবাদের দ্বান্দ্বিকতা ছাড়া কোনো থিয়েটারই সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের থিয়েটার হতে পারে না। তাই তিনি মার্কসবাদের দ্বান্দ্বিকতা সমৃদ্ধ থিয়েটার নির্মাণে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। সবকিছুকে শ্রেণিসংগ্রাম ও শ্রেণিচেতনার নিরিখে যাচাই করে নাট্যাঙ্গণে আনয়নের প্রচেষ্টা করেছেন। মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে তাঁর নাটক সৃষ্টির উদ্দেশ্য। মানুষের বিপন্নতা থেকে বাঁচানোই তাঁর নাটক সৃষ্টির মূল লক্ষ্য। প্রভু শক্তির বিরুদ্ধে মানুষের বেঁচে থাকার লড়াই, অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই তাঁর থিয়েটারের মূল বিষয়। সে লড়াই ব্যর্থ বা সফল যাই হোক না কেন। তাই উৎপল দত্ত মনে করেন—

> *সত্য সর্বসময়ে শ্রেণী-সত্য— ক্লাস ট্রুথ, হয় আপনি এ শ্রেণীর সত্য বলবেন, না-হয় ও শ্রেণীর সত্য। হয় আমরা কৃষকের পক্ষে কথা কইব, নইলে জোতদারের। হয় শ্রমিকের সত্য উচ্চারণ করবো, নইলে মালিকের। মাঝামাঝির দালালি তো সত্যের ক্ষেত্রে খাটে না। রাজনৈতিক নাটকের অবলম্বনই শ্রেণী-সত্য।* [৬৪]

শ্রেণি সংগ্রাম বিষয়টা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে এখানে কোনো মধ্যস্থতাকারীর জায়গা থাকে না। উৎপল দত্ত দেখিয়েছেন সর্বহারা সত্যই এক এবং অন্যতম বৈপ্লবিক সত্য। বুর্জোয়ার সত্য ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে কোনো সত্যই নয়, কারণ ঐতিহাসিকভাবে বুর্জোয়া শ্রেণি ক্রমাগত অবক্ষয়ের পথে ধাবমান, ধ্বংসের পথের পথিক। শ্রেণিসত্যের বিষয়টি উৎপল দত্ত বিশদভাবে তাঁর 'Towards A Revolutionary theatre' গ্রন্থে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে—

> *Of course there are at least two sides to a question, in other words there are at least two truths involved in every issue. They are class-truths What is true for the proletariat is false for the bourgeois, and vice versa.* [৬৫]

আজীবন নিরলস নিরন্তর নাট্যচর্চার মাধ্যমে উৎপল দত্ত ব্যাপক জনগোষ্ঠী ও জনমানুষের সান্নিধ্যে পৌঁছানোর অভিলাষী ছিলেন। চল্লিশের দশকের গণমুখী ধারার সঙ্গে তাঁর মার্কসীয় ধারা সমন্বিত করে তিনি ব্যাপক জনতার কাছাকাছি পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছিলেন। বাংলা নাট্য আন্দোলনকে রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তির ওপরে দাঁড় করানোর প্রচেষ্টায় অক্লান্ত পরিশ্রম অব্যাহত ছিল জীবনের অন্তিম পর্যায় পর্যন্ত। এবং সে রাজনীতি অবশ্যই মার্কসীয় রাজনীতি, মার্কসীয় আদর্শ, চিন্তা-চেতনায় সম্পৃক্ত রাজনীতি। যে ভাবধারার প্রতি, যে রাজনীতির প্রতি তিনি আজীবন বিশ্বাস করেছিলেন ও লালন পালন করেছিলেন তাঁর শিল্পকর্মে। তিনি চেয়েছিলেন, বাংলা নাটক প্রকৃত অর্থে Revolutionary Theatre-এর দিশা খুঁজে পাক। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন— "যে নাটকের রাজনীতি ভুল, তার সব ভুল।"[৬৬] এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলেন আজীবন।

উৎস নির্দেশ :

১. উৎপল দত্ত, সাক্ষাৎকার, 'অনুষ্টুপ' পত্রিকা, গ্রীষ্ম সংখ্যা, ১৩৯০ বঙ্গাব্দ, পৃ ২৩

২. উৎপল দত্ত, 'ব্রেখ্‌ট্‌ ও মার্ক্সবাদ', 'স্তালিন লাভস্কি থেকে ব্রেখ্‌ট্‌', উৎপল দত্ত গদ্য সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, সম্পা : শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, জুলাই ২০১৫, পৃ ২৮৫

৩. তদেব, পৃ ২৮৫

৪. উৎপল দত্ত, 'লিট্‌ল থিয়েটার ও আমি', 'এপিক থিয়েটার', মার্চ ১৯৯৪, পৃ ৫৪

৫. উৎপল দত্ত, 'রাজনৈতিক নাটক একটি কলহ', 'জপেন দা-জপেন যা', উৎপল দত্ত, গদ্য সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, সম্পা : শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, জুলাই ২০১৫, পৃ ২৩১

৬. তদেব, পৃ ২২৬

৭. উৎপল দত্ত, নাটক সমগ্র, প্রথম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, মাঘ ১৪২৩, পৃ ৭৩

৮. তদেব, পৃ ৭৩

৯. তদেব, পৃ ৮৮

১০. তদেব, পৃ ৯০

১১. তদেব, পৃ ৯১

১২. তদেব, পৃ ১০১

১৩. তদেব, পৃ ১০৩

১৪. তদেব, পৃ ১১০, ১১১

১৫. তদেব, পৃ ৮০

১৬. তদেব, পৃ ৮১

১৭. তদেব, পৃ ৮১, ৮২

১৮. তদেব, পৃ ৮২

১৯. তদেব, পৃ ১২২

২০. তদেব, পৃ ১৩৩

২১. উৎপল দত্ত, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, 'শূদ্রক', শরৎ, ১৪০০, পৃ ১৩০

২২. উৎপল দত্ত, 'লিট্‌ল থিয়েটার ও আমি', উৎপল দত্ত, এক সামগ্রিক অবলোকন, সম্পা : নৃপেন্দ্র সাহা, উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব ২০০৫ কমিটি, ৭ নভেম্বর ২০০৫, পৃ ৪৫২

২৩. উৎপল দত্ত, নাটক সমগ্র, তৃতীয় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, চৈত্র

১৪২০, পৃ ২৩০

২৪. তদেব, পৃ ২৩১, ২৩২

২৫. তদেব, পৃ ২৩১

২৬. সূত্র-২২, পৃ ৪৪৩

২৭. তদেব, পৃ ৪৪৪, ৪৪৫

২৮. তদেব, পৃ ৪৪৯

২৯. তদেব, পৃ ৪৪৫

৩০. দর্শন চৌধুরী, 'রাজনৈতিক নাটক ও উৎপল দত্ত', থিয়েটারওয়ালা উৎপল দত্ত, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১ম সংস্করণ, ১০ই অক্টোবর ২০০৭, পৃ ৩২৬

৩১. দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, 'মার্ক্সবাদ', 'অনুষ্টুপ', কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৯৩, পৃ ২১

৩২. সূত্র-২, পৃ ২৮৫

৩৩. তদেব, পৃ ২৮৫

৩৪. সূত্র-৩১, পৃ ২৮

৩৫. মার্কস এঙ্গেলস নির্বাচিত রচনাবলী, ১ম খণ্ড, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, বাংলা অনুবাদ প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭৯, পৃ ১৬৪

৩৬. রিচার্ড ডি উল্ফ, মার্ক্সবাদ একটি প্রথম পাঠ, অনুবাদ : অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়, অঞ্জন চক্রবর্তী, জানুয়ারি ২০২০, কলকাতা, পৃ ৬১, ৬২

৩৭. সূত্র-৩১, পৃ ৩১

৩৮. মার্কস এঙ্গেলস, রচনা-সংকলন, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭১, পৃ ৬২

৩৯. তদেব, পৃ ৬২

৪০. কার্ল মার্কস, পুঁজি, ১ম খণ্ড, ২য় অংশ, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, সম্পা : প্রফুল্ল রায়, বাংলা অনুবাদ, প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৮, পৃ ৫১

৪১. সূত্র-৩৫, পৃ ৫২

৪২. সূত্র-৩৬, পৃ ৫২

৪৩. তদেব, পৃ ৫৪

৪৪. তদেব, পৃ ৮৮

৪৫. শঙ্কর শীল, 'দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্ন', উৎপল দত্ত মনন ও সৃজন, প্রতিভাস, সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ ১৪২

৪৬. সূত্র-২, পৃ ২৮৫

৪৭. তদেব, পৃ ২৮৫

৪৮. সূত্র-৪৫, পৃ ৩৫

৪৯. সূত্র-৫, পৃ ২৩২

৫০. তদেব, পৃ ২৩০, ২৩১

৫১. Utpal Dutt, 'Political Theatre', 'Towards Revolution Theatre' Calcutta, 1995, M. C. Sarkar & Sons Pvt. Ltd. P. 28

৫২. উৎপল দত্ত, 'শিকড়', পূর্বোক্ত গদ্য সংগ্রহ, পৃ ১৮৩, ১৮৪

৫৩. সূত্র-৫১, পৃ ৫৭

৫৪. উৎপল দত্ত, 'বিষয় থিয়েটার', মার্চ ১৯৯৫ সংখ্যায় পুনমুদ্রিত, পৃ ৫৮

৫৫. সূত্র-১, পৃ ৯, ১০

৫৬. উৎপল দত্ত, 'ধর্মতলার হ্যামলেট', পূর্বোক্ত গদ্য-সংগ্রহ, পৃ ১৩৪

৫৭. উৎপল দত্ত, 'আধখানা মানুষ', পূর্বোক্ত গদ্য সংগ্রহ, পৃ ১৬৬

৫৮. তদেব, পৃ ১৬৬, ১৬৭

৫৯. তদেব, পৃ ১৭২

৬০. তদেব, পৃ ১৭৩

৬১. উৎপল দত্ত, 'চীনযাত্রী', কলকাতা, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ, পৃ ৯১

৬২. উৎপল দত্ত, 'গিরিশ মানস', কলকাতা, ১৯৮৩, পৃ ২৫৬

৬৩. সূত্র-৫১, পৃ ৫১

৬৪. সূত্র-৫, পৃ ২২৯

৬৫. সূত্র-৫১, পৃ ৫১

৬৬. উৎপল দত্ত, যে নাটকের রাজনীতি ভুল, তার সব ভুল (সুরজিৎ ঘোষের নেয়া একটি সাক্ষাৎকার), দেশ, কলকাতা, ৩০.০৩.১৯৯১, পৃ ৪২

পঞ্চম অধ্যায়

উৎপল দত্তের থিয়েটার ভাবনায় রাজনৈতিক চেতনা

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার থিয়েটারে উৎপল দত্ত একটি ব্যতিক্রমী উজ্জ্বল ও বিশিষ্ট নাম। অর্ধ শতাব্দীব্যাপী নাট্য ও থিয়েটার চর্চায় তাঁর প্রধান অভিনিবেশ ছিল রেভ্যুলিউশনারি (বিপ্লবী) থিয়েটার অভিযাত্রায়। শুরু থেকেই উৎপল দত্ত শোষিত, বঞ্চিত, মানুষের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার লড়াইকে থিয়েটার সাধনার কেন্দ্রীভূত বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। বঞ্চিত গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ও সেই আন্দোলনের অগ্রপথিকেরা তাঁর নাটকের মূল বিষয় ও প্রধান চরিত্র। কেবল নাট্যবিষয় নয়, নাট্যনির্মাণের ক্ষেত্রেও তাঁর নাটকসমূহ বাংলা নাট্যভুবনে নতুন দিক নির্দেশ করেছে। তিনি বিশ্বাস করতেন— "নাটক হবে অসংখ্য সাধারণ মানুষের জন্য, নাটক কইবে সংগ্রামের কথা।"[১] এই বিশ্বাস উৎপল দত্তকে গণনাট্যের কেন্দ্রভূমিতে নিয়ে এসে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। মার্কসীয় সমাজতত্ত্বে বিশ্বাসী উৎপল দত্ত, হাজার বছরের ঐতিহ্যে লালিত বাংলা নাটককে শ্রেণিসংগ্রাম ও শ্রেণিচেতনার নিরিখে বিপ্লবী থিয়েটার চর্চার ধারার স্রোতে মিলিয়ে নেওয়ার চেষ্টায় ব্রতী হয়েছিলেন। বাংলার থিয়েটারের ধারায় অর্থাৎ দৃশ্য, আলো, সংগীত, অভিনয়, নেপথ্য ধ্বনি, নাট্য প্রয়োগ, নাট্যরূপ সবদিক দিয়েই উৎপল দত্ত এক নব যুগের স্রষ্টা। তাঁর কালে তিনি একক ও স্বতন্ত্র।

উৎপল দত্ত সেই ব্যতিক্রমী নাট্যকার, যিনি বাংলা নাটক ও থিয়েটারে মার্কসীয় চেতনায়, নাট্য রূপায়ণে বিশেষ সাফল্য ও দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। পরিচালক ও অভিনেতা হিসেবে তাঁর দক্ষতা ও সাফল্য গগনচুম্বী। অভিনেতা, পরিচালক, নাট্যকার— তিনটি ক্ষেত্রেই তিনি সফলতার চূড়ায় পৌঁছেছিলেন। তিনি ছিলেন বাংলার থিয়েটারের চারণ, আদি-অন্ত থিয়েটারওয়ালা। সুরজিৎ ঘোষকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছিলেন, "আমি থিয়েটারের লোক, থিয়েটারেই থাকব। সারাজীবন থিয়েটার করব।"[২] কলেজে পড়াকালীন থিয়েটারের প্রতি অদম্য আগ্রহ ও ভালোবাসা জন্মলাভ করেছিল, সেই ভালোবাসা আজীবন বজায় ছিল। নিবিড়ভাবে থিয়েটার চর্চার জন্য নিজেদের নাট্যদল প্রতিষ্ঠা করেছেন, কলকাতার পেশাদার নাট্যশালার প্রযোজনাগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করেছেন, থিয়েটারকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করার কথা ভেবেছিলেন। থিয়েটারকেই মেনেছিলেন ধ্যান জ্ঞান। কেবল একজন শিল্প স্রষ্টার ভূমিকা নিয়ে থিয়েটার জগতে অবতীর্ণ হননি, নাটক অর্থাৎ থিয়েটারের মাধ্যমে তিনি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে চেয়েছেন। সে লক্ষ্যে অবিচল ছিলেন আজীবন, সে লক্ষ্য আবেগ তাড়িত নয়, আদর্শ

দ্বারা সুনির্দিষ্ট। যে রাজনৈতিক ভাবধারায় তিনি বিশ্বাসী ছিলেন, সেই বিশ্বাসে অবিচল ছিলেন জীবনের শেষ লগ্ন পর্যন্ত। আর সেই বিশ্বাস তাঁর নাটক তথা থিয়েটারের মাধ্যমে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। থিয়েটার নিয়ে তিনি পৌঁছাতে চেয়েছিলেন সাধারণ মানুষের কাছে, খেটে খাওয়া গণমানুষের কাছে, সাধারণ মানুষের আবেগের কাছে। থিয়েটার তথা নাটক দিয়ে শ্রমজীবী বঞ্চিত-শোষিত মানুষের আবেগকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন এবং সেই অদম্য আবেগ সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন সমাজ পুনর্গঠনে। ভাঙাচোরা জীর্ণ সমাজের মুক্তি ঘটিয়ে নতুন সমাজ গঠনের দায়বোধ থেকে নাট্যকার তথা থিয়েটারওয়ালা উৎপল দত্তের জন্ম।

একাধিক শিল্পের সমন্বয়ে থিয়েটার গড়ে ওঠে, তাই থিয়েটার কোন একটি অঙ্গ অবলম্বন করে বেঁচে থাকতে পারে না। "থিয়েটার এমন একটা স্বতন্ত্র শিল্প মাধ্যম যার মধ্যে দৃশ্য, আলো, সঙ্গীত, অভিনয়, নেপথ্য ধ্বনি একত্রীভূত।"[৩] অনেকসময় শক্তিশালী নাটক বিনষ্ট হয়ে যায় কিছু অযোগ্য পরিচালকের হাতে পড়ে। থিয়েটারে নাটক একটি লিখিত পাণ্ডুলিপি থাকে না, প্রযোজনার তাগিদে বা প্রযোজনার পদ্ধতিতে তা শুষে নেওয়া হয়, প্রয়োজনে পরিবর্তন করাও হয়। নাটক পরিবর্তিত হয়ে যায় বা ভাষান্তরিত হয়ে যায় অভিনেতার মাধ্যমে, থিয়েটারি শিল্পের দেহে। অভিনেতার চেহারা, কণ্ঠস্বর, চলাফেরা, কথাবলার ভঙ্গি আমরা দেখি এক বিশেষ পরিবেশে, তার দৃশ্যগ্রাহ্যতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে রং, আলো, পোশাক, সংগীত ইত্যাদির সাহায্যে। এসব সবকিছুই মিলেমিশে একাকার হয়ে নাটকের পাণ্ডুলিপির চেহারা বদলে গিয়ে তার অন্তর্নিহিত সামগ্রিক সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। এই প্রযোজনা পদ্ধতির নানা কৌশলে যে নতুন জিনিস জন্ম নেয় সেটাই থিয়েটার। থিয়েটারে প্রত্যেক পরিচালক পরিচালনার ক্ষেত্রে বাস্তব পরিস্থিতি ও তার নিজস্ব থিয়েটারী দৃষ্টিভঙ্গি ও শিল্পগত প্রবণতা অনুযায়ী রীতিনীতির প্রবর্তক। একটি নাটক কীভাবে, কোন কলাকৌশলে দর্শকের সামনে গিয়ে পৌঁছবে, তা অনেকখানি নির্ভর করে পরিচালকের ওপর এবং নাট্যপ্রযোজনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের শিল্পবোধের ওপর। বিশেষত, নাট্যনির্দেশকের শিল্পাদর্শের ওপর। থিয়েটার তাই কেবলমাত্র নাটকের পাণ্ডুলিপি নির্ভর নয়, অনেক ক্ষেত্রে তা প্রযোজনা নির্ভর। উৎপল দত্ত এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন—

থিয়েটারের একটা ভিস্যুয়াল দিক আছে যেটা বাদ দিয়ে থিয়েটার আর থিয়েটার থাকে না।[৪]

উৎপল দত্ত তাঁর থিয়েটারে ধ্রুপদী রীতিনীতিকে অর্থাৎ ধ্রুপদী নাট্যাঙ্গিককে প্রত্যাখ্যান করেছেন। থিয়েটারে তথা নাট্য প্রয়োগে স্তানিস লাভস্কি, পিস্কাটার, ব্রেখট, ওখলপকভ-এর নাট্য পদ্ধতি উৎপল দত্তকে অনুপ্রাণিত করেছিল। কিন্তু রোমান ঐতিহ্য কিংবা ভিক্টোরিয় ও এলিজাবেথিয় এমনকি সংস্কৃত নাট্যপ্রকরণ, কোনটিরই সরাসরি প্রভাব নিয়ন্ত্রণ তিনি মানেননি।

স্তানিস লাভস্কির কাছ থেকে জীবনকে পর্যবেক্ষণ করা, দলগত অভিনয়, সত্যবাদিতা এবং মঞ্চে উদ্বেগমুক্ত শিথিল থাকার কৌশল শিখেছেন। উৎপল দত্ত মনে করতেন অভিনয় করার মধ্যে আবেগের কোনো স্থান নেই, অভিনেতাকে ঠাণ্ডা মাথায় দলগত অভিনয়ে শামিল হতে হয়—

> *আমার মনে হচ্ছে আবেগের স্থান অভিনয়ে নামমাত্র বা নেই! আর নেই বলেই নবনাট্য-আন্দোলন অভিনয় নিয়ে নূতন পরীক্ষার দিকে পা বাড়াতে সাহস করেছে। নূতন অভিনয়, দলগত অভিনয়। ঠাণ্ডা মাথায় নিরুত্তাপ চিত্তে মঞ্চে না নামলে দলের মধ্যে নিজের স্থান গ্রহণ করা অসম্ভব। প্রতি মুহূর্তে যেখানে বৃহত্তর কম্‌পোজিশনে নিজের 'স্থান নেওয়ার প্রশ্ন সেখানে ওই আবেগই হচ্ছে এনিমি নাম্বার ওয়ান!* [৫]

স্বেচ্ছাচারী বড়ো অভিনেতাদের হাত থেকে থিয়েটারকে মুক্ত করে অভিনয়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে গিয়েছিলেন স্তানিসলাভস্কি। সেই উর্বর ক্ষেত্রে সততার বীজ বপন করে গিয়েছিলেন। ব্রেখট-এর এপিক থিয়েটার ও স্তানিসলাভস্কির সৃষ্ট ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। বিশেষত জগৎকে দ্বন্দ্বের ভিত্তির ওপর স্থাপন, ব্রেখট, স্তানিসলাভস্কির কাছ থেকে শিখেছিলেন। ব্রেখট নিজেও শ্রদ্ধা ভরে মস্কোর মনীষী স্তানিস লাভস্কির কাছ থেকে কী কী শিখেছেন, শ্রদ্ধাভরে তার তালিকা প্রস্তুত করে গেছেন—

> *নাটকের কাব্যগুণ উপলব্ধি করা...*
>
> *সমাজের প্রতি দায়িত্ব...*
>
> *দলগত অভিনয়...*
>
> *নাটকের কাহিনী বিন্যাস...*
>
> *সততা সহকারে চরিত্রের মুখোমুখি হওয়া...*
>
> *অনুভূতি ও কৌশলের ভারসাম্য...*
>
> *বাস্তবকে দ্বন্দ্বে ভরা রূপে উপস্থিত করা...*
>
> *মানুষের মহত্ত্ব।* [৬]

স্তানিসলাভস্কি বনাম ব্রেখট এই দ্বন্দ্ব অনেকেই উপস্থিত করেন, কিন্তু তারা অন্তরের যোগটা দেখতে পান না। কমিউনিস্ট হিসেবে ব্রেখট এগিয়ে আছেন অনেকটাই কিন্তু এটা ফর্মের প্রশ্ন, আঙ্গিকের প্রশ্ন। এখানে দু'জনেই দুই আলাদা ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত, দু'জনের কলা-কৌশলই অব্যর্থ। বিপ্লবী বিষয়বস্তু দর্শকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার তীক্ষ্ণ হাতিয়ার। ব্রেখট যেখানে দর্শক গোষ্ঠীকে

সজাগ করেন, স্তানিস লাভস্কির পদ্ধতি সেখানে দর্শকদের টেনে নেয় 'দ্বন্দ্বে ভরা বাস্তবে'। এপিক থিয়েটার বুর্জোয়া সমাজকে বিচ্ছেদ করে যুক্তি তর্কের সাহায্যে মানুষকে কমিউনিস্ট করে তুলতে চায় আর বাস্তববাদী থিয়েটার আবেগ ও সমব্যথা জাগিয়ে মানুষকে করতে চায় বিদ্রোহী। এপিক স্বভাবতই অনেক পরিণত অনেক বড়ো অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক। তবুও বিকল্প আঙ্গিক হিসেবে বাস্তববাদী ধারাও বহু বিপ্লবী বার্তার বাহন হয়ে বেঁচে আছে সারা বিশ্বে। প্রাচীন ও আধুনিক বিরাট নাট্য সাহিত্য রয়েছে, যা এপিকের কায়দা কানুন ছাড়া দর্শকের কাছে নিয়ে যাওয়া যায় না বা দর্শকের সহজ বোধ্য হয় না; কিন্তু তার পাশে রয়েছে অন্য বহু নাটক, যেগুলির প্রধান আশ্রয় একমাত্র এই বাস্তববাদী প্রয়োগধারা। তাই নাটককে যারা প্রচারের বাহন হিসাবে, সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে দেখেন তাদের কাছে এই দুই ধারার কোনো বিরোধ নেই। বরং তারা পরস্পরের পরিপূরক। উৎপল দত্ত এই দুই ধারা তথা স্তানিস লাভস্কি থিয়েটার পদ্ধতি ও ব্রেখটীয় পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত।

ব্রেখটের নানা নাটকে নানা ফর্ম ব্যবহৃত, তিনি সর্বত্র একই এলিয়েনেশন বা একই এপিক পদ্ধতি ব্যবহার করেননি। তিনি এমন কিছু নাটক মঞ্চস্থ করেছেন যেখানে তাঁর বিখ্যাত এপিক পদ্ধতি ব্যবহার করেননি বরং হুবহু স্তানিসলাভস্কির পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। উৎপল দত্ত ব্রেখট সম্পর্কিত আলোচনায় এপিকের সার কথা প্রবন্ধে জানিয়েছেন—

> *ফর্ম শূন্য থেকে মাদারি কা খেল মারফৎ ব্রেখ্ট্-এর ঘাড়ে গিয়ে ভর করেনি। ফর্মের উদ্ভব বিষয়বস্তু থেকে, নাট্যকারের চিন্তাকে দর্শকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা থেকে। ব্রেখ্ট্-এর নানা নাটকে নানা ফর্ম ব্যবহৃত, সর্বত্র একই এলিয়েনেশন বা একই এপিক পদ্ধতি তিনি ব্যবহার করেননি। এমন নাটকও তিনি লিখে মঞ্চস্থ করেছেন যেখানে তিনি হুবহু স্তানিস লাভস্কি পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন ('সেনোরা কারা'-র প্রযোজনা একটি উদাহরণ)। ফর্মের খোঁজে ব্রেখ্ট্ পিকিং অপেরার কাছে গেছেন, কাবুকি বুঝতে চেয়েছেন, প্রাচীন সংস্কৃত নাটক পড়েছেন, মার্ক্স্ অধ্যয়ন করেছেন। তাঁর কাছে ফর্ম কোনো দিনই অনড় কোনো ফর্মুলা নয়। যেভাবে হোক সাত সমুদ্দুরের নানা পাড় থেকে যে কোনো রং জোগাড় করে হোক, বিষয়বস্তুটাকে পৌঁছে দিতে হবে দর্শকের মগজে, মিশিয়ে দিতে হবে দর্শকের চিন্তাধারায়।* [৭]

ব্রেখ্ট্ নিজেই একজন শুধু মার্কসবাদী নন, তাঁর মতে মার্কসবাদী না হলে প্রকৃতপক্ষে নাট্যকার হওয়া যায় না। তিনি মনে করেন শ্রেণিসংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ না করলে অভিনেতা হওয়া যায় না। ব্রেখ্ট্ নিরপেক্ষ ছিলেন না, তিনি একজন বিপ্লবী নাট্যকার। প্রতি মুহূর্তে তিনি শ্রেণিসংগ্রামের প্রচারক ও ব্যাখ্যাকারী। ব্রেখ্ট্ ছিলেন বিপ্লবের চারণকবি— এটাই প্রধান কথা ও

মূল কথা। তাঁর যুগের কোনো বিপ্লবই তাঁর চোখ এড়ায়নি। প্যারিকমিউন (‘ডী টাগে’), ১৯৫০ সালে রুশ বিপ্লবকে কেন্দ্র করে ‘মা’, স্পেনের গৃহযুদ্ধকে কেন্দ্র করে ‘কারার’, হিটলারের অভ্যুত্থান ‘উই’, চীনের বিপ্লব ‘সমাধান’ প্রভৃতি একের পর এক বিপ্লব তাঁর নাটকের পটভূমি হিসেবে এসেছে। ছুরির মতো তাঁর বিশ্লেষণী দৃষ্টি পৌঁছে গেছে পুঁজিবাদের সারাৎসারে এবং ধর্মপ্রাণ অহিংসবাদের শোচনীয় ব্যর্থতায়। নাটকের পর নাটকে তিনি সশস্ত্র বিদ্রোহের স্বরূপ, প্রচারক, অস্ত্রের উপাসক। উৎপল দত্তের মতে—

দমন কর নয়তো দমিত হবে— মাঝে অন্য পথ নেই। [৮]

এটাই ব্রেখ্‌ট্‌-এর প্রধান পরিচয় ও মানসিকতা। তিনি বিশ্বব্যাপী সশস্ত্র বিপ্লবের এক যোদ্ধা।

উৎপল দত্ত ব্রেখ্‌ট্‌-এর মতো নিজেও বিপ্লবের চারণ, তাঁর যুগের বিভিন্ন সংগ্রাম, আন্দোলন, বিদ্রোহ এমনকি অতীত দিনের বিপ্লব, বিদ্রোহের ঘটনাপ্রবাহ তাঁর চোখ এড়ায়নি। সমস্ত বিপ্লব বিদ্রোহকে তিনি মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সংগ্রামী মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই-এর বার্তা দিয়েছেন। সংগ্রামী মানুষের সংগ্রামের অবিচ্ছিন্ন ধারাকে লোকমানসে প্রতিষ্ঠিত করার প্রত্যয়, ইতিহাস থেকে বিদ্রোহের কাহিনি বেছে নিয়ে থিয়েটার করার, যাত্রা লেখার প্রয়াস উৎপলের প্রধান নাট্যাদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় মূলত এ সূত্রেই। উৎপল দত্ত ব্রেখ্‌ট্‌-এর থিয়েটার ভাবনার অনুসারী ও নাট্য মঞ্চায়ন তথা নাট্য প্রয়োগে ব্রেখ্‌ট্‌ স্তানিস লাভস্কি দ্বারা অনুপ্রাণিত। ব্রেখ্‌ট্‌-এর সারা জীবনের বিপ্লব চিন্তা, নাট্যচিন্তা এবং আঙ্গিক চিন্তা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। একইভাবে উৎপল দত্তেরও বিপ্লব চিন্তা, নাট্যচিন্তা ও আঙ্গিকচিন্তা আন্তঃসম্পর্কিত। ব্রেখ্‌ট্‌-এর মতো উৎপল দত্ত নিজেও একজন বিপ্লবী নাট্যকার, আর বিপ্লবী নাট্যকার কখনও নিরপেক্ষ হতে পারেন না, তিনি ব্রেখ্‌ট্‌-এর মতো প্রাপ্তি মুহূর্তে থিয়েটার ভাবনার প্রতি ক্ষেত্রে শ্রেণিসংগ্রামের প্রচারক। তাই তিনি সদর্পে ঘোষণা করতে পারেন—

আমি শিল্পী নই। নাট্যকার বা অন্য যে কোন আখ্যা লোকে আমাকে দিতে পারে। তবে আমি মনে করি আমি ‘প্রোপাগান্ডিস্ট’। এটাই আমার মূল পরিচয়। [৯]

উৎপল দত্তের থিয়েটার মার্কসবাদী নাট্যচিন্তার নতুন সম্প্রসারণ এবং নতুন সংযোজন মাত্র। উৎপল দত্ত তাঁর নাটককে নির্দিষ্ট কোনো ফর্মূলায় বাঁধেননি, কারণ তিনি মনে করেন—

ফর্মূলা হচ্ছে নাটকের অশনি সংকেত। [১০]

নাটকের আসল কথা হল বৈপ্লবিক বিষয়বস্তু। এই বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে ব্রেখ্‌ট্‌ শতাব্দীর মহৎতম নাট্যকার বলে উৎপল দত্ত মনে করেন। দর্শকের কাছে বিপ্লবের বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য ব্রেখ্‌ট্‌

কখনোই ফর্ম অন্বেষণ করেননি, উৎপল দত্তও তেমনি। ফর্ম দেশ-কাল সাপেক্ষ, বিষয়বস্তু চিরন্তন। বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে ব্রেখ্‌ট্‌ বিপ্লবী নাটকের পতাকাবাহী।

উৎপল দত্ত ব্রেখ্‌ট্‌-এর নাট্যচিন্তা, নাট্যপদ্ধতি দ্বারা অনুপ্রাণিত। থিয়েটারে ব্রেখ্‌ট্‌-এর দৃষ্টিভঙ্গি ও উৎপল দত্তের দৃষ্টিভঙ্গি একই ধরনের, তবে তিনি ব্রেখ্‌ট্‌-এর মঞ্চধারণার সঙ্গে ঐক্যমত পোষণ করেন নি; বরং উৎপল দত্ত দৃশ্য সজ্জা এবং দৃশ্য উপকরণ ব্যবহারে বিশেষ যত্নবান ছিলেন বলেই আমরা জেনেছি। তীব্র জাতীয়তাবোধ ও সমাজবোধে উদ্বুদ্ধ উৎপল দত্ত মনে করেন—

> *ব্রেখটের আঙ্গিক তাঁর দেশ জার্মানির তথা মধ্য ইউরোপের বহুশত বছরের মানস গঠনে তৈরী। সে আঙ্গিককে এ দেশে আনলে— এ দেশের মানুষের মানস গঠনের সঙ্গে মিলবে না। তাছাড়া বিষয়বস্তুর মধ্যেও পরতে পরতে রয়েছে জার্মানির রাজনৈতিক ঘটনার সাম্প্রতিক ছবি। তাই ব্রেখটের নাটকের আঙ্গিক কিংবা বিষয় পুরোপুরি ভারতবর্ষ তথা বাংলার থিয়েটার আঙ্গিকে ব্যবহার সম্ভব নয়। সম্ভব হল, ব্রেখটের ভাবনাটাকে নিয়ে আসা। ব্রেখটের Epic Theatre ও Alienation Theory অনেকসময় আমাদের ঐতিহ্যের সহায়ক হয় না।* [১১]

উৎপল দত্ত ব্রেখ্‌ট্‌-এর মার্কসবাদী থিয়েটার ভাবনা বা নাট্যচর্চাকে মেনেছেন, তার নিপুণভাবে ব্যাখ্যাও করেছেন। কিন্তু কখনোই ব্রেখ্‌ট্‌-এর নাট্য পদ্ধতি অনুসরণ করেননি। তাই ব্রেখ্‌ট্‌ যখন বলেন থিয়েটারে ‘এমপ্যাথির’ জায়গা নেই সেকথা উৎপল দত্ত মানেন না। যখন ব্রেখ্‌ট্‌ বলেন—

> *Theatre must provoke with its representations of human social life— উৎপল দত্ত একথা সহজেই স্বীকার করে নেন। কিন্তু তারপরেই ব্রেখ্‌ট্‌ যখন বলেন— It must amaze to public and this can be achieved by a technique of alienating the familiam— তখন উৎপল দত্ত তা অনুসরণ করেন না।* [১২]

ব্রেখ্‌ট্‌ ও উৎপল দত্ত দুজনেই মার্কসবাদী ভাবনায় উদ্দীপিত ও জারিত থিয়েটারওয়ালা ও নাট্যকার। উৎপল দত্তের অনেক নাটকেই থিয়েটার ভাবনা, চরিত্র বা কোনো বিষয়ের প্রভাব লক্ষ করা যায়। মার্কসীয় আদর্শে সম্পৃক্ত ব্রেখ্‌ট্‌ বিশ্বাস করেন—

> *Without Marxist knowledge and a socialist outlook, it is impossible to day to understand reality or to use one's understanding to change it।* [১৩]

মার্কসবাদী ভাবনার আদর্শে উদ্বুদ্ধ উৎপল দত্ত একথাও বিশ্বাস করতেন এবং মার্কসবাদী ভাবনার নিরিখে তাঁরও সদর্প ঘোষণা—

I am partisan, no neutral and I believe in political struggle the day I cease to participate in political struggle, I shall be dead as an artist too। [১৪]

পরিচালক হিসেবে উৎপল দত্তের থিয়েটার সম্বন্ধে এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। এই দৃষ্টিভঙ্গির ফলে, কী নাটকে, নাটকের বিষয়বস্তু বা প্রয়োগ পদ্ধতিতে— সব বিষয়ে তিনি প্রচলিত বাংলার থিয়েটারের যে রীতি বা প্রথা সে প্রথা ভেঙেছেন এবং বিশ্বের রাজনৈতিক থিয়েটারের মূলস্রোতের সঙ্গে তাঁর থিয়েটারকে যুক্ত করার প্রচেষ্টা করেছেন। কিন্তু এসব কাজ করতে গিয়ে তাঁর কখনও গণমানুষের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ হয়নি বা নিজের দর্শকদের কথায় বিস্মৃত হননি বরং তার সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা সব কিছুই গণমানুষের কথা ভেবে বা দর্শকের কোষ্ঠীপাথরে যাচাই করতে চেয়েছেন। পরিচালক উৎপল দত্ত তাঁর থিয়েটারের শৈলী ও অভিনেতার সঠিক অভিনয়ের জন্য প্রয়োজন অনুভব করেন পারিপার্শ্বিক ও সমাজের অন্তরঙ্গ মেলবন্ধনে। কোনো অপরিবর্তনীয় তথ্য কিংবা দুর্বোধ্য তাত্ত্বিক ঘোরটোপে থিয়েটারকে আবদ্ধ করতে চাননি। পরিচালক উৎপল দত্ত থিয়েটারের সৌন্দর্যের পূজারি হতে গিয়ে জীবন প্রেমিক হতে ভুলে জাননি, গণমানুষের সম্পর্কে ছেদ হননি, বা নিজের দর্শকের কথা বিস্মৃত হননি বরং তাঁর সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা সবকিছুই গণমানুষের কথা ভেবেই বা দর্শকের কষ্টিপাথরে যাচাই করতে চেয়েছেন। পরিচালক উৎপল দত্ত তাঁর থিয়েটারের শৈলী ও অভিনেতার সঠিক অভিনয়ের জন্য প্রয়োজন অনুভব করেন পারিপার্শ্বিক ও সমাজের অন্তরঙ্গ মেলবন্ধন। কোনো অপরিবর্তনীয় তথ্য কিংবা দুর্বোধ্য তাত্ত্বিক ঘেরাটোপে থিয়েটারকে আবদ্ধ রাখতে চাননি। পরিচালক উৎপল দত্ত থিয়েটারের সৌন্দর্যের পূজারি হতে গিয়ে জীবনপ্রেমিক হতে ভুলে যাননি, গণমানুষের সম্পর্ক ছেদ করেননি। তাই তিনি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে মঞ্চের ঘটনার সঙ্গে ইতিহাসের বৃহৎ শক্তির যোগসূত্র স্থাপনের জন্য আজীবন সংগ্রামশীল ছিলেন। উৎপল দত্ত তাঁর থিয়েটারে প্রযোজনার ক্ষেত্রে, মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন প্রযোজনার ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু নির্বাচনে। বিষয়বস্তুর মাধ্যমে তিনি দ্রুত তাঁর নাটকের জনগণ ও দর্শকের কাছে পৌঁছাতে চেয়েছেন। বিষয়বস্তুর মধ্য দিয়ে অতি দ্রুত গণমানুষ ও দর্শককে প্রভাবিত করতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন—

প্রতি জাতি নিজ নিজ প্রিয় ফর্ম সৃষ্টি করেছে বহু শতাব্দী ধরে। সেই ফর্মেই সে দেখতে চাইবে বৈপ্লবিক নাটক। জাপানিদের কাছে বিপ্লবের বার্তা হয়তো কাবুকি মারফত সবচেয়ে দ্রুত পৌঁছে দেওয়া যাবে, বাংলার মানুষের কাছে যাত্রায়, আর দক্ষিণ ভারতে নৃত্য মারফত, মহারাষ্ট্রে তামাশায়, উত্তর প্রদেশে নৌটংকিতে, গুজরাটে ভাওয়াইয়ে। আসল কথা বৈপ্লবিক বিষয়বস্তু। [১৫]

উৎপল দত্ত বাংলা নাট্যজগতের ব্রেখ্‌ট্‌ ও পিস্‌কাটর। তিনি নাট্যকার হিসেবে ব্রেখ্‌ট্রের

মতো তথ্য-আদর্শ-নিষ্ঠাবান একজন নাট্যকার ছিলেন আবার বিখ্যাত পরিচালক পিসকাট্রের মতো দুর্ধর্ষ পরিচালক প্রযোজক ছিলেন। সেই সঙ্গে বাংলা নাট্যজগতের এক মহান অভিনেতা উৎপল দত্ত, যিনি কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে সদাসর্বদা যোগাযোগ রেখে চলেছিলেন ও তাঁর শিল্পকর্মে বামপন্থী আদর্শ ছত্রে ছত্রে বিরাজমান। উৎপল দত্ত সম্পর্কে বলতে গিয়ে সাহিত্যবিদ পবিত্র সরকার বলেছেন—

> *উৎপল দত্ত একই সঙ্গে বাংলা নাট্যজগতের ব্রেখ্ট্ এবং পিস্কাটর।... উৎপল দত্ত ছিলেন ব্রেখ্টের মতো এক তত্ত্ব ও আদর্শনিষ্ঠ নাট্যকার এবং পিস্কাটরের মতো এক দুর্ধর্ষ পরিচালক-প্রযোজক। ... এবং বাংলা নাট্যজগতের এক মহাপরাক্রান্ত অভিনেতা উৎপল দত্ত।* [১৬]

উৎপল দত্ত নাট্যকার হিসেবে নাটক রচনা করতে গিয়ে কখনও ভুলে যাননি যে, বিষয়বস্তু চিরন্তন ফর্ম দেশ-কাল সাপেক্ষ। তাই তিনি সচেতনভাবে বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছেন এবং পরিচালক হিসেবে সেই বিষয়বস্তুর মঞ্চে উপস্থাপনার বিষয়ে যথেষ্ট খেয়াল রেখেছেন। কোন কৌশলে, কেমন মঞ্চে, কেমন আলো বা কেমন সংগীতের ব্যবহারে তিনি দর্শকের কাছাকাছি পৌঁছবেন তা সদাসর্বদা তিনি খেয়াল রেখেছেন। উৎপল দত্তের মতে বৈপ্লবিক বিষয়বস্তু বা বক্তব্য পৌঁছানোর জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন সবকিছুই করতে হবে। উৎপল দত্ত সদাসর্বদা তাঁর লক্ষ্য স্থির রেখেছিলেন যে ধরনের নাটকই উপস্থাপন করা হোক না কেন, তার মোড়কে রাখতে হবে বিষয়বস্তু ও সংগ্রামকে। আঙ্গিকের প্রশ্নকে যেহেতু নির্ধারণ করে বিষয়বস্তু, সেহেতু বিষয়বস্তুকে বোঝাবার জন্য যা যা করার প্রয়োজন তা করার জন্য উৎপল দত্ত নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি মনে করতেন, প্রতিটি নাটককেই তার নিজস্ব আঙ্গিক খুঁজে নিতে হবে এবং আঙ্গিক এমন অনড় কোনো পদ্ধতি নয় যে তাকে বদলানো যাবে না। বিষয়বস্তু দর্শকের হৃদয়গ্রাহ্য, দৃষ্টিগ্রাহ্য এবং দর্শকের চিন্তার সঙ্গে মেলাতে হলে, যে আঙ্গিক ব্যবহার সবচেয়ে কার্যকরী ও পরিস্থিতি সাপেক্ষ তা খুঁজে নেওয়াই একজন আদর্শ ও প্রকৃত নাট্যকারের কাজ। বাংলা নাটকে বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক উভয়েরই পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উৎপল দত্ত সংযোজন করেছেন নতুন মাত্রা, নতুন দিক নির্দেশ করেছেন। দেশের গণমানুষের কাছে পৌঁছানো যাবে যে নাট্যভিনয়, নাট্যআঙ্গিক বা যে নাট্যভাষায় বা যে নাট্য কৌশলে, উৎপল তাকেই যথার্থ নাট্যআঙ্গিক বলে মেনেছেন। প্রতি মুহূর্তে দর্শকের কষ্ঠিপাথরে তাঁর কার্যকারিতা যাচাই হবে। তাই নাটকটিকে মঞ্চোপযোগী হতে হবে, দর্শকের কাছে আকর্ষণীয় হতে হবে। এ ব্যাপারে পরিচালক হিসেবে উৎপল দত্তের বক্তব্য—

> *নাটকটিকে এমন বাঁধুনি, এমন গতি, এমন চমক দিতে হবে যেন দর্শকের ভালো লাগে, বিষয়বস্তু যেন এমন রূপ নিয়ে দর্শকের সামনে আসে, এমন আঙ্গিক নিয়ে মঞ্চে ওঠে যেন দর্শক বুঝতে পারে ও খুশি হয়।* [১৭]

পরিচালক থিয়েটারের নিয়মে নিগড়ে বাঁধা। এতকাল বাংলা নাট্যশালা অভিনেতাদের লীলাক্ষেত্র ছিল, অভিনেতাদের আস্ফালনের আখড়া ছিল। অন্যের লেখা মুখস্থ করে, অন্যের সৃষ্ট দৃশ্যে অভিনয় করতে করতে অভিনেতার নিজের অজ্ঞাতেই হঠাৎ এমন আশ্চর্য এক আবহাওয়া গড়ে ওঠে যে থিয়েটারের মূল উদ্দেশ্য বিঘ্নিত হয়। থিয়েটার বক্তার আসর নয় বা আবৃত্তির। নাটকটিকে পরিচালক থিয়েটারের ব্যাকরণ মেনেই দর্শকের সামনে উপস্থিত করেন। থিয়েটারের অভিনয় সম্পর্কে উৎপল দত্ত বলেছেন—

> *থিয়েটারে আছেন অভিনেতা। তিনি কথা বলেন, চলা ফেরা করেন, হাত-পা নাড়েন। তবে কি তিনিই মূল গায়েন? তাঁর বাচিক অভিনয়ই যদি থিয়েটারের প্রধান উপকরণ হয়, তবে থিয়েটার আর আবৃত্তির পার্থক্য থাকে কি? যদি অভিনেতার অঙ্গ সঞ্চালনই মূল হয়, তবে নৃত্যবিদ হেসে বলবেন— আমার শিল্পরই বটতলা সংস্করণ হল থিয়েটার।* [১৮]

থিয়েটারের মধ্যে অভিনয়, দৃশ্য, আলো, সংগীত, ধ্বনি সবই একত্রীভূত। থিয়েটারে দৃশ্যসজ্জার সঙ্গে চিত্রকলা ওতপ্রোতভাবে জড়িত, এমনকি ভাস্কর্যও গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। দৃশ্যসজ্জা দর্শকের সামনে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলতে গেলে প্রয়োজন যথাযথ আলোক সম্পাতের। সর্বোপরি প্রয়োজন সংগীতের। থিয়েটারে সংগীতের ব্যবহার অপরিহার্য। কিন্তু সংগীতের ব্যবহার স্বাধীন নয়। মুক্ত উচ্ছাস এক্ষেত্রে উপযোগী নয়। নাটকের প্রয়োজনেই সংগীত ব্যবহৃত হবে কিন্তু সংগীত ব্যবহারের নির্দিষ্ট নিয়ম আছে অর্থাৎ থিয়েটার বারোয়ারি শিল্পের সমন্বয়, থিয়েটার নানা শিল্পের সমন্বয়ে গঠিত হয়। তাই থিয়েটার থিয়েটারের ভাষায় কথা বলবে এবং সে ভাষার বর্ণমালা হল তার অভিনয়, দৃশ্য সজ্জা, সংগীত, আলোকসম্পাত প্রভৃতি। এসবের সমন্বয়ে থিয়েটার গড়ে ওঠে। এপ্রসঙ্গে উৎপল দত্ত বলেছেন—

> *থিয়েটার নানা শিল্পের মিলিত সৃষ্টি, আর এই মিলের ভিত্তি হল পরস্পরের সঙ্গে ক্রমশ একাত্ম হওয়ার প্রচেষ্টা। শব্দকে হতে হবে বর্ণ, বর্ণকে হতে হবে শব্দ।*
>
> *আর এ থিয়োরির শত্রু হলেন বাস্তবাদীরা, অর্থাৎ ফোটোগ্রাফপন্থীরা। এঁরা ভুলে যান শিল্প ঠিক জীবন নয়, শিল্প জীবনোর্ধ্ব, কালোর্ধ্ব, দেশোর্ধ্ব একটা কিছু। জীবন প্রবহমান; থিয়েটার স্থিতু। জীবন সম্পূর্ণ, নাটক খণ্ডিত। এই খণ্ডিতের মধ্যে সম্পূর্ণতার চেহারাটা ধরতে গেলেই খণ্ডচিত্রকে একটা বাস্তবোত্তর রূপ দিতে হবে। রঙে ছন্দে বাঁধতে হবে তাকে। নইলে সে হয়ে থাকবে একটা বিচ্ছিন্ন মুহূর্তের অসংলগ্ন চিত্র।* [১৯]

থিয়েটারে অন্যান্য উপাদানের তুলনায় অভিনেতাকে বেশি পরিমাণে গুরুত্ব প্রদানের ফলে

থিয়েটারে অন্যান্য উপাদানগুলি চরম অবহেলিত হয়েছে। অভিনেতাদের অত্যাচারে মঞ্চে তখন নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম, মঞ্চে অভিনেতার প্রভাব একক ও অটুট। যার ফলে থিয়েটারের প্রধান উদ্দেশ্য বিঘ্নিত হয়। এ প্রসঙ্গে উৎপল দত্তের মন্তব্য—

> *অভিনেতারা মঞ্চ দখল করেছেন। তাই দৃশ্যসজ্জাকে উপেক্ষিত, অবহেলিত, দুয়োরানীর মতন পড়ে থাকতে হত পেছনে। অথচ আঙ্গিকের বিকাশে কোনো সুয়ো-র চেয়ে দুয়োরানীর অধিকারের কম হবার কথা নয়। কিন্তু সে-অধিকার স্বীকৃত হয়নি।... মঞ্চসজ্জাতেও তখন ন্যাকড়ায়-আঁকা বনপথ আর কক্ষ আর রাজপ্রাসাদে আবদ্ধ থেকে ওই অভিনেতাদের প্রতিভার আগুনে পুড়ে মরতে লাগল। আশ্চর্য ব্যাপার, এখনো পর্যন্তও একক অভিনেতাদের অসংযত আস্ফালন চলছে।... অভিনেতার গগনস্পর্শী দম্ভের পায়ে তাদের চুরমার হতে হয়েছে। অভিনেতাকে মঞ্চটা ছেড়ে দিয়ে এরা সবাই ভিড় করেছে পেছনের দিকে, ধুকপুক করে কোনোমতে বাঁচবার জন্য।* [২০]

আধুনিক থিয়েটারকে পরিচালকের থিয়েটার বলা হয়। উৎপল দত্ত 'চায়ের ধোঁয়া' গ্রন্থে পরিচালকের জয়কে আঙ্গিকের জয় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কারণ আঙ্গিকই হল একজন পরিচালকের আত্মপ্রকাশের প্রধান ভাষা। এতদিন নাট্যআঙ্গিকের তেমন কোনো গুরুত্ব ছিল না, নাট্যআঙ্গিক শৈশব অবস্থায় ছিল, কারণ এতদিন থিয়েটার ছিল অভিনেতাদের দখলে, অভিনেতাদের দাপটে নাট্যআঙ্গিকের গুরুত্ব অনেকটাই কম হয়ে গিয়েছিল। বিখ্যাত পরিচালক বের্টোল্ট ব্রেখ্‌ট্ বলেছেন—

> *The theatre is not the servant of the dramatist, but of society।* [২১]

ব্রেখ্‌ট্-এর এই উক্তি বর্তমান পরিচালকদের যেন জগৎ কাঁপানো রণহুঙ্কার। তাই একজন পরিচালক হিসেবে উৎপল দত্ত কি করণীয় সে বিষয়ে তিনি বলেছেন—

> *থিয়েটার এবং দর্শক পেলেই আমি যবনিকা বাদ দেব। তারপর বাদ দেব উইংস্, বর্ডার প্রভৃতি। তারপর হটাব সীন-জাতীয় যত জিনিস! মেঝেটাকে নানা আকারের বেদী দিয়ে ভরে দেব, এলোমেলো এদিক ওদিকে সিঁড়ি সাজাব। অভিনেতা চলতে গেলেই যাতে সিঁড়ি ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। উচ্চতর বেদী ব্যবহার করে মেঝে আর ব্যটেন লাইটের মধ্যবর্তী বিশাল জায়গাটা ব্যবহার করব। ঝড় বোঝাতে ব্যবহার করব ক্রেগ-এর আঁকা রেখা কাটা একটা কালো পর্দা বা ব্রেখ্‌ট্-বর্ণিত বিদ্যুৎ আঁকা একটা ধূসর পর্দা। জল বোঝাতে ব্যবহার করব নীল পোশাক পরা জনা কুড়ি নর্তকী। আগুন বোঝাতে হয়তো উদয়শঙ্করের প্রদর্শিত কিছু লাল রিবন নাড়ব। বৃষ্টি বোঝাতে গুটিদশেক ছাতা খুলে ধরব। যুদ্ধক্ষেত্র বোঝাতে পর্দা আর বেদীগুলোকে নাড়াব ভীম বেগে। মাতালের চোখে*

কলকাতা দেখাব : কার্ডবোর্ডের মনুমেন্ট আর হাইকোর্টকে চাকায় বসিয়ে ছুটিয়ে দেব মঞ্চের উপর দিয়ে, এলোমেলো ডগমগ কলকাতা—। যাক্‌, করব অনেক কিছুই। কিন্তু যা করব তা থিয়েটারি ঢং-এই করব। চিত্রপটের খোকা-সুলভ বাস্তবতা আমদানি করব না। [২২]

উৎপল দত্ত নাটক পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন সেন্ট জেভিয়ার্সের কলেজ জীবন থেকে। কলেজ জীবন থেকে নাট্য প্রযোজনা শুরু করলেন, তখন থেকেই তিনি রাজনীতি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই উৎপল দত্তের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা অঙ্কুর হয়েছিল। সেই রাজনৈতিক বোধ, সেই রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনা, সচেতনভাবেই তিনি নাট্য প্রযোজনার সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে 'দ্যি অ্যামেচার শেক্‌স্‌পিয়ারিয়ান্‌স্‌' যখন নাটকটি মঞ্চস্থ করল, তখনই বোঝা গিয়েছিল পরিচালক উৎপল দত্ত শুধু আধুনিক থিয়েটারের কলাকৌশল সম্বন্ধে অবহিত তাই নন, তিনি আধুনিক যুগের রাজনীতি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। প্রাচীন রোমের পটভূমিকায় শেকসপিয়রের নাটক 'জুলিয়াস সিজার'-কে উৎপল দত্ত মঞ্চস্থ করলেন আধুনিক সাজসজ্জায়, একেবারে একালের মিলেটারি পোশাকে। 'জুলিয়াস সিজার' নাটকে যা ছিল প্রাচীন রোমের স্বৈরতন্ত্রী ও প্রজাতন্ত্রীদের মধ্যে লড়াই, উৎপল দত্ত তাকেই রূপান্তরিত করলেন একালের ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে সোস্যালিস্ট ও কমিউনিস্টদের লড়াই হিসেবে। নাটকে সীজার মঞ্চে আসেন ফ্যাসিস্ট উর্দিতে, সমবেত সেনেটররা লাল ও কালো পোশাক পরে তাকে 'হাইল' উচ্চারণে স্বাগত জানান। সোস্যালিস্ট ব্রুটাশ রক্তপাতের মুখোমুখি হয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে বিদীর্ণ হন আর কমিউনিস্ট ক্যাসিয়াস তাকে রক্তাক্ত সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা বোঝান। প্রাচীন রোমের পটভূমিকে উৎপল দত্ত সুকৌশলে একালের পটভূমিতে পরিণত করেছেন। 'জুলিয়াস সিজার' নাটকের স্মৃতিচারণায় উৎপল দত্ত জানিয়েছেন—

সিজারের মধ্যে যেন কালোর্ধ দেশোর্ধ এক ডিক্টেটর দেখতে পেয়েছিলেন মহাকবি। আমাদের সিজার (এলিস এব্রাহাম) ফেল্ট হ্যাট মাথায় যখন ভাষণ দিতে উঠলেন, সমবেত কালো ও লাল পোষাকে সজ্জিত সেনেটরগণ যখন প্রবল 'হেইল' উচ্চারণে হাত তুলে সেলাম করলেন, যখন প্রজতন্ত্রী ব্রুটাস (আমি) রক্তপাতের মুখোমুখি হয়ে দ্যোদুল্যমান, যখন উগ্রপন্থী ক্যাসিয়াস (প্রতাপ) নির্ভুলভাবে রক্তাক্ত সংঘর্ষের প্রয়োজনীয়তা বোঝান, যখন নির্মম কুচক্রী এ্যান্টনি (জেফ্রি আইজাক) যে কোন মহাবাগ্মী ফ্যাসিস্তের মতন জনতাকে বিপথে চালিত করেন, তখন নাটক হঠাৎ হয়ে উঠেছিল সমকালীন বিশ্বের এক দর্পণ। ব্রুটাস ও এন্টনির ফোরাম বক্তৃতা দুটি আমরা উপস্থিত করেছিলাম রেডিও ভাষণ হিসেবে। শেষ ফিলিপাই যুদ্ধ ক্ষেত্রে দেখিয়েছিলাম বোমা-বিধ্বস্ত এক নগরীর ধ্বংসাবশেষ, যেখানে প্রজাতন্ত্রী বাহিনীর হেডকোয়ার্টার্স স্থাপিত হয়েছে। ঘন ঘন মেশিনগান ও উড়ন্ত বোমারু বিমানের আবহ-শব্দের সঙ্গে চলেছিল শেষ অঙ্কের অভিনয়। [২৩]

এই পর্বে উৎপল দত্ত একনিষ্ঠভাবে মার্কসবাদ অধ্যয়ন করেছিলেন। তেমনি ‘লিটল থিয়েটার গ্রুপ’-এ একাধিক সদস্য এসেছিলেন যারা রাজনৈতিকভাবে বামপন্থী ছিলেন। সকলের পরামর্শ মেনে এইসময় দু’টি রাজনৈতিক নাটক— ক্লিফর্ড ওডেট্‌স-এর ‘ওয়েটিং ফর লেফটি’ এবং ‘Till the day, I did’ প্রযোজনা করেন। বিপ্লবী এই দু’টি নাটকের মধ্যে উৎপল দত্ত সচেতনভাবে এদেশীয় রাজনৈতিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন। এইসময় কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি হওয়া, কমিউনিস্ট পার্টির ওপরে নানারকম গ্রেপ্তার, অত্যাচার, নির্যাতন, বেপরোয়া গুণ্ডামি প্রভৃতির ফলে পার্টির নেতাকর্মীরা দিশেহারা হয়ে পড়েছিল। তাদের হৃত মনোবল ও সাহস ফিরিয়ে আনার জন্য উৎপল দত্ত সুকৌশলে তাদের জোটবদ্ধ ও একত্রিত করার উদ্দেশ্যে নাটক দুটি প্রযোজনা করেন। নাটক দুটি প্রযোজনার কারণ হিসেবে উৎপল দত্ত বলেন—

> *১৯৪৮ সাল কমিউনিস্ট পার্টি বে-আইনি হল। গ্রেপ্তার, নির্যাতন চলল বেপরোয়া। ... কারাগারে গুলিচালনার সংবাদে ক্রোধ যেন ব্যর্থ নিঃশ্বাস হয়ে ধাক্কা মারছিল বক্ষপঞ্জরে। কাকদ্বীপে নারীহত্যা, নয়ানপুরের মাটি লাল, ডিব্রুগড়ে গণনাট্যের গুলিবর্ষণ, ময়দানে-হাজরা পার্কে জন-সমাবেশে বেপরোয়া গুলিচালনা, বউবাজারে নারী মিছিলের ওপর গুলি— আর লিটল থিয়েটার কিসের তপস্যায় মৌনী? অতএব ধরা হল ক্লিফর্ড ওডেট্‌স্-এর বিপ্লবী নাটক ‘ওয়েটিং ফর লেফটি’।* [২৪]

বিপ্লবী নাকট ‘ওয়েটিং ফর লেফটি’ প্রযোজনায় এক এবং অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য কমিউনিস্ট পার্টির হৃত মনোবলকে পুনঃরুদ্ধার করা ও সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করা। এর পরের নাটক তিনি প্রযোজনা করেন ক্লিফর্ড ওডেট্‌স-এর “Till the day I die”। নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির আমৃত্যু সংগ্রামের কাহিনি নিয়ে তৈরি ‘Till the day I die’। জার্মান পার্টির বীরত্ব গাথা আলোচ্য নাটকে বর্ণিত হয়েছে, যা ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দের কলকাতা তথা ভারতীয় কমিউনিস্টদের কাহিনি হয়ে উঠেছিল।

উৎপল দত্তের মার্কসবাদী চিন্তা-চেতনা ও মার্কসবাদী আদর্শকে স্মরণে রেখে তাঁর কিছু বিখ্যাত সফল প্রযোজনা সম্পর্কে আলোকপাত করা যেতে পারে— বিহারের ধানবাদ অঞ্চলে তখন সদ্য ঘটে যাওয়া জামাডোবায় চিনাকুড়ি ও বরাধেমো কয়লাখনির দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে লিখলেন ‘অঙ্গার’ নাটক। খনি শ্রমিকদের সে মর্মান্তিক অবস্থার সংবাদ কলকাতার সংবাদপত্রের শিরোনামে। উৎপল দত্ত তাঁর নাট্য প্রযোজনার সহায়ক কয়েকজনকে নিয়ে সেখানে গেলেন, বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন, কথা বললেন খাদনের শ্রমিকদের সঙ্গে। খনি শ্রমিকদের জীবন ও তাদের অর্থনৈতিক শোষণের নির্মম অভিজ্ঞতাগুলি অনুধাবন করলেন। দুর্ঘটনায় যেসব শ্রমিক খনি গহ্বর থেকে প্রাণে বেঁচে ফিরতে পেরেছিল, তাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। সবকিছু দেখে শুনে বুঝে কলকাতায় তাঁরা ফিরে এলেন এবং লিখলেন কালজয়ী নাটক ‘অঙ্গার’। প্রথমে এর নাম রাখা

হয়েছিল 'কালো হীরে', পরে লিট্‌ল্‌ গ্রুপ থিয়েটারের তদানীন্তন সভাপতি চিত্ত চৌধুরীর মতে নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় 'অঙ্গার'। খনি শ্রমিকদের জীবনের কথা তাদের মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কথা, শোষণ-বঞ্চনার কথা, শ্রমিকদের সংগ্রামের কথা— এইসব নিয়েই বিহারের কালো মাটির কান্না 'অঙ্গার' নাটকের মধ্যে ধূমায়িত হল। কালো কালো মানুষগুলির প্রাণবন্ত অভিনয়, উৎপল দত্তের নাট্য রচনা ও পরিচালনা, পণ্ডিত রবিশংকরের সুর মূর্ছনা, তাপস সেনের আলোর কারিকুরি, নির্মল গুহরায়ের মঞ্চসজ্জার অসাধারণ দক্ষতা, সর্বোপরি সবার মিলিত কর্মকাণ্ডে এবং অভিনয়ের প্রাণস্পর্শে বাংলার থিয়েটারে এক প্রাণোন্মাদনার জোয়ার নিয়ে এসেছিল।

বাংলার থিয়েটারের এই অভাবিত সন্ধান এবং উপস্থাপনার আন্তরিক নৈপুণ্য এবং উৎপল দত্তের প্রযোজনার বিশেষ ভঙ্গি ও কৌশল সবাইকে আকর্ষিত ও মুগ্ধ করল। অভিনয়ে সবাই জীবন্ত হয়ে উঠলেন, বিশেষ করে শট্‌ ফায়ারার স্বপ্ন বিলাসী বিনুর ভূমিকায় শ্যামল সেন অনবদ্য অভিনয়ের স্বাক্ষর রাখলেন এবং সনাতনরূপী রবি ঘোষ সবার অন্তর জয় করে নিয়েছিলেন। বিনুর মা রূপী শোভা সেনের প্রাণবন্ত ও সজীব অভিনয় বিশেষ ছাপ ফেলতে সক্ষম হয়। বিশেষত চতুর্থ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে শট্‌ ফায়ারার বিনু চরম আর্থিক অনটনের মধ্যে অতিবাহিত করা একটা নিম্নপরিবারের সংসারের করুণ কাহিনি, যা বিনু ও তার মায়ের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে উঠে আসে তা দেখে দর্শক মোহিত হয়ে যান ও তাদের প্রাণবন্ত অভিনয় দর্শককে অশ্রুসিক্ত করে তোলে—

বিনু : তুমি বুঝতে পারছ না মা, পরে বুঝবে আমি ঠিকই করেছি।

মা : না, আমি তো বুঝব না! দিনের পর দিন একা রাঁধুনির কাজ, ঝিয়ের কাজ করে চলেছি কবে তুই দুটো খেতে দিবি সেই আশায়। ঘর বেঁধে দিবি পাহাড়ের কাছে, বাগান করবি, তুলসীতলায় প্রদীপ দেবো, সুমি শাঁখ বাজাবে। কত কথাই না বলেছিলি। আর আজ সে সবই এল তোর কাছে, তুই ছুঁড়ে ফেলে দিলি। একবার ভাবলি না—। ... সুমির বিয়ে দিবি বলেছিলি না? তিন মাইল যেতে তিন মাইল আসতে— হেঁটে হেঁটেই মরে যাবে মেয়েটা।

বিনু : (একমুখ ভাত নিয়ে একটু হেসে) মা, এখন নয়, একটু খেয়ে নিই।

[মা চুপ করে থাকেন। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়— তাঁর চোখ ফেটে জল আসে। আঁচলে চোখ মোছেন।]

মা : ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। সব প্রতিজ্ঞাই তো ভুলেছিস। আর কেন? এবার আমাদের বার করে দে— মায়ে ঝিয়ে ভিক্ষে করে পেট চালাই।

বিনু : *শোনো মা, কেন অমন করে বলছ? আমি যা করেছি কর্তব্য বলেই করেছি। ও করতে আমি বাধ্য।*

মা : *তোর কর্তব্য তোর মা'র প্রতি প্রথম। নিজের ঘর ভেঙে যাচ্ছে, বনের মোষ তাড়াবার কোনো প্রয়োজন নেই।*

বিনু : *আমি ভেবেছিলাম তুমি অন্তত বুঝবে।*

মা : *না, বুঝব না, বুঝতে চাই না। গত দেড় মাস এক বেলা খাচ্ছি। পেট ভরে শেষ কবে খেয়েছিলাম মনেই নেই। এ অবস্থায় কি করে বুঝব?*

বিনু : *আমি চেষ্টা তো কম করিনি, মা।*

মা : *কবে চেষ্টা করেছিস? যা পেয়েছিলি নিজে শখ করে খোয়াতে বসেছিস।*

বিনু : *শখ করে নয়, বাধ্য হয়ে।* [২৫]

সারা মঞ্চ জুড়ে এতগুলো চরিত্রের একসঙ্গে প্রাণবন্ত, সচল, সুন্দর অভিনয় দর্শককে বিহ্বল করে তোলে। সনাতন রূপী রবি ঘোষকে দেখতে পাই যখন খনি গহ্বরে শ্রমিকের দল বেরোতে না পারায় দিশেহারা হয়ে পড়ে তখন সনাতন তাদেরকে আশ্বস্ত করতে থাকে ও সঠিক পথ নির্দেশ করতে প্রয়াসী হয়। আটকে পড়া সমস্ত শ্রমিককে মানসিকভাবে আশ্বস্ত করতে থাকে ও বিপদের মাঝখানে তাদের করণীয় সম্পর্কে অবহিত করতে থাকে—

সনা : *চুপ। কেউ আর একটা কথা বলবে না। মরতে হয় মরব। তা বলে পাগল হয়ে ভুল বকতে বকতে মরব কেন?* [২৬]

কয়লার খনির গহ্বরে যখন জল প্রবেশ করে এবং একের পর এক শ্রমিক জলের অতল গহ্বরে ডুবতে থাকে, বিনু ও সনাতন— তাদের মৃত্যুও আসন্ন, তখন ডুবে যেতে যেতে তাদের বেদনাভরা মর্মস্পর্শী সংলাপ ও অভিনয় দর্শকের অন্তরকে নাড়া দিতে সক্ষম হয় ও অন্তর বেদনা ভারাক্রান্ত করে তোলে—

সনা : *উপরের লোককে জানাবে না কি করে আমরা ফুরিয়ে গেলাম?...*

বিনুর কণ্ঠস্বর : *শ্রীচরণেষু, মা, কি লিখি। কি করে তোমাকে বোঝাই— এবার আর জমি কেনা হোলো না; সন্ধ্যাবেলায় তোমার তুলসীতলায় প্রদীপ দেয়াও হয়ে উঠলো না। তোমার বুক ভেঙে যাবে জানি মাগো, তবু আমায় ক্ষমা কোরো, এর বেশি এবার করতে পারলাম না। তোমার মুখখানা*

একবার যদি দেখতে পেতাম! সুমিকে ভালোবাসা দিও...

সনাতনের কণ্ঠ : পৃথিবীর মানুষ, তোমরা আমাদের ভুলো না। মানুষের ঐশ্বর্য আহরণ করতে আমরা নেমে যাই ধরিত্রীর অতল গর্ভে। সেখানে আমাদের জীবন রক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই— [জলের ভীম গর্জনে প্রায় চাপা পড়ে যায় কণ্ঠ, তবু দ্রুত লিখে যায় সনাতন—।]

ঐশ্বর্য লিপ্সাই মানুষকে করে তোলে শয়তান আর সেই শয়তানরা হাসিমুখে আমাদের জলে ডুবিয়ে মারে। আমরা মরে যাই, ক্ষতি নেই, তোমরা দেখো এর পরে যেন আর একজন মানুষও এভাবে ইঁদুরের মতন না মরে।...

বিনু : মা! আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম, মা!... আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম— ... আর কিছু চাইনি আমি— শুধু বাঁচতে চেয়েছিলাম— [২৭]

বঙ্গরঙ্গ মঞ্চে 'অঙ্গার' নাটকের দৃশ্যসজ্জা ও মঞ্চব্যবস্থা দর্শককে অভিভূত করল। একটি কয়লাখনির পুরো পিট হেড লিফট সমেত মঞ্চে তৈরি করা হয়েছিল অভিনয়ের সুবিধার্থে। পরে দেখা যায় সেই পিট হোল দিয়ে জল ঢুকছে খনির মধ্যে যা দেখে দর্শক চমকিত হল। তাপস সেনের আলোর বাহাদুরিতে দর্শক দেখল কয়লাখনির ভিতর জল ঢুকছে, জলের স্তর ক্রমাগত বাড়ছে এবং কয়লা খাদানের মধ্যে আটকে পড়া খনিশ্রমিকেরা আস্তে আস্তে জলস্তর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জলের তলায় তলিয়ে যেতে যেতে তাদের যে আর্তনাদ, হাহাকার, প্রাণান্তকর মর্মস্পর্শী দমবন্ধ করা সেই দৃশ্য থিয়েটারকে এক নয়া মাত্রায় উন্নীত করতে সক্ষম হল। চতুর্থ দৃশ্যে রেসকিউ কর্মকাণ্ডে অপূর্ব আলোকসম্পাত এবং শেষ দৃশ্যে একই সঙ্গে ভয়াবহ ও মায়াময় পরিবেশ সৃষ্টিতে আশ্চর্য পরীক্ষা চালানোর জন্য তাপস সেন প্রশংসিত হয়েছিলেন। খনি গহ্বরে জল প্রবেশ ও জলস্তর বাড়া সেই জলস্তর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খনিশ্রমিকদের ডুবে যাওয়ার দৃশ্য তাপস সেন অপূর্ব আলোকসম্পাতের কায়দা কানুনের দ্বারা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু সমালোচকরা 'অঙ্গার'-এর এই জলের দৃশ্যকে নিয়ে যখন সমালোচনা করেন, তার প্রত্যুত্তরে উৎপল দত্ত জানান—

কাহিনীর একান্ত প্রয়োজনেই আসছে জল। প্রথম থেকেই ইঙ্গিত রয়েছে মৃত্যুর— কয়লাখনি মজুরের অবশ্যম্ভাবী নিয়তি, যার হাত থেকে মুক্তি নেই। পুরো নাটক নির্মমভাবে এগুচ্ছে ওই শোচনীয় মৃত্যুর দিকে। বিনুর ছিল স্বপ্ন, ছিল আশা— ওই মৃত্যুতে তার স্বপ্নভঙ্গ। মা তাঁকে কোন এক মুহূর্তে অপমান করেছিলেন— ওই মৃত্যুতে তার অবসান। মহাবীর সিং-এর ছিল মানুষের প্রতি গভীর অবজ্ঞা— ওই মৃত্যুতে তার আত্মোপলব্ধি। মুস্তাকের ছিল সবাইকে ঘোল খাওয়াবার ক্ষমতা— ওই মৃত্যুতে তার

নিজেরই ঘোল খাওয়া। সনাতনের ছিল জীবনের অর্থ খুঁজে বেড়াবার অভিযান— ওই মৃত্যুতে তার জীবনলাভ। এমনি সবাই— সব চরিত্র। ওই মৃত্যুই একাধারে ক্লাইম্যাক্স, সলিউশন, পরিণতি, নাটকে বক্তব্যের সম্পূর্ণতা— সেই মৃত্যুকেই বহন করে আনছে জলোচ্ছ্বাস। তাই জলোচ্ছ্বাস আসছে নাটকের প্রয়োজনে। [২৮]

নাটকের শেষ দৃশ্যসজ্জার সৃষ্টি করেছিলেন নির্মল গুহরায়। শেষ দৃশ্যের খনিগর্ভের এই ভয়াবহ, মায়াময় পরিবেশ সৃষ্টি করতে নির্মল গুহরায় আশ্চর্য ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন ও অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তার একনিষ্ঠ কর্মপ্রচেষ্টা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা যে সফল হয়েছিল তা শেষ দৃশ্যের বাতাবরণ দেখলেই সহজেই বোধগম্য হয়। শেষ দৃশ্যের এই ভয়াবহ ও মায়াময় দৃশ্যসজ্জার জন্যে নাটকটি আরও প্রাণবন্ত ও সজীব হয়ে উঠেছে।

নাটকের প্রতিটি দৃশ্যের সঙ্গে পণ্ডিত রবিশংকর-এর সৃষ্ট আবহ সংগীত যুক্ত হয়েছে, এর সঙ্গে নানা এফেক্ট মিউজিকও যুক্ত হয়েছে। এই আবহসংগীত ও এফেক্ট মিউজিক নাটকের অনুভবকে আরও গভীরতর পর্যায়ে নিয়ে গেছে। কোন কোন দৃশ্যে এই আবহসংগীত ও এফেক্ট মিউজিক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে, যা দর্শককে এক মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হতে দেয় না। বিশেষ করে, নাটকের শেষ দৃশ্যে যে খনির ভিতরকার আটকে পড়া শ্রমিকদের কাতর আর্তনাদের সঙ্গে মিউজিকের সংযোগ ও আবহসংগীত অসামান্য মাত্রার সৃষ্টি করেছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, দর্শকদের মধ্যে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়তেন এই নাটক দেখতে দেখতে এই শ্বাসরোধকারী দমবন্ধকর দৃশ্যের উপস্থাপনার ও এফেক্ট মিউজিকের প্রভাবে। প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে এমন খবরও পাওয়া যেত নাটক শেষ হলে দর্শকদের আসন ছেড়ে উঠতে সময় লাগতো, কারণ নাটকের এই ভয়াবহতার ঘোর কাটতে বেশ কিছুটা সময় যেত।

‘অঙ্গার’ নাটকই প্রথম শ্রমিকশ্রেণিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বাংলা নাটক। ‘অঙ্গার’ নাটকে শ্রমিকশ্রেণিকে কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে ও শ্রমিকশ্রেণির হাসি-কান্না-বেদনা প্রভৃতি দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাগুলিকে তুলে ধরা হয়েছে। বাংলা নাটকে ইতিপূর্বে শ্রমিকশ্রেণি পার্শ্ব চরিত্র হিসেবে থাকত, কিন্তু আলোচ্য নাটকে কেন্দ্রীয় চরিত্র। কোম্পানির শোষণ-বঞ্চনা ও উদাসীনতার বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণির যে আন্দোলন তার বিদ্রোহ প্রভৃতি তুলে ধরা হয়েছে। অন্যায়-শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদের আন্দোলনে শামিল হয়েছে তাদের মধ্যে সংগ্রামের আভাস পরিলক্ষিত ও সেই প্রতিবাদ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয় শ্রমিক কুদরৎ। নাট্যকার উৎপল দত্ত শ্রেণিসংগ্রামের এক আভাসকে ফুটিয়ে তোলেন ‘অঙ্গার’ নাটকে। নাট্যকার নিঃসন্দেহে শ্রমিকশ্রেণির পক্ষ নিয়ে পুঁজিবাদী শোষক এবং নির্যাতন ও শোষণের বিরুদ্ধে নিজের বক্তব্যকে

চড়া সুরে বেঁধেছেন। অনেকের কাছে মনে হতে পারে নাটকের প্রচার মূল্য ও শিল্পমূল্যকে নষ্ট করে দিয়েছে কিন্তু মনে রাখতে হবে উৎপল দত্ত ছিলেন আপাদমস্তক 'প্রোপাগান্ডিস্ট', বামপন্থার প্রচারক। তাই তাঁর শিল্পকর্মে বামপন্থী আদর্শ, আন্দোলন ও সংগ্রামের ধারা থাকবে এতে আর আশ্চর্য কী! মালিকশ্রেণির অত্যাচার-শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলন-বিদ্রোহ ও প্রতিবাদকে দেখে দর্শককে বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। 'অঙ্গার' নাটক গণমানুষের ওপরে সে সময় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল তা একটি ঘটনা থেকেই সহজেই অনুমেয়। মিনার্ভায় 'অঙ্গার' অভিনয়ের সময়ে তৎকালীন কংগ্রেসি নেতা নেপাল রায় তার দলবল নিয়ে এসেও অভিনয় বন্ধ করার ক্রমাগত হুমকি দিতে থাকেন এবং কমিউনিস্ট নেতা জ্যোতি বসুর কুশপুত্তলিকা দাহন করেন। সেই ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন উৎপল দত্ত—

> *Then came the attack on our theatre. The play 'Coal' [অঙ্গার] had already run 1100 performances and that evening's house had been out well in advance. Almost next to our theatre [Minerva] is a park called the Beadon square and there from about three in the after-noon, the congress boss of the area, Nepal Ray, began haranguing his elite guard— gangsters, thieves, pickpocketets and general dropouts, At about six in the evening they burnt an effigy of Jyoti Basu there and Nepal Ray seized the microphone once more and yelled : It is our shame that a play like Angar in still running inside our area।* [২৯]

'অঙ্গার' নাটকে নাট্যকারের আদর্শ ও ভাবধারার কিছু প্রচার উদ্দেশ্য থাকলেও নাটকের বিষয়বস্তু তার উপস্থাপনা দর্শকদের মনে প্রচণ্ড উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল। অভিনেতা, অভিনেত্রীদের অসামান্য অভিনয় সকলের নজর কেড়েছিল, মনের মণিকোঠায় স্থান দিয়েছিল। স্টেজ কম্পোজিশান তো লোকের মুখে মুখে ফিরেছিল, নির্মল গুহরায়ের মঞ্চসজ্জার একটি বাস্তব কয়লাখনি সমস্ত স্টেজ জুড়ে অবস্থান করেছিল। সেখানে দেখানো হয়েছিল খনি, খনিমুখ, ক্রেন, ডুলি, ট্রলি, খনিগর্ভ এবং তার মধ্যে কালো কালো কিছু শ্রমিক জীবন। তখনকার 'দেশ' পত্রিকায় মঞ্চসজ্জার বিবরণ দিয়ে লেখা হয়েছিল—

> *কোলিয়ারির যাবতীয় সরঞ্জাম ও কয়লাখনির গঠনরীতি আলো-আঁধারের মায়ার মধ্য দিয়ে এমন প্রামাণ্য রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, যা এদেশের রঙ্গমঞ্চে এর আগে কখনও দেখা যায়নি। নাটকের শেষ দৃশ্যে অন্ধকূপের মতো খাদের একটি অংশ ও তার ভেতরে বাঁধের জলের প্লাবনের দৃশ্য এক অত্যাশ্চর্য মঞ্চমায়ার পরিচয় দেয়।* [৩০]

থিয়েটার প্রযোজনায় 'অঙ্গার' নাটকের উপস্থাপনা, বিষয়, রি-কম্পোজিশান, কোরিয়গ্রাফি, আলো, শব্দ, আবহসংগীত সব মিলেমিশে নাটকটি বাংলা থিয়েটারের নাট্য অভিনয়ের ইতিহাসে এক অনন্য নজির হয়ে রইল।

'ফেরারী ফৌজ' (১৯৬১) নাটক রচনায় উৎপল দত্ত আরেকটা নতুন বিষয় গ্রহণ করলেন। ১৯৩০-এর দশকের বাংলা সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের পটভূমিতে নাটকটি রচিত। উনিশ শতকে ত্রিশের দশকে পূর্ব বাংলায় জেগে ওঠা যুবকদের ইংরেজদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের ঘটনা নিয়েই নাটকটি গড়ে উঠেছে। উৎপল দত্তের বহু পূর্বে অভিনীত ও প্রযোজিত 'Till the day I die' নাটকের ছায়াপাত ঘটেছে 'ফেরারী ফৌজ' নাটকে, যদিও ঘটনা, চরিত্র, বিষয় বিন্যাস উৎপল দত্তের নিজস্ব সৃষ্টি। এই নাটকের দৃশ্যের শুরুতে প্রথমেই রয়েছে মঞ্চসজ্জার দীর্ঘ বর্ণনা। গান গাইতে গাইতে মঞ্চে প্রবেশ করেন বিবেক। গানের মাঝে থেমে সূর্য সেনের মুক্তি পথের নিশানায় মিলিত হওয়ার ও অর্থসাহায্যের আহ্বান জানিয়ে আবার গান ধরেন বিবেক। এরপর দেখা যায় পুলিশ অফিসার হিতেন দাশগুপ্ত বিবেককে ধরে নিয়ে যায়। প্রথমেই দৃশ্যসজ্জার মাধ্যমে দর্শককে তাক লাগিয়ে দেন। এমনি দৃশ্যসজ্জার মাধ্যমে উৎপল দত্ত প্রোসেনিয়াম থিয়েটারের সঙ্গে যাত্রার মেলবন্ধন ঘটাতে চেয়েছেন। ভুবনডাঙা গির্জা ময়দানে হ্যাজাক বাতির নীলাভ আভায় যাত্রা হচ্ছে। কিছুটা দূরেই গির্জার দরজা। বৃদ্ধরা বসেছেন রোয়াকের ওপরে জমিদার বাবুর আশেপাশে। ছেলে-বুড়ো কৃষকের দল বসেছে মাটির ওপর। পালা জমে উঠেছে, গান গাইতে গাইতে প্রবেশ করে দীর্ঘকায় পুরুষ পাগড়ি পরা, সে দেশমাতৃকার বন্দনা করছে। যা শুনে দর্শকের চোখে জল চলে আসে। নাটকের প্রথম দৃশ্যেই অপূর্ব মঞ্চসজ্জার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমেই যাত্রার একটা পরিবেশে নাটকটি শুরু হয়, যে পরিবেশে দীর্ঘকাল ধরে অভ্যস্ত বাংলার দর্শক, সেই চির চেনা যাত্রার একটি পরিবেশ সৃষ্টি করে একটা সাধারণ ও অভ্যস্ত পরিবেশের মধ্য দিয়েই উৎপল দত্ত বিবেক তথা সূত্রধরের আগমনের মধ্যে দিয়ে নাট্য ঘটনায় প্রবেশ করান নাটকের কুশীলবদের। দর্শকও একাত্ম হয়ে যায় নাট্য মুহূর্তের সঙ্গে। এখানেই উৎপল দত্তের বিশেষ মুন্সিয়ানা।

'ফেরারী ফৌজ' নাটক মিনার্ভায় অভিনয়ের সময় যে মঞ্চ পরিকল্পনা করা হয়েছিল তা নানান দিক থেকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আলো, শব্দ, দৃশ্যপট মিলেমিশে একাকার হয়ে সমগ্র নাট্য উপস্থাপনায় একটা অসাধারণ পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছিল। 'ফেরারী ফৌজ' নাটকে দৃশ্যসজ্জাকে বাস্তবানুগ করার চেয়ে নাটকের গতিকে প্রবহমান রাখার দিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়েছিল। মঞ্চসজ্জার ওপরে বিশেষ চিন্তাভাবনা করে মঞ্চকে ত্রিস্তর করে নেওয়া হয়েছিল যাতে একই সঙ্গে একাধিক দৃশ্য অভিনয় করা যায়। তিনটি স্তরের মধ্যে নিম্নস্তরে নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত জীবন, দ্বিতীয়

স্তর বা মধ্য স্তরে বিপ্লবীদের সংগ্রাম, তৃতীয় স্তরে পুলিশ, জমিদার তথা সমাজের উচ্চ শ্রেণি। এই তিনটি সুস্পষ্ট স্তর পরিলক্ষিত হয় মঞ্চে। এই ত্রিস্তরিক দৃশ্যপটে অনেকসময় একই সঙ্গে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্য অভিনীত হয়েছে। সবটাই ঘটেছে অনবদ্য আলোক নিয়ন্ত্রণ কৌশলে ও অনবদ্য উপস্থাপনায়। সেই সময়কার 'স্ক্রীন' পত্রিকায় 'ফেরারী ফৌজ' নাটকে ত্রিস্তরীয় মঞ্চের বর্ণনা ও অভিনয়ের অভিনবত্বের প্রশংসা পাওয়া যায়—

> *এই দৃশ্যে উচ্চমধ্যবিত্ত পর্যায়ের মানুষদের প্রথম স্তরে, বিপ্লবীদের আড্ডাকে দ্বিতীয় স্তরে এবং সর্বোচ্চ স্তরে প্রথমে জমিদার গৃহিণী এবং পরে চণ্ডশক্তির প্রতীক পুলিশ বাহিনীকে আবির্ভূত হতে দেখিয়েছেন উৎপল।* [৩১]

মঞ্চের পিছনে ন'ফুট উঁচু বেদি তৈরি করা হয়েছিল যা ব্যবহৃত হয়েছে গির্জায় যাওয়ার পথ হিসেবে আবার কখনও ভুবনডাঙার গ্রামের পারাপারের সাঁকো হিসেবে। মঞ্চের ডান দিকের মেঝেকে ব্যবহার করা হয়েছে বিপ্লবী অশোকের বাড়ির ভিতরের অংশ হিসেবে, আর মঞ্চের বাঁদিকের অংশে ছিল বার বণিতা রাধার ঘর ও গ্রামের হাটতলা। এই নাটকের মঞ্চসজ্জা করেছিলেন নির্মল গুহ রায়, আলোকসম্পাতে ছিলেন তাপস সেন। মঞ্চের এই নির্মাণ কৌশল ও প্রক্রিয়াকে উৎপল দত্ত স্বাগত জানিয়েছিলেন—

> *মঞ্চকে বহুস্তরে সাজিয়ে আমরা যবনিকার ব্যবহার কার্যত বর্জন করেছিলাম।* [৩২]

মঞ্চকে বহুস্তরে সজ্জিত করে তাপস সেনের অনবদ্য আলোক কলাকৌশলে অনবদ্য হয়ে উঠেছিল। আলোকের কলাকৌশল নাটকের নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টিতে যেমন সহায়তা করেছে তেমনি নাটকের গতিতেও প্রাণ সঞ্চার করেছে। নির্মল গুহরায়ের মঞ্চসজ্জা, তাপস সেনের আলোকসম্পাতের সঙ্গে মিশেছিল আবহসংগীত। পণ্ডিত রবি শংকরের নিপুণ আবহসংগীত সৃষ্টি 'ফেরারী ফৌজ' নাটকে নতুন মাত্রা এনে দিয়েছিল। নাটকের তৃতীয় দৃশ্যে মাতাপুত্রের সাক্ষাৎকারের সময় যখন অশোক লুকিয়ে বাড়িতে এসেছে জানতে পেরে মাতা বঙ্গবাসী ল্যাম্প নিয়ে তাকে দেখতে আসে এবং অশোককে জড়িয়ে ধরে ও ল্যাম্পটা তুলে সন্তানের মুখ দেখার চেষ্টা করে, তখন যে মর্মস্পর্শী আবহসংগীত ধ্বনিত হয় তা নাটকের বিষয়ভাবনাকে অন্য পর্যায়ে, অন্য মাত্রায় নিয়ে যায়। আবার নাটকের সপ্তম দৃশ্যের একেবারে শেষে জনস্ন সাহেবকে মারতে গিয়ে বিপ্লবীরা ভুলবশত ফাদার ফ্লানাগানকে হত্যা করে। তাঁর মৃত্যুর সময় গির্জায় যে সংগীত ধ্বনিত হয় সে সংগীতের সুর বড়ো মর্মস্পর্শী হয়ে ওঠে পণ্ডিত রবিশংকরের দক্ষতায়। আবার নাটকের একেবারে শেষ লগ্নে যখন বিপ্লবীরা মুক্তির লড়াইয়ে পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধে পুলিশের গুলিতে মৃত্যুবরণ করে, সেই সময়কার

সংগীতের মূর্ছনা নাট্যভাবনাকে এক উচ্চতম ও বিশেষ পর্যায়ে তুলে নিয়ে যায়।

নাটকের দৃশ্য আলো, সংগীত, মঞ্চসজ্জা প্রভৃতির পাশাপাশি 'লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপ'-এর কলাকুশলীদের অনবদ্য অভিনয় যুক্ত হয়েছিল। অশোকের চরিত্রে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় একজন আদর্শ সাচ্চা বিপ্লবী হিসেবে অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন। বিপ্লবীর আদর্শবাদের প্রতিষ্ঠা ন্যায়, নীতি, নিষ্ঠাবান, তা নির্ভীক মনে প্রকাশ অসাধারণভাবে অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। আবার অশোকের মধ্যে শত অত্যাচারের পরেও তার দ্বন্দ্ব সংশয় অত্যাচার সহ্য করার বা সহ্যশক্তি যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনি তাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করার পরে তার মানসিক যন্ত্রণা ও গুমরে ওঠা বেদনাকেও অভিনয় কৌশলের মধ্যে দিয়েও মূর্ত করে তুলেছেন—

অশোক : শান্তি রায় তাঁর দলকে রক্ষা করছেন, বিপ্লবকে রক্ষা করছেন, দেশকে রক্ষা করছেন। তিনি মহান, তিনি বিরাট, আক্রমণের সম্ভাবনাতেই তাঁকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়। অশোক চাটুয্যে সেই বিরাট প্রস্তুতির মধ্যে সামান্য একটা বিন্দু মাত্র, একটা জ্যামিতিক বিন্দু। কিন্তু তোমাদের কাছে আমি একটা পূর্ণাঙ্গ, সম্পূর্ণ মানুষ তোমাদের গায়ের রক্তে মাংসে আমার দেহ গড়ে উঠেছে। শান্তি রায়ের পক্ষে যে মানুষটাকে বোঝা অসম্ভব, তোমাদের পক্ষে সেটা সম্ভব হবে না?

[এবার বাবা মা কেউই কোন জবাব দিতে পারেন না]

আমার বিশ্বাসঘাতকতার পুরো কাহিনীটা ওদের একটা ভাঁওতা, আমার মনে ভেঙে দেয়ার একটা ষড়যন্ত্র। এবং ওরা কৃতকার্য যে হয়নি একথা বলতে পারি না। রাতের পর রাত আমার চোখে ঘুম নেই। আমি নিঃসঙ্গ, একা। দিন হলেই এইসব কাপড় জামা পরিয়ে বসিয়ে দেয় জনসন সাহেবের গাড়িতে। কিন্তু কেউ কি জানে তখন আমার পা থাকে সীটের সঙ্গে শেকল দিয়ে বাঁধা? পাশে থাকে সশস্ত্র প্রহরী? তারপর যখন ওরা জানতে পারল আমি দল থেকে বিতাড়িত, লাঞ্ছিত, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত, তখন আমাকে ছেড়ে দিতে আরম্ভ করল। জানে এখন আর আমার যাওয়ার জায়গা নেই যেখানেই যাই, সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসার আগেই প্রাণভয়ে ভীত মানুষটা পালিয়ে আসবে পুলিশ ক্যাম্পে, কারাগার তার কাছে আশ্রয় এখন। বন্ধুর হাত থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় শত্রুর কারাগার। [৩৩]

অশোক কখনও সমিতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি বা বিপ্লবীদের সঙ্গে কখনও ছলনার আশ্রয় নেননি। শত অত্যাচারে পুলিশ যখন তার বজ্র কঠিন প্রতিজ্ঞা থেকে একটি কথাও বার করতে পারেনি, তখন তাকে সুকৌশলে বিশ্বাসঘাতক সাজায়। যাতে বিপ্লবীরা মনে করে অশোক একজন

বিশ্বাসঘাতকে পরিণত হয়েছে আর তাতেই অশোক আত্মগ্লানিতে ভুগবে দ্বন্দ্ব সংশয়ে নিজের অন্তরকে জর্জরিত করবে। বিপ্লবী দলের প্রতি আপাদমস্তক বিশ্বাসী অশোক শত অত্যাচারেও একটি কথা মুখ থেকে বার করেন না, তাকে ক্রমাগত অত্যাচারে দিশেহারা করে তোলে, পাছে মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরিয়ে যায় তাই সে আত্মহত্যা পর্যন্তও করতে মনস্থির করে—

অশোক : মা, সেই রিভলভারটা চাই... নিজেকে আর বিশ্বাস করতে পারছি না। ক্রমশ মাথার মধ্যে পারম্পর্যের খেই হারিয়ে যাচ্ছে, আমি বোধ হয় ঘুমের মধ্যে কথা বলতে শুরু করেছি। আজকাল তাই প্রাণপণে চেষ্টা করি না ঘুমোতে— দাঁড়িয়ে থাকি, ছুটে বেড়াই সেল্-এর মধ্যে, দেয়ালে মাথা ঠুকি যাতে ঘুম না আসে। কিন্তু দু রাত তিন রাত পর ঘুম আসে। কখন যেন মাটিতে পড়ে যাই। যখন ঘুম ভাঙে, দেখি শকুনের মতন আমার ওপর ঝুঁকে রয়েছে সাব ইন্‌স্‌পেক্টর প্রকাশ মুখুটি। তাই আর তো ঝুঁকি নেয়া চলে না। কি বলে ফেলব কে জানে? কি বলে ফেলেছি তাই বা কে জানে? [৩৪]

পুলিশ ইন্সপেক্টর হিতেন দাশগুপ্তের অভিনয় অনবদ্য ছিল। ইংরেজ শাসকের আজ্ঞাবাহী হিসেবে তার নির্মম অত্যাচারী রূপ, বিপ্লবীদের ওপরে তার অত্যাচারের ধরন, তার কুটিলতা প্রভৃতি তার আচার-আচরণ ও কথাবার্তায় নিপুণ করে ফুটিয়ে তুলেছেন। বিপ্লবী অশোক পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পরে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় যখন সে কোনো কিছুই জানাতে চায় না তখন পুলিশ ইন্সপেক্টর হিতেন দাশগুপ্তের যে অত্যাচার ও নির্মমতার ছবি দর্শককে আলোড়িত করে তোলে। অশোককে প্রচণ্ড প্রহার, অকথ্য অত্যাচার করার পরে হিতেন দাশগুপ্ত বলেন—

অশোকবাবু! সবে শুরু হয়েছে, বুঝছেন? ভাঙতে পারিনি এমন লোক এখনো দেখিনি। মানসিক চাপ শুরু হবে, সইতে পারবেন? এটুকু বুঝলাম— আপনার শরীর শক্ত। কিন্তু এরপর যা আরম্ভ হবে, পাগল হয়ে যাবেন, চুল ক'টা সাদা হয়ে যাবে। বলে ফেলুন। [৩৫]

আবার ব্রিটিশ পুলিশের বড়ো কর্তা জনসন সাহেবের নির্দেশে হিতেন দাশগুপ্ত বিপ্লবী অশোক চাটুজ্জ্যের স্ত্রী ও কন্যার ওপরে অমানসিক ও পাশবিক অত্যাচার করতে পিছুপা হন না। সেই অত্যাচারের নির্দেশ আসে পুলিশ কর্তা জনসন সাহেবের কাছ থেকে—

জনসন : We want results, Dasgupta, results. He has a daughter, hasn't he? And a wife?

হিতেন : Yes, Sir.

জনসন : Well, why not use them?

হিতেন : I have already sent for the wife, Sir.[৩৬]

নাটকের পঞ্চম দৃশ্যে বারবণিতা রাধারানীর ঘরে হিতেনের ঘরে চারদিকে সজাগ ও পুলিশি অনুসন্ধানী দৃষ্টি, দর্শকের নজর এড়ায় না। তার চালচলন কথাবার্তা ঘরের প্রতিটি জিনিসের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ একজন দক্ষ পুলিশ অফিসারেরই পরিচয় বাহক। রাধারানীর সঙ্গে কথোপকথন কালে এক অত্যাচারী পুলিশ অফিসারের স্বরূপটি ফুটে ওঠে—

> *আমায় সব বলে ফেললে কেন রাধা? ভয়? আমাকে ভয় করে না? সবাই ভয় করে আমাকে। এটাই হল আমার ট্র্যাজেডি আমার স্ত্রী— দেবযানীর মা! সেও আমাকে ভয় করে। আর আমার হয়ে যায় রাগ। মারি, তবু সে আমাকে ভালোবাসে না। মেয়ের গা পুড়িয়ে দিই তার মাকে ব্যথা দেয়ার জন্যে। পরে নিজেরই এমন কান্না পায়। আসলে কি জানো? ওরা সবাই আমাকে ঘৃণা করে।* [৩৭]

উৎপল দত্ত নীলমণি এবং শান্তি রায়ের চরিত্রে অভিনয় করেন। তার একাধারে দেখতে পাওয়া যায় তিনটি রূপকে ফুটিয়ে তুলতে হয়েছে— নীলমণি, ছদ্মবেশী শান্তি রায় এবং বিপ্লবীর নেতা একাকার হয়ে যায়। নাটকের প্রারম্ভে নীলমণি চরিত্রটিকে দেখলে আপাতভাবে মনে হবে যিনি একজন ইংরেজ শাসকও পুলিশের মদতকারী গুপ্তচর, যে বাংলার বিপ্লবীদের বিভিন্ন প্রান্তের খবরাখবর পুলিশের কাছে সরবরাহ করে পুলিশকে সহযোগিতা করতে চান ও বাংলার বিপ্লবীদের কার্যকলাপ বিদ্রোহকে দমন করতে সদা তৎপর। ইংরেজদের সহায়তাকারী পুলিশ ইন্সপেক্টর হিতেন দাশগুপ্তকে নীলমণি সম্পর্কে বলতে শোনা যায়— “He is a friend don’t beat him”[৩৮] তাই নীলমণির কার্যকলাপ, কথাবার্তা কেমন যেন সব সন্দেহজনক। তাই নীলমণি যখন বিপ্লবী অশোক চাটুজ্জ্যের বাড়িতে আসে তখন অশোক চাটুজ্জ্যের পিতা যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় নীলমণি সম্পর্কে বলে থাকেন—

> *নিশ্চয়ই নীলমণি। গুপ্তচর। রোজ সন্ধ্যেবেলা হানা দিচ্ছে। খুব সাবধান একটা বেফাঁস কথা—।* [৩৯]

আবার অশোকের মাতা বঙ্গবাসীকেও নীলমণি সম্পর্কে বলতে শোনা যায়—

> *টাকা সব পারে। অভাবে সব করে। আমাদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিচ্ছেন আপনি। এরপর একদিন বলবেন— অশোককে ছেড়ে দেবেন কিন্তু শান্তি রায়কে ধরিয়ে দিতে হবে। ততক্ষণে আমরা কেনা গোলাম হয়ে গেছি— তাই হয়তো করে বসব।* [৪০]

নাটকের অষ্টম দৃশ্যে দেখা যায় এই নীলমণিই হলেন আসলে শান্তি রায়, যিনি বিপ্লবী

দলের নেতা, সমিতির সর্বেসর্বা। যিনি গোপনে সমিতির কার্যকলাপ, দলের প্রতি প্রয়োজনীয় নির্দেশ, নিয়ম প্রদান করেন আড়ালে থেকে দলের সমস্ত কার্যকলাপ লক্ষ করেন ও দলকে সঠিক পথে পরিচালনা করেন, বিপ্লবকেও। অষ্টম দৃশ্যে দেখা যায় বারাঙ্গনা রাধারানীর ঘরে দলের সদস্যদের সঙ্গে মিলিত হয়ে শান্তি রায় দলকে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। জনসন সাহেব কোন দিন, কবে, কোথা থেকে ঢাকা যাবেন সে সংবাদ পরিবেশন করেন শান্তি রায়। জনসন সাহেবকে স্টিমার কোম্পানির তেলের গুদামে কীভাবে তাকে হত্যা করতে হবে বিপ্লবী দলকে তার প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও কৌশল বাতলে দেন শান্তি রায়। এই গোপন শলা পরামর্শের মাঝে যখন পুলিশ এসে উপস্থিত হয়, তখন দেখি সঙ্গে সঙ্গে শান্তি রায় চোখে চশমা এঁটে নীলমণি হয়ে গেছেন। পুলিশের গুপ্তচর হিসেবে কাজ করার অভিনয়ও সঙ্গে সঙ্গে শুরু করে দেন—

> *নীলমণি : কাল থেকে নজর রেখেছি, কই তেমন কিছু তো। অ-সম্ভব। অশোক ভুল খবর দিয়েছে।... অশোক। হয়রানি করাচ্ছো কেন বাপু? পালের গোদাটাকে হ্যান্ডওভার করো না বাপু।* [৪১]

নাটকের শেষ দৃশ্যে দেখা যায় শান্তি রায় ও বিপ্লবীদের নেতা একাকার হয়ে গিয়েছেন। জনসন সাহেবকে হত্যা করতে না পেরে, কুমুদের বিশ্বাসঘাতকতায় যখন সমস্ত বিপ্লবীদলকে স্ট্রীমার ঘাটে পুলিশ ঘিরে ফেলে তখন শান্তি রায় বিপ্লবীদলকে পরামর্শ দিতে থাকেন কীভাবে এই পুলিশের ঘেরাটোপ থেকে পালাতে হবে। কিন্তু দেখেন যে পুলিশের নিশ্ছিদ্র ঘেরাটোপ থেকে বেরোনো অসম্ভব তখন শান্তি রায় বিপ্লবীদলকে লড়াই করার পরামর্শ দেন—

> *না, শির ফরোশি কা তমন্না হ্যায় আজ দিল মে। শেষ লড়াইয়ের মুহূর্ত এসে গেছে ভাই। সবাই একসঙ্গে গুলি করতে করতে বেরুবো। হাতে হাত দেবে— তোদের সঙ্গে কাজ করতে পেরে ধন্য হয়েছি।* [৪২]

উৎপল দত্তের এই ত্রিস্তরীয় অভিনয় দর্শকের কাছে বিশেষভাবে প্রশংসিত। নীলমণি থেকে ছদ্মবেশী শান্তি রায় আবার পুলিশের সামনে ছদ্মবেশী শান্তি রায় থেকে নীলমণিতে পরিণত হওয়া ও পরিস্থিতি সাপেক্ষে তাৎক্ষণিক অভিনয়, দর্শককে মুগ্ধ করে। সেই সময়ের আনন্দবাজার পত্রিকা এই চরিত্রটির সৃষ্টি ও রূপায়ণের প্রশংসা করে লিখেছিল—

> *উৎপল দত্ত প্রথমে তার অভিনয়ে চরিত্রের ছদ্ম পরিচয়ের প্রতি সুবিচার করেন এবং সেইসঙ্গে দর্শকের চিত্তে আশানুরূপভাবে সঞ্চার করেন।* [৪৩]

অভিনেতার পাশাপাশি অভিনেত্রীদের মধ্যে অশোকের মা বঙ্গবাসী দেবীর চরিত্রে অভিনয়

করেছিলেন শোভা সেন। নাটকের তৃতীয় দৃশ্যে দেখা যায় বিপ্লবী অশোক চাটুজ্জ্যে যখন লুকিয়ে বাড়িতে আসে তখন অশোকের মা বঙ্গবাসী দেবী তাকে অনেক যত্ন-স্নেহ করেন। শীর্ণ-ক্লান্ত অশোককে পায়েসের বাটি এগিয়ে দেন এবং খাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। আবার নাটকের ষষ্ঠ দৃশ্যে দেখা যায় যখন পুলিশ অশোকের মুখ থেকে কোনো কথা বার করতে না পেরে অশোককে পরিকল্পনা মাফিক বিশ্বাসঘাতকে পরিণত করে এই খবর যখন অশোকের মা জানতে পারে, তিনি প্রচণ্ডভাবে আহত হন। যখন পুলিশ পরিকল্পনা করে রটিয়ে দেন যে অশোক বিশ্বাসঘাতকতা করে সমিতির কার্যকলাপ ও তাদের নেতা শান্তি রায় সম্পর্কে সমস্ত তথ্য পুলিশের কাছে বলে দিয়েছে তখন শুনে তার মা বঙ্গবাসী দেবী প্রচণ্ডভাবেই মর্মাহত হন। তাই যোগেনবাবু যখন অশোকের নাম উচ্চারণ করেন তখন বঙ্গবাসী দেবী বজ্রকঠিন ভাষায় পুত্র স্নেহকে দূরে সরিয়ে রেখে বলে ওঠেন—

বঙ্গবাসী : এ বাড়িতে ঐ নাম করা বারণ—! আমাদের ছেলে ছিল একটা। গত মঙ্গলবার তার মৃত্যু হয়েছে। লেখো শচী, বইটা শেষ করতে হবে।

যোগেন : শচীর ওপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেছে, তারপরও কি করে লিখবে, কি করে দৈনন্দিনের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াবে?

বঙ্গবাসী : খাওয়াতেই হবে। এ বাড়ির কাজকর্ম আচার-ব্যবহারে বিন্দুমাত্র বিচ্যুতি চলবে না। যে মরে গেছে তার জন্য ভেবে ভেবে আমাদের দিন কাটবে না।

শচী : কিন্তু গোপা? ওর বাবা মরে গেছে একথা ওকে কে বলবে?

বঙ্গবাসী : অনেকেরই বাবা মরে যায়। সেটা জগতের নিয়ম। তুই না বলতে পারিস, আমি বলব। [৪৪]

আবার দেখা যায় অশোক যখন বাড়িতে দেখা করতে আসে তখন তার মা বলে ওঠে—

মা : কে অশোক? অশোক নামে কাউকে চিনি না, চিনতে আমরা ঘৃণা বোধ করি। কি প্রয়োজন এখানে?... তোমারই নেতা শান্তি রায়ের আদেশ আছে তোমাকে এখানে জলস্পর্শ পর্যন্ত করতে দেয়া চলবে না। তুমি চলে যাও এখান থেকে। [৪৫]

অশোককে তার মাতা বঙ্গবাসী দেবী প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসে কিন্তু পুলিশের পরিকল্পনায় অশোকের বিশ্বাসঘাতক হয়ে যাওয়া— এই সংবাদ তাকে এতটাই আঘাত করে যে তিনি অশোককে ঘৃণা করতে শুরু করেন। অশোকের মা সন্তান অশোককে ভালোবাসে বললে ভুল হবে,

ভালোবাসে বিপ্লবী অশোককে যে অনুশীলন সমিতির সদস্য, তাই তার মিথ্যা বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদে এতটাই মর্মাহত হয়ে পড়েন যে তার মুখ পর্যন্ত দেখতে চান না।

অশোকের স্ত্রী শচীর চরিত্রে অভিনয় করেন তপতী ঘোষ। তাঁর মর্মস্পর্শী, হৃদয় বিদারক অভিনয় বিশেষভাবে স্মরণীয়। শচী একজন বিপ্লবীর স্ত্রী। তাই সে কমবেশি বিপ্লবী ভাবধারায় ও আদর্শে বিশ্বাসী। শত প্রচেষ্টা, শত অত্যাচার করার পরেও যখন বিপ্লবী অশোকের মুখ দিয়ে একটি কথা বের হয় না, তখন পুলিশ ইন্সপেক্টর হিতেন দাশগুপ্ত অশোকের স্ত্রী শচী ও তার কন্যা গোপাকে ধরে নিয়ে গিয়ে অকথ্য অত্যাচার করে তবুও বিপ্লবী অশোকের স্ত্রী শচীদেবীকে টলাতে পারে না বা বিগলিত করতে পারে না। বরং সে আরও দৃঢ় ও প্রত্যয়ের সঙ্গে অশোককে বলে—

> *একটা কথাও বোলো না। এদের একটা কথাও বোলো না। মেয়ে আমার, অশোক চাটুয্যের সন্তান। তার একটুও লাগাবে না। একটি কথাও বোলো না এদের।* [৪৬]

পুলিশ ইন্সপেক্টর হিতেন দাশগুপ্ত শচীদেবীকে ইজ্জত লুণ্ঠনের ভয় দেখালে শচীদেবী দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর দেয়—

> *স্বামীকে মেরে ফেলেছেন আপনারা, আর ইজ্জতের ভয়? এ আমি জানতাম না। এভাবে যে একটা উদারচেতা পুরুষকে আপনারা নির্যাতন করেছেন এ জানতাম না।* [৪৭]

বারবণিতা রাধারানীর চরিত্রে নিলীমা দাশের অভিনয় বিশেষভাবে স্মরণীয়। বারবণিতার মৃত অন্ধকার জগৎ থেকে মুক্তির কামনার সঙ্গে সঙ্গে দেশমাত্রিকার বন্ধন মুক্তির স্বপ্নে বিভোর সে। দেশমাত্রিকার বন্ধন মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় তার সংগ্রামী কার্যকলাপ ও বিপ্লবীদের নিজের জীবন বাজি রেখে আপ্রাণ সহযোগিতা ও গভীর অনুভবের অভিনয় অসামান্য, অসাধারণ নজির সৃষ্টি করে। রাধারানী একজন বারবণিতা হলেও সে সুকৌশলে আশ্রয় প্রদান করে। শান্তি রায়ও রাধারানীর ঘরে গিয়ে নিশ্চিন্তে শলাপরামর্শ করে ও বিভিন্ন পরিকল্পনা করে থাকেন। রাধারানী তার উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা দিয়ে বিপ্লবীদের রক্ষা করার চেষ্টা করেন ব্রিটিশ পুলিশের শ্যেন দৃষ্টি থেকে। পুলিশ ইন্সপেক্টর হিতেন দাশগুপ্ত যখন বিপ্লবী দল সম্পর্কে সবই জানতে পারেন এবং বিপ্লবীদের সমূলে নাশ করার পরিকল্পনা করেন, তখন রাধারানী অন্য উপায়ান্ত না দেখে হিতেন দাশগুপ্তের সামনে বিপ্লবীদের সম্পর্কে আরও অনেক তথ্য দিয়ে বিপ্লবীদের ধরিয়ে দেওয়ার অভিনয় করেন। তার উপস্থিত বুদ্ধি দ্বারা হিতেনের কাছে বিপ্লবী দল ও শান্তি রায় সম্পর্কে সমস্ত কিছু ফাঁস করে দেয় ও হিতেন দাশগুপ্তকে নানান অছিলায় ভুলিয়ে মাদকের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে তাকে পান করিয়ে তাকে হত্যা করে। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ বারাঙ্গনা রাধারানীর এহেন অভিনয়

অনন্যতার ছাপ রাখে।

মার্কসবাদী ভাবাদর্শে বিশ্বাসী উৎপল দত্ত সুকৌশলে তাঁর মার্কসবাদী চিন্তা-চেতনা-আদর্শ ও ভাবধারা প্রচার করে থাকেন। আলোচ্য 'ফেরারী ফৌজ' নাটকে উৎপল দত্ত সুকৌশলে শ্রেণিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়া, শ্রেণিসংগ্রামে সহযোগিতার বিষয়টি সুকৌশলে তুলে ধরেন। রাধারানীর মতো বারাঙ্গনা দেশের স্বার্থে, দেশের বিপ্লবীদের স্বার্থে, দেশের মানুষের স্বার্থে সেও শ্রেণিশত্রুর বিরুদ্ধে শ্রেণিসংগ্রামে শামিল হয়। বিপ্লবী জ্যোতির্ময় বারাঙ্গনা নারী রাধারানী সম্পর্কে বলেন—

> *তুমি আশ্চর্য মাইয়া। ইংলন্ডের নারীরত্ন সিলভিয়া প্যাঙ্কহার্স্ট আর ভুবনডাঙার রাধারানী দেবী স্বাধীনতা যুদ্ধের ভ্যানগার্ড।* [৪৮]

স্বাধীনতা সংগ্রামে, শ্রেণিসংগ্রামে ইংল্যান্ডের রানীরত্ন সিলভিয়া প্যাঙ্কহার্স্ট-এর সঙ্গে বাংলাদেশের ভুবনডাঙা গ্রামের রাধারানী দেবী এক হয়ে যায়। আবার হিতেন দাশগুপ্ত ও প্রকাশ মুকুটি-এর চরিত্রের মধ্য দিয়ে শ্রেণিশত্রু বিষয়টিও প্রস্ফুট করেন। থিয়েটারওয়ালা উৎপল দত্ত অশোকের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে মার্কসবাদের নীতি-আদর্শকেও তুলে ধরার প্রচেষ্টা করেন। অশোক ও কুমুদের কথোপকথনে সে ভাবধারা স্পষ্ট—

> *অশোক : মাস্টারদা যেখান পারেননি, ভগৎ সিং যেখানে ব্যর্থ হয়েছেন? না, আমার মনে হয় শান্তি দাও পারেন না। কোনো লোক একা পারেন না। জনতা নিজেই পারে সে কাজ করতে। নিজের সংগঠন সৃষ্টি করতে। লেনিন বলেছেন—*
>
> *কুমুদ : লেনিন বিদেশে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, আমরা সে পদ্ধতি নেব কেন?*
>
> *অশোক : নেব, কারণ পরাধীনতা সব দেশেই এক— আফ্রিকায়, রাশিয়ায়, ভারতে। বিদেশী বর্জনকে অমন ridiculous limits-এ নিয়ে যেও না, কুমুদ, যে পিস্তলটা ব্যবহার করছ সেটাও বিদেশে তৈরী।* [৪৯]

দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ও বিপ্লবী আন্দোলনে দক্ষিণপন্থী কিছু নেতাদের চরম বিশ্বাসঘাতকতা সর্বজনবিদিত। বিপ্লবী আন্দোলনের পটভূমিতে আপন স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে দেশকে বিকিয়ে দিতেও পিছুপা হয়নি। মার্কসবাদের 'প্রোপাগান্ডিস্ট' উৎপল দত্ত বিপ্লবী আন্দোলনের পটভূমিকায় ও স্বাধীনতা আন্দোলনে দক্ষিণপন্থীদের বিশ্বাসঘাতকতা, বামপন্থীদের লড়াইয়ে এগিয়ে দিয়ে পিছন দিক দিয়ে কলকাঠি নেড়ে সেই আন্দোলনকে অবদমিত করার প্রচেষ্টা, স্বাধীনতা সংগ্রামে বামপন্থীদের আমরণ সংগ্রাম, সেই সংগ্রামের চিত্র তিনি সুকৌশলে অঙ্কন করেছেন—

যোগেন : কংগ্রেস-এর অহিংস সংগ্রামের রেজলিউশন পড়েছিস?

অশোক : হ্যাঁ।

যোগেন : কি মনে হয়?

অশোক : বিট্রেয়াল! বিশ্বাসঘাতকতা, আমাদের লড়াইয়ে ঠেলে দিয়ে পেছন থেকে হঠাৎ— নন ভায়োলেন্স! দক্ষিণপন্থীরা ক্ষমতা দখল করেছে, বাবা। ওরা চায় আমরা ধরা পড়ি। কোনো কোনো জেলায় ওরা সরাসরি পুলিশকে সাহায্য করছে। [৫০]

নাট্যকার উৎপল দত্ত নাটকের নির্দেশকও পরিচালক। থিয়েটারকে সাফল্যে পৌঁছে দেওয়ার সব কৃতিত্ব তাঁর। তিনি তাঁর থিয়েটারকে সাফল্যমণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে তাঁর সময়ে সৃষ্ট প্রতিভাগুলিকে সফলভাবে মঞ্চে ব্যবহার করার প্রচেষ্টা করেছেন। থিয়েটারকে দর্শকের কাছে আরও আকর্ষণীয় ও গ্রহণযোগ্য করার উদ্দেশ্যে মঞ্চ-আলো-সংগীত-অভিনয় সব দিকে সজাগভাবে দৃষ্টি রেখে প্রত্যেকটা বিষয়ের জন্য সফল ব্যক্তিদের দ্বারা কাজ সম্পন্ন করার প্রচেষ্টা করেছেন। তাই মঞ্চ-আলো-সংগীত-অভিনয় একাকার হয়ে গিয়েছিল এই নাটকে।

‘কল্লোল’ (১৯৬৫) উৎপল দত্তের নৌবিদ্রোহ কেন্দ্রিক অসামান্য ঐতিহাসিক প্রযোজনা। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ভারতের নৌ বিদ্রোহের ঘটনা বৃত্তান্ত ‘কল্লোল’ নাটকের মূল অবলম্বন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাস থেকে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাস পর্যন্ত রয়্যাল ইন্ডিয়ান আর্মির ভারতীয় নৌসেনারা মোট উনিশ বার বিদ্রোহ করে, যে বিদ্রোহের ভয়াবহতা ও ব্যাপকতা ইংরেজদের যেমন ভীত সন্ত্রস্ত করে তেমনি তাদের সন্ত্রাসী সাম্রাজ্যের ভিত নাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। এই বিদ্রোহের গতিপ্রকৃতি ও ভয়াবহতায় ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ব্রিটিশ রাজশক্তি চরম নিষ্ঠুরতার সঙ্গে বিদ্রোহ দমন করতে তৎপর হয় ও দমন করে। ১৯৪৪-খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে অসম্পূর্ণ ও ব্যর্থ নৌবিদ্রোহের পর পুনরায় নৌবিদ্রোহ সংগঠিত হয় ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে। সেনাবাহিনীর মধ্যে ব্রিটিশ শাসনের অত্যাচার শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হয় ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের নৌবিদ্রোহের মধ্য দিয়ে।

‘কল্লোল’ নাটকের সময়কাল ১৯৪৬। পরাধীন ভারতবর্ষের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা লাভের ঠিক প্রাক্মুহূর্ত। এই সময় দেশের নানা প্রান্তে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ এবং স্বাধীনতা লাভের উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে এশিয়ার দেশে দেশে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের বন্যা দেখা দিয়েছে সর্বত্র। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আজাদহিন্দ ফৌজের ‘দিল্লী চলো’ অভিযান, বন্দিমুক্তি আন্দোলন, ছাত্র-

শ্রমিক-কৃষক ধর্মঘট সব মিলিয়ে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এক অগ্নিগর্ভ, অশান্ত, ভয়ংকর পরিস্থিতির সম্মুখীন। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের ভারত ছাড়ো আন্দোলন ব্যাপক ও বিস্তার লাভ করতে সক্ষম। এই প্রেক্ষাপটেই তিনি 'কল্লোল' নাটকের অবতারণা ও প্রযোজনা করেন।

'কল্লোল' নাটকটি প্রযোজনার সময় মিনার্ভা থিয়েটারে যে মঞ্চ প্রস্তুত করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল তা এককথায় অসাধারণ ও বিশেষ কৃতিত্বের দাবি রাখে। শব্দ, আলো, দৃশ্যপট এবং চরিত্র মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল নাট্য উপস্থাপনায় এবং এক অসাধারণ পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিল যা দর্শককে চমকিত করে। মঞ্চ সজ্জার ওপরে বিশেষ দৃষ্টি ও যত্নবান ছিলেন। নাটকে তিনটি সেট ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ তিনটি স্থানে নাটকের ঘটনা সংস্থাপন করা হয়েছে— 'খাইবার' জাহাজের বিশাল সেট, ওয়াটার ফ্রন্ট বস্তি সেট এবং ব্রিটিশ বাহিনীর নৌসেনার হেড কোয়ার্টার অ্যাডমিরাল র‍্যাটট্রের ডাকবাংলো সেট। প্রথম সেটে ভারতীয় নৌ জাহাজ 'খাইবার'-এর নাবিকদের কাহিনি দেখানো হয়েছে। 'খাইবার' এখানে প্রতীকধর্মী, 'খাইবার' সব বিদ্রোহী জাহাজের প্রতিনিধি স্বরূপ। 'খাইবার' মঞ্চের মাঝখানে বিরাট জাহাজ যেন উপকূলে নোঙর করে আছে। এই জাহাজের সৈন্যরা সমুদ্র বক্ষে ইটালিয়ান নৌসেনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে অনেকে আহত হন ও মারা যান, কিন্তু শেষপর্যন্ত তারাই জয়ী হয়। কিন্তু 'খাইবার' জাহাজ ও তার নাবিকেরা যুদ্ধ শেষে নিখোঁজ হয়ে যায়।

আরেকটা সেট দেখা যায় ওয়াটার ফ্রন্ট বস্তি। সেখানে বেশিরভাগ নাবিকের আত্মীয় পরিজনেরা। তারা আশায় বুক বেঁধে থাকে নিখোঁজ নাবিকদের জন্য। 'খাইবার' জাহাজের গানার সার্দুল সিংয়ের জন্য তার স্ত্রী লক্ষ্মীবাঈ দিনাতিপাত করতে থাকে। দীর্ঘদিন স্বামীর অদর্শনে ও যোগাযোগহীনতায় তার মধ্যে গভীর বেদনা যেমন জাগ্রত হয় সেইসঙ্গে প্রকট হয়ে ওঠে অর্থাভাব ও অনটন। এহেন পরিস্থিতিতে তার মানসম্মান ও ইজ্জত বিপর্যস্ত হওয়ার মুখে। তাদের পরিবারের এই বিপদের সময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন অবসরপ্রাপ্ত নৌসেনা সুভাষ দেশাই। তৃতীয় সেটে দেখা যায় ব্রিটিশ নৌবাহিনীর অফিসারদের হেড কোয়ার্টার অ্যাডমিরাল র‍্যাটট্রে-র বাংলো। সেখানে দেখা যায় যখন নৌবিদ্রোহীদের আয়ত্তে আনা যাচ্ছে না, তাদেরকে পরাস্ত করা কোনোভাবেই সম্ভব নয় তখন দেশীয় কিছু বিশ্বাসঘাতক নেতাদের সহায়তায় তাদেরকে বন্দি করার নির্লজ্জ কৌশল আশ্রয় করার কাহিনি। কংগ্রেস নেতা মগনলাল বাজুরিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়ে অ্যাডমিরাল র‍্যাটট্রে ও ক্যাপ্টেন আর্মস্ট্রং নাবিকদের সঙ্গে আলোচনায় বসার ব্যবস্থা করে ও সমস্তরকম প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, বিশ্বাসঘাতকতা করে আলোচনা টেবিলেই নাবিকদের গ্রেপ্তার করা হয় ও সমস্ত আন্দোলন এক মুহূর্তে ভূ-লুণ্ঠিত হয়।

নাটকের মঞ্চের মাঝখানে দেখানো হয়েছিল সুবিশাল যুদ্ধ জাহাজ। কখনো দর্শকের দিকে

আড়াআড়ি, কখনো বা জাহাজটিকে সোজাসুজিভাবে। অভিনয় চলত কখনো জাহাজের নীচে, কখনো জাহাজের ডেকে, কখনো বা জাহাজের শীর্ষে। আবার জাহাজের নীচে গণগণে আগুনে ভরা বয়লার রুমে। একটা গোটা জাহাজ যেন তার সমস্তকিছু সরঞ্জাম সহযোগে জলে ভাসছে। নাটকের মঞ্চ পরিকল্পনা ও মঞ্চসজ্জায় ছিলেন সুরেশ দত্ত। তার মঞ্চ নির্মাণের কৌশলে মনে হত এক সত্যিকারের জাহাজ উপকূলে নোঙর করে আছে। সুরেশ দত্তের মঞ্চসজ্জায় দর্শকরা অবাক হয়ে গিয়েছিল। আলোকসম্পাতের দায়িত্বে ছিলেন তাপস সেন। তাঁর আলোর কারিকরিতে দেখানো হয়েছিল জাহাজের পদপ্রান্তে সমুদ্রের জলের বিশাল ঢেউ আর সেই ঢেউয়ের টলমল জাহাজের দৃশ্য। জাহাজের ডেক আর মাস্তুল এবং গনগনে লাল আগুনে উদ্ভাসিত বয়লার রুম। যুদ্ধ চলাকালীন জাহাজের গায়ে এসে পড়ত যুদ্ধবিমানের ছায়া। আলোকের কায়দায় আবার দৃশ্যের চকিত পরিবর্তন হয়ে দেখা যেত শ্রমিকদের বস্তির অভ্যন্তর, আবার আলোকের কায়দায় পরের মুহূর্তে দৃশ্য পরিবর্তনে মঞ্চটি হয়ে উঠত ব্রিটিশ অ্যাডমিরালের হেডকোয়ার্টার্স। সুরেশ দত্তের মঞ্চসজ্জা ও তাপস সেনের আলোকসম্পাতের কারিকুরি দর্শককে মুগ্ধ করে দিয়েছিল। আলোকসম্পাতে তাপস সেনের কারিকুরি ও সুরেশ দত্তের দক্ষতা সম্পর্কে তাঁর 'লিট্‌ল্‌ থিয়েটার ও আমি' প্রবন্ধে বলেছেন—

> *বিদ্রোহের দৃশ্যে প্রথমে তেরঙ্গা ও লিগের ঝাণ্ডা ক্রুজার খাইবারের মাস্তুলে উঠে হারিয়ে গেল অন্ধকারে। তারপর ইন্টারন্যাশনাল গানের সঙ্গে লাল নিশান এসে, সদর্পে উড়তে লাগল আলোকবৃত্তের মধ্যস্থলে এবং ঘন ঘন স্লোগানে মুখরিত হতে লাগল প্রেক্ষাগৃহ। নেপথ্যে ক্লান্ত তাপস সেন হঠাৎ ঘুরে আমার হাত চেপে ধরলেন। লিট্‌ল্‌ থিয়েটারের বহু বছরের ত্যাগ ও শ্রম যেন ঐ মুহূর্তে কেন্দ্রবিন্দুতে এসে রোমাঞ্চিত সার্থকতায় পূর্ণ হল।* [৫১]

নাটকের শুরুতেই সূত্রধারের কণ্ঠে অহিংস আন্দোলনের অসাড়তা এবং সহিংস আন্দোলনের সার্থকতার তাৎপর্য খুঁজে পাই। তিনি তাঁর গানের মধ্য দিয়ে ইতিহাসের সেই কালো যবনিকা উন্মোচন করেছেন যেখানে অহিংস আন্দোলনকারীদের হীন চক্রান্ত ও বিশ্বাসঘাতকতা কীভাবে সহিংস আন্দোলনকারীদের সমস্ত আন্দোলনকে পরিকল্পনা মাফিক ভেস্তে দিয়ে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। নাটকের সূত্রধার ঘটনা পরম্পরার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে, সেই সঙ্গে সঙ্গে নাটকের মূল বক্তব্যও তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। নাটকের গোটা পরিস্থিতি ও ঘটনা বুঝতে সূত্রধারের বর্ণনা দর্শককে যথেষ্ট পরিমাণ সাহায্য করে। নাটকের সঙ্গে দর্শকদের একাত্মতা ঘটিয়ে তুলতে সুত্রধারের বক্তব্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। উৎপল দত্ত সুকৌশলে সূত্রধারের মাধ্যমে সেই উদ্দেশ্য সাধন করেছেন। সূত্রধার চরিত্রের মধ্য দিয়ে নাটকের মূল বক্তব্যের পরিস্ফুটন এই পূরাতন ধারা উৎপল

দত্ত সুকৌশলে ও উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবেই ব্যবহার করেছেন সফলতার সঙ্গে। কংগ্রেসি শাসকদের বিকৃত ইতিহাস প্রচারের প্রচেষ্টা, নৌবিদ্রোহে তাদের চরম বিশ্বাসঘাতকতা ও সহিংস আন্দোলনকারী নাবিকদের আন্দোলনের ইতিহাস উৎপল দত্ত সূত্রধারের কণ্ঠে ফুটিয়ে তুলেছেন—

শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের পথে।
স্বাধীনতা যেন শিশুর হাতের মোয়া
হরির লুঠের বাতাসা, কুড়িয়ে নিলেই হোলো।
বিপ্লব কি শীতের সকালে গলির মোড়ে
নবাগত মিঠে রোদের ফালি,
যার খুশি পোয়ালেই হোলো?...
আজ বলবো ঐ নৌবিদ্রোহের কাহিনী চুপি চুপি।
অহিংস ইতিহাসের চোখে ধুলো দিয়ে,
এই নিভৃত কক্ষে আপনাদের বলি—
কোত্থেকে এল এই স্বাধীনতা।
যতই সাবান দিয়ে কেচে
ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা ঊর্ধ্বে তুলি,
আসলে ও-পতাকা রক্ত লাল,
বোম্বায়ের নাবিকদের, ক্রুদ্ধ ছোটলোকদের রক্তে।।”[৫২]

নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র সার্দুল সিং। সার্দুল সিং চরিত্র সৃষ্টিতে উৎপল দত্ত বিশেষ মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। ‘খাইবার’ জাহাজের গানার সার্দুল সিং। সাহসে, তেজে ও দীপ্তিতে ভরপুর এক অনবদ্য চরিত্র হয়ে উঠেছেন তিনি। ‘কল্লোল’ নাটকের তৃতীয় দৃশ্যে দেখা যায় ‘খাইবার’ জাহাজের মধ্যে ব্রিটিশ অফিসাররা ‘পিপিলস এজ’ পত্রিকার একটি কপি পায়, যা ছিল তখন রাজদ্রোহমূলক। এই পত্রিকা কীভাবে জাহাজে এল তার কারণ অনুসন্ধান করতে ব্রিটিশ অফিসাররা ‘খাইবার’ জাহাজের নাবিকদের ওপরে অকথ্য অত্যাচার শুরু করে ও একজনকে বন্দি করে। এহেন অত্যাচারের পরিস্থিতিতে সার্দুল সিংয়ের পক্ষে অসহনীয় হয়ে ওঠে। সে তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং হাতে মেশিনগান তুলে নেয়। একজন ইংরেজ অফিসারকে জখম করে

ও বাকিদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করে তার প্রবল পরাক্রমে। ইংরেজ অফিসারদের সামনে সে অনমনীয় ও দুর্বার, চোখে চোখ রেখে সে লড়াই করতে জানে। ইংরেজ অফিসারদের প্রতি তাই তার সদম্ভ হুমকি—

সার্দুল ।। ক্যাপ্টেন আর্মস্ট্রং। আপনাদের ঠিক পাঁচ মিনিট দেয়া হোলো, পাঁচ মিনিটের মধ্যে অস্ত্রগুলো ডেকে রেখে হাত তুলে দাঁড়াবেন। নইলে মেশিনগান চালিয়ে আপনাদের তিন জনকেই শেষ করে দেব।

[নীরবতা। তারপরই রেটিং রা আওয়াজ তোলে সাম্রাজ্যশাহী হো বরবাদ, ইনকিলাব জিন্দাবাদ।]

...আর্ম ।। গানার সার্দুল সিং। এ কি করলে? ভারতীয় নৌবাহিনীর নামে কলঙ্ক লেপন করলে? ডেনহাম, অস্ত্রাগারে যাওয়ার চেষ্টা করো। সার্দুল সিং, আমি হুকুম দিচ্ছি তুমি এই মুহূর্তে টারেট থেকে নেমে এস।

[ডেনহাম দৌড় মারতেই সার্দুলের মেশিনগান গর্জে ওঠে, ডেনহাম ছিটকে পড়ে যান। জাহাজীরা আবার আওয়াজ তোলে।]

সার্দুল ।। ক্যাপ্টেন আর্মস্ট্রং, অস্ত্র ফেলে দিন বলছি। নইলে দেখলেন তো, মেরে ফেলবো? [৫৩]

মার্কসবাদী ভাবনায় বিশ্বাসী উৎপল দত্ত সার্দুল সিংয়ের সশস্ত্র প্রত্যাঘাত দ্বারা একজন ইংরেজ অফিসারকে জখম ও অন্যান্য অফিসারদের আত্মসমর্পণের মধ্যে দিয়ে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করতে চেয়েছেন যে— অস্ত্র ছাড়া জয় সম্ভব নয়, সাম্রাজ্যবাদকে দমন করতে গেলে, সাম্রাজ্যবাদ থেকে মুক্তি পেতে হলে, দেশকে কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা প্রদান করতে হলে সশস্ত্র প্রতিরোধ ছাড়া কোনো পথ নেই। অনুনয়-বিনয়, অনুগ্রহ প্রার্থী হয়ে থাকলে সাম্রাজ্যবাদী শাসকের হাত থেকে কখনো স্বাধীনতা সম্ভব নয়। স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজন সশস্ত্র সংগ্রাম।

চতুর্থ দৃশ্যের শেষ দিকে দেখা যায় গোরা ফৌজ কাস্‌ল্ ব্যারাকস্ আক্রমণ করে নিরস্ত্র জাহাজীদের নির্মমভাবে হত্যা করছে। নিরস্ত্র জাহাজীদের ওপরে অতর্কিত ও অকথ্য অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে সার্দুল সিং কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ অমান্য করে গুলি চালায়। নিরস্ত্র জাহাজীদের গোরা সৈন্যদের বর্বরোচিত আক্রমণ থেকে রক্ষা করে, সঙ্গে সঙ্গে গোরা সৈন্যদের পিছু হটতে বাধ্য করে—

খাইবার-এর কামান গর্জন করে ওঠে। এক মুহূর্ত নীরবতা— তারপর কাস্‌ল ব্যারাকস থেকে স্লোগান শোনা যায় খাইবার জাহাজ জিন্দাবাদ।

দুষমনের মেশিনগান পোষ্ট ধ্বসে গেছে। টারেট হুমায়ুন রেঞ্জ নাইন ফোর অট অট অট টু

গ্রীন স্যালভো। দুষমন পালাচ্ছে। টারেট ইনকিলাব টু ডিগ্রীজ আপ রেঞ্জ এইট অট অট অট স্যালভো। মারো কমরেড, জানিয়ে দাও খাইবার পৌঁছে গেছে। [৫৪]

সার্দুল সিংয়ের মধ্যে এই সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উৎপল দত্ত সেই বার্তাটাই জনতার দরবারে পৌঁছাতে চেয়েছেন যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে পরাজিত করে দেশমাতৃকাকে স্বাধীন করার ব্রতে অস্ত্রের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। সশস্ত্র সংগ্রামের পক্ষেই তিনি সওয়াল করেছেন।

স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত সার্দুল সিং অন্যায়ের সঙ্গে আপসহীন। বিদ্রোহের ক্ষেত্রে সে যেমন আপসহীন তেমনি দেশমাতৃকার স্বাধীনতাকল্পে মৃত্যুবরণ করার মধ্যেও তার মধ্যে কোনো রফা কাজ করে না। আপসহীন, দৃঢ়, বলিষ্ঠ সম্মুখভাগের যোদ্ধা সার্দুল সিং উৎপল দত্তের সৃষ্ট অন্যতম শ্রেষ্ঠ চরিত্রগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধক্ষেত্রে হোক বা বাস্তবে প্রতিকূল পরিবেশ বিবেচনা করে দেখতে বললে আপসহীন সার্দুল সিংয়ের সোজাসাপটা উত্তর—

বিবেচনা? বিবেচনা তো শিখিনি। আর সবাই যে বয়সে বই পড়ে, হাসে, জগৎটাকে দেখে মুগ্ধ হয়, আমরা যে সে বয়সে শুধুই মানুষ মারা শিখেছি। আমরা দেখি শুধুই টার্গেট, রেঞ্জ ওয়ান সিবাস অট্ অট্ অট্ স্যালভো। জীবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলি চলে গেল সম্পূর্ণ অপরিচিত অসংখ্য লোককে হত্যা করতে করতে। আজ হঠাৎ কী বিবেচনা করবো? [৫৫]

উৎপল দত্ত সার্দুল সিংয়ের মা কৃষ্ণা বাঈয়ের চরিত্রটি সৃষ্টিতে অনন্য সাধারণ নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। যে নারী বৈপ্লবিক চেতনা, বৈপ্লবিক শৌর্যে ও বিশ্বাসে ভরপুর। কৃষ্ণাবাঈয়ের চরিত্রে শোভা সেন অসাধারণ অভিনয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কৃষ্ণাবাঈ চরিত্রটির মধ্যে আমরা দেখতে পাই মাতা হিসেবে একদিকে যেমন তার মধ্যে সন্তানের স্নেহ, মায়া মমতায় ভরপুর, তেমনি অন্যদিকে স্বাধীনতার প্রশ্নে, সংগ্রামের প্রশ্নে লড়াকু সৈনিকের মতো দৃঢ়তা ও কাঠিন্যের পরিচয় জ্ঞাপন করেছেন। স্নেহশীলা মাতা ও সংগ্রামী সৈনিক এই দুই সমন্বয়ে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে কৃষ্ণাবাঈ চরিত্রটি। সার্দুল সিংয়ের নিখোঁজ হওয়ার সংবাদে মাতা কৃষ্ণাবাঈ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে ওঠেন ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস সার্দুল সিং একদিন ঘরে ফিরে আসবেই। তার মাতৃস্নেহের পাশাপাশি দেখি আগামী সংগ্রাম ও বিদ্রোহের প্রতি তিনি সচেতন। স্বাধীনতা সংগ্রামী ও বিদ্রোহীদের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র কৃষ্ণাবাঈ সযত্নে ও সন্তর্পণে লুকিয়ে রাখেন, যাতে সেই অস্ত্রশস্ত্রের হদিস কাকপক্ষীও যেন না পায়। পঙ্গু জাহাজী সুভাষ দেশাই ও সার্দুলের মাতা কৃষ্ণাবাঈয়ের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে সার্দুলের মাতা কৃষ্ণাবাঈয়ের কাছে অস্ত্র লুকিয়ে রাখা ও দীর্ঘদিন ধরে অস্ত্র জমানোর প্রসঙ্গটি উন্মোচিত হয়—

সুভাষ ।। অস্ত্রশস্ত্রগুলো কোথায় লুকিয়ে রেখেছ বলো তো?

কৃষ্ণা ।।   বলবো কেন?... লড়াই লাগলে তো জানতে পারবিই।

সুভাষ ।।   কত অস্ত্র জমেছে?

কৃষ্ণা।।   গোটা কুড়ি পিস্তল, চারটে বন্দুক, দু'হাজারের বেশী গুলি। [৫৬]

গোলাবারুদ ও বন্দুকের সন্ধান ইংরেজরা জানতে পারার পর কৃষ্ণাবাঈ তাঁর পুত্রবধূ লক্ষ্মীবাঈয়ের ওপর শত অত্যাচারের সত্ত্বেও স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ কৃষ্ণাবাঈ কোনোভাবেই বন্দুক ও গোলাবারুদের সন্ধান দিতে নারাজ। শত অত্যাচার ও নির্যাতনের পরেও তাঁর সন্ধান জানাতে অস্বীকার করেন। শুধু তাই নয় ইংরেজদের হুমকি পর্যন্ত দিয়ে থাকেন যে ভবিষ্যতে এই বন্দুক ও গোলাবারুদ নিয়ে তিনি ও তার বস্তিবাসীরা বদলা নেবেন। স্বাধীনচেতা সংগ্রামী নারী কৃষ্ণাবাঈ ভীষণ আহত হন যখন জানতে পারেন ইংরেজদের চক্রান্তে পা দিয়ে সংগ্রামকে পিছনে ফেলে সার্দুল সিং উপযাচক হয়ে ধরা দেয়। সার্দুল সিংয়ের আত্মসমর্পণের ঘটনা বিদ্রোহী নারী কৃষ্ণাবাঈয়ের কাছে যেন এক চরম লজ্জার বিষয়। নাটকের দশম দৃশ্যে তার কথোপকথনেই তা স্পষ্ট—

কৃষ্ণা ।।   ঐ গর্দভ। বুদ্ধু। ঐ সার্দুল। যেচে গিয়ে ধরা দিল? কেন ধরা দিল?

নুরুদ্দিন ।। আর কি করবে কৃষ্ণাবাঈ? লড়াই তো শেষ।

কৃষ্ণা ।।   কখনো নয়। শুনুন মেজর সাহেব, সার্দুলকে মারবেন জানি, কিন্তু ঐ বন্দুকগুলো রইল, বদলা নেব।

নুরুদ্দিন ।। আর লড়ে কি হবে? তার ওপর তোমার প্রাণ বাঁচাবার জন্যই ওরা গিয়েছিল সিটিং-এ। নইলে তোমায় মারতো।

কৃষ্ণা ।।   (চিৎকার) সেটাই তো আমার লজ্জা। সার্দুল কখনো এত নীচে নামতে পারে ভাবিনি। ওকে এ শিক্ষা তো আমি দিইনি। মা বাবা বউ-এর সঙ্গে ছেলেখেলার চেয়ে ঢের ঢের বড় হল বিপ্লব, আজাদীর লড়াই— এ শিক্ষাই তো পেয়েছে সে। [৫৭]

প্রাক্তন জাহাজী পঙ্গু সুভাষ দেশাই চরিত্রটির মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য বর্তমান। শ্রেণি সংগ্রাম— এই মার্কসবাদী আদর্শকে উৎপল দত্ত সুকৌশলে সুভাষ দেশাই নামক চরিত্রর মধ্য দিয়ে পরিস্ফুটিত করেছেন। 'ক্যাসল ব্যারাক'-এ বিপন্ন জাহাজীদের বাঁচাতে গিয়ে খাইবার জাহাজ বিপদে পড়েছিল। যখন খাইবার সংকীর্ণ প্রণালীর মধ্যে ঢোকে তখন গোরা ফৌজের পাঁচটি জাহাজ সেই

প্রণালীর মুখ বন্ধ করে দেয়। ফলে বহির্জগৎ থেকে খাইবার সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, প্রবল খাদ্যাভাব দেখা দেয়। খাইবার জাহাজের নাবিকদের যখন জীবন বিপন্ন ও সংকটময় তখন তাদের উদ্ধারে এগিয়ে আসে পঙ্গু সুভাষ দেশাই। তার একটি হাত না থাকা সত্ত্বেও সে গোপনে সাঁতার কেটে আটকে পড়া জাহাজীদের খাবার পৌঁছে দেওয়ার সংকল্পে অটল। খাইবার জাহাজের নাবিকদের বিপদে সুভাষ দেশাই স্থির থাকতে পারেন না। শত বাধা ও প্রচণ্ড গুলি বর্ষণের মধ্যে সুভাষ দেশাইয়ের প্রত্যয়—

> *তার দায়িত্ব নেবেন আপনারা প্রত্যেকে। 'খাইবার' আমাদের জন্যেই লড়ছে। তাকে খাওয়ানোর দায়িত্বও আমাদের। প্রাণ দিয়েও।* [৫৮]

নাটকের বিষয় ও ভাবনার সঙ্গে সংগতি রেখে সংগীত ও সুর সংযোজনা করেছিলেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস। নাটকের বিষয়ের সঙ্গে সংগতি রেখে সুর সংযোজনার ক্ষেত্রে হেমাঙ্গ বিশ্বাস এদেশের নানা সুর যেমন ব্যবহার করেছেন। পাশাপাশি বিদেশের নানা সংগীতের সুরের সাহায্যও তিনি নিয়েছেন। এই দেশি ও বিদেশি সুরগুলি ভারতের নৌবিদ্রোহের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। 'কল্লোল' নাটকের প্রযোজনা সম্পর্কে উৎপল দত্ত তাঁর 'লিট্ল্ থিয়েটার ও আমি' প্রবন্ধে বলেছেন—

> *হেমাঙ্গ বিশ্বাস মহারাষ্ট্রের পোয়াড়া ও লাওনি সুরে পশ্চিম প্রান্তের মহান মেহনতি মানুষের অন্তরে কথাগুলি যেন সাজিয়ে দিলেন পুষ্পস্তবকের মতন। সুরেশ দত্ত সৃষ্টি করলেন খাইবার ক্রুজার ও বস্তির দৃশ্য, তাপস সেনের আলো। আর সংগীতে আমরা জর্মন, রুশ ও চীনা বিখ্যাত নৌ-বিদ্রোহের গান কয়েকটি ব্যবহার করেছিলাম। আর অবশ্যই আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগীত।* [৫৯]

উৎপল দত্ত তাঁর 'কল্লোল' নাটকের দৃশ্যসজ্জা, আলোকসম্পাত, সংগীত প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাঁধাধরা নিয়ম মেনে চলেননি। বাস্তব দৃশ্যসজ্জা বা বাস্তবোত্তর দৃশ্যসজ্জা তাঁর নাটকের প্রযোজনার প্রয়োজনবোধে ব্যবহার করেছেন। তাঁর এক এবং অন্যতম উদ্দেশ্য থিয়েটারের মাধ্যমে দর্শকের কাছে পৌঁছানো, নাটকের বক্তব্যকে দর্শকের দরবারে পৌঁছে দিয়ে গণমানসে তার প্রভাব তৈরি করা। তাই শুধুমাত্র দৃশ্যসজ্জার জন্যই দৃশ্যসজ্জা নয়, সাধারণ মানুষের দরবারে পৌঁছতে প্রযোজনার ক্ষেত্রে যা যা প্রয়োজন তা তিনি অনুসরণ করেছেন। তাঁর নাটকের বিভিন্ন চরিত্র তাদের সপ্রতিভ অভিনয়, সময়োপযোগী বিভিন্ন পোশাক ও তাদের বিভিন্ন চলচলন, ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে তাদের মানিয়ে নেওয়ার সক্ষমতা প্রভৃতি নানা চরিত্রের নানা বৈচিত্র্যের সুষম সমন্বয় গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। সংগীত, আলোকসম্পাত, নেপথ্য ধ্বনি প্রভৃতির অনন্য ঐক্য গড়ে

উঠেছে ‘কল্লোল’-এর প্রযোজনায়। ‘কল্লোল’ চলাকালীন সেই সময়কার ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’-য় নাটকটির প্রযোজনার বিশেষ প্রশংসা করে লেখা হয়েছিল—

> *বিশেষ প্রশংসার যোগ্য অবশ্যই এর প্রযোজনার দিকটি। দৃশ্য, ধ্বনি এবং অভিনয়ের অসাধারণ টিমওয়ার্কের মাধ্যমে যেভাবে দর্শকদের একের পর এক উত্তেজক মুহূর্তের মুখোমুখি করে দেওয়া হয়েছে তা সত্যই বিস্ময়কর। দৃশ্য পরিবর্তনের কাজ অতি দ্রুত। জাহাজের দৃশ্যসজ্জা [একাধিক] অপূর্ব; প্রয়োজন মতো আলোছায়ার নিয়ন্ত্রণ এবং ধ্বনিপ্রেক্ষপণের ফলে গোটা ব্যাপারটি মায়া সৃষ্টি করতে পেরেছে।* [৬০]

মার্কসবাদী চিন্তা-চেতনা ও আদর্শে বিশ্বাসী উৎপল দত্ত নিজেই নাটক লিখেছেন, নাটকে নির্দেশনা করেছেন, অভিনয় করেছেন আবার পরিচালনাও করেছেন। তাঁর থিয়েটার সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছানোর সমস্ত কৃতিত্ব তাঁর একান্ত নিজের এবং সে থিয়েটার অবশ্যই বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী থিয়েটার। তিনি তাঁর নাটকের বিষয় অনুযায়ী আঙ্গিক নির্মাণে যত্নবান ছিলেন। দৃশ্যসজ্জা, অভিনয়, আলোকসম্পাত, আবহ সংগীত— এ সবকিছুরই সমন্বয়কে উৎপল দত্ত নাটকের আঙ্গিক বলে মনে করতেন। সুনির্দিষ্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী হওয়ায় অর্থাৎ মার্কসবাদী আদর্শে বিশ্বাসী হওয়ায় উৎপল দত্ত তাঁর নাটকে সমস্ত আঙ্গিকের ব্যবহার করেছেন যাতে তাঁর সেই আদর্শের অর্থাৎ মার্কসবাদী আদর্শের প্রতিফলন ঘটে। আর সেই আদর্শ প্রতিফলন করার উদ্দেশ্যে নাট্য আঙ্গিকের প্রত্যেকটা দিকের প্রতি অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। মার্কসবাদী রাজনৈতিক নাটককার উৎপল দত্তের বিষয় আঙ্গিক নির্বাচনের এক এবং অন্যতম উদ্দেশ্য দর্শকের দরবারে পৌঁছানো ও থিয়েটারকে বৈপ্লবিক থিয়েটারে উন্নীত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা। নাটকের মধ্যে দিয়ে সাধারণ দর্শকের কাছে পৌঁছানোই ছিল তাঁর গন্তব্য। এই বিষয়ে কখনো তিনি আপস করেননি। আর দর্শকের কাছে পৌঁছানোর জন্যই তিনি সদা সচেতন। থিয়েটারে যে কৌশল সাধারণ দর্শকের কাছে পৌঁছানো যাবে বলে তিনি মনে করেছেন ওই নাটকের জন্য তিনি সেই আঙ্গিক বা সেই কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন। দর্শকের দরবারে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে থিয়েটার নিয়ে তাঁর নিরন্তর পরীক্ষা নিরীক্ষা, আলো-সংগীত, মঞ্চসজ্জা, অভিনয়, নেপথ্য ধ্বনি প্রভৃতি সব দিকেই তাঁর সর্বদা সজাগ দৃষ্টি এবং তাঁর কালের সফল ব্যক্তিদের দ্বারা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে তিনি কাজ সম্পন্ন করতে চেয়েছেন। মঞ্চ-আলো-সংগীত-অভিনয় প্রতিটি আঙ্গিক তাঁর প্রযোজনায় একাকার হয়ে ওঠে, যা একক অনন্য ও বিশেষ কৃতিত্বের দাবি রাখে।

উৎস নির্দেশ :

১. উৎপল দত্ত, 'আমার রাজনীতি আমার থিয়েটার', কলকাতা, ২০০৫, পৃ ২৩

২. উৎপল দত্ত, 'সুরজিৎ ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎকার', 'দেশ', ৩০ মার্চ ১৯৯১, পৃ ৩৫

৩. সূত্র-১, পৃ ২৮

৪. উৎপল দত্ত, 'যে নাটকের রাজনীতি ভুল তার সব ভুল' (সুরজিৎ ঘোষের নেওয়া একটি সাক্ষাৎকার), 'দেশ', কলকাতা, ৩০.০৩.১৯৯১

৫. উৎপল দত্ত, 'সঙ্গীত ও অভিনয়', 'চায়ের ধোঁয়া', 'উৎপল দত্ত গদ্য সংগ্রহ', প্রথম খণ্ড, সম্পা-শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, জুলাই ২০১৫, পৃ ১০৫

৬. উৎপল দত্ত, 'স্তানিস্‌লাভস্কির পথ', 'স্তানিস্‌লাভস্কি থেকে ব্রেখ্‌ট্', উৎপল দত্ত, 'সঙ্গীত ও অভিনয়', 'চায়ের ধোঁয়া', 'উৎপল দত্ত গদ্য সংগ্রহ', প্রথম খণ্ড, পৃ ২৭৪

৭. উৎপল দত্ত, 'এপিকের সারকথা', 'স্তানিস্‌লাভস্কি থেকে ব্রেখ্‌ট্', পূর্বোক্ত, 'উৎপল দত্ত গদ্য সংগ্রহ', পৃ ২৭৭

৮. তদেব, পৃ ২৭৭

৯. শোভা সেন, 'ব্যারিকেডে দাঁড়িয়ে তুমি আর আমি', 'উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন', সম্পা-নৃপেন্দ্র সাহা, উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব ২০০৫ কমিটি, ৭ নভেম্বর ২০০৫, পৃ ১৩৩

১০. সূত্র-৭, পৃ ২৮৩

১১. দর্শন চৌধুরী, 'থিয়েটারওয়ালা উৎপল দত্ত', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১ম সংস্করণ ১০ই অক্টোবর ২০০৭, পৃ ১৮২, ১৮৩

১২. তদেব, পৃ ১৮২

১৩. তদেব, পৃ ১৮২

১৪. Utpal Dutta, "Political Theatre", 'Forwards a Revolutionary Theatre', M. C. Sarkar & Sons Pvt. Ltd., 1995, P. 34

১৫. সূত্র-৭, পৃ ২৮৩

১৬. পবিত্র সরকার, ভূমিকা, উৎপল দত্ত নাটক সমগ্র-১ম খণ্ড, সম্পা- শোভা সেন, সৌভিক রায়চৌধুরী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, মাঘ ১৪২৩, পৃ ১১

১৭. সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আধুনিক থিয়েটার ও উৎপল দত্ত', 'উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন', পৃ ১৯৯

১৮. উৎপল দত্ত, 'থিয়েটারের ভাষা', 'চায়ের ধোঁয়া', উৎপল দত্ত গদ্য সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ ১১৪

১৯. তদেব, পৃ ১১৮

২০. উৎপল দত্ত, 'দৃশ্যসজ্জা', 'চায়ের ধোঁয়া', উৎপল দত্ত গদ্য সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, পৃ ৭৭

২১. উৎপল দত্ত, 'আঙ্গিক', 'চায়ের ধোঁয়া', পূর্বোক্ত উৎপল দত্ত গদ্য সংগ্রহ প্রথম খণ্ড, পৃ ৭৩

২২. সূত্র-২০, পৃ ৭৮, ৭৯

২৩. উৎপল দত্ত, 'লিট্ল্ থিয়েটার ও আমি', 'উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন', পৃ ৪৪৩, ৪৪৪

২৪. তদেব, পৃ ৪৪৩, ৪৪৪

২৫. উৎপল দত্ত, নাটক সমগ্র, প্রথম খণ্ড, সম্পা- শোভা সেন, সৌভিক রায়চৌধুরী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ, মাঘ ১৪২৩, পৃ ১১৫, ১১৬

২৬. তদেব, পৃ ১৩৯

২৭. তদেব, পৃ ১৪৩, ১৪৪

২৮. উৎপল দত্ত, 'অঙ্গারে আঙ্গিক', 'উৎপল দত্ত গদ্য সংগ্রহ', প্রথম খণ্ড, পৃ ৩৮৬, ৩৮৭

২৯. সূত্র-১৪, পৃ ৪০, ৪১

৩০. সূত্র-১১, পৃ ৫২

৩১. তদেব, পৃ ৫৯

৩২. তদেব, পৃ ৫৯

৩৩. সূত্র-২৫, পৃ ২০৮

৩৪. তদেব, পৃ ২০৮, ২০৯

৩৫. তদেব, পৃ ১৮৬

৩৬. তদেব, পৃ ১৮৮

৩৭. তদেব, পৃ ২০১

৩৮. তদেব, পৃ ১৬২

৩৯. তদেব, পৃ ১৭৩

৪০. তদেব, পৃ ১৭৪

৪১. তদেব, পৃ ২২২

৪২. তদেব, পৃ ২২৭

৪৩. সূত্র-১১, পৃ ৬০

৪৪. সূত্র-২৫, পৃ ২০৫

৪৫. তদেব, পৃ ২০৬, ২০৭

৪৬. তদেব, পৃ ১৯০

৪৭. তদেব, পৃ ১৯০

৪৮. তদেব, পৃ ১৬৯

৪৯. তদেব, পৃ ১৬৫

৫০. তদেব, পৃ ১৭৭

৫১. সূত্র, পৃ ৪৬

৫২. উৎপল দত্ত, নাটক সমগ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পা : শোভা সেন ও সৌভিক রায়চৌধুরী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪২৫, পৃ ২৩৭, ২৩৮

৫৩. তদেব, পৃ ২৬০

৫৪. তদেব, পৃ ২৬৬

৫৫. তদেব, পৃ ২৫৫

৫৬. তদেব, পৃ ২৪৯

৫৭. তদেব, পৃ ৩০৭

৫৮. তদেব, পৃ ২৭১

৫৯. সূত্র-২৩, পৃ ৪৫৬

৬০. সূত্র-১১, পৃ ৯০

উপসংহার

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে উৎপল দত্ত বাংলা নাট্যচর্চার ইতিহাসে এক উজ্জ্বল, ব্যতিক্রমী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। গণনাট্য সংঘে যোগ দান থেকে শুরু করে জীবনের অন্তিম লগ্ন পর্যন্ত প্রায় অর্ধশতাব্দীব্যাপী নাট্যচর্চায় তাঁর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লবী থিয়েটার (Revolutionary) অভিযাত্রায়। তিনি সমাজে শোষিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত গণমানুষের অধিকার ও যথাযথ মর্যাদা রক্ষার লড়াইকে নাট্যজীবনের শুরু থেকেই নাট্যসাধনার কেন্দ্রীভূত বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষ তথা সারাবিশ্বের গণমানুষের সাম্রাজ্যবিরোধী সংগ্রাম, ন্যায্য অধিকার আদায়ের সমস্ত সংগ্রামী আন্দোলন তাঁর নাটকের প্রধান উপজীব্য বিষয়। বঞ্চিত-শোষিত-লাঞ্ছিত গণনায়ক তাঁর নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র। আধুনিককালে নাটকের বিষয় চয়ন ও রূপরীতির ক্ষেত্রে উৎপল দত্তের নাটক নতুন মাত্রা সংযোজনে সমর্থ। কেবলমাত্র নাট্যবিষয় নয়, নাট্যনির্মাণের ক্ষেত্রেও উৎপল দত্তের নাটকসমূহ বাংলা নাট্যজগতের নব দিক নির্দেশক। মার্কসীয় দর্শন ও সমাজতত্ত্ব তাঁর থিয়েটার চর্চায় প্রয়োগ করেন নিপুণ কৌশলে। হাজার বছরের ঐতিহ্যমণ্ডিত বাংলা নাটককে শ্রেণিচেতনা ও শ্রেণিসংগ্রামের নিরিখে মিলিয়ে নেওয়ার চেষ্টায় ব্রতী হন। মার্কসীয় তত্ত্বের নাট্যরূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে উৎপল দত্ত শুধুমাত্র বাংলা নাট্য জগতে নয় সমগ্র বিশ্বে বিশিষ্টতাজ্ঞাপক। নাট্যপ্রয়োগ, নাট্যনির্মাণ, নাট্যলক্ষ্য, নাট্যরূপ— সবদিক থেকেই উৎপল দত্ত এক নব যুগের দিশারী। তাঁর কালে তিনি একক ও অনন্য। বিশ শতকের পঞ্চাশ-ষাটের দশকে বাংলা নাটকের গণজীবন মূল সংলগ্নতার বহমান ধারা নতুন মাত্রা লাভ করে, যার শুভ সূচনা চল্লিশের দশকে। উৎপল দত্ত অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এই নাট্যধারাকে আরও বেগবান ও কল্লোলিত করেন এবং এগিয়ে নিয়ে যান কয়েক যোজন দূরে।

পরাধীন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকারের উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারের পুত্র উৎপল দত্তের সাহিত্য সাংস্কৃতিক আবহের মধ্যে বেড়ে উঠেছিলেন। উচ্চবিত্ত, বনেদি পরিবারে বেড়ে ওঠা উৎপল দত্ত ছিলেন নিরন্তর পড়ুয়া মানুষ, বিপুল ও বিস্তারিত ছিল তাঁর অধ্যয়ন পরিধি। সেন্ট জেভিয়ার্সের রত্নগর্ভ গ্রন্থাগার তাঁর বিপুল পঠনপাঠনের সহায়ক। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকদের রচনাগুলির সঙ্গে তাঁর ক্রমে পরিচয় ঘটতে থাকে ও তাদের ঐতিহাসিক কাহিনি ও সুচিন্তিত মতামত ব্যাখ্যা গভীরভাবে অন্তরাত্মায় অনুধাবন করেন। পাশাপাশি শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের রচনাগুলির সঙ্গে তাঁর পরিচয় লাভ হতে থাকে। ওডেট্স, শেকসপিয়র, ব্রেখট্, গোর্কি-র মতো জগৎজোড়া খ্যাতিসম্পন্ন কিংবদন্তি নাট্যকারগণের রচনায় তিনি তাঁর আকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হন। বাংলা

সাহিত্য এবং বিশ্ব সাহিত্য পাঠে উৎপল দত্তের গভীর আগ্রহ সম্পর্কে সৌমেন চট্টোপাধ্যায় 'উৎপল দত্ত জীবন কথায়' লিখেছেন—

> "নাটক বা নাট্য সম্পর্কিত বইপত্র পড়াশোনাও ছিল প্রচুর। পিটার ব্রুক, স্তানিস্লাভস্কিদের বই ছাড়াও শেকসপিয়ার তো বটেই, পৃথিবীর যেখানকার যে নাটক সম্পর্কে বই পাওয়া যেত, সব সংগ্রহ করে পড়া তাঁর কাছে ছিল 'মাস্ট'।"[১]

উৎপল দত্তের পড়াশোনার ব্যাপ্তি যে কত বিস্তৃত ও ব্যাপক ছিল সেটা তাঁর নাট্য বিষয় নির্বাচনেই বোঝা যায়। গভীর অধ্যয়ন বিষয়েও উৎপল দত্তের মন্তব্য—

> "কৈশোর থেকেই তাঁর নানা বিষয়ে পড়াশোনার ঝোঁক ছিল।"[২]

১৯৫০-খ্রিস্টাব্দের টালমাটাল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে উৎপল দত্তের নাট্য জগতে প্রবেশ। প্রাথমিক পর্যায়ে নাট্যাভিনয় ও নাট্য পরিচালনার কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখলেও নাটক লেখার কথা তিনি কখনও কল্পনা করেননি। কিন্তু নাটক প্রযোজনা করতে গিয়ে তিনি এক সমস্যার সম্মুখীন হলেন, যে নাটক তিনি প্রযোজনা করতে চাইলেন সে নাটক তিনি পাননি। বাধ্য হয়ে তিনি নাটক লিখতে শুরু করেন। একে একে লিখলেন শতাধিক নাটক ও নাট্য দক্ষতায় হয়ে উঠলেন বাংলা নাট্য সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নাটককার। উৎপল দত্তের নাটককার হয়ে ওঠার কাহিনি শতবর্ষ আগে বাংলা সাহিত্যের মহাকবি ও নাটককার মাইকেল মধুসূদন দত্তের কথা পাঠকবর্গকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যিনি প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্যের বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে এক বিশেষ স্থানের অধিকারী। মাইকেল মধুসূদন দত্তও নাটক লেখবার কথা কখনও ভাবেননি, কিন্তু রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় দেখে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাছে এই 'রত্নাবলী' নাটক 'অলীক কুনাট্য' মনে হয়েছিল। বাংলা নাটক সম্পর্কে ও বাংলা নাট্যজগৎ সম্পর্কে অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে তিনি লিখেছিলেন—

> "অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে
> নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।"[৩]

মধুসূদন দত্ত বঙ্গের অলীক কুনাট্য দেখে ব্যথিত ও বিচলিত হয়ে বাংলা নাটক লিখতে মনস্থির করেন এবং শর্মিষ্ঠা নাটক লেখেন। উৎপল দত্তের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। উৎপল দত্ত পঞ্চাশ-ষাট দশকের রাজনৈতিক টালমাটাল অবস্থায় বিপ্লবের হুঙ্কারে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু প্রযোজনার জন্য যথোপযুক্ত নাটক খুঁজে তিনি পাননি। তিনি সমকালীন 'মৃদু প্রগতির ফিসফিসে'

সন্তুষ্ট হতে পারেননি ও তৃপ্ত হতে পারেননি। তিনি চাইছিলেন একজন সামরিক যোদ্ধার রণহুঙ্কারে নাট্য জগতে প্রবেশ করতে। তাঁর প্রয়োজনেই তিনি নাটক লিখতে মনস্থির করেন। সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উৎপল দত্ত যে ধরনের নাটক প্রযোজনা করতে চেয়েছিলেন, তা তিনি না পাওয়ায় নাটক লিখতে বাধ্য হয়েছেন; তাঁর সুযোগ্যা সহধর্মিণী শ্রীমতি শোভা সেন তাঁকে নাটক রচনায় উদ্দীপিত ও অনুপ্রাণিত করেন। নাট্যকার উৎপল দত্ত তাঁর নাটককার হিসেবে অভিষেক হওয়ার উপলব্ধির কথা জানিয়ে লিখেছেন—

> "প্রধানত শোভা সেনের নাছোড়বান্দা তাগিদে আমি মৌলিক নাটক লিখি— 'ছায়ানট'। নাটক লেখা আমার কল্পিত ভবিষ্যৎ ছকে কোনওদিনই ছিল না। পথ-নাটিকা লিখতাম, কিন্তু মঞ্চের পূর্ণাঙ্গ নাটক লেখার যোগ্যতা আমার আছে এমন চিন্তাও মাথায় আসেনি। এখনও আসে না। কিন্তু উর্দুতে বলে— মজবুরন। নাটক লিখতে বাধ্য হয়েছিলাম, কেননা অনেক খুঁজে আমরা যে নাটক চাই তা পাইনি। কিছু চাষীর কান্না বা মধ্যবিত্ত পরিবারের বিলাপের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছিল তৎকালীন গণনাট্য। 'প্রগতিশীল নাটক' বলতে যা বোঝায় তা অন্য কোন দল করলে সাধুবাদ জানাতে কার্পণ্য করিনি। কিন্তু লিটল থিয়েটার চাইছিল মৃদু প্রগতির ফিসফাস নয়, টালমাটাল বিপ্লবের কর্কশ হুঙ্কার। 'ছায়ানট' আমার হাতেখড়ি মাত্র। ভবিষ্যতে বৈপ্লবিক কিছু লিখতে গেলে আগে সহজ কিছুতে হাত পাকানো উচিত— এরকম একটি আইডিয়া মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল শোভা এবং ঘড়ি ধরে কাজ আদায় করে নাটক সম্পূর্ণ করেছিল।"[৪]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বাংলা নাট্য জগতে নাট্যকারগণ মৃত্তিকা সংলগ্ন গণমানসের কাছে পৌঁছানোর নিরন্তর প্রচেষ্টা করেছেন। বিজন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী, সলীল সেন, দিগিন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঋত্বিক ঘটক প্রমুখ নাটককারগণ নবদল জীবনবোধ, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও বাস্তবের কাছাকাছি পৌঁছানোর প্রয়াস, সর্বোপরি গণচেতনার যে ধারা সৃষ্টি করেছিলেন, সে ধারার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী হলেন উৎপল দত্ত। জ্যোতিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে ডি. এল. রায় পর্যন্ত অনেক নাটককার সাম্রাজ্যবিরোধী নাটক লিখেছেন এবং মঞ্চস্থ করেছেন। কিন্তু তাদের নাটকের সামগ্রিক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে শুধুমাত্র রাজনীতি তাদের সমগ্র নাটকের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক ছিল না। তাঁরা অন্য অনেক বিষয়ের সঙ্গে রাজনীতিকে বিষয় হিসেবে নাট্যাঙ্গনে প্রয়োগ করেছিলেন। তাঁরা সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাবলিকে সোজাসুজি নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে উপস্থিত না করে বিভিন্ন সামাজিক ও ঐতিহাসিক বাতাবরণে তা উপস্থাপিত করার প্রয়াস করেছিলেন। কিন্তু উৎপল দত্ত বাংলার নাট্যসাহিত্যের প্রথম নাটককার যিনি রাজনৈতিক ঘটনাকে সরাসরি নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে উপস্থাপিত করেছেন। আর দশটা নাটকের সঙ্গে কিছু নিখাদ

রাজনৈতিক নাটক রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। এখানেই পূর্বসূরিদের থেকে উৎপল দত্ত একেবারেই স্বতন্ত্র ও একক। উৎপল দত্তের কাছে নাটক অবসর বিনোদন বা শখের বিষয় ছিল না, তিনি বিশ্বাস করতেন— নাটক মানে সংগ্রাম, নাটক সংগ্রামের হাতিয়ার। তাঁর নাটক রচনা, প্রযোজনা ও পরিচালনার প্রত্যেকটা অঙ্গনে রাজনৈতিক চেতনা ও রাজনৈতিক বিশ্বাসের আভাস পরিলক্ষিত হয়। উৎপল দত্ত তাঁর 'Towards a Revolutionary Theatre' গ্রন্থে বলেছেন—

> "From the very begening of my theatre work, we have tried to put revolution in a historical perspective।"[৫]

উৎপল দত্ত সেই নাটককার যিনি দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিজেকে জড়িয়েছেন, প্রত্যক্ষভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে শামিল হয়েছেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের দাবিতে বিভিন্ন প্রয়োজনে পথনাটক রচনা করেছেন, অভিনয় করেছেন ঘাটে-মাঠে-বাজারে, তেমনি বিভিন্ন রাজনৈতিক বক্তৃতাও উপস্থাপন করেছেন। রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের বিশাল প্রেক্ষাপটে নিজেকে জড়িয়ে তিনি তাঁর বিভিন্ন রাজনৈতিক নাটক রচনা ও প্রযোজনা করেছেন। আপাদমস্তক তাঁর মনীষা রাজনৈতিক নাটক রচনায় ও প্রযোজনায় সম্পৃক্ত ছিল। তাঁর দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা আমরা শুনতে পাই—

> "যেদিন থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনে আমি আর যুক্ত থাকতে পারব না সেদিন থেকে আমার শিল্পসত্তারও মৃত্যু ঘটবে।"[৬]

উৎপল দত্ত যে রাজনৈতিক আদর্শ লালন-পালন ও বহন করে গেছেন আজীবন নাট্যরচনায় ও নাট্যপ্রযোজনায় প্রয়োগের মাধ্যমে জনমানসে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তা মার্কসবাদী রাজনৈতিক আদর্শ। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সর্বদাই আদৃত ছিল মার্কসবাদী চিন্তা চেতনায় ও ভাবনায়। সেই মার্কসবাদী চিন্তাভাবনাকে থিয়েটারে সফলভাবে প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন দক্ষতার সঙ্গে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে পড়ার সময় বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্ট আন্দোলন ও তাদের গতিপ্রকৃতি কিশোর উৎপল দত্তকে চমকিত করে। মার্কসবাদীদের কার্যকলাপ ও আদর্শ তাঁকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। স্মৃতিচারণায় তিনি বলেছেন—

> স্কুলে থাকতেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লাল ফৌজের মহান 'প্রতিরোধ ও প্রত্যাক্রমণের কাহিনী পড়ে চমকিত হতাম। স্তালিনের সহজ ও তীক্ষ্ণ ভাষায় লেখা প্যামফ্লেট ও বই তখন থেকে পড়েছি।"[৭]

স্কুলে কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতি একটা বিশেষ আগ্রহ ও ভালোলাগা থেকেই উৎপল দত্ত স্কুল শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মার্কসবাদ সম্পর্কে গভীর অধ্যয়নে ব্রতী হন—

"স্কুল শেষ হতে না হতে লেনিন, মার্কস, এঙ্গেল্স— এমনকি হেগেল, ফয়েরবাখ, কান্টে প্রমোশন নিয়েছি।"[৮]

মার্কসবাদের প্রতি আগ্রহ ও মার্কসবাদকে অন্তরাত্মায় সম্পৃক্ত করে তিনি তা বহন করেছিলেন আজীবন। মার্কসবাদী চিন্তা-চেতনা ও ভাবধারাকে তিনি থিয়েটারে সফলভাবে দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন। মার্কসবাদী চিন্তা-চেতনায় অটল বিশ্বাসে কখনও বিচ্যুতি ঘটলেও তা তিনি অতি দ্রুততার সঙ্গে সংশোধন করে চেতনায় বহন করেছেন আজীবন এবং সেই আদর্শ থেকে কখনোই বিচলিত ও পথভ্রষ্ট হননি। তাঁর সমসাময়িক বিভিন্ন নিকট বা দূরাতীতের রাজনৈতিক ঘটনাবলিকে কেন্দ্র করে নাটক রচনা করেছেন, তা অবশ্যই মার্কসবাদী চিন্তাধারার আলোকে। তাঁর নাট্যদলের উপরে শাসকবর্গের বর্বর, অকথ্য অত্যাচার ও আক্রমণ নেমে এসেছে, ব্যক্তিগত জীবনে তাঁকে নানারকম পাশবিক অত্যাচার ও হেনস্থা এমনকি হাজতবাসকে সঙ্গী করেছেন, তবুও তাঁর আদর্শ থেকে পিছুপা হননি। রাজনৈতিক ভাবনা ও চিন্তা-চেতনার জগৎ থেকে কখনোই তাঁর বিচ্যুতি ঘটেনি শত প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও। সমসাময়িক রাজনৈতিক বিভিন্ন ঘটনাবলি তাঁর নাট্যাঙ্গনে নিয়ে আসার জন্য শাসকশ্রেণির দ্বারা ও বিরোধী শত্রুর দ্বারা প্রতিনিয়ত আক্রান্ত হয়েছেন তবুও কখনও ভীত হননি। শ্রেণিশত্রুর মুখোশ উদ্‌ঘাটন করতে ও শত্রুর স্বরূপ উন্মোচন করতে সদাসর্বদা তিনি মার্কসবাদী আদর্শে নাট্যরচনায় ব্রতী ছিলেন।

উৎপল দত্তের বিষয়ভাবনার পাশাপাশি নাটকের আঙ্গিকের প্রতিও সদাসর্বদা তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টিভঙ্গি রেখেছিলেন নাটকের আঙ্গিকেও মার্কসবাদী চিন্তায় আবদ্ধ করে উপস্থাপনা করার প্রয়াস সদাসর্বদা পরিলক্ষিত। তিনি সব সময় এই ধারণা পোষণ করতেন— নাটকের বিষয়বস্তু হবে আন্তর্জাতিক মানের এবং অবশ্যই তা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। সেই সঙ্গে নাটকের আঙ্গিক হবে সম্পূর্ণ দেশীয় ও জাতীয় পটভূমিকায় নির্মিত। মার্কসবাদী চিন্তা-চেতনার ধারার সঙ্গে সদাসর্বদা সামঞ্জস্য রেখে নাটকের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক নির্বাচন করার ক্ষেত্রে সদা তৎপরতা লক্ষণীয়। বেট্রোল্ড ব্রেখ্‌ট-এর মতো উৎপল দত্তও বিপ্লবের চারণ। ব্রেটোল্ড ব্রেখ্‌ট তাঁর যুগের বিভিন্ন সংগ্রাম ও বিদ্রোহ আন্দোলনের আগুনকে অতীত দিনের সমস্ত বৈপ্লবিক ঘটনাবলি তাঁর চোখ এড়ায়নি। সমস্ত বিপ্লব আন্দোলন সংগ্রামকে তিনি মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন ও সংগ্রামী গণমানুষের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করার বার্তা দিয়েছেন। উৎপল দত্তের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সংগ্রামী মানুষের সংগ্রামের অবিচ্ছিন্ন ধারাকে লোক ও মানুষে প্রতিষ্ঠিত করার প্রত্যয় সদাসর্বদা তাঁর মধ্যে পরিলক্ষিত। মার্কসীয় ভাবনায় উদ্দীপিত ও জারিত থিয়েটারওয়ালা নাট্যকার উৎপল দত্তের মার্কসবাদী ভাবনার নিরিখে তাঁর সদর্প ঘোষণা—

"I am partisan, not reutral, and I believe in political stuggle the day I cease to participate in political struggle, I shall be dead as an artist too।"[৯]

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ অর্থাৎ মার্কসীয় ডায়ালেকটিস এ বিশ্বাসী হয়ে উৎপল দত্ত সমাজের বিভিন্ন প্রকার দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষকে নাটকের মধ্য দিয়ে পাঠক ও দর্শকবর্গের কাছে উপস্থিত করার প্রচেষ্টা সর্বদা। তিনি নাটকের মধ্য দিয়ে সমাজের নির্যাতিত, শোষিত, নিপীড়িত ও বঞ্চিত মানুষের কাছে পৌঁছাতে চেয়েছেন। বিশ্বজুড়ে সমাজতান্ত্রিক বিভিন্ন আন্দোলন তাঁর চিন্তা-চেতনাকে আরও স্বচ্ছ ও দৃঢ় করতে সক্ষম হয়েছে। তাঁর কাছে নাটক কখনোই বিনোদন নয়, ছিল আদর্শ শৃঙ্খলা ও প্রত্যয়ের বিষয়। নাটক মানেই সংগ্রাম— এ তথ্যে বিশ্বাসী। তাই নাটক রচনা, পরিচালনা ও প্রযোজনার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তাঁর রাজনৈতিক বিশ্বাসের প্রত্যয় পরিলক্ষিত। নাটক হবে সর্বদা রাজনৈতিক নাটক ও গণমানুষের সৌজন্যে। সর্বদা তিনি বাংলার রাজনৈতিক নাটকের অস্তিত্ব প্রসঙ্গে প্রচলিত ধারণার বিপরীত ধারণা পোষণ করতে পছন্দ করতেন। তিনি মনে করেন, বাংলার রাজনৈতিক নাটক শতবর্ষ ধরে লালিত ও বাংলার রাজনৈতিক নাট্যশালা কার্যকরভাবে উপস্থিত। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের চেয়ে আমাদের দেশের নাটকে দর্শকরা নাট্যশিল্পের সঙ্গে অনেকবেশি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং মানসিকভাবেও আগ্রহী। আমাদের দেশে রাজনৈতিক নাটক দেখে দর্শকের মধ্যে সৃষ্ট যে মানসিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায় তা পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে পরিলক্ষিত হয় না। থিয়েটারকে বিপ্লবীর থিয়েটারের পর্যায়ে উন্নত হতে গেলে উৎপল দত্ত মনে করেন—

> "আমরা ভুলে যাচ্ছি যে, সর্বত্র রয়েছে বৈপরীত্যের সহ-অবস্থান এবং সংঘর্ষ। এই বিপরীত ধারা সবসময়ে পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত— থিসিস অ্যান্ড অ্যান্টি থিসিস। এটা বুঝতে না পারলে আমরা সমাজের কন্ট্রাডিকশনগুলোকে আমাদের দ্বন্দ্বগুলোকে সঠিকভাবে দর্শকের সামনে উপস্থিত করতে পারছি না। সেইটাই হচ্ছে বিপ্লবী নাট্যশালার, বিপ্লবী থিয়েটারের প্রধান কাজ।"[১০]

উৎপল দত্ত আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করেছেন, ভারতবর্ষের সংগ্রামী ঐতিহ্য থেকে ভারতবাসী সদাসর্বদা বঞ্চিত। ভারতীয় গণমানুষের প্রতিপক্ষকে সদাসর্বদা মিথ্যা প্রচারে ব্যতিব্যস্ত রেখে তাদের সংগ্রাম ও ঐতিহ্যটাকে বিস্মৃত করার প্রচেষ্টায় তৎপর। প্রতিপক্ষের এ ধরনের মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের জন্য শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের ঐতিহ্যের অধ্যায়গুলোকে তুলে আনতে হবে যেগুলো তার প্রতিপক্ষরা মিথ্যা প্রচারে মুছে ফেলার প্রচেষ্টায় রত। ভারতবর্ষের মানুষ দুর্বল, ভীরু-কাপুরুষ এই মিথ্যাটাকে ভেঙে ফেলতে হবে। শত্রুদের কৌশলের মোকাবিলার জন্য নিজেদেরও বিভিন্ন কৌশলের আশ্রয় নিতে হবে বলে উৎপল দত্ত ধারণা পোষণ করতেন।

প্রতিপক্ষরা বা শ্রেণিশত্রুরা সদাসর্বদাই এই প্রচার করতে চেয়েছেন যে, ভারতবর্ষের মানুষের পিছনে কোনো উল্লেখযোগ্য সংগ্রামী ঐতিহ্য নেই। এই মিথ্যার বিরুদ্ধে গণমানুষের প্রতিরোধ ও সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে বলে তিনি মনে করেন। শাসক-শোষকেরা যেভাবে অত্যাচারের রথচক্র দিয়ে অবদমিত করতে চেয়েছেন তার বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে। উৎপল দত্ত বিশ্বাস করেন, এভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে গণমানুষ উপযুক্ত মোকাবিলা করতে পারলে একদিন রাজনৈতিক নাটক বিপ্লবী নাটকে উন্নীত হতে পারবে। তিনি বলেছেন—

> "The political theatre must not only deal with day to day political issue, but must also transcend it to create proletarian myths of revolution. Only tehn would it fulfil its task as Revolutionary Theatre।"[১১]

সাম্যবাদে বিশ্বাসী উৎপল দত্ত মানুষকে শ্রেণি অবস্থানের নিরিখে দেখেছেন। তিনি সর্বদা মেহনতি মানুষ, সাধারণ মানুষ তথা গণমানুষের কাছে পৌঁছাতে চেয়েছেন, সেই গণমানুষ, সেই অতি সাধারণ মানুষ নাটকে কী দেখতে চায় সে প্রসঙ্গে তাঁর সজাগ দৃষ্টি পরিলক্ষিত। দেশ-কাল-ধর্মীয় পরিচয়ের ঊর্ধ্বে তাঁর নাটকে মানুষ এসেছে তার সংগ্রামী চেতনার পরিচয় ও কর্মের পরিচয়ে। পৃথিবীর সকল গণমূল সংলগ্ন মানুষ তথা সংগ্রামী মানুষ, সকল বিপ্লবী তাঁর নিকট-আত্মীয় বলে তিনি মনে করতেন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই হোক না কেন শ্রমজীবী সংগ্রামী মানুষরা তাঁর চেতনায় নিকট-আত্মীয়। এই সংগ্রামী শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য ধারাকে লোকমানুষে প্রতিষ্ঠিত করার অদম্য প্রয়াস ধ্বনিত হয় উৎপল দত্তের কণ্ঠে। সেই প্রচেষ্টার জন্য তিনি সদাসর্বদা পেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন ভৌগোলিক সীমাকে, সময়ের সীমানাকে। দেশ থেকে দেশান্তরে অক্লান্ত পরিভ্রমণ করে তিনি নাট্যাঙ্গনে তুলে এনেছেন সংগ্রামশীল বিভিন্ন মানুষের ইতিকথা ও তাদের সংগ্রামের ঐতিহ্য। তাঁর নাটকে গণমানুষই নায়ক, তারাই তাঁর নাটকের নিয়ন্ত্রক। এ প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত—

> "পুরাকাল থেকে আজ পর্যন্ত যে রীতিতে নাটক সৃষ্টি হয়ে এসেছে তাকে বজায় রেখেই নতুনকে গ্রহণ করতে হবে। সাধারণ মানুষ নাটকে আসবে নয়া-ট্র্যাজেডির নায়ক হয়ে।... সমাজ একটা যুদ্ধক্ষেত্র, নয়া যোদ্ধৃবৃন্দকে তুলে ধরুন, আপসে সাধারণ মানুষ অসাধারণ হয়ে উঠবে।"[১২]

জনতার কাছে রাজনীতি পৌঁছে দেওয়া উৎপল দত্তের প্রধান ও অন্যতম উদ্দেশ্য। নাট্যকর্মীদের এটাই একমাত্র ও প্রধান কাজ হওয়া উচিত বলে তিনি ধারণা পোষণ করতেন এবং সে রাজনীতি অতি অবশ্যই কৃষক-শ্রমিকের রাজনীতি। শ্রমজীবী মানুষের লড়াই সংগ্রামের কথা সে ব্যর্থতা হোক বা সাফল্য, ভীরুতা বা কাপুরুষতা সবকিছুই সকলের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

রাজনৈতিক নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য— সমাজের ঘটনাপ্রবাহ ও সেই ঘটনার অভ্যন্তরীণ সত্য, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে অতি সূক্ষ্ম ও সচেতনভাবে দর্শকের সামনে তুলে ধরা। রাজনৈতিক নাটক, রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে শাসক শ্রেণির অবস্থান, কৃত্রিম দেশপ্রেম, লোক দেখানো দেশসেবা প্রভৃতি জনতার সামনে উন্মোচিত করতে পারে। রাজনৈতিক নাটকই ইতিহাসের প্রকৃত ঘটনাপ্রবাহের আসল চিত্র তুলে ধরতে পারে জনতার দরবারে। বিপ্লবই একমাত্র শ্রমিক-কৃষক তথা সংগ্রামী মানুষকে তার নিজস্ব পরিচয়হীনতা থেকে মুক্ত করতে পারে। তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে বৈপ্লবিক নাটক নির্মাণে সদাসচেষ্ট থেকেছেন—

> "বিপ্লবে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। শ্রমিক কৃষককে পুঁজিপতিরা করে রাখে ব্যক্তিত্বহীন, গোষ্ঠীবদ্ধ উৎপাদনী যন্ত্রমাত্র, তারা আধখানা হয়ে আছে। বিপ্লব তাকে এই পরিচয়হীনতা থেকে মুক্তি দেয়।"[১৩]

উৎপল দত্তের নাটকের বিষয়ের নানা বৈচিত্র্য থাকলেও তাঁর নাটকের স্থান-কাল বিভিন্ন হলেও তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কখনও একবিন্দুও বিচ্যুত হননি। শুধুমাত্র কয়েকটি রাজনৈতিক নাটক লিখে তিনি ক্ষান্ত হননি তাঁর আদ্যোপান্ত সমস্ত নাটকই রাজনৈতিক ভাবধারার নাটক। এখানেই অন্যান্য নাট্যকারদের সঙ্গে তাঁর মৌলিক পার্থক্য। বিপ্লবী থিয়েটারের অভিযাত্রায় বিশ্বাসী ছিলেন আজীবন।

উৎপল দত্তের সুচিন্তিত অভিমত, নিজ পাঠাগারে বসে কখনও রাজনৈতিক নাটক লেখা যায় না বাস্তবে যা অনবরত ঘটে চলেছে শুধুমাত্র সেটাকে নাটকে দেখাবার বিষয় নয়, বরং যা ঘটবে বা যা ঘটার কথা বা যা ঘটা উচিত তা দেখানোই একজন প্রকৃত নাটককারের দায়িত্ব ও কর্তব্য। তথ্য বিকৃতি নয় বরং সব সত্য তথ্য যথাযথ উপস্থিত করা একজন রাজনৈতিক নাটককারের প্রধান কাজ। নাটককার সরেজমিনে তদন্ত করে ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রাজনৈতিক নাটক রচনায় অগ্রসর হওয়া উচিত। তাঁর 'রাজনৈতিক নাটক একটি কলহ' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—

> "সত্যটা তথ্যের চেয়ে অনেক বড়। সত্য ইতিহাসের অংশ। এবং যেহেতু মেহনতী মানুষ হচ্ছে ইতিহাসের উদীয়মান শক্তি, তাই তার সত্যটাই সত্য। ... গোর্কি ও ব্রেখট্ দুজনেই বলে গেছেন— যা ঘটছে সেটাই দেখাব না। যা ভবিষ্যতে ঘটবে, যা ঘটা উচিত তাও আমরা দেখাব। সন্ত্রাসের সময়ে কৃষক পড়ে মার খাচ্ছিল শুধু সেটাই সত্য, আর অদূর ভবিষ্যতে সে যে বিদ্রোহ করবে এই অনিবার্য ইতিহাসটা সত্য নয়? শুধু যা দেখছ তাই দেখাও— এটা বুর্জোয়া বাস্তবতার দাবি।"[১৪]

উৎপল দত্ত বাংলা নাট্যজগতে ব্রেখ্ট ও পিসকাটারের সঙ্গে তুলনীয়। নাট্যকার হিসেবে

ব্রেখ্‌টের মতো তথ্য আদর্শ নিষ্ঠাবান একজন নাটককার, আবার পরিচালক হিসেবে পিস্‌কাটারের মতো দুর্ধর্ষ পরিচালক ও প্রযোজক ছিলেন। সেই সঙ্গে বাংলা নাট্যজগতে এক অতুলনীয় মহাপরাক্রান্ত অভিনেতা ছিলেন উৎপল দত্ত। কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে সদাসর্বদা যোগাযোগ রেখে চলেছিলেন উৎপল দত্ত, তাঁর শিল্পকর্মের প্রতিটি ছত্রে ছত্রে বামপন্থী আদর্শ ও চিন্তা-চেতনা বিরাজমান। উৎপল দত্ত সেই ব্যতিক্রমী নাট্যকার, যিনি বাংলা নাটক ও থিয়েটারে মার্কসীয় ভাবনা, মার্কসীয় আদর্শে নাট্যরূপায়ণে বিশেষ সাফল্য ও অতুলনীয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। পরিচালক অভিনেতা হিসেবে তাঁর দক্ষতা ও সাফল্য ঈর্ষণীয়। তিনি তাঁর থিয়েটার নিয়ে পৌঁছাতে চেয়েছিলেন সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের কাছে, সমাজের নীচু স্তরের মানুষ, যারা শাসক শোষক শ্রেণি দ্বারা সদাসর্বদা শোষিত, অবহেলিত তাদের আবেগের কাছে। থিয়েটারের মাধ্যমে সমাজের শ্রমজীবী শোষিত, বঞ্চিত মানুষের আবেগের বিস্ফোরণ ঘটাতে চেয়েছেন উৎপল দত্ত এবং সেই অদম্য আবেগ সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন সমাজ পুনর্গঠনে। শাসক-শোষকের নাগপাশ থেকে ভাঙাচোরা জীর্ণ সমাজকে মুক্তি দিয়ে নতুন সমাজ গঠনের দায়বোধ থেকে নাটককার তথা থিয়েটারওয়ালা উৎপল দত্তের জন্ম।

ব্রেখ্‌ট যেমন ছিলেন বিপ্লবের চারণ তেমনি উৎপল দত্তও। ব্রেখ্‌ট্‌ তাঁর যুগে বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রাম, বিদ্রোহ এমনকি অতীত দিনের ঘটনাপ্রবাহ কোনোকিছুই তাঁর চোখ এড়ায়নি, সমস্ত বিপ্লব বিদ্রোহকে তিনি মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সংগ্রামী মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করার বার্তা প্রদানে অনড় ছিলেন। একইরকমভাবে উৎপল দত্তও সংগ্রামী মানুষের প্রতিবাদ, প্রতিরোধের নিরন্তর ধারাকে লোকমানসে সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রত্যয় এবং ইতিহাস থেকে বিদ্রোহের কাহিনি বেছে নিয়ে থিয়েটার ও নাটক লেখার প্রয়াস উৎপল দত্তের প্রধান নাট্যদর্শ হিসেবে বিবেচিত। ব্রেখ্‌টের মতো উৎপল দত্তও একজন বিপ্লবী নাট্যকার আর আদর্শগতভাবে বিপ্লবী নাট্যকার কখনও নিরপেক্ষ হতে পারেন না। উৎপল দত্ত নিজেকে প্রোপাগান্ডিস্ট বলে সর্বদা আখ্যায়িত করতেন। ব্রেখ্‌টের মতো প্রতিটি মুহূর্তে থিয়েটার ভাবনায় প্রতিটা ক্ষেত্রে শ্রেণিসংগ্রামের প্রচারক ছিলেন। থিয়েটারকে ব্রেখ্‌ট সমাজ পরিবর্তনের রণক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করেছেন, আর উৎপল দত্ত সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার রূপে। মার্কসীয় আদর্শে আদ্যোপান্ত সম্পৃক্ত ব্রেখ্‌ট বিশ্বাস করেন—

> "Witout Marxist knowledge and socialist outlook, it is impossible today to understand reality or to use one's understanding to change it."[১৫]

মার্কসবাদী চিন্তা-চেতনায় উদ্বুদ্ধ ও জারিত উৎপল দত্ত সদাসর্বদা একথা বিশ্বাস করতেন এবং

থিয়েটারের মাধ্যমে তিনি শোষিত লাঞ্ছিত শ্রমজীবী সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে চেয়েছেন।

ইতিহাস পাঠে উৎপল দত্ত বিশেষভাবে আসক্ত ছিলেন। তাঁর ইতিহাস বীক্ষার মূলে আছে শ্রেণিসংগ্রামের দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি মনে করতেন বিশ্বের সব দেশের মতো ভারতবর্ষের ইতিহাস ও শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস, অনবরত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ইতিহাস। যুগ যুগ ধরে শাসকের যে অত্যাচার ও শোষণ তার বিরুদ্ধে শোষিত মানুষের প্রতিরোধের ইতিহাস। তিনি মনে করতেন ভারতবর্ষের মানুষকে তাদের প্রকৃত ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে জানাতে হবে। শোষিত-নিপীড়িত-বঞ্চিত মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে তাদের সংগ্রামের ঐতিহ্য। পাঠকবর্গের কাছে উৎপল দত্ত সুচতুরভাবে বিভিন্ন কৌশলে ইতিহাসের আসল সত্যকে এবং ইতিহাসের ভিতরকার সত্য ইতিহাসকে তাঁর নাটক ও থিয়েটারের মাধ্যমে তুলে ধরার নিরন্তর প্রচেষ্টারত। তিনি তাঁর নাটকে সমাজে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার মর্মমূলে প্রবেশ করে আসল সত্যকে তুলে আনার এবং তা দর্শকের কাছে তুলে ধরার চেষ্টায় ব্রতী ছিলেন। ইতিহাসের নানান উত্থান-পতন এবং সমকালীন সংকটে অন্ধের মতো না থেকে সত্যানুসন্ধানেই নিজেকে নিয়োজিত করেছেন জীবনের অন্তিমপর্ব পর্যন্ত। তিনি ইতিহাসকে নতুনভাবে নির্মাণ করেছেন নতুন তাৎপর্যে উপস্থাপন করার প্রয়াসে সর্বদা সচেতন থেকেছেন। ঐতিহাসিক নাটক সম্পর্কে উৎপল দত্ত 'বিদ্রোহের নাটক' প্রবন্ধে বলেছেন—

> "ইতিহাস চেতনা ব্যতীত সমকালকে বোঝার চেষ্টা করাই বাতুলতা। আজকের সংগ্রাম দীর্ঘ এক ঐতিহ্যের পরিণত রূপমাত্র। এই উপলব্ধি এলে তবে ঐতিহাসিক নাটকের গুরুত্ব বোঝা যায়। নইলে আজকের লড়াইটা হয়ে যায় ছিন্নমূল, বা শত্রুর প্রচার অনুযায়ী বিদেশ থেকে আমদানি করা একটা ষড়যন্ত্র মাত্র। গণবিদ্রোহ যে ভারতের মানুষের মজ্জার মধ্যে মিশে আছে, ইতিহাস ঘেঁটে তার সব নজির আমাদের খুঁজে বার করে রূপায়িত করা উচিত ছিল।"[১৬]

মানুষে মানুষে ব্যবধান ও বৈষম্যের কারণ অনুসন্ধান উৎপল দত্তের ইতিহাস জ্ঞান ও বৈপ্লবিক চেতনাকে সুতীক্ষ্ণ করেছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগ্রাম ঐতিহাসিক বিবর্তন, সেই সঙ্গে সামাজিক পথ পরিবর্তন উৎপল দত্ত সুনিপুণভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন ও বিচার বিশ্লেষণ করেছেন ও তাঁর শিল্পকর্মে স্থান দিয়েছেন। শ্রেণিসংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়কে তিনি বিচার বিশ্লেষণ করেছেন শ্রেণিসংগ্রামের দৃষ্টিকোণ থেকে। জাতীয় ইতিহাসকে কেন্দ্র করে তাঁর লেখা নাটকগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তার সিংহভাগ জুড়ে আছে জাতীয় সংগ্রাম বা সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রাম— 'ফেরারী ফৌজ', 'কল্লোল', 'মহাবিদ্রোহ', 'তিতুমীর' প্রভৃতি। সশস্ত্র বিপ্লবের বিভিন্ন ঐতিহাসিক পর্যায় ও প্রেক্ষাপটকে উৎপল দত্ত অতি দক্ষতার সঙ্গে সুনিপুণভাবে উজ্জ্বল করে তুলেছেন তাঁর রচনায় ও প্রযোজনায়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

এবং প্রান্তিক

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
SJIF Approved Impact Factor : 7.309
Vol. 9th Issue 20th, May, 2022

সম্পাদক
আশিস রায়

কার্যকরী সম্পাদক
সৌরভ বর্মন

এবং প্রান্তিক
চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২

Scanned by TapScanner

শর্মিষ্ঠা সিন্‌হার কাব্যগ্রন্থ 'প্রত্যয়'ঃ একটি আদ্যন্ত অনুভব
রামকৃষ্ণ ঘোষ ৭০৮

বাংলা সমালোচনা সাহিত্য বিকাশে তিন প্রতিবেশী রাজ্য :
অসম, ঝাড়খণ্ড ও ত্রিপুরা
অনির্বাণ সাহু ৭১৬

রাভা জনজাতি : উৎস ও পরিচয় সংক্রান্ত মতবাদসমূহ
শঙ্করী অধিকারী চন্দ্র ৭২৬

নবদ্বীপের কাঁসা শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা
সুমিত কুমার মণ্ডল ৭৩৪

ভগীরথ মিশ্রের উপন্যাস
প্রভাস চন্দ্র দেহুরী ৭৪০

মানভূমের ভাষা আন্দোলনে লোকসেবক সংঘের অবদান
পূর্ণচন্দ্র মহাপাত্র ৭৫০

ব্রাত্যজনের গল্পকার হরিশংকর জলদাস
তরুণকান্তি মন্ডল ৭৫৯

মার্কসবাদী 'প্রোপাগাণ্ডিস্ট' উৎপল দত্ত
কমলেশ মণ্ডল ৭৬৩

সুব্রতা ঘোষ রায়ের কবিতা ঃ 'জল যেন কবিতা' স্বগতোক্তির বহিঃপ্রকাশ
দেবাশিস ঘোষ ৭৭২

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ঃ অনন্য মনীষা, শিক্ষাদান ও বিজ্ঞান সাধনা
মনোজ কুমার পাত্র ৭৮১

Women In Nineteenth Century Bengal: An Analysis
Through The Prism of The Kartabhaja Sect
Chanchal Chowdhury ৭৯২

Discussion on Some Aspects of Tribal Migration and
Their Engagement of Modern Economic Sectors in
North-East India during the British Regime
Shipra Mondal ৮০২

Preventive conservation of the traditional fishing tools by the
fishermen of sunderban in West Bengal
Ashis Majumdar ৮১৩

Scanned by TapScanner

মার্কসবাদী ‘প্রোপাগাণ্ডিস্ট’ উৎপল দত্ত

কমলেশ মণ্ডল

গবেষক, বাংলা বিভাগ

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

উৎপল দত্ত একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন— “আমি মনে করি, আমি প্রকৃত স্তালিনবাদী।”[১] তাঁর স্মৃতিচারণামূলক প্রবন্ধ ‘লিট্‌ল থিয়েটার ও আমি’ সেখানে তিনি মন্তব্য করেছিলেন—

> “বারম্বার রাজনৈতিক দলের পাশে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিক নাটকই আমরা করে যাব। এবং ক্রমান্বয়ে রাজনীতি শিখব দম্ভ ও গরিমা ত্যাগ করে।” [২]

বাংলা নাটকে যারা সাহসিকতার সঙ্গে রাজনীতিকে মঞ্চে নিয়ে এসেছেন এবং জনপ্রিয় করে তুলেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন উৎপল দত্ত। বাংলা নাটকে রাজনীতি নিয়ে কথা বলার ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে উৎপল দত্তের অবদান সবচেয়ে বেশি। অনেকে রাজনৈতিক নাটক এবং উৎপল দত্তকে সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করতে কুণ্ঠাবোধ করেন না। উৎপল দত্ত প্রথম নাট্যকার যিনি রাজনৈতিক ঘটনা নিয়ে সরাসরি নাটক লিখেছেন। পূর্বসূরিদের থেকে উৎপল দত্ত এখানেই একেবারে স্বতন্ত্র। উৎপল দত্ত একান্তভাবেই সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ, উপনিবেশিকতাবাদ-এর বিরোধী এক বিশিষ্ট রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির নাট্যকার। এই সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ ও শোষণের বিরুদ্ধে তাঁর কলম গর্জে উঠছে সদা সর্বদা।

উৎপল দত্ত ছিলেন ‘পার্টিজান’। তার ‘Towards A Revolutionary Theatre’ গ্রন্থে লিখেছেন—

> “I am Partisan, not neutral, and I believe in political struggle the day I cease to participate in political struggle, I shall be dead as an artist too.” [৩]

উৎপল দত্ত আদ্যন্ত মার্কসবাদী আদর্শে বিশ্বাসী একজন নাট্যকার ছিলেন। মার্কসীয় দর্শন সমস্ত জীবন ধরে তিনি লালন-পালন ও বহন করে গেছেন। তাঁর নাটকের প্রতিটি আঙ্গিকে মার্কসীয় ধ্যান-ধারণা, চিন্তাভাবনা ও তাঁর আদর্শের কথা পরিলক্ষিত। ছোটো থেকেই উৎপল দত্ত মার্কসীয় আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করতেন। মার্কসবাদের প্রতি আকর্ষণ ও রাজনৈতিক চেতনা অঙ্কুরিত হয়েছিল স্কুলে পড়ার সময় থেকেই—

> “ইস্কুলে থাকতেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লাল ফৌজের মহান প্রতিরোধ ও প্রত্যাক্রমণের কাহিনী পড়ে চমকিত হতাম। স্তালিনের সহজ ও তীক্ষ্ণ ভাষায় লেখা প্যামফ্লেট ও বই তখন থেকে পড়েছি।

ইস্কুল শেষ হতে না হতে লেনিন, মার্কস, এঙ্গেলস— এমনকি হেগেল, ফয়েরবাখ, কান্টে প্রমোশন নিয়েছি।” [৪]

উৎপল দত্ত ছিলেন প্রোপাগান্ডিস্ট-মার্কসবাদের প্রোপাগান্ডিস্ট। তিনি সগর্বে সব সময় বলতেন—

“আমি শিল্পী নই। নাট্যকার বা অন্য যে কোন আখ্যা লোকে আমাকে দিতে পারে। তবে আমি মনে করি আমি প্রোপাগান্ডিস্ট। এটাই আমার মূল পরিচয়।” [৫]

নিজেকে ‘প্রোপাগান্ডিস্ট’ বলতে তাঁর কোনোরকম দ্বিধাবোধও ছিল না। তাঁর নাটক বিপ্লবের বিশ্বাসে ভরা এবং তাঁর মনটি ছিল সদা সর্বদা প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে পূর্ণ। যখনই যেখানে শ্রমিক-কৃষক-মজদুর শ্রেণির স্বার্থ বিঘ্নিত তখনই তিনি তাঁর লেখনী ধারণ করেছেন, গর্জে উঠেছে তাঁর কলম। বামপন্থী আদর্শ সদা সর্বদা জাগ্রত ছিল তাঁর লেখনীতে।

শিল্প-সাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে লেনিন দুই রকমের প্রচারের কথা বলেছিলেন— ‘প্রোপাগান্ডা’ এবং ‘এজিটেশন’। ‘প্রোপাগান্ডা’ হল আমাদের সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে মানুষের মনে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও ঘৃণা জাগ্রত করা। শিল্প-সাহিত্যের মাধ্যমে মানুষের মনের মধ্যে এই প্রকার প্রচার করে যাওয়া হল ‘প্রোপাগান্ডা’। শিল্প-সাহিত্যের মাধ্যমে মানুষের মনের গভীরে প্রবেশ করে সমাজ সম্পর্কে ঘৃণা জাগ্রত করাই হল ‘প্রোপাগান্ডা’র মূল উদ্দেশ্য। ‘এজিটেশন’ হল কোনো একটা তাৎক্ষণিক বিষয়ের উপর মানুষকে সচেতন করে রুষ্ট করে তোলা। বিভিন্ন পথনাটিকা এই ‘এজিটেশন’-এর অংশ। ‘প্রোপাগান্ডা’-তে জীবন ও মানুষের চরিত্রের মধ্য দিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে, শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে, সামাজিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে মানুষের জীবন সংগ্রামের কথা থাকবে। মানুষকে ভাবিত করে তার চেতনার বিকাশ ঘটাবার প্রচেষ্টা থাকে। মানুষের মনের গভীরে কাজ করে যাওয়া এই প্রচারকেই বলে ‘প্রোপাগান্ডা’। ‘প্রোপাগান্ডা’ মানুষকে ভাবিত করে মনের গভীর পৌঁছে মানসিকতার পরিবর্তন ঘটায়।

উৎপল দত্তের রাজনীতি ছিল মার্কসবাদী রাজনীতি, শ্রেণি সংগ্রামের রাজনীতি, সমাজ শোষণ ও রাজনৈতিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে জাগ্রত জনতার সমবেত প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও সংগ্রামের রাজনীতি। সমস্ত জীবন তিনি মার্কসবাদী ধ্যান-ধারণা বহন করে চলেছিলেন। স্কুল ও কলেজে যে সমস্ত বামপন্থী বইপত্র পড়েছিলেন সেগুলি তাঁকে বামপন্থী রাজনীতির প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট করে তুলেছিল। কলেজ ছাড়ার পর মার্কসবাদ সম্পর্কে আরও গভীরভাবে পড়াশোনা শুরু করেন। গণনাট্যে যোগদান করে তিনি সরাসরি যুক্ত হয়ে পড়েন সেইসময়কার আন্তর্জাতিক বিভিন্ন

পরিস্থিতি নিয়ে বাক্‌বিতন্ডা, মতপার্থক্য ও বিভিন্ন বিষয়ের বিচার-বিশ্লেষণে। সে সময় তাঁর চোখের সামনে ঘটতে থাকে কমিউনিস্ট পার্টির উপরে নানা রকম অত্যাচার ও বে-আইনিকরণ। বন্দিদের উপর গুলি চালানো, কাকদ্বীপে নারী হত্যা; ডিব্রুগড়ে গণনাট্য সংঘের অনুষ্ঠানে গুলি বর্ষণ, বউবাজারে নারী মিছিলের উপরে বেপরোয়া গুলি বর্ষণ— এইসব ঘটনাবৃত্তান্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলে তাঁর ব্যক্তিজীবনে ও তাঁর নাট্যশিল্পকর্মে। উৎপল দত্তের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়—

> "তখন একেবারে উত্তাল কলকাতার রাস্তা এবং আক্রান্ত হচ্ছে কমিউনিস্টরা। ... কংগ্রেসীরা আক্রমণ করছে কমিউনিস্টদের। এই প্রথম আমার চোখের সামনে কালীঘাটের পার্টি অফিস আক্রান্ত হয়। এবং সেখান থেকে কমরেডদের টেনে বার ক'রে ক'রে রাস্তায় ফেলে মারছে, এইসব আমি দেখি। কলেজ যাতায়াতের পথে।" [৬]

এইসব ঘটনাবৃত্তান্ত দেখে উৎপল দত্তের মনে অত্যাচারীদের প্রতি গভীর ঘৃণা ও অত্যাচারিতদের প্রতি সমবেদনা ও সহমর্মিতা জাগ্রত হয়। উৎপল দত্তের ভাষায়—

> "এইভাবে প্রথমে just একটা sympathy হয়।" [৭]

মাকর্সবাদের প্রতি তাঁকে আরও আকৃষ্ট করে তোলে। বামপন্থীদের বিভিন্ন কর্মপন্থা, যথা— বিভিন্ন আন্দোলন, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ প্রভৃতি অনেক কাছ থেকে গভীরভাবে লক্ষ করেন; এবং মার্কসবাদকে তাঁর সত্তায় ধারণ করেন। তিনি মার্কসবাদীদের বিভিন্ন কর্মপন্থাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবন করেছেন এবং সেই বামপন্থী আদর্শকে তাঁর নাট্যসৃষ্টির মধ্যে অতি নিপুণ ও দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। তাঁর শিল্পকর্মের মধ্যে আজীবন মার্কসবাদকে বহন করে গেছেন, প্রোপাগান্ডা করে গেছেন মার্কসবাদী আদর্শকে।

পথনাটকের রচনা ও অভিনয়ের ক্ষেত্রে যুগস্রষ্টা ছিলেন উৎপল দত্ত। তিনি মার্কসবাদী হিসেবে প্রতিটি নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির প্রচারে পথনাটককে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ১৯৫০ সালে মহেশতলা উপনির্বাচনে কমরেড সুধীর ভাণ্ডারীর প্রচারে উৎপল দত্ত ও তাঁর সহযোগীরা দিনরাত পরিশ্রম করে পথনাটক অভিনয় করেন, যা নিহারেন্দু দত্ত মজুমদারের হারের অন্যতম কারণ হয়ে উঠেছিল। মহেশতলা উপনির্বাচনের ফলাফল যখন কংগ্রেসের নিহারেন্দু দত্ত মজুমদার বিপুল ভোটে পরাজিত হলেন তখন কমিউনিস্ট পার্টির তরফ থেকে উৎপল দত্তকে ও তাঁর সহযোগীকে বিশেষ প্রশংসা করা হয়েছিল এবং নির্বাচনে জয়ের প্রধান কৃতিত্ব তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। উৎপল দত্তের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়—

"সারাদিন এলাকা ঘুরে ঘুরে অভিনয়। ... পরদিন ভোর থেকে আবার টহল— হেঁটে, লরিতে, জগদ্দলের মতন এক বিস্ফোরক মোটরগাড়িতে। বাটা কারখানার গেটে, নুংগিতে, বজবজে, দশ-বারো মাইল দূরের গাঁয়ে, মহেশতলার প্রতি পথের মোড়ে।" [৮]

মার্কসবাদ হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণির মতবাদ। মার্কসবাদী রাজনীতি শ্রমিক শ্রেণির রাজনীতি। প্রকৃতপক্ষে মার্কসবাদকে বুঝতে গেলে শ্রমিক শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বুঝতে হয়। 'ব্রেখ্‌ট ও মার্কসবাদ' প্রবন্ধে উৎপল দত্ত বলেছেন—

"দার্শনিকদের তথাকথিত নিরপেক্ষ ও শীতল মস্তিষ্ক বিশ্লেষণে জগতের আসল সত্য ধরা পড়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই। শ্রমিকের একপেশে ও জঙ্গি উপলব্ধিতেই বরং জগৎকে বোঝা সম্ভব। এবং বুঝে তাকে পরিবর্তিত করাও সম্ভব। মার্কসবাদ হচ্ছে শ্রমিক শ্রেণির মতবাদ। শ্রমিকশ্রেণির সঙ্গে নাট্যশালার সাযুজ্য ঘটাবার ব্রেখ্‌টীয় দাবি তাহলে শুধু একটা রণধ্বনি নয়, সেটা হচ্ছে জগৎ, মানুষ, সমাজ, উৎপাদন-সম্পর্ক সব বুঝবার একমাত্র পথ। সেটা হচ্ছে সত্যে পৌঁছুবার একমাত্র উপায়।" [৯]

উৎপল দত্ত শ্রমিক শ্রেণিকে তথা শ্রমিক আন্দোলনকে নাট্যাঙ্গনে নিয়ে এলেন। শ্রমিক শ্রেণির দুর্দশা, তাদের প্রতি শোষণ অত্যাচারের কাহিনি নিয়ে লিখলেন কালজয়ী নাটক 'অঙ্গার'। স্কুলে ও কলেজে পড়ার সময় বামপন্থী সম্পর্কে, কমিউনিজম সম্পর্কে যে পুথিগত শিক্ষা অর্জন করেছিলেন তা সরাসরি নাটকের মধ্যে প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তার বাস্তবায়ন ঘটিয়ে ছিলেন, 'শ্রমিক শ্রেণিকে নাটকে আনয়ন'-এর মধ্যে দিয়ে। এ বিষয়ে উৎপল দত্তের স্পষ্ট বক্তব্য ছিল—

"বাংলার পেশাদার নাট্যশালায় তখনো পর্যন্ত শ্রমিক শ্রেণি আসেনি, শ্রমিককে অচ্ছুৎ করে রাখা হয়েছিল পেশাদার থিয়েটারে, এমনকি গণনাট্য সংঘের নাটকগুলিও তখন আবর্তিত হচ্ছিল 'কিছু চাষীর কান্না বা মধ্যবিত্ত পরিবারের বিলাপের মধ্যে'।" [১০]

বিহারের ধানবাদ অঞ্চলে বড়াধেমো কয়লা খনির দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে 'অঙ্গার' নাটকটি লেখা হয়। সেখানকার কয়লা খাদানে আগুন লেগে যাওয়া ও জল ঢুকে যাওয়ার ফলে খনি শ্রমিকদের মর্মান্তিক অবস্থা নিয়ে নাটকটি লিখিত হয়। উৎপল দত্ত ও তার কয়েকজন সহকর্মীরা বড়াধেমোয় গিয়ে বাস্তব অবস্থা দেখলেন, যেসব শ্রমিকরা বেঁচে ফিরেছিল তাদের সাক্ষাৎকার নিলেন, শ্রমিকদের বাস্তব জীবন ও তাদের শোষিত অবস্থার নির্মম অভিজ্ঞতাগুলি উপলব্ধি করলেন। নাটকটির শেষ দৃশ্যে কয়লাখনি গহ্বরে জল ঢুকে যাওয়া, স্রোতের সঙ্গে ডুবন্ত শ্রমিকদের প্রাণ বাঁচানোর মর্মান্তিক লড়াই বাংলা থিয়েটারের কিংবদন্তি হয়ে আছে, অমর হয়ে আছে শ্রমিক আন্দোলন ও তাদের বাঁচার লড়াই।

উৎপল দত্ত চেয়েছিলেন শ্রেণি-সংগ্রামকে নাটকে ব্যবহার করতে হবে। 'অঙ্গার' নাটকে শ্রমিক শ্রেণিকে মঞ্চে তুলে ধরলেন। এরপরে নাটক 'ফেরারী ফৌজ', যেখানে দেখা গেল বিপ্লবীদের কার্যকলাপ। 'তিতাস একটি নদীর নাম'-এর নাট্যরূপ দিলেন, সেখানে দেখা গেল শ্রমজীবী মানুষের জীবন সংগ্রাম ও বেঁচে থাকার লড়াই। এর থেকে স্পষ্ট হচ্ছিল উৎপল দত্তের শ্রেণি দৃষ্টি বা শ্রেণি সংগ্রাম একটি সুনির্দিষ্ট দিকেই অগ্রসর হচ্ছে। এই শ্রেণি সংগ্রামের পথ ধরেই ১৯৬৫ সালে এল কালজয়ী নাটক 'কল্লোল'।

উৎপল দত্ত মার্কসবাদী শিল্পীর শিল্প সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে শ্রমিক শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে অন্বিত করলেন। কমিউনিস্ট পার্টি যেহেতু শ্রমিক শ্রেণির পার্টি, তাই শ্রমিকের চেতনার জগৎ ও মানসিক জগৎকে জানতে ও বুঝতে গেলে পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলা অতি আবশ্যকীয়। কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে মার্কসবাদী শিল্পীর চেতনা আবিলতায় আচ্ছন্ন তো হয় না বরং শ্রমিকদের চেতনার জগৎকে বোঝা সম্ভব হয়। উৎপল দত্তের ভাষায়—

> "কোনো দলের নেতৃত্ব স্বীকার করলেই যে শিল্পী স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে তার স্বাধীন থাকারই কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। নির্দেশ কোনো পার্টিই দেয় না, দেয় রাজনৈতিক লাইন। সে লাইন সাংস্কৃতিক জগতে প্রয়োগ করার ভার নাট্যদলগুলির। সে-লাইন অনুসরণ না করলে শ্রেণি সংগ্রামে নাটককে শামিলই করা যাবে না।" [১১]

উৎপল দত্ত বিশ্বাস করতেন শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শাসকশ্রেণির দ্বারা শোষিত মানুষের ওপরে নানা অত্যাচার ও দমন-পীড়ন, শ্রেণি হিংসা এক অনিবার্য সত্য। সারা বিশ্বে একই চিত্র। উৎপল দত্ত মনে করেন সব দেশের মতোই ভারতের ইতিহাস শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস, অনবরত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ইতিহাস, যুগে যুগে শাসকের অত্যাচার, নিপীড়ন, নির্যাতন ও শোষিতের প্রতিরোধের ইতিহাস। তিনি মনে করতেন ভারতবর্ষের মানুষকে জানাতে হবে তাদের ইতিহাসকে, অত্যাচারিত-শোষিত-নিপীড়িত শ্রমিক শ্রেণির কাছে তুলে ধরতে হবে তাদের সংগ্রামী ঐতিহ্য। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের প্রায় প্রতিটি অধ্যায়কেই তিনি মার্কসবাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁর শিল্পকর্মে তুলে ধরেছেন। তাঁর নাটকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের বিষয়গুলি একাধিকবার ফিরে এসেছে,— 'ফেরারী ফৌজ', 'কল্লোল', 'টোটা', 'তিতুমীর' প্রভৃতি। যাত্রার সংখ্যাটা আরও বেশি— 'রাইফেল', 'সন্ন্যাসীর তরবারি', 'কুঠার', 'জালিয়ানওয়ালাবাগ', 'নীলরক্ত', 'দিল্লী চলো', 'স্বাধীনতার ফাঁকি', 'বৈশাখী মেঘ' প্রভৃতি। কেননা তিনি মনে করতেন—

> "সশস্ত্র বিদ্রোহের দীর্ঘ ঐতিহ্যটাকে রক্ষা করতে হবে। কারণ আগামী বিপ্লবটা তারই পরিণতি, ফলশ্রুতি, উত্তরাধিকারী।" [১২]

নাটকে ও যাত্রাপালায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের ইতিহাস বারে বারে ফিরে আসা নিয়ে এক সাক্ষাৎকারে তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল যে, "অতীত ইতিহাসের একটা Period নেওয়া এবং সেটাকে closely project করা"— এটা আপনাকে বারে বারে আকর্ষণ করে কেন? জবাবে উৎপল দত্ত বলেছিলেন—

> "মার্কসবাদী দৃষ্টিতে ইতিহাসকে না দেখলে মার্কসবাদী দৃষ্টিতে বর্তমানকেও দেখা যায় না। এটা আমরা বিশ্বাস করি, এবং নাটকের একটা অন্যতম প্রধান কাজ হচ্ছে অতীতকে সঠিকভাবে মার্কসবাদী আলোকে তুলে ধরা। কেননা, আগের সমস্ত বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানেরই ঐতিহ্য বহন করছে আজকের কমিউনিস্টরা। কমিউস্টিরা কোনও ভুঁইফোড় শক্তি নয়। তারা পৃথিবীতে যত বিপ্লব আগে হয়ে গেছে, সে সমস্ত ঐতিহ্যের তারা হচ্ছে উত্তরসূরী।" [১৩]

আন্তর্জাতিক নাটক ও পালাগুলিতে বিষয় হিসেবে চয়ন করেছেন বিভিন্ন দেশের শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাস। 'মে দিবস', 'রক্তাক্ত ইন্দোনেশিয়া', 'লেনিন কোথায়', 'স্তালিন', 'অজেয় ভিয়েতনাম', 'মানুষের অধিকারে', 'নীল সাদা লাল' প্রভৃতি নাটকগুলির মধ্য দিয়ে উৎপল দত্ত ভারতবর্ষের নিরক্ষর শ্রমজীবী মানুষের কাছে পৃথিবীর শ্রমিক সংগ্রামের ইতিহাস পৌঁছে দেওয়ার জন্য সদা সর্বদা প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য তাঁর প্রধান উপজীব্য বিষয়। ভারতবর্ষের শ্রমজীবী মানুষের যে সংগ্রাম, তা সারা পৃথিবীর শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামের অংশ। এই সত্য উৎপল দত্ত বারে বারে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন এদেশের শ্রমিকের কাছে, যাতে তারা বুঝতে পারে যে, তারা বিচ্ছিন্ন নয়, তারা পৃথিবীর সমস্ত শ্রমিক শ্রেণির শরিক। তাদের দুঃখ, যন্ত্রণা ও কষ্ট বিচ্ছিন্ন নয়। তাদের দুঃখ-কষ্টের ভাগীদার পৃথিবীর সমস্ত শ্রমিক শ্রেণি। নাটক ও পালার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের সর্বহারা শ্রমজীবী মানুষ এই বিশ্বাস অর্জন করবে যে, বিশ্বজুড়ে রয়েছে তাদের সহযোদ্ধারা। কারণ উৎপল দত্ত শ্রমিক আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাস করতেন। তাঁর ভাষায়—

> "আমরা শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাস করি।... আমি ১৯১৭ সালের ভাষায় কথা কইছি— যখন লেনিন ছিলেন। যখন পৃথিবীর কোথাও কোনো শ্রমিকের ওপর আক্রমণ হলে সেটা সোভিয়েত দেশ নিজের ওপর আক্রমণ ব'লে মনে করতো।" [১৪]

উৎপল দত্তের কাছে নাট্য জগৎটা ছিল যুদ্ধক্ষেত্রের মতো, শ্রেণি সংগ্রামের রণক্ষেত্র। যেখানে তিনি বামপন্থী আদর্শে বিশ্বাসী একজন যোদ্ধা, শ্রেণি সংগ্রামের যোদ্ধা। উৎপল দত্তের নাটকে বারে বারে তিনি শ্রেণি সত্য বা 'class truth' বিষয়টি তুলে ধরতে চেয়েছেন। মঞ্চের ওপরে সারা জীবনে নাট্যচর্চার মাধ্যমে যে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছাতে চেয়েছেন তা হল— শ্রেণি সত্য।

তিনি ‘শ্রেণি সত্য’ ধারণাটিকে তাঁরা থিয়েটারের দার্শনিক ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর সব শিল্পকর্মই সৃষ্টি হয়েছিল ‘শ্রেণি সত্য’-এর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। তিনি এক মুহূর্তের জন্য শ্রেণি সত্যের ঊর্ধ্বে কোনো বিমূর্ত সত্য, আধ্যাত্মিক সত্য বা শাশ্বত সত্য বিশ্বাস করতেন না। তাঁর মতে—

> “সত্য সর্বসময়ে শ্রেণি সত্য— ক্লাস ট্রুথ। হয় আপনি এ-শ্রেণীর সত্য বলবেন, না-হয় ও-শ্রেণীর সত্য। হয় আমরা কৃষকের পক্ষে কথা কইব, নইলে জোতদারের। হয় শ্রমিকের সত্য উচ্চারণ করবো, নইলে মালিকের। মাঝামাঝির দালালি তো সত্যর ক্ষেত্রে খাটে না। রাজনৈতিক নাটকের অবলম্বনই শ্রেণি সত্য।” [১৫]

‘রাজনৈতিক নাটক, একটি কলহ’ প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে রাজনৈতিক নাটককে বাস্তবের তথ্য থেকে শ্রেণি সত্যে উপনীত করতে হয়।

> “ ‘মালো পাড়ার মা’ নাটকের ‘অখ্যাত মালো পাড়াকে নিকারাগুয়া, এল সালভদরের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়’।” [১৬]

উৎপল দত্তের নাটক ছিল শ্রমিক শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সৃষ্ট বিপ্লবী নাটক। তাঁর মতে একমাত্র শ্রমিকের দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করলেই তবেই মার্কসবাদী শিল্পচিন্তার মর্মবস্তুকে হৃদয়াঙ্গম করা সম্ভব। তাঁর শিল্পকার্যে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গির মূল নীতিগুলি সফলভাবে প্রয়োগ করেছিলেন। মার্কসবাদ সম্পর্কে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি অবিচল দায়বদ্ধতা ছিল তাঁর শক্তির উৎস। নিজের রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় তিনি হয়ে উঠেছিলেন এক স্বাধীনচেতা ও স্বনির্ভর মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী। তিনি বলতেন—

> “আমি প্রোগাগান্ডা করে বেড়াই আমার আদর্শকে, আমার কমিউনিজমকে। আমার নাটকের মাধ্যমে, বক্তৃতার মাধ্যমে আমি আমার আদর্শকে প্রচার করে যেতে চাই। এটাই আমার ধর্ম।” [১৭]

—একথাগুলি সার্থক ও যুক্তিযুক্ত।

উৎস নির্দেশ :

১. উৎপল দত্ত, সাক্ষাৎকার, ‘অনুষ্টুপ’ পত্রিকা, গ্রীষ্ম সংখ্যা, ১৩৯০ বঙ্গাব্দ, পৃ ২৩

২. উৎপল দত্ত, ‘লিট্‌ল থিয়েটার ও আমি’, ‘এপিক থিয়েটার’, মার্চ, ১৯৯৪, পৃ ৬৫

৩. Utpal Dutta, “Political Theatre”, ‘Towards A Revolutionary Theatre’, M. C. Sarkar & Sons Pvt. Ltd., 1995, P. 34

৪. পূর্বোক্ত, 'লিট্‌ল থিয়েটার ও আমি', পৃ ৪৭
৫. শোভা সেন, 'ব্যারিকেডে দাঁড়িয়ে তুমি আর আমি', 'উৎপল দত্ত এক সামগ্রিক অবলোকন', সম্পা : নৃপেন্দ্র সাহা, উৎপল দত্ত নাট্যোৎসব ২০০৫ কমিটি, ৭ নভেম্বর ২০০৫, পৃ ১৩৩
৬. উৎপল দত্ত, সমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, 'শুদ্রক', 'শরৎ' ১৪০০, পৃ ১২৫
৭. তদেব, পৃ ১২৫
৮. পূর্বোক্ত, 'লিট্‌ল থিয়েটার ও আমি', পৃ ৫৩
৯. উৎপল দত্ত, 'ব্রেখ্‌ট্‌ ও মার্কসবাদ', 'স্তানিস্‌লাভ্‌স্কি থেকে ব্রেখ্‌ট্‌', উৎপল দত্ত, গদ্য সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড), সম্পা : সমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি ১৯৯৮, পৃ ২৮৫
১০. পূর্বোক্ত, 'লিট্‌ল থিয়েটার ও আমি', 'এপিক থিয়েটার, মার্চ ১৯৯৪, পৃ ৫৪
১১. উৎপল দত্ত, 'রাজনৈতিক নাটক, একটি কলহ', 'জপেন দা জপেন যা', উৎপল দত্ত গদ্য সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড), পৃ ২৩১
১২. উৎপল দত্ত, 'শিকড়', 'জপেন দা জপেন যা', উৎপল দত্ত গদ্য সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড), পৃ ১৮৩
১৩. উৎপল দত্ত, সমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, 'শূদ্রক', শরৎ, ১৪০০, পৃ ১৪৫
১৪. উৎপল দত্ত, সাক্ষাৎকার, 'দেশ', ৩০ মার্চ, ১৯৯১, পৃ ৪৪
১৫. পূর্বোক্ত, উৎপল দত্ত, 'রাজনৈতিক নাটক, একটি কলহ', পৃ ২২৯
১৬. তদেব, পৃ ২৩১
১৭. পূর্বোক্ত, 'ব্যারিকেডে দাঁড়িয়ে তুমি আর আমি', পৃ ১৩৩

কমলেশ মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
whatsApp No. 8646854976